কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে

ডঃ উইলিয়ম কেম্পবেল

দ্বিতীয় সংস্করণ

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে

কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস

আমি ছাড়া আর মাবুদ নেই; আমি ন্যায়বান আল্লাহ্‌,
আমি উদ্ধারকর্তা।
আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।
"হে দুনিয়ার সব শেষ সীমাগুলো, আমার দিকে ফেরো এবং উদ্ধার পাও,
কারণ আমিই আল্লাহ্‌, আর কেউ মাবুদ নয়।
আমি নিজের নামেই কসম খেয়েছি,
আমার ন্যায্যতায় আমি এই কথা বলেছি,
আর তা বাতিল হবে না।
সেই কথা হল, আমার সামনে প্রত্যেকে হাঁটু পাতবে
এবং আমার অধীনতা স্বীকার করবে।
তারা আমার বিষয় বলবে,
'কেবল মাবুদের মধ্যেই সততা ও কুদরত আছে।

– ইশাইয়া ৪৫:২১খ-২৪ক

লেখক:

ডঃ উইলিয়ম এফ ক্যাম্পবেল, এম.ডি.

মূল (ইংরেজী)
গ্রন্থস্বত্ব © **১৯৮৬**, ২০০২ আরব ওয়ার্ল্ড মিনিস্ট্রিস
দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই বইয়ের সম্পূর্ণ অংশ বা এর
কোনো অংশবিশেষ প্রকাশ করা যাবে না।
ISBN 1-881085-03-01
মিডেল ইস্ট্ রিসোর্সেস
পোষ্ট বক্স ৯৬
আপার ডার্বি, পিএ **১৯০৮২**

বঙ্গানুবাদ:
প্রথম সংস্করণ, ২০০৮

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

প্রথম খণ্ড
গোড়ার কথা

প্রথম অধ্যায় শব্দ সম্পর্কে কতগুলো প্রাথমিক অনুমান ১২

দ্বিতীয় অধ্যায় ডঃ বুকাইলির নিজস্ব প্রাথমিক অনুমান ২৮

দ্বিতীয় খণ্ড
কোরআন ও হাদিসের আলোকে কিতাবুল মোকাদ্দস

প্রথম অধ্যায় : কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : হাদিস ও সুন্নাহ ৭৬

তৃতীয় খণ্ড
কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন:
উভয় কিতাবের সংকলনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে

প্রথম অধ্যায় : "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল"(Documentary Hypothesis) মতবাদ—
তৌরাত ও কোরআনের ওপর এর আরোপিত প্রভাব ৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : গাঠনিক সমালোচনা (Form Criticism) মতবাদ—
কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের ওপর এর প্রভাব ১১৯

তৃতীয় অধ্যায় : তুলনামূলকভাবে কোরআন ও ইঞ্জিলের ইতিহাস ১২৯

ক। কোরআন ও ইঞ্জিলের প্রচারের শুরু ১২৯

খ। কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের চূড়ান্ত সংকলন ১৪৭

গ। কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের ভিন্ন-পাঠ ১৬৪

ঘ। প্রাথমিক যুগের সংঘাত ও বিরোধীতার সাথে
ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংঘাত ও বিরোধীতার তুলনা। ১৮১

ঙ। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিলের বিকাশ ১৯৭

চ। ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআনের প্রচারের পর্যালোচনা ২০৯

চতুর্থ খণ্ড

বিজ্ঞান এবং ওহী

প্রথম অধ্যায় : কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ২১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : কোরআনে কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা (ভুল?!) নেই ২২৫

ক। আসমান, পৃথিবী, এবং ৬ বা ৮ দিনের সৃষ্টি ২২৫

কোনো ভুল নেই

খ) এনাটমি, ভ্রূণ বিদ্যা ও বংশগতিবিদ্যা ২৪২

কোনো ভুল নেই

গ) উপকথা, রূপক বর্ণনা ও ইতিহাস ২৮১

পঞ্চম খণ্ড

ওহী প্রমাণ করার পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায় : আল্লাহ্‌র সৃষ্টিক্ষমতার প্রমাণ ও
কোরআন অনুসারে ওহী যাঁচাই করার পদ্ধতি ২৯৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : তৌরাত অনুসারে ওহী যাঁচাই করার পদ্ধতি ৩০৬

ষষ্ঠ খণ্ড

ঈসা মসীহ্ ও হজরত মুহাম্মদ (দঃ) - পথভ্রষ্ট দুনিয়ার জন্য দুইজন নবী?

প্রথম অধ্যায় : হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত ৩১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঈসা মসীহের নবুয়ত ও মসীহ্ হিসেবে তাঁর কাজ ৩৫১

তৃতীয় অধ্যায় : ঈসা মসীহের নবুয়ত ও মসীহ্ হিসেবে তাঁর কাজ (আরো তথ্য) ৩৬৩

চতুর্থ অধ্যায় : কষ্টভোগী মসীহ্ ৩৭৬

পঞ্চম অধ্যায় : সাফায়াত করার ক্ষমতা ৩৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধার্মিক গোলাম ও সাফায়াতকারী রূপে ঈসা মসীহের ভূমিকা ৪১৩

সপ্তম অধ্যায় : প্রতিটি লোক নিজের ভাষায় শুনেছে ৪২০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক : ঈসা মসীহের মোজেজার প্রত্যক্ষদর্শীদের আনুমানিক সংখ্যা ৪২৫

পরিশিষ্ট খ : মসীহের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী ও এর পূর্ণতা ৪৪০

পাণ্ডুলিপির ছবি

ছবি ১।	Papyrus p46, ১ করিন্থীয় ১৫, ২০০ খ্রীষ্টাব্দ	১৪৬
ছবি ২।	কোরআন, সূরা আল-নূর ২৪:৩৪-৩৭, ১৫০ হিজরী	১৬৬
ছবি ৩।	কোডেক্স ভেটিকানাস, ইউহোন্না ৮-৯, ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ	১৭৬
ছবি ৪।	Papyrus p52, ইউহোন্না ১৮:৩১-৩৩, ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	২০১
ছবি ৫।	Papyrus p75, লূক ২৪:৩১-৫০, ২০০ খ্রীষ্টাব্দ	২০৩
ছবি ৬।	কোডেক্স সিনাইটিকাস, ইউহোন্না ১, ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ	২০৬
ছবি ৭।	Papyrus p75, ইউহোন্না ১৪:৯-২৬ ২০০ খ্রীষ্টাব্দ	৩২৬
ছবি ৮।	ডেড সি স্ক্রোল, ইশাইয়া ৫৩, ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	৩৭৭
ছবি ৯।	Papyrus p66, ইউহোন্না ১০:১৩-১৭ ২০০ খ্রীষ্টাব্দ	৩৮২

প্রকাশকের কথা

এই বইয়ের দেওয়া কোরআন শরীফের আয়াতের উল্লেখিত সংখ্যা হয়ত মাঝে মাঝে আপনার কোরআন শরীফের সাথে মিলবে না। তার কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন অনুবাদকারীগণ আয়াতের সংখ্যাগুলো একটু ভিন্নভাবে গণনা করেন। সেজন্য যদি মিলে না যায় তবে সেই আয়াতের আগের কয়েকটা আয়াত এবং পরের কয়েকটা আয়াত পর্যন্ত পড়বেন। সম্ভবত তা করলে আসল আয়াতটা পাওয়া যাবে।

আরবী-বাংলা অনুলিখন

আরবী হরফ

ا		ق	ক্ব
ب	ব	ك	ক
ت	ত	ل	ল
ث	ছ	م	ম
ج	জ্ব	ن	ন
ح	হ	ه	হ
خ	খ	و	উ
د	দ	ي	ইয়া
ذ	জ	ء	'
ر	র	**হরকত**	
ز	য	ـَ	আ
س	স	ـِ	ই
ش	শ	ـُ	উ
ص	ছ		
ض	দ্ব	ـَا	আ
ط	ত্ব	ـِي	ঈ
ظ	জ	ـُو	ঊ
ع	'		
غ	',গ,ঘ		
ف	ফ		

ভূমিকা

কেন একটা বইয়ের জবাব দেবার জন্য আরেকটি বই লেখা হলো?

যদিও দশ বছর আগে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, তবু এত দিন পর কেন তা আবার পড়ার প্রয়োজন হলো?

ওই বইয়ে এমন কী ছিল, যার উত্তর লেখার জন্য একজন ডাক্তার ৩ বছর ওষুধপত্র থেকে দূরে ছিলেন?

*ওই বইটা **তিউনিশিয়া** ও **মরক্কোর** প্রায় প্রতিটি বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।*

গোটা **আমেরিকায়** আলোড়ন তোলা সেই বইটি, যে-বইটি একজন মিশরীয় যুবকের হাতে দেখা যায়, যে যুবকটি তাঁর প্রেমিকাকে ওই বইটি পড়িয়ে প্রভাবিত করতে চায়।

ওটাই প্রথম বই যা **লন্ডনের** রিজেন্ট পার্কের মসজিদের বইয়ের তাকে কোরআন ও হাদিসের ঠিক নিচেই থাকে।

ওটাই প্রথম বই যা কোনো কোনো লোকের কাছে এতো মূল্যবান বলে মনে হয়েছে যে, ১৯৮৩ সাল থেকে এই বইটি *মূল ফরাসী ভাষা ছাড়াও ইংরেজী, আরবী, ইন্দোনেশিয়ান, ফারশী, সার্বক্রোয়েশীয়, তুর্কী, উর্দূ, এবং গুজরাটি* ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

আমি তিউনিশীয় এক যুবকের কাছে প্রথম ওই বইটির কথা শুনি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, একজন ফরাসী ডাক্তার ওই বইটি লিখেছেন। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "আপনি কি ডঃ মরিস বুকাইলির লেখা ***কিতাবুল মোকাদ্দস, কোরআন ও বিজ্ঞান*** বইটি পড়েছেন? তিনি ওই বইয়ে কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। এমনকি তিনি এই কথাও বলেছেন যে, কোরআনে কোনো বৈজ্ঞানিক ভুল নেই।"

আমি যখন ডঃ বুকাইলির লেখা ওই বইটি পড়ছিলাম, আমি দেখেছিলাম যে, আসলেই তিনি কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন,

> “আএরপর আমি আরবী ভাষা শিখি এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কোরআনের আয়াতসমূহ পরীক্ষা করতে শুরু করি .. আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হই যে, ***কোরআনে এমন একটাও বক্তব্য নেই যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খন্ডন করা যেতে পারে।”*** [১]

এর পাশাপাশি ***কিতাবুল মোকাদ্দসের*** কথার বলার সময়ে বলেছেন, তিনি কেবল একে *‘বৈপরিত্ত’, ‘অসঙ্গত’ ও “অবিশ্বাসযোগ্য”* কথা রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দস বিশেষজ্ঞরা তা এড়িয়ে গেছেন, আর যখন তারা ওইগুলো উল্লেখ করেছেন, তাঁরা তখন শব্দের মারপ্যাচে তা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন।[২]

---

[১] বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, মরিস বুকাইলি, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠ-১০

[২] ওপরে উল্লেখিত বই ,পৃষ্টা-ix

ডঃ বুকাইলির বইটি পড়ে, স্পষ্টতই মুসলমানরা রোমাঞ্চিত হবেন, কারণ, যদি তা সত্য হয়, তবে কোরআনের প্রতি তাঁদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। এই বইটি হচ্ছে এক ধরনের দ্বিতীয় সাক্ষী।

যদিও এই কথাও সমানভাবে স্পষ্ট যে, আমরা খ্রীষ্টানরা দেখি যে, ওই বইয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের সত্যতার জোরালো সাক্ষ্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিতাবুল মোকাদ্দসের যেসব ওহী বা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, সেগুলো ওই বইয়ে তিনি উল্লেখ করেননি।

ডঃ বুকাইলি মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন যে, সুখবরের লেখকরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

ইঞ্জিল শরীফের প্রাচীনতম অনুলিপি সম্পর্কে কয়েক কথা বলেই সেই অনুলিপি খারিজ করে দিয়েছেন। আমাদের কাছে তিনি এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন, বর্তমানে যে-কিতাবুল মোকাদ্দস আছে, এর বৈধতার ভালো কোনো সাক্ষী নেই।

শেষে, ইঞ্জিল শরীফকে রোনাল্ডের (Chanson de Roland) গানের সাথে তুলনা করে বলেছেন, "এই কাহিনী কাব্যে একটি সত্য ঘটনাকে রূপকথার মতো সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে।"[৩]

অবশ্যই এই ধারণা খুব ভালোভাবে সেই সব মুসলমানের জন্য উপযুক্ত হবে, যাঁরা জোরালো ভাষায় বলেন যে, খ্রীষ্টানরা কিতাবুল মোকাদ্দস পরিবর্তন করেছে- অর্থাৎ ঈসা মসীহের কালাম ও জীবন সম্পর্কে বৈধতার সাক্ষী নেই। এটি খুবই মারাত্মক ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অভিযোগ। উত্তর আফ্রিকায় দীর্ঘদিন থাকার সময়েই প্রায় সব মুসলমানদের কাছ থেকেই এই কথা শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হলেও পরে আর বিরক্ত হইনি। তবে এখন আমার মনে হয় যে, আমারই ভুল হয়েছিল।

১৯৮৩ সালে লন্ডন দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমি বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি ইঞ্জিল শরীফের সবচেয়ে প্রাচীন অনুলিপি Codex Sinaiticus দেখেছিলাম। এই প্রাচীন অনুলিপিটি ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। আমার লেখা এই বইয়েরই ১৫৫ পৃষ্ঠায় এই প্রাচীন অনুলিপিটির ছবি দেখানো হয়েছে। যাদুঘরে ঢুকে প্রহরীর কাছ থেকে পথনির্দেশ জেনে নিয়ে আমি কাঁচ দিয়ে ঘেড়া একটি বাক্সের দিকে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে যেতে-যেতে আমি ভাবছিলাম, আলোর প্রতিফলন ছাড়া আমি কীভাবে কাঁচের ওপর দিয়ে আমি ছবিটি তুলবো?

তারপর, আমি আমার সামনে রাখা কিতাবের পৃষ্ঠাটি দেখলাম। আমি সেই কিতাবুল মোকাদ্দসের দিকে তাকালাম, যা এখন আমার সামনে আছে। এই কিতাব সম্পর্কে আমি বহুবার অনেক লোকের কাছ থেকে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের কিতাব পরিবর্তন করেছ।' আর এইসব কথা এক মুহূর্তের মধ্য দিয়ে আমার মাথার মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। আমি জোরে কেঁদে ফেললাম। এমনকি আজো যখন আমি এই বই লিখছি, তখনও আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আমি তা ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। এটি ছিল আমার কাছে যেন আমার ভাইকে ছু'য়ে দেখা, যে আজ থেকে ১৬০০ বছর আগে তা লিখেছিলেন। এটি ছিল বাস্তব, এমন একটি প্রমাণ যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়, যে সুখবর আগে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে।

---

[৩] ওপরে উল্লেখিত বই ,পৃষ্টা ১০৮

আমি তা ছুঁ'তে পারিনি। আমি তাঁদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আমার আবেগ বুঝতে পারেনি যে, তাঁদের সেই অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। তাই আমি কেবল এর ছবি তুলে ফিরে এলাম।

আমার লেখা এই বইটি এখন আপনার হাতে আছে, তাহলে এখন এই কথা বলা যায় যে, ডঃ বুকাইলির বই এবং এই বইয়ের সাথে মূল্যায়নের সুযোগ এখন আপনার হাতে আছে। কিন্তু আসলে এর চেয়েও বড় কাজ রয়েছে। এটি একটি প্রচেষ্টা, খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে গভীরতম পর্যায়ে যে মূল বিরোধ রয়েছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ এই উভয় দিকই এই বইয়ে রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মুসলমানরা দাবী করেন যে, কিয়ামতের দিনে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁদের জন্য সাফায়াত করবেন। এটি তাঁদের আবেগের কথা। তাঁরা এই কথা ভেবে নিজের দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মনে-মনে সান্ত্বনা পেতে চান। কারণ, কিয়ামতের সেই দিনে একাকী আল্লাহ্‌র বিচারাসনের সামনে তাঁরা দাঁড়াতে চান না। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সম্পর্কে কোরআনে কি কোনো প্রমাণ আছে?

খ্রীষ্টানরা বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ঈসা মসীহকে পাঠিয়েছেন। তিনি সমস্ত লোকদের পাপের জন্য জীবন-কোরবানী দিয়েছেন। যাঁরা তাঁকে নাজাতদাতা হিসেবে বিশ্বাস করেন যে, ঈসা মসীহ্ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, আর তিনি এখন তাঁদের জন্য সাফায়াত করছেন। ইঞ্জিল শরীফে কি তাঁদের এই ধারণা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ আছে?

ওপরে যেভাবে বলা হয়েছে, মুসলমানরা জোরালো ভাষায় বলেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে বদবদল করা হয়েছে। কোরআনে বা হাদিসে কিংবা ইতিহাসে কি এই সম্পর্কে কোনো প্রমাণ আছে?

যদি দুটি বই তাঁদের বক্তব্যের সাথে একমত হতে না-পারে, কীভাবে আমরা এদের মধ্যে কোনটিকে সত্য বলে বেঁছে নেব। কীভাবেই বা আমরা একজন সত্য নবীকে জানতে পারবো?

আর আমার যোগ্যতাই বা কতটুকু যে, আমি এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি?

সবার আগে আমি পাঠকদের জানাতে চাই যে, আমিও ডঃ বুকাইলির মতো একজন ডাক্তার। দ্বিতীয়তঃ আমিও তাঁর মতো উত্তর আফ্রিকায় প্রচলিত আরবী-শিখেছি। তৃতীয়তঃ আমিও ডঃ বুকাইলির মতো কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন দুটোই পড়েছি।

এমনকি এই বইয়ে আমার অজানা অনেক বিষয় যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, এমনকি মানুষের ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করেছি, তাঁদের মতামত নিয়েছি। আর এভাবে আমি যতদূর সম্ভব ভুল এড়াতে চেষ্টা করেছি।

যাঁদের মাতৃভাষা আরবী, আমি আমার শব্দ-অধ্যয়ন তাঁদের দেখার জন্য দিয়েছি। এতে তাঁরা বলতে পারবেন যে, আমার শব্দ-অধ্যয়ন সঠিক আছে কি-না? অন্যান্য বন্ধুরা এবং আমার স্ত্রী, যাঁরা এই পাণ্ডুলিপি পড়ে মতামত দেওয়ার জন্য সময় দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চিতভাবেই এই বইয়ে লেখা সমস্ত কিছুর জন্য দায়িত্ব আমার ঘাড়েই এসে পড়ে, আর আমি তা স্বীকারও করছি।

প্রাথমিক অনুমান (Basic Assumptions)

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে কোনো বা প্রত্যেক লেখকের প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption ও তাদের কোনো কিছুর প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভংগী নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption ও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, কিতাবুল মোকাদ্দস হচ্ছে একটি নির্ভুল ঐতিহাসিক কিতাব, আর সুখবর সত্য বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফের অর্থ আলোচনার করার সময়ে, আমি বুঝার চেষ্টা করেছি এবং আয়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার জন্য আমি স্থির ছিলাম - এর অর্থ এই যে, এই আয়াতগুলো নাজিলের সময়ে লোকেরা যেভাবে তার অর্থ বুঝে ছিল, আমি সেই অর্থ বলতে চেয়েছি। আমি এ কথা বলতে চাইনি যে, এই হচ্ছে আয়াতের আসল ব্যাখ্যা, এই ধরনের প্রলোভনকে আমি এড়িয়ে চলেছি। আমার নিজস্ব পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভংগীর মুখে লাগাম টেনে ধরার ক্ষেত্রে আমি কতদূর সফল হয়েছি, তা বিচার করার ভার আমি পাঠকের ওপরে রইল।

শেষ করার আগে আমি ব্যাখ্যা করতে চাই, কেন আমি একচেটিয়াভাবে প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption শব্দটি ব্যবহার করেছি। আমার এক বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিয়েছে, আমি যা বলতে চাচ্ছি তা প্রকাশ করার জন্য, বিশেষভাবে যে-অধ্যায়ে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে এই শব্দটি সবচেয়ে উপযুক্ত বা মানানসই হয়নি। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে শব্দটি হতে পারতো, “যুক্তিতর্কহীনভাবে পূর্ব অনুমান”, “স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করা”, “অগ্রাধিকার” বা “পক্ষপাতিত্ব” এর সাথে আরো যোগ করা যেতে পারে, “ভবিষৎ অনুমান” এবং “কিছু প্রমাণ করার জন্য যা সত্য বলে ধরে নেয়া বা প্রকল্প।”

এই কথা সত্যি যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুমান বা basic assumptionকে বুঝানো হয়, যা একজন লোকের জীবনে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। অথবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো “অনুমিত পরিকল্পনা দলিল” (Documentary Hypothesis) তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেক জায়গায় ভবিষৎ অনুমান শব্দটি হতে পারে উপযুক্ত শব্দ, কিন্তু আমি প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption শব্দটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি এই শব্দটিকে ধরে রাখতে চাই। কারণ, এই প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption শব্দটি ১৩০০ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ওকামের উইলিয়ামের কাছ থেকে এসেছে। তিনি লিখেছেন,

> “Essentia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.", যার মানে, "প্রাথমিক অনুমিত বিষয় বা Basic Assumptions (কোনো বস্তুর মূল স্বভাব সম্পর্কে) যেন প্রয়োজনের বাইরে বৃদ্ধি না পায়।”

এই বাক্যাংশকে বলা হয় Occam's Razor “ওকামের ক্ষুর” । আমরা অবশ্যই এই ক্ষুর বা ছুরি দিয়ে কেটে বাদ দেব, কম করে হলেও সমস্ত অতিরিক্ত প্রাথমিক অনুমিত বিষয়গুলোকে (basic assumption) স্বীকার করে নেব।

দ্বিতীয়তঃ এটি আমাদের সামনে এই ধারণা তুলে ধরে যে, আমরা প্রতিবার একটি প্রাথমিক অনুমান তৈরি করি, এমনকি ছোট হলেও আমরা নতুন করে শুরু করি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে

আমরা অটল ছিলাম এবং আমরা একটি নতুন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার জন্য ভেবেছি। আমরা এই সব নতুন প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption নিয়ে সমস্যাগুলোর সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় অংশের ১ম অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে, হাইয়ার ক্রিটিকরা প্রাথমিকভাবে ধরে নিয়েছেন (basic assumption) যে, হজরত মূসা (আঃ) লিখতে পারতেন না। ১ম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডঃ বুকাইলি প্রাথমিকভাবে ধরে নিয়েছেন যে, কোরআনে ব্যবহৃত "ধোঁয়া" শব্দটি দ্বারা প্রাথমিক-গ্যাসীয়-অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তওরাতে ব্যবহৃত পানি সম্বন্ধে খ্রীষ্টান বৈজ্ঞানিকদের ধারণা হচ্ছে তওরাতে ব্যবহৃত "পানি" শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে, ড. টর্কি সপ্তম আসমান বুঝাতে গিয়ে আরো কয়েকটি প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption তৈরি করেছেন।

এই ধরনের কাজ করতে গেলে প্রাথমিত অনুমানগুলোকে ভুল বলা যায় না। আর এগুলো তৈরি করা পাপও নয়। এটি হচ্ছে এই সম্পর্কে শেষ কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা অবশ্যই প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption তৈরি করবো, তবে এদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করবো।

সবশেষে, আরবী শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। মৌলানা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী অনুদিত কোরআনে সূরার নামের যে অর্থ দেওয়া আছে, আমি সেই অর্থ গ্রহণ করেছি। [বাংলা অনুবাদে আমরা হরফ প্রকাশনীর কোরআন শরীফ থেকে সূরার নামের বাংলা অর্থ দিয়েছি।]

আর্ন্তজাতিক ধ্বনী নির্দেশনা অনুসারে আমি সূরার আরবী নাম ও আয়াতের আরবী শব্দ সরাসরি ইংরেজীতে অনুবাদের সময় ব্যবহার করেছি। কিন্তু চারটি ব্যতিক্রম আছে, "থ" ও "শ" শব্দের সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণ থাকায় আমরা তাই ব্যবহার করেছি। তবু কতগুলো দুর্বল দিক রয়েছে। *ফরাসী বা ইংরেজী ভাষায় অনুদিত আরবীয় লেখকদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ তাঁরা নিজেরাই তাঁদের নাম ল্যাটিন অক্ষরে এভাবেই লিখেছেন।*

হাদিসে ব্যবহৃত আরবী নামগুলো ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের সময় একরূপ রাখা যায়নি। যেহেতু, আমি আরবী ভাষায় তাদের নাম দেখিনি, সুতরাং, আমি সাধারণতঃ ইংরেজী লেখকরা যেভাবে লিখেছেন, আমি সেভাবেই লিখেছি।

আগের যুগে অধিকাংশ আরবী শব্দ যেগুলো ইংরেজী ভাষায় ঢুকেছে আর সেগুলো সঠিক ইংরেজী বানান রয়েছে, যেমন হিজরী, শিয়া, সেগুলো আসি সেভাবেই রেখেছি। তবে, সামান্য কিছু শব্দ যেমন মুসলমান, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং কোরআন এগুলো তাদের নতুন ইংরেজী বানান রীতিতে লেখা হয়েছে। এই ধারণাগুলোকে মনে রেখেই, **আসুন আমরা এখন ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস বইটি আবারও দেখি ও আবারও পরীক্ষা করি।**

ডঃ উইলিয়ম এফ ক্যাম্পবেল, এম.ডি.

প্রথম খণ্ড

গোড়ার কথা

প্রথম অধ্যায়

শব্দ সম্পর্কে কতগুলো প্রাথমিক অনুমান

প্রতিটি পাঠক, লেখক, ব্যক্তি বইয়ে আলোচিত কোনো বিষয় বা কোনো নির্দিষ্ট প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption নিয়ে আলোচনার সময়ে শব্দ সম্পর্কে কতগুলো প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption করে নেন। তিনি মনে করেন, তার ধারণাই সত্য। কখনো কখনো এই ধারণাগুলো সত্য কি-না তা পরীক্ষা করে, বিজ্ঞানের মতো যাঁচাই করে, আবার কখনো বা পুরাতত্ত্ব দ্বারা কিংবা ঐতিহাসিক দলিলের উল্লেখ দ্বারা তা প্রমাণ করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রায় সময়েই এইগুলো পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। আর বিশেষভাবে যেসব ধারণা পরীক্ষা করা যায় না, যেগুলোকে আমরা **প্রাথমিক অনুমান** বা Basic Assumptions বলে উল্লেখ করেছি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি বিশ্বাস করি যে কোন পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যে কাগজের ওপরে এই বই ছাপা হয়েছে, আসলেই তার অস্তিত্ব আছে। এই পৃথিবী পদার্থে পূর্ণ। অবশ্য যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র ছিলাম, তখন অধ্যাপক আমাদেরকে জীনো নামের একজন গ্রীক দার্শনিকের কথা বলেছিলেন। জিনো বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর সবকিছু মায়া। আমি বোকামী করেই হাত তুলে শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিলাম, "কিন্তু, তিনি কীভাবে জীবন উপভোগ করেছিলেন, যদি তিনি মনে মনে করেছিলেন, পৃথিবী মায়া?

অধ্যাপক স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন, তুমি কি মায়া উপভোগ করতে পারো না?"

অধ্যাপক অবশ্যই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। তত্ত্বগতভাবে এই কথা না বলার কোনো কারণ নেই যে, কেন তুমি মায়া উপভোগ করতে পারো না। আমরা দিবাস্বপ্নেরমায়ায় প্রচুর সময় ব্যয় করি। আমার সমস্যা ছিল, পৃথিবী বাস্তব নয়, এই ধারণা আমার ভাবনার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না।

মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে। এই তিন সমপ্রদায়ের লোকেরাই বিশ্বাস করেন যে, একজন আল্লাহ্ আছেন, যিনি এই বিশ্বজগত একেবারে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটি এমন একটি বিশ্ব যাকে স্পর্শ করা যায়, পরিমাপ করা যায়।

আমাদের একই ধরনের সমস্যা থাকা সত্বেও কোনসময়ে আমাদের প্রাথমিক অনুমানের বিষয়ে এক মত হওয়া যায় না একবার মরক্কোতে থাকার সময়ে একজন লোক আমার কাছে রোগের বিষয়ে পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। আমি যখন তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে, আগে তিনি কী

করতেন; তখন তিনি বললেন যে তিনি একজন আলেম-মাদ্রাসারথ- শিক্ষক ছিলেন। ইঞ্জিল শরীফ নিয়ে আমাদের সামান্যই আলাপ হয়েছিল, আর তারপর তিনি আরো কিছুটা আলাপ করার জন্য আমাকে তাঁর বাড়িতে দাওয়াত দিলেন। তাঁর সাথে কথা বলার সময়ে ইউহোন্না ১:৪১ আয়াতে বর্ণিত আল-মাসিয়্যা (**المَسِيًّا**) শব্দটি আমাদের আলোচনায় চলে এলো। আমি তাঁকে বললাম, “আল- মসীহ্ শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ “মাসিয়াখ” থেকে এসেছে, যার সমার্থক শব্দ আরবী ভাষায় আল-মসীহ্ (**المَسِيح**) ও ইংরেজী ভাষায় Messiah বলা হয়েছে।

তিনি বললেন, “নাহ!, তা হতেই পারে না, আল-মসীহ্ শব্দটি হজরত মোহাম্মদের উপাধি। হজরত মোহাম্মদের অনেক নাম আছে।”

আমি অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি দ্বারা বিষয়টি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলাম। সবশেষে আমি বললাম, “ঠিক আছে, চলুন, আমরা অভিধানে দেখি শব্দটির কী অর্থ দেওয়া আছে। আশা করি আপনার কাছে মুনজিদ (আরবী-আরবী অভিধান) আছে?”

“ওহ! না, আমরা তা দেখতে পারি না!”

“কিন্তু কেন পারি না, আমি একেবারেই নিশ্চিত যে, অভিধানে শব্দটি আছেই।”

“নাহ!, আমরা তা করতে পারি না,” তিনি আবারও কথা কয়টি বললেন। “আপনি অভিধান তৈরি করেছেন।”

আপনি কি বলতে চান যে, আমি অভিধান তৈরি করেছি?” আমি জানতে চাইলাম। পরে আমি বললাম, “আমি সেই অভিধান লেখার জন্য কিছুই করিনি।”

“হ্যাঁ, আপনারা তৈরি করেছেন। খ্রীষ্টানরাই এই অভিধান লিখেছে।”

আমাদের বিতর্ক সেদিন এভাবেই শেষ হয়েছিল। মরক্কোতে ২৫ বছর আগে তৈরি একমাত্র এই আরবী অভিধানই বিক্রি হচ্ছিল। ক্যাথলিকরা এই অভিধানটি লেবাননে তৈরি করেছিলেন। আর এর আইনতঃ বৈধতা সম্পর্কে তিনি আমার সাথে একমত হতে পারেননি।

যদি আমরা একটি শব্দের অর্থের সাথে একমত হতে না পারি, তবে আমরা অভিধানের সাহায্য নিতে পারি না। সেই আরবী অভিধানের বৈধতা সম্পর্কে আমাদের মাঝে প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন একরূপ ছিল না।

শব্দগুলোর অর্থ

ওপরের উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কোনো সার্থক বিতর্কের জন্য, আমাদের শব্দগুলোর অর্থ এবং কীভাবে ওই শব্দগুলোর অর্থ জানা যায় সে সম্পর্কে একমত হতে হবে। এই বিষয়টি ডঃ বুকাইলির বইয়ে বারবার এসেছে। তিনি তাঁর বইয়ে আরবী শব্দ “’আলাক্বা” (**العَلَقة**)-র অর্থ নিয়ে পুরো অধ্যায় জুড়ে আলোচনা করেছেন। তিনি চার পৃষ্ঠা জুড়ে তিনটি গ্রীক শব্দ- “লালিও”, “আকুও” আর “পারাক্লিটস”- এগুলোর অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সুতরাং, কীভাবে আমরা শব্দগুলোর অর্থ জানতে পারি? এই অর্থ যে সঠিক, তা সঠিক বলার জন্য কার ক্ষমতা রয়েছে? কীভাবেই আমরা অভিধানগুলো তৈরি করতে পারি?

উত্তরটি হচ্ছে, আপনি ও আমি অভিধান তৈরি করতে পারি। আমরা একটি নির্দিষ্ট যুগে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা অভিধান তৈরি করতে পারি। ভাষাবিদরা কোনো শব্দের মৌখিক ও লিখিত ব্যবহারকে কিছুটা আলাদা হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু যেহেতু আমরা কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে আলোচনা করছি, আর উভয়ই লিখিত কিতাব, আমরা লিখিত ভাষার জন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিধান তৈরি করতে হয়, সে বিষয়টি এখন আমরা দেখবো।

সানফ্রাসসিসকো স্টেট কলেজের ইংরেজী ভাষার একজন অধ্যাপক ভাষাবিদ ড. এস আই হাইয়াকাওয়া[১] কীভাবে অভিধান তৈরি করতে হয়, তা নিম্নে বর্ণনা করেছেন:

> এখন আমরা দেখবো যে কীভাবে অভিধান তৈরি করতে হয় আর কীভাবে সংকলকগণ একটি সংজ্ঞা ঠিক করেন— একটি অভিধান লেখার কাজ পড়াশোনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়, সেই যুগের সাহিত্য, বা অভিধানে যে-বিষয়টি আলোচিত হবে সেই বিষয়ের ওপর প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। এইভাবে সংকলকগণ পড়াশোনার পাশাপাশি, তাঁরা একটি কার্ডে প্রতিটি আকর্ষণীয় আর দুষপ্রাপ্য শব্দ, একটি গতানুগতিক শব্দেরও প্রতিটি অস্বাভাবিক, উদ্ভট ব্যবহার অথবা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত ওই শব্দের অর্থ, সচরাচর যে-অর্থে প্রচুর এজমালি শব্দ ব্যবহার করা হয়, আর যে-বাক্যগুলোতে ওই শব্দগুলো রয়েছে তা লিখে রাখেন, যেমন
>
> pail
> The dairy pails bring home increase of milk
> Keats, *Endymion*
> I, 44-45
>
> এ কথা বলা যায় যে, প্রসঙ্গের পাশাপাশি প্রতিটি শব্দটি সংগ্রহ করা হয়— যখন তা শ্রেণীবদ্ধ করা শেষ হয়, তখন দেখা যায়, প্রতিটি শব্দের, যে কোনো স্থান হতে সংগৃহিত দুই বা তিনটি এমনকি কয়েকশ' বর্ণনামূলক উদ্ধৃতি, প্রতিটি কার্ডে থাকে।
>
> "তাহলে দেখা যায় যে, একটি শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অভিধান সংকলক তাঁর
>
> সামনে সেই শব্দের বিবরণ রয়েছে এমন কার্ডের স্তুপ নিয়ে বসেন। একজন লেখক কর্তৃক দেওয়া সেই শব্দের সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রকৃত ব্যবহার প্রতিটি কার্ডে লেখা থাকে। তিনি প্রতিটি কার্ড মনোযোগের সাথে পড়েন, কতগুলো অগ্রাহ্য করেন, বাকীগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়েন, তিনি কী মনে করেন তার ভিত্তিতে সেই শব্দের বিভিন্ন অর্থ অনুসারে কার্ডের স্তুপ আবার পৃথক করেন। সবশেষে, তিনি সেই শব্দটির এই বাঁধাধরা নিয়ম অনুসারে সংজ্ঞা লিখেন যে, প্রতিটি সংজ্ঞা **অবশ্যই** তাঁর সামনে রাখা উদ্ধৃতির ভিত্তিতে হতে হবে, আর তা সেই শব্দের অর্থ প্রকাশ করবে।

---

[১] *Language in Thought and Action*, New York, Harcourt, Brace and World, Inc. 1964, p. 55-56.

“সুতরাং, একটি অভিধান লেখা, এটি এমন ধরনের কাজ নয় যে, শব্দের আসল অর্থের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্যকে সাজানো হয়েছে, কিন্তু এ কাজ হচ্ছে একজন লোকের সর্বোচ্চ সামর্থ অনুসারে, বিভিন্ন শব্দগুলো সূদূর বা নিকট অতীতে লেখকদের কাছে কী অর্থ বহন করত তা লেখার কাজ —। ***অভিধানের লেখক হচ্ছেন একজন ঐতিহাসিক, তিনি কোনো আইন প্রনয়নকারী বা আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি নন।***

ব্যবহারের ভিত্তিতে শব্দের অর্থ নির্ণয়

ব্যবহারের ভিত্তিতে কোনো শব্দের মানে খুঁজে বের করার জন্য এখন আমরা একটি আরবী বিশেষ্য **الوِزْر** ‘আল-উইযার’ (বোঝা) পরীক্ষা করে দেখবো। আরবী ভাষায় ‘আল-উইযার’ সম্পর্কিত আরেকটি বিশেষ্য হচ্ছে, **الوَازِرَة** আল-ওয়াযিরাহ্ (ভারাক্রান্ত ব্যক্তি) আর এর ক্রিয়াপদ হচ্ছে, বহন করা (**وَزَرَ** ওয়াযারা) কোরআনে এই শব্দগুলো রয়েছে। একটি কোরআনের বর্ণনামূলক সূচী গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন যে, এই শব্দসমষ্টি ২৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে।[২]

প্রথমে আমরা মক্কী সূরা তাহা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ২০:৮৭ আয়াত পরীক্ষা করে দেখবো। যেখানে আমরা পড়ি যে, বনি- ইসরাইলরা সোনার বাছুর তৈরি করেছে:

> উহারা বলিল, "আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অংগিকার স্বেচ্ছায় ভংগ করি নাই; তবে আমাদের ওপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের **বোঝ**..."।

যদি আমরা একটি ছোট কার্ডে এটি লিখে রাখি, আমরা অন্য বাক্যগুলোর সাথে একে এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারবো। যে-বাক্যগুলোতে বলা হয়েছে যে, বোঝা বলতে এমন কিছু বুঝানো হয়েছে, যা বহন করা যায়। এর পাশাপাশি সম্ভবতঃ কিছুটা ভারী অথবা শ্রমসাধ্য বা কষ্টকর অবস্থাকে বুঝায়, যেহেতু তা বহন করার জন্যই তাদের তৈরি করা হয়েছিল অথবা বাধ্য করা হয়েছিল।

তারপর আমরা এখন দেখবো, সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৪ আয়াত যা ১ম হিজরী থেকে নাজিল হয়েছিল। এখানে যতক্ষণ কাফিররা পরাজিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের সাথে জিহাদ করতে মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

> “—অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ; তোমরা জিহাদ চালাইবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার **বোঝা** (অস্ত্র) নামাইয়া ফেলে, —আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজন অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে, যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দিবেন না।

---

[২] এই আরবী মূল ১বার "আশ্রয়প্রার্থী" আর ২বার "মন্ত্রী" হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থগুলো এখানে আমাদের আলোচনার বাইরে।

এখানে বোঝার একটি নতুন অর্থ আছে। এখানে এটি সহজে বুঝা যায় না, কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে, বোঝা বলতে এখানে যুদ্ধে লোকদের আহত ও নিহত হওয়া এবং সম্ভবতঃ বন্ধু ও প্রিয়জন হারানোর মতো ব্যথা বুঝানো হয়েছে।

সবশেষে, আমরা নিম্নের আয়াতটি দেখবো। গাঢ় অক্ষরে লেখা বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ সেই সব আরবী শব্দকে বুঝাচ্ছে যা নিয়ে আমরা গবেষণা করছি। আর আমরা ধরে নিচ্ছি, প্রতিটি আয়াত আলাদা আলাদাভাবে আমরা ছোট কার্ডে লিখছি।

প্রাথমিক মক্কা যুগে নাজিল হওয়া সূরা ফাতির (সৃষ্টিকর্তা) ৩৫:১৬-১৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।—কোনো **বহনকারী** অন্যের **বোঝা বহন** করিবে না; কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও উহা বহন করিতে আহ্বান করে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না, নিকট-আত্মীয় হইলেও— ।"

প্রাথমিক মক্কা যুগে নাজিল হওয়া সূরা নজ্‌ম (নক্ষত্র) ৫৩:৩৬-৪১ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "তাহাকে কি অবগত করানো হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে, ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব? উহা এই যে, কোনো **বহনকারী অপরের বোঝা বহন** করিবে না; আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যাহা সে করে— অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান।

মধ্য মক্কা যুগে নাজিল হওয়া সূরা তাহা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ২০:১০০-১০২ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "উহা হইতে যে বিমুখ হইবে সে কেয়ামতের দিনে মহাভার বহন করিবে উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই **বোঝা** উহাদের জন্য হইবে কত মন্দ। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং— ।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আন্‌আম (গবাদি পশু) ৬:৩১ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "যাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুক্ষীন হওয়াকে মিথ্যে বলিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, এমনকি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন কেয়ামত উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা বলিবে. "হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ। তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের **বোঝা** (পাপ) বহন করিবে; দেখো, তাহারা যাহা **বহন** করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আন্'আম (গবাদি পশু) ৬:১৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "— প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার (**বোঝা**) গ্রহণ করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই; তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে, তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা যুমার (মানুষের দল) ৩৯-৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি তাঁহার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য ইহাই পছন্দ করেন। একের **ভার** অন্যে **বহন** করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন, অন্তরে যাহা আছে, তাহা তিনি সম্যক অবগত।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা নাহ্ল (মৌমাছি) ১৬-২৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

"ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদের **পাপভার** পূর্ণমাত্রায় এবং **পাপভার** তাহাদেরও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখো, উহারা যাহা **বহন** করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট।"

১ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বনি- ইসরাইল, (ইসরাইলের সন্তানগণ) ১৭:১৩-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিনে আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব (আমল নামা), যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত। 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও **ভার বহন** করিবে না।"

এটি খুব স্পষ্ট যে, যখন আমরা এই আয়াতগুলোর একটির সাথে আরেকটির মিল খুজে দেখি, তখন দেখি 'আল-উইযার' শব্দটি এখানে আরেক ধরনের "বোঝা"র অর্থ প্রকাশ করছে। যদি আপনি আল্লাহ্র কালাম অস্বীকার করেন, তবে আপনি এই বোঝা বহন করবেন। যদি আপনি কুফরী করেন বা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনার ওপর এই এই বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। এই বোঝা হচ্ছে, প্রতিটি লোকের কর্মফল। আর তা প্রতিটি লোকের জন্য আলাদা আমলনামায় লিখা হবে, যা সে নিজেই পাঠ করবে। এই বোঝাকে পিঠে বহন করার কথা বলা হয়েছে, যদিও আল্লাহ্ জানেন আমাদের অন্তরে কি আছে। এসব ধারণা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এই বোঝা হচ্ছে **আমাদের পাপ।**

আমাদের ছোট কার্ডগুলোতে 'আল-উইযার' শব্দের জন্য আমারা সেই অর্থ মেনে নেব, যে-অর্থে হজরত মোহাম্মদের সময়ে আরবের কুরাইশ গোত্রের লোকেরা শব্দগুলো ব্যবহার করতেন:

মহাভার, বোঝা-
হয় শারীরিক আর নয়তো মানষিক,
পাপ, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

আমরা যখন হেনস ওয়েহারের লেখা *এ ডিকশনারী অব মর্ডান রিটেন এরাবিক*[৩] অভিধানে বইয়ে “উইযার” শব্দটির অর্থ দেখলাম, সেখানে লেখা আছে,

মহাভার, বোঝা, ভারগ্রস্থ করা,
পাপ, অপরাধ,
দায়ী, দায়িত্ব

আমরা শব্দটির একটি অর্থ ‘দায়িত্ব ‘এখানে গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু মহাভার, বোঝা, পাপ এই অর্থগুলো যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে আমরা সঠিক অর্থই গ্রহণ করেছি।

একটি ধর্মতত্ত্বীয় অভিধানে এই আয়াতগুলো সম্পর্কে আমরা আরো কিছু মন্তব্য পাওয়ার আশা করতে পারি। অর্থাৎ এর সঠিক অর্থ দেখানো হয়েছে, পরম্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও একজন পাপী আরেকজন পাপীকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। প্রতিটি লোকের আমলনামায় লেখা পাপ অনুসারেই সে শাস্তি পাবে। কেবলমাত্র একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি তুমি কাউকে বিভ্রান্ত করো; তবে তোমাকে আরও বেশী শাস্তি দেওয়া হবে। যে বিভ্রান্ত করে সে নিজের পাপের শাস্তি বহন করার পাশাপাশি যাকে সে বিভ্রান্ত করেছে, তার পাপের শাস্তিও সে বহন করবে। অন্যদিকে একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি- যাঁর নিজের কোনো পাপের বোঝা নেই- তিনি সাফায়াৎ করতে পারেন অথবা অন্যের বোঝা বহন করতে পারেন, এই আয়াতগুলোতে এমন কোনো কথা বলা হয়নি।

ভাষার ক্রমাগত পরিবর্তন

অনেক দিন আগে ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে একজন সুইজ ফাদার-অধ্যাপক ফার্ডিনান্ড ডি সুজা, যিনি একজন আধুনিক ভাষাবিদ, তিনি জোরালো ভাষায় তাঁর ছাত্রদের কাছে এই সত্য প্রকাশ করেন যে,

> “—ভাষা বিভিন্ন কারণের প্রভাবে অধঃপতিত হয়, এর চাইতে বরং বলা যায়, হয় ধ্বনী অথবা অর্থ সমৃদ্ধ করে একটি নতুন রূপ লাভ করে। **ভাষার এই বির্বতন অবশ্যই ঘটবে**। এমন একটি ভাষারও নজির নেই, যা বিবর্তনকে প্রতিরোধ করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে, যে-কেউ এই পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করতে পারে।”[৪]

ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ André Martinet, তিনি তাঁর লেখা *এলিমেন্টস অব জেনারেল লিঙ্গুইসটিকস* বইয়ে একই ধারণার কথা আবারও বলেছেন। এই বইটি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন,

> “আমরা এই সময়ে এই মন্তব্য কবতে পারি যে, ভাষাগুলোর ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন না থাকলে ভাষার কাজ বন্ধ হয়ে মরে যারে। আর যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই যে-কথা

---

৩ Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1971.

৪ *Cours de Linguistique Gènèrale*, Payot, Paris, 1969, p 111.

আমরা বলেছি, আমরা উপস্থাপনা (যথাযথভাবে) এর কাজ বুঝাতে, এটি হচ্ছে একটি বির্বতনের প্রক্রিয়া। (এমনকি আমরা এটি দেখতে পারি) "এক মুহূর্তেই এই চিন্তা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের প্রভাবিত করে যে, এটি যে কোনো সময়ের জন্য প্রতিটি ভাষার জন্য ভালো।[৫]

ইংরেজী ভাষায় "লুকিং আন্ডার এ হুড" এই কথা বললে ৫০০ বছর আগে একজন সন্নাসীকে বুঝাতো। আজ আমরা হুড বলতে বুঝি মটর গাড়ীর ইঞ্জিন। আরও বলা যায় যে, হুড বা আবরণী বলতে হতে পারে একজন চোরকেও বুঝায় যে মটর গাড়ী চুরি করেছে। **(**উদাহরণ হিসেবে বাংলা ভাষায়ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে "পত্র" বলতে কেবল গাছের পাতা বুঝাতো। কিন্তু বর্তমানে "পত্র" বলতে চিঠিপত্র, সংবাদপত্রকে বুঝায়। প্রাচীনকালে ব্যবহৃত শব্দ "আলাবু" থেকে "লাবু" সবশেষে "লাউ" শব্দটি এসেছে। এক এক যুগে লোকেরা একই জিনিসকে ভিন্ন নামে জেনেছে।**)**

ব্রুকলিন কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক লুইস বি, সুলায়মান তাঁর লেখা *সিমানটিকস এন্ড কমন সেন্স* বইয়ে এটি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, এই সব ধারাবাহিক পরিবর্তনের জন্য, কোনো শব্দের অর্থ জানার জন্য কেবলমাত্র একটি পথ রয়েছে,

যে কোনো যুগেই কোনো আক্ষরিক চিহ্ন (শব্দ), সেই যুগে সেই শব্দটিকে লোকেরা কীভাবে ব্যবহার করতো, তাকেই উক্ত শব্দটির সেই সময়কালীন প্রকৃত অর্থ বলে স্বীকার করতে হবে।[৬]

সার কথা হলো এই যে: সময়ের সাথে সাথে, কতগুলো শব্দের অর্থ বদলে যায়, আবার অন্যদিকে কিছু শব্দের অর্থ অপরিবর্তিত রয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, আজ, আপনি ও আমি হয় শব্দটির আগের সংজ্ঞা আমাদের সমর্থন ও অনুমোদন করতে হবে; অথবা আমরা বর্তমানে শব্দটি যে-অর্থে ব্যবহার করছি, তার ভিত্তিতে প্রতিটি শব্দের অর্থের নতুন সংজ্ঞা দিতে হবে। আর **কোনো শব্দের ব্যবহারই হচ্ছে, একমাত্র আসল বিষয়, যা কেবলমাত্র আগের অর্থ স্বীকার করে নেয়া অথবা নতুন অর্থের প্রকাশকে গ্রহণ করার বিষয়টির সত্যতা দৃঢ়তার সাথে নিরূপন করতে পারে।**

ব্যুৎপত্তিঘটিত বিভ্রান্তি (The Etymological Fallacy)

ড. সুলায়মান নিম্নের কথা কয়টি বলে এই সাধারণ ভুল ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন:

"**বুৎপত্তিগত বিভ্রান্তি** হচ্ছে এমন ধরনের বিভ্রান্তি, যা মনে করে যে আগের অর্থই (সম্ভবতঃ মূল উৎস শব্দ হতে পারে ল্যাটিন, গ্রীক, বা সংস্কৃত ভাষা) প্রকৃত অর্থ আর

---

[৫] Max Leclerc et Cie. 1960. Eng. Trans. Univ. of Chicago Press, 1964, p 37.
[৬] Holt, Rinehart, & Winston, Inc. New York, 1966, p 23.

পরবর্তীকালের যে অর্থগুলো মধ্যে দুঃখজনক ভেজাল রয়েছে, তা প্রথম সুযোগেই তা ছেঁকে ফেলা দেয়া উচিত।”[৭]

যে কোনো শব্দের অর্থ মূল অর্থ - আসল অর্থ খুঁজে দেখা হচ্ছে বিভ্রান্তি। বরং আমাদের অবশ্যই খুঁজে দেখতে হবে যে, লোকেরা কীভাবে ব্যবহার করছে, তার মধ্যেই আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। **কোনো শব্দের আসল অর্থ বর্তমানে শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না আর বর্তমান ব্যবহারও আগের যুগে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না।** ৫০০ বছর আগে যদি কোনো একটি লেখায় কোনো শব্দ, অথবা ব্যাবিলনে প্রাপ্ত কোনো পোড়ামাটির ফলকে কোনো শব্দ, একবার মাত্র পাওয়া যায়, তবে আগের (বা নবীন) জানা অর্থ একটি সম্ভবতঃ অর্থ আমাদের অনুমান করতে সাহায্য করে। এটি কোনো অর্থকে প্রমাণ করতে পারে না। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে কোনো খ্রীষ্টানের নিকট বা ৭ম খ্রীষ্টাব্দে কোনো মুসলমানের নিকট একটি শব্দের অর্থ কী ছিল, তা জানার জন্য তারা কীভাবে শব্দটির অর্থ ব্যবহার করত, তা আমাদের অবশ্যই তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ডঃ বুকাইলি, অবশ্য এই সব বিশেষজ্ঞের সাথে একমত নন। তাঁর সর্বশেষ বইয়ে তিনি লিখেছেন:

“একটি সাধারণ নিয়ম আছে, যাতে আধুনিক জ্ঞানের সাথে আমি কোনো ভুল দেখতে পাই না। একটি শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে - সবচেয়ে পুরানো অর্থ, যা সবচেয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাথে একে মিল করানো যায়। অন্যদিকে এর থেকে উদ্ভূত অর্থ কোনো অর্থহীন, মিথ্যে ধারণা তৈরি করে।[৮]

দুর্ভাগ্যক্রমে ডঃ বুকাইলির নিয়মই অর্থহীন মিথ্যে ধারণা তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা আরবী শব্দ “ত্বা‘ইর” (**الطَّائِرِ**) নিয়ে আলোচনা করবো। ১ম হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বনি-ইসরাইল, **১৭:১৩** আয়াতে “ত্বা‘ইর” শব্দটি আমরা দেখতে পাই। সেখানে বলা হয়েছে,

“প্রত্যেক মানুষের **কর্ম** আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি—।”

মূল অর্থ এবং বর্তমানে “ত্বা‘ইর” শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে, হচ্ছে *পাখি*। আরবীয়রা রোমানদের মতোই ভবিষৎ গণনার জন্য উড়ন্ত পাখি ব্যবহার করতেন। সুতরাং, এখান থেকে যা বুঝা যায়, তা হচ্ছে, অশুভ পূর্ব লক্ষণ বা মন্দভাগ্য, কোরআনের এই আয়াত পাঠ করে এর মূল অর্থ অনুসারে অনুবাদ হচ্ছে, আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের গলায় পাখি বেঁধে দিয়েছেন। আর এই অনুবাদ দেখে লোকেরা হাসবে।

আরেকটি উদাহরণ হিসেবে, আমরা হিব্রু শব্দ “রাখমাহ” দেখবো। এই শব্দটি তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ সিপারার **১৪:১৭** আয়াতে দেখা যায়। যে শব্দটি মূল ‘রাখম’ থেকে এসেছে, তার অর্থ হচ্ছে, ভালোবাসা। আমরা আশা করতে পারি যে, এখানে শব্দটির অর্থ প্রেমিক হবে। যতক্ষণ

---

[৭] ওপরে উল্লেখিত বই ,পৃষ্ঠা-৫১

[৮] *L'Homme, D'Ou Vient-il,* Seghers, Paris, 1981, p 186.

পর্যন্ত আমরা না একটি প্রবন্ধে পড়ি যে, মৃত দেহ খাবার জন্য, 'রাখমাহ' আকাশে ঘুড়ে ঘুড়ে উড়ছে।

এই শব্দটির অর্থ উল্টে গিয়ে হয়েছে, **'শকুনি'**। কিন্তু একটি অভিধান অনুসারেই এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; কারণ, এই পাখিগুলো একই জীবনের জন্য শত্রুর ভূমিকা পালন করে। যে কোনো দিক দিয়ে এটি স্পষ্ট যে, মূল অর্থ আমাদেরকে সমকালীন অর্থের কাছে নিয়ে আসে না, বা কোনো লোক বলতে পারে না যে, মূল অর্থই বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে আরো সঠিক।

তৃতীয় উদাহরণ হিসেবে, আমরা এলকুহল শব্দ নিয়ে আলোচনা করবো। এলকুহল একটি আরবী শব্দ আল-কুহল (**الكُحْل**) থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে সুরমা- কালো এন্টিমনি চূর্ণ, যা আরবীয় মেয়েরা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত চোখে লাগিয়ে আসছে। পরবর্তীকালে রোমীয়দের সময়ে এই শব্দটি কোনো খাঁটি জিনিস বুঝাতো। পাতন প্রনালীতে যখন প্রথম এলকুহল তৈরি হয়, এটি ছিল খাঁটি, তাই এর নাম দেওয়া হয়, এলকুহল। এই শব্দটি আবার আরবী ভাষায় আল-কুহল(**الكُحُول**) হিসেবে ফিরে গেছে, যার অর্থও এলকুহল। উভয় শব্দ দু'টি একই মূল থেকে এসেছে। উভয় শব্দ দুটি আজো ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এই প্রশ্ন করাটা বোকামী হবে যে, এই দুটির মধ্যে কোনটি বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সঠিক।

সবশেষে, শব্দের অর্থ সম্পর্কে এই অংশে আলোচনা শেষ করার আগে, আমি মিশরীয় আলেম, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর চমৎকার অনুদিত কোরআন শরীফের ভূমিকায় তিনি যে-কথা বলেছেন, সেখান থেকে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা আমি প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

> "প্রতিটি ধার্মিক লেখক ও চিন্তাবিদদের কোরআনের সেবার জন্য তার যতরকমের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার সবই তাঁর প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু কখনো তাঁর নিজের মতবাদ এবং সিদ্ধান্ত একত্রে মিশ্রিত করতে পারবেন না। অবশ্য, যদি যুক্তিগ্রাহ্য হয়, তবে আয়াতের নিজস্ব তাফসীরের জন্য যা সাধারণঃত সম্পূর্ণ স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার দাবী করে। ব্যাখ্যার সময়ে বিভিন্ন কারণে আমাদের প্রায়ই সমস্যা হয়, যার মধ্যে কয়েকটি আমি নিম্নে উল্লেখ করছি:
>
> (১) কোরআনে ব্যবহৃত আরবী শব্দের অর্থ যা রাসূল ও তাঁর সাহাবীরা বুঝতেন এছাড়াও আলাদা অর্থ আছে। সমস্ত জীবন্ত ভাষাই এই ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। **প্রাচীনকালের তফসীরকারকগণ ও ভাষা বিজ্ঞানীরা এসব বিষয়ে খুব ব্যাপক ভাবে জোর দিয়েছেন। আর আমরা অবশ্যই তাদের সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলবো।** যেখানে তারা একমত হতে পারেননি, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক অর্থ ব্যবহার করবো। সেসব নির্ভরযোগ্য ব্যাখা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, আমরা সেটি গ্রহণ **করবো। আমরা কোনো নতুন আক্ষরিক অর্থ আবিষ্কার করবো না।**"[৯]

---

[৯] Yusuf Ali, ওপরে উল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা x

অন্য কথায় বলতে হয়, আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কোনো শব্দের আক্ষরিক নতুন অর্থ খুঁজার জন্য স্বপ্ন দেখবো না। আমরা এক দুর্বোধ্য লেখার মুখোমুখি হয়েছি বলে কেবলমাত্র এই কারণে তা করবো না।

প্রসঙ্গ

ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের অর্থ বুঝার জন্য প্রসঙ্গ একটি উপায়। এখন আমরা অবশ্যই এখানে কোনো শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের অর্থ নিরূপন করার জন্য প্রসঙ্গের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। 'আল-উইযার' শব্দ নিয়ে আমাদের আলোচনার সময়ে আমরা দেখেছি যে, বোঝা ও পাপ ছাড়াও এর আরেকটি অর্থ হতে পারে 'দায়িত্ব'। সুতরাং, যদি কেউ আমাদের ইংরেজীতে "উইযার অব সুলতান" বললে সেই বাকাংশের অর্থ জিজ্ঞেস করে, তবে আমরা উত্তর দিতে পারবো না। এই কথাটি উইযার শব্দ থেকে আমরা জানতে পারি না যে, এর অর্থ কী সুলতানের পাপ না সুলতানের দায়িত্ব। এই প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে হলে আমাদেরকে পুরো বাক্যটি শুনতে হবে। আর একেই **প্রসঙ্গ** বলে।

ডে সুসারী (De Saussure) এই বিষয়টি তাঁর বইয়ে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন, তিনি বলেছেন,

> "—ভাষা হচ্ছে এমন একটি রীতি যাতে সমস্ত শব্দ হচ্ছে স্বাধীন, সেখানে একটির আলাদা কোনো মূল্য নেই। যদি না তা, আরেকটির সাথে কোনো বাক্যের মধ্যে একসাথে না থাকে— ।[১০]

আর সুলায়মান এটি আরো বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন, তিনি লিখেছেন,

> "শব্দ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় না। সংগঠিতভাবে শব্দগুলো ব্যবহারের সময়ে একটি শব্দের অর্থ অনিবার্যভাবে তার প্রসঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যার মধ্যে কম করে হলেও অন্যান্য আরো শব্দ বাক্যের মধ্যে রয়েছে, কোনো অনুচ্ছেদের মধ্যে বা কোনো দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে সেই শব্দটির আসলে আরো অনেক গুরুত্ব আসলে রয়েছে।"[১১]

> "১৭৮৭ সালে একটি শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত হতো, এটি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, (যতদূর সম্ভব, লিখিত রেকর্ড যা প্রকাশ করে) ১৭৮৭ সালে ব্যবহারকারীরা এই শব্দ কী অর্থে ব্যবহার করেছে।"[১২]

ডঃ দাউদ রাহবার তাঁর লেখা God of Justice বইয়ে প্রসঙ্গের গুরুত্বের ওপর কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, যার মধ্যে একটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। কোরআনের সূরা আল-সাফ্‌ফাত (শ্রেণীবদ্ধকারীগণ) ৩৭:৯৬ আয়াতে আমরা পড়ি যে,

"وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ" ("ওয়া আল্লাহু খালাক্বাকুম ওয়া মা তা'মালূন")

---

[১০] De Saussure, ওপরে উল্লেখিত পুস্তক পৃষ্ঠা ১৫৯

[১১] Solomon, ওপরে উল্লেখিত পুস্তক পৃষ্ঠা ৪৯

[১২] Solomon, ওপরে উল্লেখিত পুস্তক পৃষ্ঠা ৫১

এই বাক্যের দু'টি বিকল্প অনুবাদ হতে পারে:

ক) আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আর যা কিছু আপনি করেন, তাও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন।
খ) আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আর যা কিছু আপনি তৈরি করেন, তাও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন।

এই দু'টি অনুবাদের মধ্যে কোনটি আমরা গ্রহণ করবো? আমাদের বাক্যগুলো দেখতে হবে, যে-বাক্যটি আমরা প্রশ্ন করছি, তার আশেপাশের বাক্যও আমাদের পড়তে হবে। ৯১ আয়াতের শুরুতে উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে আমরা আরো কিছু তথ্য দেখতে পাই।

> "পরে সে (হযরত ইব্রাহিম) সন্তপর্ণে উহাদিগের দেবতাগুলোর নিকটে গেল এবং বলিল. 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন?" এই আয়াতে আয়াতটির প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম এই কথাগুলো মুর্তীপূজারীদের কাছে বলেছেন যে, তারা যে মূর্তিগুলো তৈরি করে, সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অক্ষম সৃষ্টি। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা মূর্তি **তৈরি** করছ।"

এই আয়াতটিকে প্রসঙ্গ থেকে আলাদা করে দেখেছেন বলেই, একজন বিশিষ্ট আলেম ঈমাম গাজ্জালী এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আর যাকিছু আপনি **করেন**, সবই আল্লাহ্ হতে হয়। এভাবে কোরআনের সমর্থন আবিষ্কার করে, এই ধর্মতত্ত্বীয় ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষ ভালোমন্দ যা-কিছু করে তা আল্লাহ্ নিজেই তা মানুষকে দিয়ে করান।[১৩]

গোটা প্রসঙ্গ

কখনো কখনো গোটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সময়ে, আমাদের একই বিষয়ে অন্য অধ্যায়ে বলা বাক্যগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। জর্দানের অধ্যাপক হাসান আব্দাল ফাতাহ কাটকাট তাঁর লেখা *"দি এপোসল ওয়াজ নোন বিফোর হিজ বার্থ"* বইয়ের *মানার আল-ইসলাম* নামক প্রবন্ধে[১৪] এর উদাহরণ পাওয়া যায়। তিনি এটি দেখিয়েছেন, হজরত মোহাম্মদের জন্মের আগেই তাঁর আগমন সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অধ্যাপক সাহেব তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ সিপারার ১৮:১৮-১৯ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে,

> "আমি [আল্লাহ্] তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মত একজন নবী দাঁড় করাব। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেব সে তা-ই তাদের বলবে। সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।"

---

[১৩] Dr. Daud Rahbar, এ, জে ব্রিল, লেইডেন, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-২০

[১৪] জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-১৯৮১, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় বিবরণ সিপারার ৩৪:১০ আয়াতের কেবলমাত্র একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

> "আজ পর্যন্ত বনি-ইসরাইলদের মধ্যে মূসার মত আর কোন নবীর জন্ম হয় নি— ।"

পরে তিনি এই বাক্য দু'টোকে একত্রে সংক্ষেপিত করে বলেছেন:

ক) আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, হজরত মূসা (আঃ)-এর মতো আরেকজন নবীকে উৎপন্ন করার জন্য

খ) কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের শেষে এই মন্তব্য করা হয়েছে যে, হজরত মূসা (আঃ)-এর মতো আর কোনো নবীর ইসরাইলের বংশে জন্ম হয়নি।

প্রথমতঃ অধ্যাপক কাটকাট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "যেহেতু ইসরাইলীদের মধ্যে হজরত মূসা (আঃ)-এর মতো আর কোনো নবীর জন্ম হয়নি; "তাদের ভাইদের" এই বাকাংশ দ্বারা হজরত **ইসমাইলের বংশধরদের** বুঝানো হয়েছে। হজরত ইসহাকের বংশধরদের বুঝানো হয়নি। আর এটি হচ্ছে, হজরত **মোহাম্মদের** আগমন সম্পর্কে ওহী।

এই অনুমান সঠিক কি-না তা যাচাই করার জন্য "তাদের ভাইদের" এই বাক্যাংশ সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে; তৌরাত পাঠ করেই আমরা তা জানতে পারি। সেখানে হজরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? যখন আমরা প্রসঙ্গ পরীক্ষা করি, তখন আমরা দেখি যে, সেখানে আরো তথ্য রয়েছে, যা আমাদের জানা দরকার। দ্বিতীয় বিবরণ সিপারায় ১৮:১৫-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তাঁর কথামতো তোমাদের চলতে হবে। তুর পাহাড়ের নিকট যেদিন তোমরা সকলে মাবুদের সামনে জমায়েত হয়েছিলে সে'দিন তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্র নিকট তাই চেয়েছিলে। তোমরা বলেছিলে,' আর আমরা আমাদের মাবুদ আল্লাহ্র কথা শুনতে কিংবা এই মহান আগুন দেখতে চাই না; তা হলে আমরা মারা যাব।'
>
> "মাবুদ আমাকে বলেছিলেন,' তারা ভালোই বলেছে। আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মতো একজন নবী দাঁড় করাবো। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলবো, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেবো সে তাই তাদের বলবে।" ইত্যাদি

আমরা যখন এই আয়াতগুলো পড়ি, আমরা দেখি যাঁরা তাঁর সাথে তুর পাহাড়ে আল্লাহ্র আওয়াজ শুনেছিলেন হজরত মূসা (আঃ) বনি- ইসরাইলের সেই সব লোকদের কাছে কথা বলেছিলেন। আর আল্লাহ্ তাঁদেরকে বলেছিলেন, তাঁরা যা চেয়েছে, তিনি তাঁদেরকে তাই দেবেন।

সুতরাং, "তাদের ভাইদের" বলতে কেবলমাত্র তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে যেসব ইহুদী সেখানে উপস্থিত ছিল, তাঁরাই তাঁর ভাই। যদি বিষয়টি এখনও স্পষ্ট না হয়, তবে আমরা আগের অধ্যায়ে

দেখবো। সেখানে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে "তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে" তারপর যথাযথভাবে এর অর্থ করা হয়েছে। ১৭:১৪-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ যে দেশটি তোমাদের দিতে চাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে—যখন তোমরা বলবে, 'আমাদের আশেপাশের জাতিগুলোর মতো এসো, আমরা আমাদের জন্য একজনকে বাদশাহ্ হিসেবে বেঁছে নেই,' — **সে যেন তোমাদের ইসরাইলীয় ভাইদের মধ্যে একজন হয়। যে তোমাদের ভাই নয় এমন ভিন্ন জাতির কোনো লোককে তোমরা তোমাদের বাদশাহ করবে না।"**

এখানে বাকাংশ **"তোমার ভাইদের মধ্য থেকে"** বলতে স্পষ্টভাবেই **ইসরাইলী ভাইদের** বুঝানো হয়েছে, হজরত ইসমাইলের বংশধরদের কথা এখানে বলা হয়নি।

এছাড়াও বলা যায়, কোরআনেও একই অর্থে বুঝানো হয়েছে। শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-আ'রাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:৬৫, ৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

> 'আদ জাতির নিকট আমি **উহাদের ভ্রাতা** হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল.' হে আমার সম্প্রদায়, ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর.— ।"

> ছামুদ জাতির নিকট **তাহাদের ভ্রাতা** সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম— ।

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ফরাসী ভাষায় অনুদিত কোরআন[১৫] একটি টিকায় বলেছেন,

> "আরবী শব্দ *"আখ"* বলতে *ভাই* ও *একই গোত্রের সদস্য* এই উভয় অর্থেই বুঝানো হয়েছে।"

হিব্রু ভাষায়ও ভাইকে "আখ" বলা হয়। এবং একে উভয় অর্থে *ভাই* ও *গোত্রের সদস্য* হিসেবে অর্থ বুঝানো হতে পারে। তৌরাত শরীফের দ্বিতীয় বিবরণ সিপারায় ওপরের উদ্ধৃত অংশে একেবারে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে- তখন এমন একজনের কথা বলা হয়েছে, যিনি একই গোত্রের সদস্য। আল্লাহ্ স্পষ্টভাষায় বনি- ইসরাইলীদের বলেছেন, **"আমি তাহাদের ভাইদের মধ্য থেকে, তোমার আপন গোত্র থেকে অর্থাৎ তোমাদের বনি- ইসরাইলী ভাইদের মধ্য থেকে।"**

আমরা যখন তৌরাত শরীফের দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের দ্বিতীয় অংশে উদ্ধৃত ৩৪:১০-১২ আয়াতগুলো পড়ি, আমরা দেখি যে, সঠিক অর্থ বুঝার জন্য প্রসঙ্গের আরো বেশী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখানে আমরা পড়ি,

> "আজ পর্যন্ত ইসরাইলীয়দের মধ্যে মূসা (আঃ)-এর মতো আর কোনো নবীর জন্ম হয়নি যার কাছে মাবুদ বন্ধুর মতো সামনা সামনি কথা বলতেন। মাবুদ মূসা (আঃ)কে মিশর দেশে ফেরাউন ও তাঁর কর্মচারী এবং তাঁর সারা দেশের ওপর যে সমস্ত কেরামতি-নিশানা ও কেরামতি কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন সেরকম কাজ আর কেউ করেনি। সমস্ত ইসরাইলীদের চোখের সামনে

[১৫] *Le Coran,* Le Club Français du Livre, 1959.

মূসা যে মহাশক্তি দেখিয়েছিলেন কিংবা যে সমস্ত ভয়-জাগানো কাজ করেছিলেন তা আর কেউ কখনও করেনি।”

এই বিষয়টি তওরাতের শুমারী সিপারার **১২:৬-৮** আয়াতে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

> “মাবুদ বললেন,’ তোমার আমার কথা শুন- তোমাদের মধ্যে কোনো নবী থাকলে আমি মাবুদ, দর্শনের মধ্য দিয়ে নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করি আর কথা বলি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। কিন্তু **আমার গোলাম মূসার সাথে আমি তা করি না— তার সাথে সামনা সামনি পরিষ্কারভাবে কথা বলি—**।”

এই প্রসঙ্গ কী পার্থক্য তুলে ধরেছে। এটি আমাদের বলে যে, হজরত মূসা (আঃ)-এর কী অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, কীভাবে **সেই সময় পর্যন্ত** অন্যান্য নবীদের চেয়ে হজরত মূসা (আঃ) আলাদা ছিলেন। এখানে মাবুদ তাঁকে এমন একজন নবী বলেছেন, যাঁকে **তিনি বন্ধুর মতো জানতেন,** যাঁর সাথে তিনি **সামনা সামনি** কথা বলতেন।

এখানে আরো দেখা যায় যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের বাণীকে কোরআন সমর্থন করেছে। সূরা নিসা (নারী), ৪:১৬৩-১৬৪ আয়াতে হজরত মূসা (আঃ)-এর একই বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

> “তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পূর্ববর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে জবুর দিয়াছিলাম— মূসার সাথে আল্লাহ্ **সাক্ষাৎ বাক্যালাপ** করিয়াছিলেন (**تَكْلِيمًا** তাকলীমান)।”

আমরা দেখেছি যে, হজরত মূসা (আঃ)কে আলাদা তালিকায় রাখা হয়েছে। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও অন্যান্য নবীদের চেয়ে হজরত মূসা (আঃ) আলাদা। কারণ, হজরত মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্ **সরাসরি** আলাপ করেছেন।

এই কথা সবাই জানে যে, মক্কাবাসীদের কুফরী সম্পর্কে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) একজন সতর্ককারী হিসেবে সতর্ক করেছেন। কিন্তু কোরআন কখনো এই দাবী করে না যে, তিনি হজরত মূসা (আঃ)-এর মতো মোজেজা করেছেন। অথবা আল্লাহ্ তাঁর সাথে মুখোমুখি কথা বলেছেন।[১৬] অথবা সরাসরি তাঁকে জানতেন।

[১৬] যেহেতু হযরত মূসা একমাত্র নবী, যিনি দু’টি অবশ্যপূরণীয় শর্ত পূরণ করেছেন, ঈসা মসীহ প্রায় ৫০টিরও বেশী মোজেজা করেছেন। আরও বলা যায় যে, মার্ক ১:৩২-৩৪; এবং ৭:৫৩-৫৬; লূক ১০:১,১৭ এবং মথি ১৫:২৯-৩১ বলে যে, তিনি অনেক লোককে সুস' করেছেন অথবা বলা যায় , যারা তাঁর কাছে এসেছে, তাদের সবাইকে সুস' করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে মুখোমুখি জানতেন, ইউহোন্না ১:১,১৮, বলেছে, ঈসা মসীহ ছিলেন আল্লাহর কালাম (**الكَلِمَةُ**)। ঈসা মসীহ শুরুতেই আল্লাহর সাথে ছিলেন, বেহেসে- আরোহন করার পরে তিনি পিতার কোলে আছেন।

সুতরাং, যদি দাবী করা হয় যে, এই আয়াতগুলো হজরত মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলের মধ্যে কোনো নবীর আগমনের কথা বলা হয়নি, তাহলে বলতেই হয় যে, অধ্যাপক কাটকাট **কোরআনে ও কিতাবুল মোকাদ্দস উভয় কিতাবে বর্ণিত প্রসঙ্গ অবজ্ঞা করেছেন।**

সিদ্ধান্ত

সুতরাং, কেবলমাত্র একটি পথ খোলা আছে, পুরানো যুগের কোনো শব্দের বা বাক্যাংশের নতুন অর্থ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, একজনকে অবশ্যই যে সময়ে লেখা সেই সময়ে ব্যবহৃত শব্দটির নতুন ব্যবহার কবিতা, চিঠি বা সরকারী দলিল থেকে উদাহরণ দিতে হবে; - প্রথম শতাব্দী হচ্ছে ইঞ্জিল শরীফ ব্যবহারকারীদের জন্য আর প্রথম হিজরী হচ্ছে মুসলমানদের জন্য। এটি সাধারণতঃ সেই সময়ে ঘটে যখন সেই সময়ে কোনো নতুন দলিলের উৎস খুঁজে বের করা হলে। উদাহরণ হিসেবে আমরা নজি মাটির ফলকের কথা বলতে পারি। এগুলো পোড়া মাটির তৈরি, যা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লেখা হয়েছিল। হযরত ইব্রাহিমের সময়ে পালনীয় প্রথা কেমন ছিল, তা এই কাদা মাটির ফলকগুলো আমাদেরকে জানতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যখন কিতাবুল মোকাদ্দস, কোরআন বা অন্যান্য বই বা দলিল থেকে কিছু উদ্ধৃত করি, সেই সময়ে সেই বিষয়ের ওপরে লেখা আমাদের সমস্ত প্রসঙ্গই উদ্ধৃত করা উচিত। একজন খ্রীষ্টান হিসেবে আমি অবশ্যই সমান সততার সাথে যেভাবে কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত উদ্ধৃত করি, তেমনিভাবে কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করবো। আবার অন্যদিকে একজন মুসলমান যেভাবে কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেন, সেভাবেই তাঁর সমান সততার সাথে কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত উদ্ধৃত করা উচিত।

আমরা যখন আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে আলোচনা করি তখন একটি শব্দের অর্থ পরিবর্তন করা অথবা প্রসঙ্গের বাইরে কোনো কিছু উদ্ধৃত করা স্পষ্টতঃই একটি গুরুতর বিষয়। আসলে তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করে আমার “নিজের” শব্দ বসাচ্ছি। কম করে হরেও বলা যায় যে, এটি হচ্ছে এক ধরণের অর্থের পরিবর্তন (আল-তাহরিফ আল-মানাওয়ী) এক ধরনের মিথ্যে কথা বলা, আর এই কাজটির জন্য ইহুদীদেরকে কোরআনে দোষী করা হয়েছে; আর হতে পারে - এটি এক ধরনের অংশিবাদী (الشِرْكْ/শিরক) কাজ অর্থাৎআমি এবং আমার ধারণাকে আল্লাহ্‌র কালামের সাথে যোগ করছি। **সুতরাং, পাক-কিতাবের কোনো বিষয় উদ্ধৃত করার সময়ে সততার সাথে গোটা প্রসঙ্গ তুলে ধরতে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডঃ বুকাইলির নিজস্ব প্রাথমিক অনুমান

সর্বপ্রথমেই ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, "প্রতিটি বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখেছেন।-une objectivite totale...sans le moindre exclusif." তিনি বলেছেন,

> "সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে, পূর্বতন যাবতীয় ধ্যান-ধারণা পরিহার করেই আমি সর্বপ্রথম কোরআনের বাণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলাম।—এরপর আমি কিতাবুল মোকাদ্দসের পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলোর ওপর আমি আমার গবেষণা তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে শুরু করি। এক্ষেত্রেও আমি আগের মতোই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী বজায় রাখি।[১]

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি কোনো সৃষ্টি ও জ্ঞান সম্পর্কিত দর্শনবিদ্যা নিয়ে কথা বলবেন না; বরং তিনি সত্য বিষয়গুলো নিয়েই শুরু করবেন। তিনি মনে করেছেন, যে-কেউ এই সত্যবিষয়গুলো থেকে আরোহী পদ্ধতিতে নিজের ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। এখানে সেই লোককে উদ্বুদ্ধ করার দরকার নেই যে, আগে থেকেই কোনো বিষয় তাকে মেনে নিতে হবে।

এই বিষয়টি, অবশ্যই বিংশ শতাব্দীর সামাজিক বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারকে অবজ্ঞা করা হয়েছে যে, "গতানুগতিক" ও যে সত্য ব্যখ্যার করা যায় না, এমন সত্য বিষয় বলতে আর কোনো কিছু নেই। এই বিষয়টি জনাব কুন, তাঁর বই "*দি ষ্ট্রাকচার অব সাইন্টিফিক রিভুলসন*" নামক বইয়ে বলেছেন। এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "সত্যের" ব্যাখ্যা একজনের পূর্ব থেকেই সৃষ্টি ও জ্ঞান সম্পর্কিত দর্শনবিদ্যার কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। তিনি লিখেছেন,

> প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বারবার এটি দেখিয়েছেন যে, একদল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একাধিক তত্ত্ব গঠিত হতে পারে। [২]

আগের যুগের পণ্ডিতেরা এই ধারণাকে স্বীকার করেছেন। জেমস ওর, ১৯০৫ সালে বিডারম্যান নামক একজন জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদের কথা উদ্ধৃত করে লিখেছেন,

> "এটি সত্যি নয়, কিন্তু চোখের বালির মতো, যদি কেউ দৃঢ়রূপে দাবী করে যে, মতবাদগত কোনো বিষয় আগেই মেনে না নিলে প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সমালোচনা অগ্রসর হতে পারে বা হওয়া উচিত—প্রতিটি ছাত্র ঐতিহাসিক তদন্তগুলো, কিছুটা সীমিত সংজ্ঞার মধ্যে নিয়ে আসবে, এগুলো এমন নমনীয় হবে, যা

---

[১] *La Bible, Le Coran, et la science,* Dr. Maurice Bucaille, Edition Seghers, Paris 1976. পৃষ্ঠা-viii

[২] Thomas S. Kuhn, 2nd Ed., Univ. of Chicago Press ,1970, p 76.

ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব, আর এগুলো হচ্ছে সেই ছাত্রের জন্য মতবাদগত আগেই মেনে নেয়ার বিষয়।[৩]

ডঃ বুকাইলির সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়ার দাবী তার নিজেরই কতগুলো বিষয় যা তিনি আগেই মেনে নিয়েছিলেন, তা বাতিল করেছে। সুতরাং, আমরা তাঁর চারটি **প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন** দেখবো ও তাদেরকে আলোতে বের করে আনবো, যাতে প্রতিটি পাঠক তা বুঝতে পারে।

১. বিজ্ঞান হচ্ছে সমস্ত কিছুর মাপকাঠি

ডঃ বুকাইলির প্রথম বিষয় যা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, তা হচ্ছে, পাক-কিতাব ও বিজ্ঞানের মধ্যে, কোনটিকে সত্য রূপে সমর্থন করা হবে তাই হচ্ছে প্রাথমিক মাপকাঠি, আর এর সাহায্যেই আমরা পাক কালামের প্রামাণিকতা বিচার করতে পারি। এই কথার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন অবশ্যই করা যায় যে, কোন পর্যায়ের মতের মিল এখানে প্রয়োজন? কী পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার এখানে দরকার?

যেহেতু প্রত্যেকেই জানে যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অতীতে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। ডঃ বুকাইলি নিজে তা স্বীকারও করেছেন। আর এই কারণে তিনি তাঁর বইয়ের মূল উপাদান হিসেবে নিচের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করেছেন:

> "এ'বিষয়ে একটি কথার ওপরে আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই- আর তা হলো, সাইন্টিফিক ডাটা বা বৈজ্ঞানিক তথ্য-পরিসংখ্যান বলতে আমরা সেই সত্যকে বুঝাতে চেয়েছি, যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিবেচনায় ব্যাখ্যামূলক সেই সব থিওরী বা সিদ্ধান্ত বাদ দেওয়া হয়েছে- যেসব থিওরী একদা কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সেগুলোর উপযোগিতা হারিয়ে গেছে। এই কথার দ্বারা যা বলতে চাচ্ছি, তা হলে, আমি শুধুমাত্র সেই বৈজ্ঞানিক সত্যকেই বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করছি, যা অখন্ডনীয় এবং অবিসম্বাদিতভাবেই সত্য। আর যেসব বিষয়ে কিছু আংশিক বা অসম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে, সেই ক্ষেত্রে কেবল ততটুকু গ্রহণ করেছি- যতটুকু বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যতটুকুর ব্যবহারে ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই।[৪]

বিজ্ঞান সম্পর্কে ডঃ বুকাইলির এই সংজ্ঞা নিয়েই আমরা ভালোভাবেই আমদের বিতর্ক শুরু করতে পারি। কিন্তু এটি এটি এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে যে, পানির গতি চক্র, মহাকাশ পদার্থবিদ্যা, বা ভ্রূণবিদ্যার ওপরে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

---

[৩] *Old Testament Critics,* Thomas Whitelaw, Kegan, Paul, Trench, Trubner, & Co , Ltd., London, 1903, p 172.
[৪] ডঃ বুকাইলি, ওপরে উল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা-vii

আমরা যখন বিজ্ঞান শব্দের মূল খুঁজি (ডঃ বুকাইলি এই ধরনের কাজ পছন্দ করেন) তখন আমরা দেখি যে, এটি ল্যাটিন *scientia* শব্দ থেকে এসেছে, এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সুতরাং, আমাদের বিজ্ঞান শব্দ নিয়ে আলোচনার সময়ে অবশ্যই সেই বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, যেগুলো আমরা "জানি"। এর মধ্যে অবশ্যই থাকবে পুরাতত্ত্বীয়, ঐতিহাসিক সত্যসমূহ, এর পাশাপাশি থাকবে কীভাবে পর্বতসমূহ তৈরি হয়েছিল। এমনকি নির্দিষ্ট কতগুলো ধর্মীয় সত্যসমূহ থাকতে পারে, যেমন যেসব ওহী পূর্ণ হয়েছিল, তা অবশ্যই আমাদের বিবেচনা করতে হবে।

তারপর, তিনি ৮ পৃষ্ঠায় তিনি তাঁর সংজ্ঞাকে আরো সংস্কার করে তিনি লিখেছেন,

> "ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের এই যে বিরোধ, তা কিন্তু শাব্দিক অর্থেই ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত্র কোনো বিরোধ নয়।"

আবারও আমি নিজে ডঃ বুকাইলির এই প্রচেষ্টা অর্থাৎ আলোচনার ক্ষেত্রকে সংক্ষেপিত করা এবং "শাব্দিক অর্থেই ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত্র কোনো বিরোধকে" বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আমি একমত নই। লেখা ও পড়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাঁর বই হোক বা এই বই-ই হোক, ধর্মীয় সত্যকে খুঁজে বের করা।

আসল প্রশ্ন হচ্ছে, **"আল্লাহ্ কি আছেন?"** যদি **থাকেন**, **"কীভাবে আমরা তাঁকে জানতে পারি ও তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি?**

একটি প্রাণীবিদ্যা বা রসায়ণ বইয়ের মধ্যে কোনো ভুল নাও থাকতে পারে, কিন্তু এই বইগুলো আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলে না।

কখনো কখনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ধর্মীয় কোনো বিষয় যা আমরা স্বীকার করে নেই, একটির অপরটির বিপরীত। এই ধরনের কাজের উদাহরণ হিসেবে আমরা ১৫৬-১৫৮ পৃষ্ঠা দেখবো, যেখানে ডঃ বুকাইলি তারা, গ্রহ আর জলন্ত উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে বলেছেন। তিনি প্রাথমিক মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-সাফ্‌ফাত (শ্রেণীবদ্ধকারীগণ) ৩৭:৬ আয়াতের উল্লেখ করেছেন:

> "আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজীর সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।"

স্পষ্টতই এই আয়াতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এখন আমরা প্রসঙ্গ দেখবো, এর সাথে ৭-১০ আয়াত যোগ করে পড়লে দেখা যায়, সেখানে বলা হয়েছে,

> "আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজীর সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং **রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদের্াহী শয়তান থেকে। ফলে উহারা উর্দ্ধ জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না** এবং উহাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে - বিতাড়ণের জন্য এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। **তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাৎধাবন করে।"**

এখানে জলন্ত বস্তু সম্পর্কে ড. বুকাইলির মতে এগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য, এমন রুহানিক সত্যের-আল্লাহ্ ও শয়তানের সাথে এগুলো কাজ করছে বৈজ্ঞানিকভাবে যা প্রমাণ করা যায় না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে কোনো ব্যক্তি জানেন যে, জলন্ত বস্তুগুলো হচ্ছে, উল্কা। সুতরাং, এই কথা বলা

যায় যে, আল্লাহ্ একজন রূহানিক সত্তা, তিনি একটি রূহানিক সত্তা শয়তানের দিকে একটি বস্ত নিক্ষেপ করছেন।[৫]

ডঃ বুকাইলি এই বিষয়টি নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন, শেষে তিনি এই কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, "তবে, একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট যে কোরআন যখন তাঁর বর্ণনায় জাগতিক বস্তুর দ্বারা কোনো বিষয় আমাদের বুঝাতে চায়, তখন - **আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের যতটুকু জ্ঞান দান করেছে,** বিশেষতঃ তার সাহায্যে আমরা অনায়াসে তা বুঝে নিতে পারি। কিন্তু কোরআনের এই বক্তব্য যখন নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তখন তার অর্থ আমাদের কাছে হয়ে পড়ে **অবোধগম্য** কিংবা রহস্যময়। পরের পৃষ্ঠায় নিচে তিনি লিখেছেন, "এসব বিষয় খুব সম্ভব আমাদের আলোচ্য গবেষণার আওতার বাইরে।"[৬]

একে বৈজ্ঞানিক সমস্যা বলা যায় কি-না সে-বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু আসলে এটি একটি বড় সমস্যা। একটি সত্য নিয়ে সমস্যা, এমন একটি সমস্যা যাকে এই কথা বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় ন যে, "কোরআন—অবোধগম্য বা অস্পষ্ট" অথবা "এসব বিষয় খুব সম্ভব আমাদের আলোচ্য গবেষণার আওতার বাইরে।" এই ধরনের বক্তব্য সেখানে তাঁর লেখা *বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান* বই থেকে যেখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম একসাথে আলোচিত হয়েছে সেই বই থেকে আসলে আমরা কী পাব বলে আশা করতে পারি?

এই কারণগুলোর জন্য আমি জোর গলায় বলতে পারি না যে, এই বইয়ে কেবল বিজ্ঞান নিয়ে অথবা রূহানি বিষয়- যা "আমাদের আলোচ্য গবেষণার আওতার বাইরে" তা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই বই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু এই বইয়ে সেই সব সমস্যাগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো যে কোনো মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলোচনার মৌলিক বিষয়। কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে কোরআন কী বলে? আসলে কি কিতাবুল মোকাদ্দসে রদবদল করা হয়েছে? কীভাবে মুসলমানরা জানেন যে, কোরআনে রদবদল করা হয়নি? হাদিসের স্থান কোথায়? কিতাবুল মোকাদ্দসে ও কোরআনে সাফায়াৎ করা সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেছেন? কীভাবে আমরা একজন **প্রকৃত নবীকে** চিনতে পারি?

---

[৫] উল্কা ও ও উল্কাপিণ্ড নিয়ে আমাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চতুর্থ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখুন

[৬] ডঃ বুকাইলি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৫৮

কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআনকে একই মাপকাঠি দিয়ে মাপা হয়নি

২. বিংশ শতাব্দীর ভাষায় কিতাবুল মোকাদ্দসের কথা বলা প্রয়োজন

ডঃ বুকাইলি বিংশ শতাব্দীর মাপকাঠিতে কিতাবুল মোকাদ্দসের বিচার করেছেন, তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসকে একটি বিজ্ঞানের বই হিসেবে পড়েছেন। যদি তাঁর বুঝার ক্ষমতা অনুসারে কিতাবুল মোকাদ্দসের কোনো অংশে মনে হয়েছে, সেখানে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে, যা তিনি বুঝতে পারেননি, তখন তিনি সেগুলোকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন, তাই স্বতঃসিদ্ধভাবেই ধরে নিয়েছেন যে, সেগুলো আল্লাহ্‌র কালাম নয়। কিতাবুল মোকাদ্দসের যা-কিছু তাঁর কাছে "অপ্রমাণযোগ্য" মনে হয়েছে এবং অথবা মিল নেই বলে তিনি মনে করেছেন, তখন তিনি বলেছেন, কিতাবুল মোকাদ্দসে যে-ভুল রয়েছে, এগুলো হচ্ছে তার প্রমাণ।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কিতাবুল মোকাদ্দসে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করা বা তুলনা করে সত্যতা যাচাই করা যায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি আল্লাহ্‌র কালাম নয়, বড়জোর একে মানবীয় ঐতিহাসিক বিবরণী হিসেবে বলা চলে। কিতাবুল মোকাদ্দসের কোনো অংশ সম্পর্কে তিনি যা বুঝেছেন এবং সেই অংশ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যারও সংশোধন করার প্রয়োজন হতে পারে, তা তিনি স্বীকার করেননি। কোনো ব্যাখ্যা, কোনো খাপ খাওয়ানোর অনুমতি নেই। এগুলো লেখক কেবল "নানা বাগাড়ম্বরে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে- কখনো বা ইনিয়ে বিনিয়ে - অত্যন্ত চালাকির সাথে একযোগে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন।"[৭]

এই ধরণের মূল্যায়নকে বলা হয় বিরোধ-পথ। এখানে পাককিতাবের বিরুদ্ধে পক্ষ নেয়া হয় আর প্রচুর চেষ্টা করা হয় যেন প্রতিটি ভুল তুলে ধরা যায়।

৩. কোরআন নাজিল হওয়া সময়ের প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে পারে

আবারও এখানে ধরা নেয়া হয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পরম মাণ ও পরম জ্ঞান হিসেবে- এর সাহায্যে আমরা কোরআনের সত্যতা যাচাই করা যায়। এই ধারণা স্বীকার করে নিলে, মনে হয় যে ওপরে কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে একটি পার্থক্য আছে,

সূরা নাযিয়াত (আকর্ষণকারী) ৭৯:২৭-৩৩ আয়াত উদ্ধৃত করার পরে ডঃ বুকাইলি বলেছেন,

> "আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মানুষের জন্য প্রদত্ত এই যেসব নিয়ামত, এখানে তা এমন এক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, -যে ভাষাটা ছিল আরব উপদ্বীপের সাধারণ কোনো কৃষক কিংবা বেদুইনের নিকট

---

[৭] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ২৫০

> সহজবোধ্য। এই বর্ণনার মধ্যে কিন্তু নিহিত রয়েছে আকাশমন্ডল সৃষ্টির কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ।”[৮]

স্পষ্টতার অভাব আগে ধরলেও এখানে আর কোনো ভুল বলে ধরা হয়নি। যেভাবে তিনি দাবী করেছেন, তিনি যখন কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগের লোকদের জন্য বিশেষ ছাড় দিয়েছেন। এটি কিন্ত প্রাক বৈজ্ঞানিক ভাষায়, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ণনায় উদ্ধৃত করার জন্য তাঁকে অনুমতি দিয়েছে।

এই ধরনের পথকে “মিলের পথ” বলা হয়। এটি অথবা পাক-কিতাব ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিল করে বা সমন্বয় খুঁজে।

এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, কোরআনের মধ্যে কোনো “দুবোর্ধ্যতা” নেই। অবশ্যই একটি একক শব্দের অনুবাদ “দুর্বল বিষয় হতে পারে”[৯] আর আমরা ওপরে আলোচনার সময়ে দেখেছি যে, “জলন্ত বস্তুর” অর্থ অস্পষ্ট। কিন্তু কোনো “দুবোর্ধ্য” কিছু নেই “অপ্রমাণযোগ্য” বা “অমিল” নেই। সম্ভবতঃ এইজন্য যে কারও একজনের বলা উচিত, আগে থাকলেও **এখন আর কোনো** “দুবোর্ধ্যতা” নেই। কেননা, ডঃ বুকাইলি স্বীকার করেছেন,

‘‘একারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী গুজরে গেছে, কোরআনের ব্যাখ্যাকারক বা তফসীর-লেখকগণ (যাদের রচনা ইসলাসী সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত) কোরআনের বিশেষ বিশেষ বাণী বা বক্তব্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আসলে, ওইসব ভুল ছিল তাঁদের একান্ত অনিচ্ছাকৃত। কেননা, ওইসব বাণীর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য বুঝা সে যুগে তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। ওইসব তফসীর- লেখকের সময়কাল গুজরে যাওয়ার অনেক পরে, একান্ত হালে এসে, - (যে সময়ের ব্যবধান আমাদের সময় থেকে খুব বেশী দূরে নয়- শুধুমাত্র সেই আধুনিক যুগেই এসেই) **কোরআনের ওইসব আয়াত বা বাণীর সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দান করা সম্ভব হচ্ছে।—** এভাবে কোরআনের বিশেষ বাণীর জন্য পদে পদে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন পড়ে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য জ্ঞানের; আর এভাবেই কোরআনের ওইসব বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়তে থাকে।[১০]

> “অন্য কথায়, কোরআনের বাণীতে যা-কিছু রয়েছে, অতীতে মানুষকে সে-সব বাণীর বাহ্যিক অর্থ ও আপাতঃ তাৎপর্য গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে।”[১১]

এই ধরনের “দুর্বল” অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ডঃ বুকাইলি **আরবী শব্দের** নতুন নতুন অর্থ খুঁজে (আবিষ্কার) বের করে তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে একই সারিতে আনার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন।

---

[৮] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১৩৮

[৯] ডঃ বুকাইলির ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১৯৪

[১০] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১২১

[১১] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১২২

অনেক মুসলমান ছাত্র - বিশেষভাবে যাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁরা ডঃ বুকাইলির এই প্রচেষ্টা দেখে রোমাঞ্চিত হবেন। কিন্তু এই বিষয় থেকে স্বীকার করতে হবে যে, ঐতিহ্যবাহী মুসলমান তফসীরকারকেরা যারা ভালো আরবী ব্যাকরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতেন, তারা আধুনিক (বিশেষভাবে ইউরোপীয়) বরং উদ্ধত লোকদের - তুলনায় কোরআনের সঠিক অর্থ ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। বিশেষভাবে যদিও কোরআনে জোর দিয়ে দাবী করা হয়েছে, কোরআন কুরাইশ গোত্রের কথ্য ভাষা "স্পষ্ট আরবী" ('আরাবীয়ুন মুবীনুন عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) ভাষায় নাজিল করা হয়েছে যেন তারা বুঝতে পারে। এই প্রচেষ্টার পাশাপাশি ডঃ বুকাইলি ব্যক্তিগত অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এই রকম ব্যাখ্যা দেওয়া কোরআন হারাম বা নিষেধ করেছে।

ফলাফল

প্রতিটি পাঠকই জানেন যে, আমরা যা খুঁজি, তা প্রায় সব সময়ে পাই। যদি আমরা কোরআন বা কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে মনে মনে এই কথা স্বীকার করে নিয়ে পড়ি যে, এতে ভুল রয়েছে, তাহলে অবশ্যই আমরা ভুল খুঁজে পাব। আমরা যদি এখন "বিরোধীতার পথ" অনুসরণ করি, তবে অবশ্যই আমরা ভুল খুঁজে পাব। যদি আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন ক্ষমাসুন্দর মন নিয়ে পড়াশোনা করি, এবং আশা করি আল্লাহ্ ও তাঁর বিজ্ঞান একমত হবে, তাহলে আমরা "মিলের পথ" অনুসরণ করছি। আর তাহলে আমরা খুব কমই -সম্ভবতঃ দু-একটি ভুল খুঁজে পাব। যদি আমরা অবস্থা অনুযায়ী বিজ্ঞান ও অথবা পাককালাম শিথিলভাবে ব্যাখ্যা করি, তাহলে আমরা যে মিল খুঁজছি তা আমরা খুঁজে পাব।

ডঃ বুকাইলি কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্ষেত্রে, "বিরোধীতার পথ" আর কোরআনের ক্ষেত্রে "মিলের পথ" ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই ধরনের আচরণের উদাহরণ হিসেবে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের সৃষ্টি-তত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করতে পারি। তিনি প্রথম অধ্যায়ে এ'বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করতে গিয়ে, — এক সপ্তাহের যে কাজ তাঁরা দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক বিচারে তার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এই বিষয়ে মানুষ এখন পরিপূর্ণভাবে জানে যে, প্রতিটি পর্যায়ে সৃষ্টির জন্য সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। —তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, সপ্তাহের এই হিসাবটা কি আসলেই দিনক্ষণের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ, নাকি এর অর্থ কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক কোনো অনির্দিষ্ট কাল? সপ্তাহের বা দিনের হিসাব যদি সেই অনির্দিষ্ট কাল বলে ধরা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও ইমামদের রচিত কিতাবুল মোকাদ্দসের এতদসংক্রান্ত বর্ণনা আরো বেশী করে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে।"[১২]

[১২] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ২৭-২৮

এ'ভাবে তিনি প্রথম অধ্যায়ে এই সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের দিন বলতে একটি **অনির্দিষ্ট সময়কাল** বুঝিয়েছে। কিন্তুতিনি যখন আরেকবার একই বিষয় নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে কোরআনের সাথে সম্পর্কিত করে আলোচনা করার সময়ে তিনি বলছেন,

> "কিতাবুল মোকাদ্দসের এই 'দিনের' ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর যে কোনো দিন মানুষের দৃষ্টিতে এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত।"[১৩]

তিনি আগে যে-কথা স্বীকার করেছিলেন, অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দসে দিন বলতে একটি সময়কাল বুঝিয়েছেন - যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য, পরে তিনি তা ভুলে গেছেন। তিনি এখন দৃড়তার সাথে বলছেন, কিতাবুল মোকাদ্দসে দিন বলতে ২৪ ঘন্টার দিন বুঝানো হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়, আর এ'ভাবে "প্রমাণিত" হচ্ছে যে, এখানে "বড় ভুল" রয়েছে।

পরের পৃষ্ঠায় তিনি তিনি আরবী শব্দ "يَوْم ইয়ায়ুম" যার অর্থ দিন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি কোরআন থেকে দুটি আয়াত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর অর্থ সময় কাল হতে পারে।[১৪]

তিনি লিখেছেন,

> "এই 'সময়কাল' বোঝাতে 'ইয়ায়ুম' শব্দটি কোরআনের অন্যখানেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সূরা সাজদা (প্রণিপাত) ৩২:৫: —'
>
> — সময়কালের' (ইয়ায়ুম) মধ্যে যাহার হিসাব তোমাদের গণনায় সহস্র
>
> বৎসর।" (উল্লেখ্য যে, এই ৫নং আয়াতের আগে ছয়টি সময়কালের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির যে-কথাটি বলা হয়েছে, এটাই হচ্ছে সেই সময়কালের সঠিক হিসাব)। ব্রাকেট ডঃ বুকাইলি নিজে দিয়েছেন।- সূরা মা'আরিজ (সোপানশ্রেণী) ৭০:৪ আয়াতেও বলা হয়েছে:
>
> "— এমন এক দিনে (ইয়ায়ুম) যাহার পরিমান পার্থিব গণনায় ৫০ হাজার বৎসর।"

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আয়াতগুলো যে **প্রসঙ্গে** নাজিল হয়েছিল তা না দেআ পর্যন্ত এই কথাগুলো আমাদের খুবই প্রভাবিত করে। মক্কী সময়ের মধ্যভাগে নাজিল হওয়া সূরা আল-সাজদা (প্রণীপাত) ৩২:৪-৫ আয়াত পাঠ করি, সেখানে বলা হয়েছে,

> "আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের কোনো অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবেনা? তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে- যে দিনের পরিমান হইবে তোমাদিগের হিসেবে সহস্র বৎসরের সমান।

---

[১৩] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১৩৪

[১৪] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৩৫

আর মক্কী যুগের প্রথম দিকে আল-মা'আরিজ ৭০:৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "ফেরেশতা এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে উর্দ্ধগামী হয় এমন একদিনে তাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।"

আমরা যখন এই আয়াতের প্রসঙ্গ দেখি, আমরা দেখি যে, এই দিনগুলো হচ্ছে, বিশেষ রূহানি দিন। এই উভয় আয়াতেই কিয়ামতের দিনগুলোর কথা বলেছে। আর দ্বিতীয়টিতে ফেরেশতা ও রূহের আল্লাহ্‌র দিকে উর্দ্ধগামী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদের কোনোটিও প্রমাণ করে না যে, যাঁদের কাছে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) হিজরতের আগে প্রচার করেছেন সেই মক্কাবাসীরা "ইয়াযুম" বলতে কী বুঝতেন। আসলে, বিশেষ সংজ্ঞার প্রয়োজন হতে পারে কারণ সাধারণ অর্থে একে দিনের বেলা বা ২৪ ঘন্টার দিন বুঝানো হয়েছে। আবারও এখানে আমরা দেখি যে, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

তবে, যেহেতু এই আয়াতগুলোতে আরবী শব্দ "ইয়াযুম" বলতে এখানে সময় কাল হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে, তাই আসুন, আমরাও তা মেনে নেই আর স্বীকার করি যে, কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয়ের জন্যই তা করা হয়েছে।

কিন্তু যদি ডঃ বুকাইলি "ইয়াযুম" শব্দের এই অর্থ কোরআনের জন্য গ্রহণ করতে চান, তবে কেন তিনি কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে এই আয়াত উদ্ধৃত করবেন না?

> "আল্লাহ্‌র সেই একই কালাম দ্বারা এখনকার আসমান ও দুনিয়া আগুনে পুড়িয়ে ফেলার জন্য জন্য রাখা হয়েছে; আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিহীন লোকদের বিচার ও ধ্বংসের দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, এই কথাটি ভুলে যেও না যে, **প্রভুর কাছে একদিন এক হাজার বৎসরের সমান এবং এক হাজার বৎসর একদিনের সমান—তিনি** তোমাদের প্রতি ধৈর্য ধরছেন, কারণ, কেউ যে ধ্বংস হয়ে যায়, এটা তিনি চান না, বরং সবাই যেন পাপ থেকে মন ফিরায় এটাই তিনি **চান**।" (২ পিতর ৩:৭-৯)

এই কথাগুলোর একটি রূহানি অর্থ আছে। কিয়ামতের দিন সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। যে কোনো দিক দিয়েই এই কথার সাথে কোরআনের অর্থের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

"*জেনেসিস ওয়ান এন্ড দি অরিজিন অব দি আর্থ*" বইয়ে নিউম্যান ও আকিলম্যান লিখেছেন,

> "আমরা ইংরেজরা যেভাবে দিন বুঝি এ ছাড়াও অন্য অর্থ তা বুঝানো হয়েছে, এটা দেখানোর জন্য যে হিব্রু শব্দ "ইয়ুম" বা দিন শব্দ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন নেই, প্রায় সময়েই এর অর্থ সূর্য উঠার পর কাজের সময়কে বুঝাতো। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ঋতুর ওপর নির্ভর করে বারো ঘন্টা সময় (পয়দায়েশ ১:৫, ১:১৪ক) অন্য সময়ে রাত-দিন মিলে ২৪ ঘন্টা সময় বুঝিয়েছে (পয়দায়েশ ১:১৪খ, শুমারী ৩:১৩); খুব কমসময়েই ইয়ুমকে দীর্ঘ সময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (পয়দায়েশ ২:৪, হেদায়েতকারী ১২:৩)।[১৫]

---

[১৫] Intervarsity Press, Downers Grove, Illinois, 1977, p 61.

কেন ডঃ বুকাইলি এই শেষের আয়াতগুলোকে বাদ দিয়েছেন? পয়দায়েশ ২:৪ আয়াতে ৬দিন সৃষ্টি-কাজ শেষ করার পরে আল্লাহ্‌র বিশ্রাম নেওয়ার পরে বলা হয়েছে, যা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

> "সৃষ্টিকালে যে দিন মাবুদ আল্লাহ্‌ পৃথিবী ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করলেন, তখনকার আসমানসমূহ ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই।" এখানে **দিন** শব্দটি বলতে সৃষ্টি কাজের ৭ দিনের কথা বলা হয়েছে।

হেদায়েতকারী ১২:৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "সেই **দিনে** ঘরের রক্ষাকারীরা কাঁপবে, আর শক্তিশালী লোকেরা কুঁজা হয়ে যাবে; যারা গম পেষে তারা অল্প লোক বলে কাজ ছেড়ে দেবে, আর জানালা দিয়ে যারা দেখতো, তারা ভালো দেখতে পাবে না।"

এই আয়াতগুলো রূপক। কিতাবুল মোকাদ্দসের একটি আধুনিক আক্ষরিক অনুবাদে দেখা যায়, "এমন এক সময় আসবে, যখন তোমার বয়সের জন্য হাঁটু কাঁপবে, আর তোমার সবল পা দুর্বল হয়ে পড়বে, ইত্যাদি। এখানে **দিন** বলতে বৃদ্ধ সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে।

ডঃ বুকাইলির ধারণা অনুসারে আরবী ইয়াযুম শব্দের অর্থ যে সময়কাল হতে পারে, তা কিন্তু নতুন নয়। সাধু আগষ্টিন চতুর্থ শতাব্দীতেই এই একই ধারণা হিব্রু শব্দ ইয়াযুমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, সৃষ্টির দিন এতো বিশাল, এতো জাঁকালো, এতো গভীর জ্ঞানপূর্ণ যে, আমরা একে কেবলমাত্র সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের মধ্যে সীমিত দিন বলে ধরে নিতে পারি না বরং আল্লাহ্‌ নিজেই এই দিনগুলোকে বিভক্ত করেছেন বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। এগুলো হচ্ছে, সৃষ্টির দিন, কেবল সৌর দিন নয়, আর তাই তিনি তাদেরকে বলেছেন, প্রকৃতি, বৃদ্ধি বা "*dies ineffabiles*"।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *মর্ডান সাইন্স ও ক্রিশ্চিয়ান ফেইথ*[১৬] বইয়ে বলা হয়েছে যে, ৬ দিনের সৃষ্টিকাজ একটি দীর্ঘ সময়-কাল, অথবা যুগ পর্যায় এবং এই ধারণাকে বলে "দিন - যুগ তত্ত্ব বা Day-Age Theory।

এই বইটি এবং ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য বইগুলো সম্ভবতঃ ডঃ বুকাইলির কাছে ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আন্দ্রে নিহার প্রণীত *লা এসেসসিয়াল ডু প্রফেটিসমি*[১৭] বই সম্পর্কে কী বলা যায়? **কোম্পেনড্রিতে** পাওয়া *লা বাইবেল, লি কোরআন এট লা সাইন্স* এর একটি পর্যালোচনায় ফ্রেরী ক্রিশ্চিয়ান মেরী মন্তব্য করেছেন,

---

[১৬] Eleven Essays, Van Kampen Press, Wheaton, 1948.

[১৭] PUF, 1955, p 135-136

“আরবী ইয়ায়ুম শব্দ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। যদিও পয়দায়েশ কিতাবে বর্ণিত ইয়ুম শব্দটি এর সমতুল শব্দ নয়।— সমকালীন ইহুদী ধর্মের সবচেয়ে সেরা ব্যাখ্যাকারী-André Neher পরামর্শ বিবেচনা করাই যথেষ্ট হতে পারে।

“পয়দায়েশের প্রথম অধ্যায়ে, ইয়ুম শব্দটির তিনটি ভিন্ন অর্থ আছে। ১:৪ আয়াতে দিনকে আলো হিসেবে বলা হয়েছে। অথবা বরং এই কথা বলা যায় যে, এটি আলোর আরেক নাম। ইয়ুম এর এখানে একটি মহাজাগতিক অর্থ আছে; এটি দুটি বিপরীত শব্দের একটি, আলো- অন্ধকার। ১:১৪ আয়াতে একই শব্দ ইয়ুম-এর জোর্তিবিদ্যার অর্থ আছে; এটি দিনকে বুঝায়- একটি দিনে সূর্য উঠার পর, পরের দিন সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়কে বুঝায়। এই সব বর্ণনার মধ্য দিয়ে বুঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টির আংশিক উপাদান বুঝাতে উপসংহারে বলা যায় যে, সৃষ্টির আরও একটি অর্থ বুঝানো হয়েছে। **এটি একটি সময়কাল বুঝায়।** এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত এটি বিসতৃত। কিতাবুল মোকাদ্দসে পরবর্তী সময়ে ইয়ুম বলতে ইতিহাসের স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টির ৭ দিন তাহলে Aস্বাভাবিক হয়ে যাবে। এদেরকে সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়ে সমভাবে ভাগ করা যাবে না? যে-কেউ এভাবেও বলতে পারেন যে, এগুলো জোর্তিবিদ্যা সম্পর্কিত দিন নয়, কিন্ত কালমিতি অনুসারে এগুলো বলা হয়েছে। এগুলো দেখায় যে, সময় চলমান, এর অগ্রগতি, অন্যকথায় একে বলা যায় ইতিহাস।—তারা হচ্ছে পরম্পরাক্রমে আসা দিনগুলোর প্রথম দিনগুলো হিসেবে যা এখন নির্ণয় করা হচ্ছে এবং এগুলো সৃষ্টির অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেয়।— বিকাশের বৃহত্তর (Devenir) অর্থে একে ইতিহাস বলা যায়।”[১৮]

উপসংহারে আমরা দেখি যে, যদিও বিপরীতে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ রয়েছে, তবু ডঃ বুকাইলি কিতাবুল মোকাদ্দসের সেই সব আয়াতকে বেঁছে নিয়েছেন, সেই সব ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যেগুলো বিজ্ঞানের সাথে বিরোধিতা সৃষ্টি করে! তাহলে এটি হচ্ছে, “বিরোধী” পথ- এর আরেকটি উদাহরণ।

“পানি” ও “ধোঁয়া”

“মিল পথ” আর “বিরোধী পথ”-এর আরেকটি উদাহরণ হিসেবে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন থেকে আয়াত দেখবো, যা একই সৃষ্টি কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। একদিকে আমরা ডঃ বুকাইলি আর অন্যদিকে নিউম্যান ও আকিলম্যানের মন্তব্য লক্ষ্য করবো।

ড. রবার্ট সি নিউম্যান কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাকাশ পদার্থ বিদ্যার ওপর পি এইচ ডি ডিগ্রি পেয়েছেন। এর পাশাপাশি বিবলিকাল থিওলজিকাল স্কুল থেকে স্নাতোকত্তর ডিগ্রিও তাঁর রয়েছে। অন্যদিকে মিঃ হারম্যার জে একেলম্যান কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও ফিজিক্স ও স্পেস রিচার্স সেন্টারের গবেষণা সহযোগী ছিলেন। এর পাশাপাশি ফেইথ থিওলজিকাল সেমিনারী থেকে

[১৮] No. 69, 22nd year, 23 Dec. 1977, p 8.

মাষ্টার অব ডিভাইনিটি ডিগ্রি পেয়েছেন। তাঁদের লেখা বই, *জেনেসিস ওয়ান এন্ড দি অরিজিন অব আর্থ* বইটিতে সযত্নে প্রচুর আধুনিক যুক্তি দিয়ে এই ধারণা সমর্থন করা হয়েছে যে, পয়দায়েশ ১ অধ্যায়ের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের মিল রয়েছে। নভোপদার্থবিদ্যা ও কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে এই কথা বলা যায় যে, বিজ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে এই উভয় বিষয়ের ওপর তাঁদের কথা বলার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং, আমরা এখন নিম্নে তওরাতের একটি অংশ দেখবো এবং ডঃ বুকাইলির "বিরোধী পথ" এর পথের সাথে ড. নিউম্যান ও মিঃ একেলম্যানের "মিল পথ" - এর তুলনা করবো।

পানি: তৌরাত, পয়দায়েশ **১:১-২**

> "সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার উপরিভাগ তখনও কোনো বিশেষ আকার পায়নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তার ওপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা পানি। আল্লাহ্র রূহ্ সেই পানির ওপরে চলাফিরা করছিলেন।"

ডঃ বুকাইলির "বিরোধী পথ"	ডঃ নিউম্যান ও মিঃ একেলম্যানের "মিল পথ"
স্বীকার করে নিতে অসুবিধা থাকার কথা নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে আজ আমরা যাকে মহাবিশ্ব বলছি, তা অন্ধকারে ঢাকা ছিল। কিন্তু এই সময়ে পানির অস্তিত্ব ছিল বলে কিতাবুল মোকাদ্দসে যা উল্লেখ করা করা হয়েছে, তা নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বর্তমান পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব, বিশ্বসৃষ্টির সূচনায় গ্যাস জাতীয় বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্বের সমূহ প্রমাণ বিদ্যমান। এই অবস্থায় সেখানে পানির অস্তিত্ব থাকার কথা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।[১৯]	একইভাবে মাইম শব্দটি প্রায় সময়েই অনুবাদ করা হয়েছে "পানি" বা "পানি রাশি" এ সম্পর্কে প্রথমে যা মনে করা হয়, তার চেয়েও এখানে বড় অর্থ আছে। বিভিন্ন উপলক্ষে অন্যান্য তরল পদার্থের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা কম করে হলেও পানির মধ্যে অন্য কিছুর মিশ্রনকে বুঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রস্রাব (২ বাদশাহনামা ১৮:২৭); বীর্য (ইশাইয়া ৪৮:১); এছাড়াও পানির কঠিন বা বায়বীয় অবস্থা বুঝাতেও মাইম শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। বরফ (আইয়ুব ৩৭:১০, ৩৮:৩০) বাষ্প অথবা বন্যা (শামুয়েল ২২:৫; আইয়ুব ২৬:৮; ৩৬:২৪-২৮; ইয়ারমিয়া ৫১:১৬) বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।[২০] পয়দায়েশ ১:২ আয়াতে 'মাইম' শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে কিন্তু বরফের বিশাল চাই, একটি বরফের স্ফটিকের স্তর বা পানির বিন্দু, জলীয় বাষ্পের একটি বৃহৎ মেঘ, অথবা অন্যান্য তরল পদার্থের একত্র মিশ্রণ, এই শব্দের ব্যবহার দ্বারা পাককিতাবে হতে পারে একটি উপরিস্তর বুঝানো হয়েছে, যার ওপরে আল্লাহ্‌র রূহ্ চলাচল বা উড়াউড়ি করছিল। প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রথার সাথে একমত হয়ে বলা যায়, একটি অন্ধকার নীহারীকার মাঝে কিছু জলীয় বাষ্প ছিল বলে আশা করা যায়। আরেকটি সম্ভাবনা রয়েছে যে, মাইম শব্দ আভাষ দেয় যে, এর অর্থ রাসায়নিক কিছুও হতে পারে। এটি মেঘ জাতীয় কিছু নয়। কারণ পানিতে আছে অক্সিজেন ও হাইড্রজেন, আর মেঘ হাইড্রজেন, হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। মাইম হচ্ছে গুটিকয়েক হিব্রু শব্দের একটি, যার এই ধরনের অর্থ হতে পারে।[২১]

এখন আমরা কোরআন থেকে নিম্নের অংশটি দেখবো এবং ডঃ বুকাইলির "মিল পথ"- এর সাথে কাল্পনিক "বিরোধী পথ"-এর তুলনা করবো।

ধোঁয়া: শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা হা মিম সেজদা (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ ও সেজদা), **৪১:৯খ-১১** আয়াতে বলা হয়েছে,

"— তিনিই তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্টে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যান এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমভাবে

[১৯] বুকাইলি, পৃষ্ঠা ২৩

[২০] মাইম এর সমার্থক আরবী শব্দ-মা,বহুবচনে মিয়া (مَاء مِيَاء)। ওয়েহার অভিধানে শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে, পানি,তরল এবং রস।

[২১] Neuman/Eckelmann, ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ৭১-৭২

যাচনাকারীদিগের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ-বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন,'তোমরা উভয়ে আস; ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল,' আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।'"

ডঃ বুকাইলির মিল পথ	কাল্পনিক বিরোধী পথ
"৪১ নং সূরার এই চারটি আয়াতে যে কয়টি পয়েন্ট রয়েছে, এরপর আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনায় করবো। এর প্রথমটি হচ্ছে, আদিতে মহাশূন্য জগতের গ্যাস জাতীয় অবস্থা—"[২২] "আদিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুকণা সহকারে গ্যাসীয় পিণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা- কেননা এটাই হচ্ছে ধোঁয়ার (আরবী শব্দ دُخَان দুখান') ব্যাখ্যা। এই দুখান হলো, এমন এক গ্যাস জাতীয় পদার্থের স্তর -যা কমবেশী স্থিরভাবে ঝোলানো এবং যার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুকণা উচ্চতর কিংবা নিম্নতর তাপের দরুণ কখনো কঠিন এমনকি কখন বা তরল অবস্থায় রয়েছে।"[২৩] "এক্ষেত্রে আমরা সূর্য এবং তার উপসৃষ্টি, বিশেষত পৃথিবীর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি (কেননা এটি আমাদের নিকট সহজে বোঝা যায়)। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের পরিবেশীত তথ্য হলো, গ্রহ-নক্ষত্র ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম দুটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়েছিল। এক আদি নীহারিকার ঘনীভূত হওয়ার ঘটনায়; এবং দুই সেই নীহারিকার বিভক্ত বা টুকরা হওয়ার ঘটনায়। সুতরাং, বিজ্ঞানের এই তথ্য কোরআনের বর্ণনার সাথে হুবুহু মিলে যাচ্ছে। কোরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, - মহাকাশের ধূর্মমন্ডলীর দ্রবণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার বিভক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এইজন্য, এক্ষেত্রে আমরা কোরআনের বর্ণনা ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের মধ্যে পুরোপুরি মিল অর্থাৎ সঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি।"[২৪]	এই আয়াতগুলো বলছে যে, কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে ধোঁয়া থেকে আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। ধোঁয়ার মধ্যে জৈব উপাদান রয়েছে। সুতরাং, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। কারণ প্রাথমিক গ্যাসীয় স্তরে থাকার সময়ে এর মধ্যে কোনো জৈব উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এছাড়া আরও বলা যায় যে, নীহারিকাকে ধরে নেয়া হয় এগুলো গ্রহ সৃষ্টির অগ্রদূত, এগুলো এমন তরল পদার্থ যে এতে কোনো ভাসমান কণা থাকার সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র প্রতি মিলি লিটারে অল্প কয়েকটি মাত্র খুব তরল গ্যাসীয় অনু আর সাময়িকভাবে ধূলী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এটি কিছুটা প্রাথমিক গ্যাসীয় অবস্থার কথা বলে, তাহলে পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই ধোঁয়া থাকা উচিত। কিন্তু এই আয়াতগুলো বলছে, যদিও আকাশে তখন ধোঁয়া ছিল, কিন্তু সে-সময়ে দুনিয়ায় দৃঢ় পর্বতমালা ও খাদ্য থাকার কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে, এখানে জোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত মারাত্মক ভুল রয়েছে।

সুতরাং, আমাদের এই ক্ষুদ্র গবেষণার ফল কী দাঁড়ালো? নিউম্যান ও একেলম্যান বলেছেন যে, তওরাতের পয়দায়েশ সিপারার ১:২ আয়াতে বর্ণিত পানি বলতে প্রাথমিক গ্যাসীয় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। ডঃ বুকাইলি বলেছেন যে, এটি সম্পূর্ণ ভুল। অন্যদিকে ডঃ বুকাইলি বলেছেন কোরআনের

[২২] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১৩৬

[২৩] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১৩৯

[২৪] ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা ১৪৭

৪১ নং সূরা দোখানে, বর্ণিত ধোঁয়া বলতে প্রাথমিক গ্যাসীয় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বিরোধী মতে বিশ্বাসী লেখক বলছেন যে, এটি সম্পূর্ণ ভুল।

হিব্রু ও আরবী শব্দের ব্যবহার ও নভোপদার্থবিদ্যা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান এই দুটো ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি সত্য আর একটির চেয়ে কোনটি আরো বেশী সঠিক তা নির্ধারণ করার অনুমতি আমাদের দিতে পারে। কিন্তু এই গবেষণার আসল বিষয় হচ্ছে এটি দেখানো যে, একটি বিষয়ে পক্ষপাতের ফল কী হতে পারে। যদি ডঃ বুকাইলি বলেন যে, ধোঁয়া বলতে প্রাথমিক গ্যাসীয় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে, তবে এমন কোনো যুক্তি তাঁর থাকতে পারে না যে, তিনি নিউম্যান ও একেলম্যানের যুক্তিকে অস্বীকার করবেন। তাঁরা বলেছেন যে, পানি বলতে একটি প্রাথমিক গ্যাসীয় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অথবা কথাটিকে ঘুড়িয়ে বলাও যায়।

এটি অবশ্যই অসম্ভব যে, তিনি নিরপেক্ষ, কোনো বিষয়ের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। আমি আমার নিজের মত সমর্থন করি। আমি আশা করি আমার পূর্বতন সিদ্ধান্ত-এ'বিষয়ে যেগুলো আমাকে একজন খ্রীষ্টান হতে সাহায্য করেছে- সেগুলো সত্য। আর সেগুলোকে যা সমর্থন করে, আমি সেগুলো সমর্থন করতে রাজি আছি।

সুতরাং, এই ছোট্ট কৌতুকের মধ্যে অনেক সত্য রয়েছে। এই কৌতুকটি আমার ছোট্ট মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুনে এসে আমাদের শুনিয়েছিল।

> "বিজ্ঞানীদের সবসময়ে সত্যের ওপর নির্ভর করে কথা বলা উচিত।"

আমরা অবশ্যই আমাদের পক্ষপাতগুলো স্বীকার করি এবং এভাবে একটি আলোচনার সময়ে তাদের মুখে লাগাম দিতে চেষ্টা করি। নইলে, একজন গর্জনকারী পশুর মতো এগুলো আমাদের সত্য ভুলিয়ে দেয়। একজন বন্ধু বলেছিলেন,

> "একজন মুসলমান অথবা একজন খ্রীষ্টান যখন তর্কের খাতিরে শুরুতেই স্বীকার করেন যে, তিনি নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক মানষিকতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তুমি তখনি দেখবে যে, তোমার সামনে বিপদ রয়েছে। সেই লোকটি বিপদজনক, কারণ, তিনি মোহ বা ভুলের মধ্যে রয়েছেন। এমনকি তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না যে, তিনি কতটা অবৈজ্ঞানিক মানষিকতা সম্পন্ন, কতটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাঁর মন।

যদি আমি কোনো আয়াতের অর্ধেক অংশ, যা আমার ধারণার সাথে খাপ খায় এইটুকু উদ্ধৃত করি, তবে বুঝা যাবে যে, আমি সত্যকে ভুলে গেছি। যদি আমি একই বিষয়ে অন্যান্য আয়াতগুলোকে উদ্ধৃত করতে বিরক্ত রোধ না করি, যদিও তা আমার ধারণার বিরোধীতা করে, তবে বুঝা যাবে যে, আমি সত্যের দিকেই ঝুঁকে আছি।

আমরা অবশ্যই, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা দ্বিতীয় শ্রেণীর গতানুগতিক বা বহুল প্রচলিত উক্তির কাছে নতি স্বীকার করবো না। সেখানে বলা হয়েছে,

"যদি সত্যের সাথে থিওরীর মিল না হয়, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে সাজিয়ে নিতে হবে।"

আমাদের অবশ্যই ১০০% বিরোধী পথকে বাদ দিতে হবে। এর দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, সেই ধরণের মনোভাব যারা কোনো ভালো জিনিসকে স্বীকার করে না, আমরা যেসব লোকের সাথে একমত নই, তাদের সাথে সেই বিষয়গুলি সংশোধন করতে পারবো না, এর কোনো সঠিক কারণ নেই। আমরা অবশ্যই কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের পক্ষপাতকে স্বীকার করে নিয়ে, তারপর সমস্ত সত্য বিষয়গুলোকে দেখার চেষ্টা করবো, তারপর আমরা নিরপেক্ষভাবে রায় দেব।

অবশ্যই এই ধরণের মনোভাব ঈসা মসীহের শিক্ষার মধ্যেই আছে; যখন তিনি বলেছেন, "তুমি অন্য লোকদের নিকট থেকে যেমন ব্যবহার আশা করো, অন্য লোকদের প্রতিও তেমন ব্যবহার কর।" আর তৌরাত থেকে তিনি উদ্ধৃত করে বলেছেন, "তোমার ভাইকে নিজের মতো ভালোবাস।"

৪. কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে আরো কিছু প্রাথমিক অনুমিত বিষয় (Basic Assumptions)

ডঃ বুকাইলি ধরে নিয়েছেন যে, **তওরাতের** উৎস ও উন্নয়নের জন্য "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" বা ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস" মতবাদ সত্য। কতগুলো বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ১৮৯০ সালের দিকে এই তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল। এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে:

ক) **বহুআল্লাহবাদ (শেরেকী) অবস্থা থেকে এক খোদাবাদে (তৌহিদে) বিশ্বাসের বিবর্তন হয়েছে।** এর ফলে মনোযোগ দিয়ে ভাবা হয় যে, হিব্রু জাতির কমবেশী ধর্মীয় সচেতনতার ফল হিসেবেই পুরাতন নিয়ম উদ্ভুত হয়েছে। **এখানে ফেরেশতা বা পাক-রূহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেননি।**

খ) যেহেতু হযরত ইব্রাহীমের জীবনে যেসব প্রথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তওরাতের বাইরে আর কোনো উল্লেখ নেই (যেমন বৈমাত্রীয় বোন সারাকে বিয়ে করা, সারার কথামতো নিজের দাসী-স্ত্রী হাজেরাকে দূর করে দেওয়া) এবং যেহেতু হিত্তীয় জাতির লোকদের কথা তওরাতের বাইরে উল্লেখ করা হয়নি; সেহেতু, হযরত **ইব্রাহিম,** হযরত **ইসহাক,** হযরত **ইয়াকুব যাঁদেরকে বনি ইসরাইলের গোষ্ঠীপিতা বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কাল্পনিক চরিত্র, ঐতিহাসিক নয় আর তাই তওরাতে বর্ণিত বিবরণীগুলো হচ্ছে রূপকথা বা গল্প।**

গ) হজরত মূসা (আঃ) ও হিব্রু জাতির লোকেরা লিখতে পারতেন না, কারণ লিখন-প্রনালীর আবিষ্কার তখনও হয়নি।

ঘ) **সুতরাং, ১৪০০ বা ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তওরাতের পাঁচটি কিতাব হজরত মূসা (আঃ) লেখেননি, যেভাবে কিতাবুল মোকাদ্দস (এবং কোরআন) বারবার দাবী করে আসছে।** কিন্তু এটি ১৩০০ বছর পরে ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অজানা সংকলক ও লেখকের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল। এঁরাই

বারবার হজরত মূসা (আঃ)-এর নাম ব্যবহার করেছেন। এই ধারণাকে J,E,D,P theory বা "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" (documentary hypothesis) বলে।

ঙ) আরো যোগ করা যায়, তাঁরা বলুন আর নাই বলুন, যে লোক প্রথমে এই তত্ত্বের প্রস্তাব **করেন, তিনি কিন্তু মোজেজায় বিশ্বাস করতেন না।** তাঁরা হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত ঈসা মসীহের মোজেজা বিশ্বাস করেননি- তাঁরা ওহী বা প্রত্যাদেশও বিশ্বাস করেননি যে, আল্লাহ্ তাঁর কালামের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মত অনুসারে আল্লাহ্ কখনও হজরত মূসা (আঃ) বা হজরত ঈসা মসীহের সাথে কথা বলেননি, আর তাঁদেরকে আল্লাহ্ তাঁর কালাম বলতেও বলেননি। আর অন্যদিকে দেখা যাবে যে, তাঁরা যদি কোরআন মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন, তবে তাঁরা বলবেন যে, আল্লাহ্ হযরত মোহাম্মদের সাথেও কথা বলেননি। আমরা এমন কথাও বলতে পারি যে, **মোজেজা ও ওহী বা প্রত্যাদেশের ওপর এই ধরনের অবিশ্বাস হচ্ছে সমস্ত থিওরীর পেছনে প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন।**

ডঃ বুকাইলি অনেক ক্যাথলিক পন্ডিতদের কথা উদ্ধৃত করেছেন, যাঁরা এই তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন। এঁদের মধ্যে জি পি স্যানড্রোজ, ২৫ তিনি সলকরের ডমিনিকান ফ্যাকাল্টির অধ্যাপক, আর, পি ডি ভক্স, ২৬ যিনি জেরুসালেমের ইকোলো বিবলিকার পরিচালক, পেপিরাসের ক্যাথলিক ইনষ্টিটিউটের ফাদার কানেনগিয়েসার, ২৭ আরো অনেকে রয়েছেন। আমি বলছি না যে, এই সব লোকেরা মোজেজা ঘটার সম্ভাবনাকে অবিশ্বাস করেছেন, কারণ আমি তাঁদের বই পড়িনি। এমনকি ডঃ বুকাইলি নিজেও মোজেজা ঘটার সম্ভাবনা অস্বীকার করেননি। আর এই কথাটি তাঁর বইয়ের ২ নং পৃষ্ঠায় গোড়ার কথা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি সেখানে জাগতিক পিতা ছাড়াই ঈসা মসীহের অলৌকিক জন্মের কথা স্বীকার করেছেন। আমি যা বলছি তা হচ্ছে, অবিশ্বাসী প্রোটেষ্টান্ট ধর্মতত্ত্ববিদ- যাঁরা এই জিইডিপি তত্ত্বের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, মোজেজা ঘটা একেবারেই অসম্ভব।

ডঃ বুকাইলি ঠিকই জামাতের নেতাদের- ক্যথলিক বা প্রোটেষ্টান্ট যাই হোন না কেন- ক্রোধের শিকার হবেন, জামাতে এবাদতকারীদের সামনে হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত ঈসা মসীহের কথা যাঁরা প্রচার করেন, লোকেরা যেন বিশ্বাস করে যে, তাঁরা আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া কথাই লোকদের কাছে বলছেন; আর পরে তাঁরা পণ্ডিতের মতো নিবন্ধ লিখেন যে, তাঁরা কোনোমতেই এগুলো বিশ্বাস করেন না।

স্পষ্টতঃই আমি এই জিইডিপি-তত্ত্বটির সাথে একমত নই। আমরা এই বইয়ের তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে কিছু প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখবো যে কেন এটি ভুল এবং এর কোনো কার্যকারীতা নেই। কিন্তু এখন, প্রথমেই আমরা পরীক্ষা করে দেখবো, কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে কোরআন কী বলে? এই পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই পাঠক নিজেই যাচাই করে বুঝতে পারবেন ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে. *যদি "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল"* বা ডকুমেন্টারী *হাইপোথিসিস)মতবাদ সত্যি হয়, যেভাবে ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন,* ***তাহলে এটি কিতাবুল মোকাদ্দসের সাথে-সাথে কোরআনকেওমিথ্যে প্রমাণিত করবে।***

দ্বিতীয় খণ্ড

কোরআন ও হাদিসের আলোকে কিতাবুল মোকাদ্দস

প্রথম অধ্যায়

কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য

একজন খ্রীষ্টান যখন কোনো মুসলমানের কাছে বলেন যে, কেন তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের কোনো আয়াত আয়াত বিশ্বাস করেন, তখন বেশিরভাগ মুসলমানই বলে থাকেন, **"কিন্তু আপনারা আপনাদের কিতাবে রদবদল করেছেন।"** এই ধরনের মারাত্মক অভিযোগের কথা বলার সময়ে তাঁরা যে-কথা বলেন তা হচ্ছে "হার্‌রাফা"(حَرَّفَ)। তাঁরা এরপরে কোরআনের সেই আয়াতটি উল্লেখ করেন, যে আয়াতে হার্‌রাফা শব্দটি রয়েছে। এইজন্য আমরা এই অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করবো **যে, কোরআন** আসলে অন্যান্য আসমানি কিতাব যেমন **তৌরাত, জবুর শরীফ** ও **ইঞ্জিল-** যেগুলো, যথাক্রমে হজরত মূসা (আঃ), হজরত দাউদ ও হজরত ঈসা মসীহের ওপরে নাজিল হয়েছিল- সেই কিতাবগুলো সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য কী?

এই প্রসংগে কোনো কোনো লোক এই কথা নিশ্চয়ই বলবেন যে, 'কীভাবে একজন অমুসলমান কোরআন সম্পর্কে এত সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে? আমি প্রথমেই এই কথা স্বীকার করছি যে, এই ধরনের আপত্তি করার যথার্থ কারণও আছে এই জন্য যে, একটি কিতাবের অর্ন্তনিহিত বিষয় ভালোভাবে বুঝার জন্য সেই কিতাবের "বিশ্বদর্শন" পূর্ব থেকেই জানতে হয়।

তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোরআন নিজের সম্পর্কে বলেছে যে, এটি সুস্পষ্ট কিতাব, যা সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় ('আরাবীয়ুন মুবীনুন عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) লেখা হয়েছে, যেন আরবী ভাষাভাষী অবিশ্বাসী কুরাইশ সমপ্রদায়ের লোকেরা বুঝতে পারে। যেভাবে বিশ্বাসীরা কিতাবুল মোকাদ্দস এর আয়াতসমূহ অধ্যয়ন করে থাকেন, আমরা, সেই একই পদ্ধতিতে কোরআন অধ্যয়ন করবো।

যে বিষয়গুলো এখানে রয়েছে, যা কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গের ওপর ভিত্তি করে আমরা সেই আয়াতগুলো অধ্যয়ন করবো। কোনো কোনো সময়ে এই প্রসংগ কেবল একটি আয়াত বা আয়াতের অংশ বিশেষ হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে দেখা যাবে যে, একটি শব্দ বা বাক্যের অংশবিশেষের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের একটি পাতার গোটাটাই পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হতে পারে।

মুসলিম আলেমরাও কোরআনের এই ধরনের অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। *গড অব জাস্টিস* [১] এই বইয়ের লেখক ড. দাউদ রাহবার লিখেছেন, "যদি আমরা মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও

[১] E.J. Brill, Leiden, 1960, p xiii. ড. রাহবার ১৯৫৬-১৯৫৯ সন পর্যন্ত আংকারা বিশ্ববিদ্যালযে উর্দু ও পাকিস্তান স্টাডিস এর বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বিশেষ দাযিত্বে ছিলেন।

কোরআনের তফসীর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বিবরণ তৈরি করতে চাই, তবে এই ধরনের পূর্নাঙ্গ অধ্যয়নের গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে, সেই সময়ে রাসূল ও তাঁর সাহাবীরা

সেই ঐতিহাসিক পরিবেশে কোরআনের কী অর্থ বুঝতেন, তা আমাদের জানতে হবে।”

তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো একটি বিষয়ের ওপর ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে কোরআনের তফসীরকারকগণ ওই বিষয়ের ওপর লেখা সমস্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও তুলনা করেননি। এইজন্য সুস্পষ্টভাবে তিনি কোরআনের তফসীরকারক আল-বায়জাবীর উদাহরণ তুলে ধরেছেন। আল-বায়জাবী একটি বাকাংশ “দুনিয়া ও আসমান” সম্পর্কে বলেছেন, এখানে দুনিয়ার কথা প্রথমে বলা হয়েছে “কারণ যখন তুমি আরোহন করো, তখন তোমাকে নিচ থেকে ওপরের দিকে আরোহন করতে হবে। ড. রাহবার আরো বলেছেন, “এর পর পরেই, বায়জাবির তফসীরে আমি বিষয়টি লক্ষ্য করি যে তিনি অন্য এক স্থানে আগে আসমান ও পরে দুনিয়া শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আর এখানে সুস্পষ্টভাবেই এই কথাটি বলা যায় যে, তিনি আগে যে-কথাটি বলেছেন, তা তিনি ভুলে গেছেন।[২]

ভূমিকার শেষে ড. রাহবার খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য এই ধরনের সমন্বিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সমস্ত তথ্য নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থ তৈরি করা যায়। আমাদের কি অধিকার আছে যে, আমরা কোনো একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা করার সময়ে কেবল মাত্র কয়েকটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করবো, যেখানে একই বিষয়ের ওপরে আরও তিনশো আয়াত রয়েছে? আমি একেবারেই নিশ্চিত যে, এই ধরনের দৃষ্টিভংগী নিয়ে এই প্রথম একটি বই লেখার কাজ শুরু করা হয়েছে। কোরআনের এই ধরনের পূর্নাঙ্গ বিবরণ যা এখানে উল্লেখ করা হবে, তা বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে, তা আরো উৎকর্ষের জন্য মুসলিম আলেমদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু এই বইয়ে কোরআনের বিভিন্ন বিষয়ে যে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ সংকলন গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে. তা যে প্রথমবারের মতোই করা হয়েছে, এই কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না।”[৩]

কোরআনের আয়াতের ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহারের সময় সবসময়েই ভিত্তি হিসেবে আমি জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর[৪] অনুবাদ ব্যবহার করেছি। তারপরে মুহাম্মদ পিকথল সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ[৫] অথবা মুহাম্মদ হামিদুল্লাহর ফরাসী অনুবাদ[৬] কোরআনের মূল আয়াতের অর্থের কাছাকাছি বলে আমার নিকটে মনে হয়েছে, সেখানে আমি তাঁদের অনুবাদ ব্যবহার করেছি। জনাব মেসন এর ফরাসী অনুবাদ[৭] থেকে আমি খুব কমই ধারণা নিয়েছি। (এছাড়া এই বইয়ের অনুবাদে লেখকের

---

[২] ওপরে উল্লেখিত পুস্তক,পৃষ্ঠা xvii.

[৩] ওপরে উল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা xx

[৪] প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

[৫] *The Glorious Qur'an,* Muhammad Marmaduke Pickthall, World Muslim League, New York, 1977.

[৬] *Le Coran,* Muhammad Hamidullah, Le Club Francais du Livre, 1959.

[৭] *Le Coran,* D. Masson, Editions Gallimard, 1967.

অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ "কোরআনুল করিম" ব্যবহার করা হয়েছে।)

এখানে আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই, কোনো কোনো আয়াতে এমন কতগুলো আরবী শব্দ রয়েছে, যা আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করেছি, সেই শব্দগুলোর আক্ষরিক অনুবাদ আমি নিজেই করেছি। যদিও এতে ইংরেজী ভাষার গাথুনি নাড়িয়ে দিয়েছে বলে পাঠককদের কাছে মনে হতে পারে, কিন্ত এই কাজ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব পাঠকেরা আরবী শব্দের সাথে পরিচিত নন, তাঁরাও যাতে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন, এই জন্যই আমি তা করেছি।

আমরা প্রথমে ঈসা মসীহের সময়ে প্রচলিত তৌরাত সম্পর্কে কোরআনের আয়াতগুলো লক্ষ্য করবো। পরে আমরা ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হযরত মোহাম্মদের সময়ে তৌরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে কোরআনে কী বলা হয়েছে, তা লক্ষ্য করবো। শেষে আমরা সেই আয়াতগুলো দেখবো, যে আয়াতগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতগুলো পরিবর্তন (তাহরিফ) করা হয়েছে। এখন আমি যে-কথাগুলো বলেছি, তার প্রেক্ষিতে কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে কোরআন কী বলে, সেই বিষয়ে আমি এখন আমার মতামত পাঠকদের পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনার জন্য উল্লেখ করবো।

ক. যে আয়াতগুলো বলছে, ঈসা মসীহের সময়ে তৌরাত নির্ভুল ছিল

ক১. সূরা মরিয়ম (ধার্মিকা এক মহিলার নাম) ১৯:১২, ৭ হিজরী

‘হে ইয়াহিয়া! (ইয়াহ্য়া তরিকাবন্দীদাতা) এই কিতাব দৃড়তার সহিত গ্রহণ করো, আমি তাঁহাকে শৈশবে দান করিয়াছিলাম জ্ঞান, —

ক২. সূরা আলি- ‘ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৪৮, ২-৩ হিজরী

এবং তিনি (আল্লাহ) তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তৌরাত ও ইঞ্জিল।

ক৩. সূরা তাহরীম (অবৈধকরণ) ৬৬.১২, ৭ হিজরী

আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন,’ ইমরান তনয়া মরিয়মের - সে তাঁহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করিয়াছিল।’

ক৪. সূরা আলি-’ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৪৯-৫০, ২-৩ হিজরী

ঈসা বলিবে, আমি আসিয়াছি, —আমার সম্মুখে (আমার হাতে) তওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল, উহার কতকগুলোকে বৈধ করিতে।

ক৫. সূরা সাফ্‌ফ (শ্রেণী) ৬১.৬, ৩ হিজরী

"স্মরণ করো, মরিয়ম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, হে বনি- ইসরাইল, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকটে যে তৌরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক।

ক৬. সূরা মায়িদা (অন্নপাত্র) ৫:৪৯/৪৬, ১০ হিজরী

মরিয়ম তনয় ঈসাকে তাঁহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের (যা তাঁর হাতে ছিল) সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে **তাহাকে ইঞ্জিল দিয়াছিলাম**, উহাতেও ছিল পথের নির্দেশ ও আলো।

ক৭. সূরা মায়িদা (অন্নপাত্র) ৫:১১৩/১১০, ১০ হিজরী

তখন আল্লাহ্‌ বলিবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি অনুগ্রহ স্বীকার কর; পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে, **তোমাকে কিতাব, হিকমত, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম।**

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বশেষ আয়াতটি ১০ম হিজরীতে নাজিল হয়েছিল। এই আয়াতগুলোতে তরিকাবন্দীদাতা হজরত ইয়াহিয়াকে দৃড়তার সাথে কিতাব গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে (ক১)। ঈসা মসীহের মা আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন (ক৩)। আল্লাহ্‌ প্রতিজ্ঞা করছেন, ঈসা মসীহের জন্মের পূর্বেই তাঁকে তৌরাত শিক্ষা দিবেন (ক২)।

ঈসা মসীহ্‌ বলেছেন যে, তাঁর সামনে যে তৌরাত রয়েছে, ইঞ্জিল তার সত্যতার সমর্থনকারী (ক৪.ক৫)। আর হযরত মোহাম্মদের সময়ে আল্লাহ্‌ বলছেন যে, তিনি হযরত ঈসাকে তৌরাত শিক্ষা দিয়েছেন (ক৬, ক৭)। **আমরা এই আয়াতগুলো থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রথম শতাব্দীতে, ঈসা মসীহ্‌ যখন জীবিত ছিলেন, তখনও আসল, অপরিবর্তনীয়, নির্ভুল তৌরাত, অপরিবর্তীত অবস্থায় ছিল।**

এইজন্য ৭ম হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা তাহরিমের ওপরে উল্লেখিত আয়াতে (ক৩) বলা হয়েছে যে, হজরত মরিয়ম আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহে (কুতুবিহি كُتُبِهِ) বিশ্বাস করতেন। এখানে কিতাবসমূহ বলতে হজরত মূসা (আঃ)-এর ওপর নাজিল হওয়া তৌরাত ছাড়াও ইহুদীদের নিকটে তবলিগকারী অন্যান্য নবীদের ওপরে নাজিল হওয়া অন্যান্য সহিফাগুলোর কথা বলা হয়েছে।

খ. যে আয়াতগুলো দেখায়, ঈসা মসীহ্‌ ও হযরত মোহাম্মদের জমানার মধ্যবর্তী সময়েও বিশ্বস্ত ও খাঁটি খ্রীষ্টানদের অস্তিত্ব ছিলঃ

খ১. সূরা মায়িদা (অন্নপাত্র) ৫:১১৩-১১৪, /১১০ ১০ হিজরী

"আল্লাহ্‌ বলিবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! **—আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম —**। আরও স্মরণ করো, **আমি যখন হাওয়ারীদিগকে (الحَوَرِيُّون) এই**

প্রেরণা দিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসুলের প্রতি ঈমান আনো, তাহারা **বলিয়াছিল,' আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান (আত্মসমর্পনকারী)।**

খ২. সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৫২-৫৩, ২-৩ হিজরী

"যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধী করিল, তখন সে বলিল,' আল্লাহ্‌র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী, শিষ্যগণ **বলিল,'আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী।** আমরা আল্লাহে ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পনকারী। তুমি ইহার সাক্ষী্‌ থাকো। হে আমাদের প্রতিপালক! **তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ, তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসুলের (ঈসার) অনুসরণ করিয়াছি।"**

খ৩. সূরা সাফ্‌ফ (শ্রেণী) ৬১:১৪, ৩ হিজরী

হে মূমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মরিয়ম-তনয় ঈসা হাওয়ারীগণকে বলিয়াছিল,'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?' **হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বণী ইসরাইলের একদল ঈমান আনিল** এবং এক দল কুফরী করিল। **তখন আমি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল,** তাহাদের শত্রুদের মোকাবেলায় **তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।**

খ৪. সূরা হাদিদ (লোহা) ৫৭:২৬-২৭, ৮ হিজরী থেকে নাজিল হয়েছিল

আমি নুহ্‌ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুয়ত এবং কিতাব। কিন্তু উহাদের অল্পই সত্য-পথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশ ছিল সত্য ত্যাগী। অতঃপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং **অনুগামী করিয়াছিলাম মরিয়াম-তনয় ঈসাকে, এবং তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্নাসবাদ-ইহাতো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল।** আমি উহাদের ইহার বিধান দেই নাই; অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। **উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম, পুরস্কার** এবং উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

আমরা এই আয়াত থেকে শিখি যে, যদিও খ্রীষ্ট-ধর্মে সন্নাসবাদ-আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসেনি, কিন্তু ঈসা মসীহের উম্মতদের মধ্যে এমনও অনেক খাঁটি ঈমানদার ছিলেন, যাঁরা তাঁদের প্রাপ্য পুরস্থার (বেহেস্তে) পাবেন।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, ৪র্থ শতাব্দীতে সন্নাসবাদ-শুরু হয়। যদি ও কিছু কিছু লোক যেমন থিবস শহরের আলেম হজরত পৌল তৃতীয় শতাব্দীতে সন্নাসী হিসেবে একাকী বসবাস করতেন। কিন্তু ৩০৫ খ্রীস্টাব্দে মিশরের সাধূ এন্টনী প্রথমে একটি মুক্ত দল হিসেবে সন্নাসীদের সংঘ গড়ে তুলেন। আর একই সময়ে সিনাইয়েও সন্নাসবাদ-চালু হয়েছিল। খ্রীষ্টানসন্নাসীরা দল বেঁধে একসাথে বসবাস শুরু করেন।

খ৫. সূরা কাহ্‌ফ (গুহা) ১৮:১০, ২৫ মক্কী সূরা

> যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।'— উহারা উহাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর আরও নয় বৎসর— ।

মৌলানা ইউসুফ আলী কোরআনের তফসীরে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, ইফিষ শহরের ৭জন খ্রীষ্টান যুবক নির্যাতনের সময়ে পালিয়ে এসে এই গুহায় লুকিয়ে থাকেন। তাঁরা ৩০০ বছর এখানে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ৪৪০ থেকে ৪৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সম্ভাব্য বিভিন্ন তারিখ নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেছেন, খলিফা ওয়াথিক (৮৪২-৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ) সেই জায়গাটি খুঁজে বের করা ও পরীক্ষা করে দেখার জন্য এক অভিযাত্রী দল পাঠিয়েছিলেন।[৮] জনাব হামিদুল্লাহ এই সম্ভাবনার কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি মনে করেছেন য়ে এই ঘটনা খ্রীষ্টান ধর্ম শুরুর আগে ঘটেছিল। তবে, জনাব তওফিক আল-হাকিম *আহেল আল-কাফ* কিতাবে স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, এসব যুবকেরা খ্রীষ্টান ছিলেন।

খ৬. সূরা বুরূজ (গ্রহ বা রাশিচক্র) ৮৫:৪-৯ মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছিল।

> "ধ্বংস হইয়াছিল কুন্ডের (আগুন) অধিপতিরা- ইন্ধনপূর্ণ যে কুন্ডে ছিল অগ্নি, যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল;এবং উহারা মুমিনদের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে-

তফসীরকারী হামিদুল্লাহ তাঁর অনুদিত কোরআন শরীফের টিকায় লিখেছেন যে, এখানে ইয়েমেন দেশের এক ইহুদী বাদশাহ যোনোয়াসের কথা বলা হয়েছে। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রীষ্টানদের ওপর নির্যাতন করেছিলেন। যেসব খ্রীষ্টানরা পুনরায় ইহুদী হতে চাননি, তিনি তাঁদের ওপর নির্যাতন করতেন। খলিফা ওমর (রাঃ) এই সব নির্যাতিত খ্রীষ্টানদের সম্মানে একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৯] মৌলানা ইউসুফ আলীও তিনটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার একটি ব্যাখ্যা হিসেবে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।[১০]

প্রথম তিনটি আয়াত স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ঈসা মসীহের উম্মতেরা **মসীহকে অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ্‌র দ্বারা "অনুপ্রাণীত"** হয়েছেন (খ১), তাঁরা **আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হতে চেয়েছেন** (খ২, খ৩) আর **তাহারা বিজয়ী হইল** (খ৩)। আরো বলা হয়েছে যে, এমনকি **মিশরে ৪র্থ শতাব্দীতে** যখন সন্নাসবাদ অনুশীলন শুরু হয়েছিল, তখন **কিছু কিছু খাঁটি ঈমানদার** ছিলেন (খ৪)।

---

[৮] *The Holy Qur'an,* Yusuf Ali, পৃষ্ঠা -৭৩০ এবং ৭৩৬

[৯] *Le Coran,* Hamidullah, পৃষ্ঠা -৫৯৩

[১০] দি হোলি কুরআন, ইউসুফ আলী, টিকা ৬০৫৫, পৃষ্ঠা -১৭১৪

খ৫ও খ৬ এ আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলি থেকে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও মক্কা নগরীর লোকেরা তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখানে খ্রীষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। তাহলে কোরআনের এই সত্য স্বীকারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, ৪৫০ খ্রীস্টাব্দে ইফিষ শহরে (বর্তমান তুরস্ক) আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য কিছু খাঁটি খ্রীষ্টান বসবাস করতেন। আর ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইয়েমেন দেশে এ-সব খ্রীষ্টান শহীদদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

এই আয়াতগুলো কোনো খ্রীষ্টান মতবাদের কথা এখানে স্বীকার করে না। কিন্তু, সেই সময়ে সদূর ইফিষ শহর থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়ে খ্রীষ্টানরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করতেন। আর এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁরা তাঁদের পাক-কিতাব ও ধর্মীয় পুস্তকগুলো রেখে গেছেন, - ওই সব কিতাব ও ধর্মীয় পুস্তকের অনুলিপির কিছু কিছু এখন আমাদের কাছেও চলে এসেছে। যদি তাদের পাক-কিতাব, আজকে যে তৌরাত ও ইঞ্জিল আমাদের কাছে আছে, এই পাককিতাবের চেয়ে আলাদা হতো, তবে আমরা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রামাণিক সাক্ষ্য খুঁজে পেতাম।

গ. এই আয়াতগুলো দেখায় যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)- এর সময়ে তৌরাত ও ইঞ্জিল নির্ভুল ছিল ও এর কোনো রদবদল হয়নি।

গ১. সূরা সাবা (দেশবিশেষ) ৩৪:৩১ প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা

কাফেরেরা বলিল, আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না **এবং ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে (তৌরাত ও ইঞ্জিল) নহে—** ।

টিকা: গাঢ় অক্ষরে লেখা ক্রিয়াপদ দেখায় যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর জামানার লোকদের সময়ে কর্তমান কাল বুঝাতে এই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। বাঁকা অক্ষরে বাক্যাংশ একদল ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা হজরত মোহাম্মদের সময়ে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী ছিল। এখানে এই বিষয়টির ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সব সময়েই এমন একদল খাঁটি বিশ্বাসী ছিলেন, যাঁরা তাঁদের নিজেদের কিতাব পরিবর্তন করেননি।

গ২ .সূরা ফাতির (সৃষ্টিকর্তা) ৩৫:৩১ প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা

এবং আমি তোমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা তোমাদের নিকট আছে। ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের (তৌরাত ও ইনজিল) সমর্থক।

গ৩ .সূরা ইউনুস (নবীর নাম) ১০:৩৭ প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা

এই কোরআন আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কাহারও রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, **যাহা তোমাদের হাতে আছে**। ইহা তাহার (তৌরাত ও ইনজিল) সমর্থক এবং ইহা **বিধান সমূহের** বিশদ ব্যাখ্যা। **ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই** যে, ইহা জগত সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

গ৪. সূরা ইউসুফ (নবীর নাম) ১২:১১১ শেষ যুগের মক্কী সূরা

— **ইহা (কোরআন)** এমন এক বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে। কিন্ত মূমীনদের জন্য ইহা **পূর্বগ্রন্থে (তৌরাত** ও ইঞ্জিল) **যাহা আছে তাহার সমর্থক** এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।

গ৫.সূরা আন্'আম (গবাদি পশু) ৬:১৫৪-১৫৭ শেষ যুগের মক্কী সূরা

অতঃপর আমি মূসাকে দিয়াছিলাম **কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ-** যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। এই কিতাব আমি নাজিল করিয়াছি যাহা কল্যানময়। সুতরাং, ইহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে। পাছে তোমরা বলো, **'কিতাব তো শুধু আমাদের পুর্বে দুই সমপ্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা তাহাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে গাফিল ছিলাম,' কিংবা** তোমরা বলো, 'যদি কিতাব (তৌরাত ও ইঞ্জিল) আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইতো তবে আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম।'

গ৬. সূরা মু'মিন (বিশ্বাসী) ৪০:৬৯-৭০ -৭১শেষ যুগের মক্কী সূরা

তুমি (মোহাম্মদ) কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কীভাবে উহাদিগকে বিপদগামী করা হইতেছে? *যাহারা A স্বীকার* করে কিতাব ও **যাহা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম** তাহা; শীঘ্রই তাহারা জানতে পারিবে- যখন উহাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

গ৭. সূরা আহ্‌কাফ (স্থান বিশেষের নাম) ৪৬:১২ শেষ যুগের মক্কী সূরা

ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ সরূপ। **আর এই কিতাব ইহার (তৌরাত) সমর্থক**, আরবী ভাষায়, যেন ইহা যালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

গ৮. সূরা আহ্‌কাফ (স্থান বিশেষের নাম) ৪৬:২৯-৩০ শেষ যুগের মক্কী সূরা

স্মরণ কর আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা কোরআন পাঠ শুনিতেছিল। — যখন উহারা কোরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদের সমপ্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল। উহারা বলিয়াছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে **মূসার পরে, ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে** সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

গ৯. সূরা বাকারা (গাভী) ২:৯১, ২ হিজরী

এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ণ কর; তাহারা বলে, '**আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছে (তৌরাত) তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি।'** অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, **যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে (তৌরাত)** তাহার সমর্থক। —

গ১০. সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৩-৪, ২-৩ হিজরী

"তিনি (আল্লাহ) সত্যসহ তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের (নির্ভুলতার) সমর্থক, আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন, তৌরাত ও ইঞ্জিল (কিতাবুল মোকাদ্দস) যাহা **তাহাদের নিকট আছে** - ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য — ।

গ১১. সূরা নিসা (নারী) -৪:১৬২-১৬৩, ৫-৬ হিজরী

কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা (ইহুদী) জ্ঞানে সুগভীর তাহারা ও মুমিনগণ **তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও ঈমান আনে—** আমি তো তোমার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ,'ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে জবুর দিয়াছিলাম।

গ১২. সূরা তাওবা (অনুশোচনা) ৯:১১১, ৯ হিজরী

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহিত হয়। **তৌরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে**। নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্টতর কে আছে?

গ১৩. সূরা মায়িদা (অন্নপাত্র) ৫:৪৮, ১০ হিজরী

আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, ইহার পুর্বে অবতীর্ণ কিতাবের (সত্যতার) সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে (**وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ** ওয়া মুহাইমিনান 'আলায়হি) যাহা তাহাদের হাতে আছে।

আমরা দেখি যে, এই আয়াতগুলোতে তৌরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে জোরালো সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদের সময়েও এই কিতাবগুলো ছিল। আর এই কিতাবগুলোতে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

কোরআন **আরবী ভাষায়** হজরত মূসা (আঃ)-এর ওপরে নাজিল হওয়া তওরাতের সমর্থক [গ৭]। আর তার প্রয়োজন ছিল, কারণ মক্কাবাসীরা **"দুই সমপ্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব"; তাছাড়াও তারা তাহাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে গাফিল ছিল,' বলে** বুঝতে পারতো না, নয়তো মক্কাবাসীরা তাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত হইত [গ৫] এছাড়াও বলা যায় যে, এটি তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফের বিশদ ব্যাখ্যা "ইহাতে কোনো সন্দেহ নেই" [গ৩] এবং আগের কিতাবের সংরক্ষক [গ১৩]।

মক্কাবাসীরা বলে, "আমরা এই কোরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না এবং ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে (তৌরাত ও ইঞ্জিল) নহে, যাহা তাহাদের নিকট আছে [ক১] কোনো কোনো ইহুদী বলে যে, তাদের কাছে যা নাজিল হয়েছে, শুধু সেই কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে, যদিও **তাদের কাছে যে**

কিতাবসমূহ আছে, কোরআন তার (সত্যতা) সমর্থক [গ৯]। এখানে সতর্ক করা হয়েছে, যারা যারা (এখন) কোরআনকে আর **যাহা (আগের কিতারসমূহ) সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম** তাহা অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে [গ৬] *কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা (ইহুদী) জ্ঞানে সুগভীর* তাহারা ও মুমিনগণ **তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও ঈমান আনে** [গ১১] আর জিন্নরাও কোরআন আর তৌরাত উভয় কিতাব বিশ্বাস করে[গ৮]

সূরা তওবার শেষে নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের অন্যতম এক আয়াতে বলা হয়েছে, **তৌরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে** [গ১২]। সবশেষে, তাহাদের নিকট আছে (**بَيْنَ يَدَيْهِ** বায়ন ইয়াদাইহি) এই বাকাংশের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। এই বাক্যাংশ গ২, গ৩., গ৪, গ৮, গ১০, গ১৩ এবং ওপরে ক৫, ক৬ আয়াতগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। আমি অনুবাদের সময় শব্দ থেকে শব্দ অনুবাদ করেছি। কারণ তাহলে এটি বুঝায় যে, এখানে বর্তমান কাল বুঝানো হয়েছে। কখনো কখনো এই বাক্যাংশের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে, "তাদের মধ্যে" অথবা "তার হাতে রয়েছে।" কিন্তু সাধারণ অর্থে একটি বাকধারা হিসেবে এর অর্থ হচ্ছে, "তার উপস্থিতিতে" বা "তার ক্ষমতার মধ্যে", অথবা "তার দখলে" কিংবা"তার নিয়ন্ত্রণে"। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, "তোমার কথা তোমার হাতে রয়েছে:, এর অর্থ হচ্ছে, "তুমি এখন কথা বলতে পারো" অথবা "এবার তোমার বলার পালা"। "তার হাতের মধ্যে কোনো অস্ত্র নেই" এই কথার অর্থ হচ্ছে, "সে নিরস্ত্র"। সূরা ৩৪:১২আয়াতে, হজরত সুলায়মান ও জিন্নদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, জিন্নরা তাঁর হাতের মধ্যে কাজ করত।

মৌলানা ইউসুফ আলী এই আয়াতের অনুবাদ করে বলেছেন, "তার সামনে কাজ করেছে" কিন্তু টিকায় তিনি তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, জিন্নরা তাঁর চোখের সামনে কাজ করেছে।

সুতরাং, এই আয়াতগুলোর অর্থ হচ্ছে, কোরআন আগের কিতাব তৌরাত ও ইঞ্জিলকে সমর্থন করেছে, সাক্ষ্য দিয়েছে, যে কিতাবগুলো "তাদের উপস্থিতিতে", "তাদের চোখের সামনে ছিল"। এই অংশে বর্ণিত ওপরে আলোচিত অন্যান্য আয়াতগুলো দেখাচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, "তাঁর চোখের সামনে" বৈধ, তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফের অস্তিত্ব ছিল।

ঘ. যে আয়াতগুলো দেখায় যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজে তৌরাত ও ইঞ্জিল থেকে আয়াত উল্লেখ করেছেন বা বিচার মিমাংসার জন্য ব্যবহার করেছেন।

ঘ১. সূরা নাজ্‌ম (নক্ষত্র) ৫৩:৩৩-৩৮ মক্কী সূরা, মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছিল।

> তুমি (মুহাম্মদ) কি দেখেছ যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং দান করে সামান্যই পরে বন্ধ করিয়া দেয়? তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে? **তাহাকে কি অবগত করানো**

হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে, এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?- উহা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।

ঘ২. সূরা শু'আরা (কবীগণ) ২৬:১৯২-১৯৭ মক্কী সূরা, মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ের দিকে নাজিল হয়েছিল।

নিশ্চয়ই আল-কোরআন জগৎসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জিবরাইল (রুহুল আমিন) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়, ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছে তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পারো। **পূববর্তী কিতাবসমূহে (জবুর) অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে। বনি- ইসরাইলের পন্ডিতগণ ইহা অবগত আছে-** ইহা কি তাহাদের জন্য নিদর্শন নহে?

ঘ৩. সূরা তাহা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) **২০:১৩৩** মক্কী সূরা, মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ের দিকে ৭ হিজরীতে নাজিল হয়েছিল।

উহারা বলে, 'সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনয়ন করে না কেন?' **উহাদের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে** (আল-ছুহুফ আল-উয়ালা **الصُّحُوفِ الأُولَى**)।

এই আয়াতের ব্যাখায় তফসীরকারক বায়জাবী লিখেছেন-পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ বলতে বুঝানো হয়েছে, তৌরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য আসমানী কিতাব।

ঘ৪. সূরা আম্বিয়া (আল্লাহ্‌র সংবাদবাহক গণ) ২১:৭ মক্কী সূরা, মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ের দিকে নাজিল হয়েছিল।

তোমার (মুহাম্মদ) পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম; **তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদিগকে—** ।

ঘ৫. সূরা আম্বিয়া (আল্লাহ্‌র সংবাদবাহক গণ) ২১:১০৫ মক্কী সূরা, মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ের দিকে নাজিল হয়েছিল।

আমি আসমানী কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

এখানে সরাসরি জবুর শরীফ থেকে ৩৭:২৯ আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। জবুর শরীফের এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহভক্ত লোকেরা দেশের দখল পাইবে আর সেখানে চিরকাল বাস করিবে। আমরা একটু আগে একই সূরার যে আয়াত (২১:৭) উল্লেখ করেছি, তার সাথে এই আয়াতটি বিবেচনা করলে, এটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআনের মত অনুসারে জবুর শরীফ থেকে আল্লাহ্‌ যে-আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, হযরত মোহাম্মদের সময়েও সেই নির্ভুল জবুর শরীফের অস্তিত্ব ছিল।

ঘ৬. সূরা যুখরুখ (সুবর্ণ) ৪৩:৪৪, ৪৫ মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

কোরআন তো তোমার (মুহাম্মদ) ও তোমার সমপ্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে। **তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা করো**, আমি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ‘ইবাদত করা যায়?

তফসিরকারক আলেম বায়জাবি, জালাল উদ্দিন আর ইউসুফ আলীর মতে "তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞেস করো" এর অর্থ হচ্ছে তাদের লোকদের কাছে জানতে বলা হয়েছে- যারা তাদের কিতাব ও শিক্ষা শিখেছে। সুতরাং, এই কথা এখানে বলা যায় যে, এই সব কিতাব ও শিক্ষা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সময়ে পাওয়া যেত।

ঘ৭. ইউনুস (নবীর নাম) ১০:৯৪ মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

আমি তোমার (মুহাম্মদ) প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি **তুমি সন্দেহে থাক, তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে;—** ।

ঘ৮. সূরা নাহ্‌ল (মৌমাছি) ১৬:৪৩-৪৪ মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

তোমার (মুহাম্মদ) পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম, **তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীগণকে (আহলে কিতাব)**।

ঘ৯. সূরা বনি- ইসরাইল (ইসরাইল সন্তানগণ) ১৭:১০১, ১ হিজরী থেকে শুরু করে মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

"তুমি (মুহাম্মদ) বনি- ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখো, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম।"

ঘ১০. সূরা বনি- ইসরাইল (ইসরাইল সন্তানগণ) **১৭:১০৭-১০৮, ১ হিজরী থেকে শুরু করে মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।**

"বলো, তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না ***করো, তাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে*** **তাহাদের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে** এবং উহা উহাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।"

ঘ১১. সূরা রা’দ (বজ্রধ্বনী) ১৩:৪৩ মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, ‘তুমি (মুহাম্মদ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত নহ।’ বলো, আল্লাহ্ **এবং যাহাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে**, তাহারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।’

ঘ১২. সূরা আ’রাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৫৬-১৫৭ মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

তোমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাপন করিয়াছি।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আর আমার দয়া তাহাদের প্রতি -যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। 'যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তৌরাত ও ইঞ্জিল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে।

ঘ১৩. সূরা আ'রাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৫৯ মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হয়েছিল।

"মূসার সমপ্রদায়ের মধ্যে এমন দল (উম্মা أُمَّةٌ) রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেই মতেই বিচার করে।"

ঘ১৪. সূরা আ'রাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৬৮-১৭০

"দুনিয়ায় আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে; *তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ কতক অন্যরূপ* এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি, যাহাতে তাহারা প্রত্যবর্তন করে। — কিতাবের অংগীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতিত বলিবে না? এবং **তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়ন করে— যাহারা (ইহুদী) কিতাবকে ধারণ করে** ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

ঘ১৫. সূরা বাকারা (গাভী) ২:১১৩ ২ হিজরী

ইহুদীরা বলে, 'খ্রীষ্টানদের কোনো ভিত্তি নাই' এবং খ্রীষ্টানরা বলে, 'ইহুদীদের কোনো ভিত্তি নাই'; অথচ **তাহারা কিতাব পাঠ করে।**

ঘ১৬. সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:২৩, ২-৩ হিজরী

তুমি কি তাহাদিগকে দেখো নাই যাহাদিগকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল **তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করা হইয়াছিল যাহাতে উহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়;** অতঃপর *তাহাদের একদল* ফিরিয়া দাঁড়ায়, আর তাহারাই পরাঙমুখ;

তফসিরকারকেরা এই আয়াত বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁরা একমত যে, একটি বিরোধীয় বিষয় মিমাংসার জন্য ইহুদীরা হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে অনুরোধ করেছিল। তিনি সেই ইহুদীদের কাছে প্রস্তাব দেন যেন তারা তাদের কিতাব থেকে এই সমস্যার নিস্পত্তি করে। কিন্তু তারা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে চলে যায়।

ঘ১৭. সূরা আলি-ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৭৯, ২-৩ হিজরী

কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবূয়ত দান করিবার পর সে মানুষ বলিবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও; ইহা **তাহার** জন্য সঙ্গত নহে; বরং সে বলিবে, **'তোমরা রাব্বানী** * * **(رَبَّانِيِّين আদর্শ শিক্ষক) হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান করো এবং যেহেতু তোমরা আন্তরিকতার সাথে অধ্যয়ন করো।'**

(**প্রতিটি অনুবাদক এখানে বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করেছেন, আমি আলেম মেসনের অনুবাদ ব্যবহার করেছি।)

ঘ১৮. সূরা আলি-ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৯৩-৯৪, ২-৩ হিজরী

তৌরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাইল নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বনি- ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্য **হালাল** ছিল। বলো, **'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তৌরাত আনো এবং পাঠ কর।'** ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্য সৃষ্টি করে তাহারই যালিম।

ঘ১৯. সূরা নিসা (নারী) ৪:৬০

তুমি (মুহাম্মদ) কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে অথচ তাহারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থী হইতে চায়, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ (তওরাতে) দেওয়া হইয়াছে এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়?

ঘ২০. সূরা ফাত্হ (বিজয়) ৪৮:২৯, ৬ হিজরী

তাহাদের লক্ষণ তাহাদের (মুসলমান বিশ্বাসী) মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকিবে; তওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের ওপরে দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক।

এই আয়াতে আমাদের কাছে ঈসা মসীহের বলা মেসালের পরোক্ষভাবে যথাযথ উল্লেখ করা হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফের দ্বিতীয় সিপারা মার্ক ৪:২৬-২৮ আয়াতে আমরা পড়ি,

"আল্লাহ্র রাজ্য এ'রকম- একজন লোক জমিতে বীজ ছড়ালো। — জমি নিজেই ফল জন্মালো - প্রথমে চারা, পরে শীষ এবং শীষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা। দানা পাকার পর সে কাস্তে লাগালো; কারণ, ফসল কাটার সময় হয়েছে।"

ঘ২১. সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:৪৩, ১০ হিজরী

তাহারা তোমার ওপর কীরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে অথচ **তাহাদের নিকটে রহিয়াছে তৌরাত যাহাতে আল্লাহ্র আদেশ আছে।**

ঘ২২. সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:৪৫, ১০ হিজরী

আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম, অতঃপর কেহ উহা **ক্ষমা** করিলে **উহাতে** তাহারই **পাপমোচন** হইবে। **আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।**

এখানে কিতাবুল মোকাদ্দসের হিজরত সিপারার একটি আয়াত কোরআন উদ্ধৃত করেছে। আল্লাহ্ হজরত মূসা (আঃ)কে যে হুকুম দিয়েছিলেন তা আবার এখানে আবার বলা হয়েছে। তৌরাত শরীফের হিজরত **সিপারার ২১:২৩-২৫** আয়াতে আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন, "এ'ভাবে শাস্তি দিতে হবে যেমন প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা; পোড়ানোর বদলে পোড়ানো, আঘাতের বদলে আঘাত এবং বেত্রাঘাতের বদলে বেত্রাঘাত।" তারপর মদিনাবাসী ইহুদীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, "**আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ** (তৌরাত) **করিয়াছেন, তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম**"

ঘ২৩. সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:৫০, ১০ হিজরী

ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। **আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক।**

ঘ২৪. সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:৬৫, ৬৬, ৬৮, ১০ হিজরী

কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত ও ভয় করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের দোষ অবশ্যই অপনোদন করিতাম। এবং তাহাদিগকে সুখময় জান্নাতে দাখিল করিতাম। তাহারা যদি তৌরাত, ইঞ্জিল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রষ্ঠিত করিতো, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ওপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একদল (উম্মা أُمَّةٌ) রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।

বলো,'হে কিতাবীগণ! তৌরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নাই।'

ওপরের আয়াতগুলোতে বারবার এই সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে যে, হজরত মোহাম্মদের জীবনকালেই নির্ভুল তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফ ছিল। **আর** এই কিতাবগুলো মুসলমান ও অমুসলমান সবাই এই কিতাবগুলোকে একইভাবে স্বীকৃতিও দিয়েছিল।

একজন মক্কাবাসী যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, **"সে মূসার কিতাবে, এবং ইব্রাহীমের কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কে সে অবগত ছিল"[ঘ১] "তাদের নিকট এসেছিল সুস্পষ্ট প্রমাণ যাহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে"[ঘ৩] হজরত মুহাম্মদ (দঃ) "যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে"**, তাহাদের সাক্ষী হিসেবে মেনে নিয়েছেন [ঘ১১]।

এখানে বলা হয়েছে, কোরআন নাজিল সম্পর্কে **"পূববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে"। "বনি- ইসরাইলের পন্ডিতগণ ইহা অবগত আছে"** [ঘ২] **বিশ্বাস করার** আগেই তাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া **হইয়াছে**[ঘ১০]। তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদের কাছে কিতাব আছে [ঘ১৪] আর অন্যরা হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বিশ্বাস না করলেও, তাদের কাছে থাকা কিতাব **"অধ্যয়ন করে"[ঘ১৪]**।

ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সমপ্রদায়ের **লোকেরা, "কিতাব পাঠ করে"[ঘ১৫] ও "আন্তরিকতার সাথে অধ্যয়ন করে"** [ঘ১৭]।**"কিছু কিছু ধার্মিক ইহুদী আছে"ঘ১৩] "যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেই মতেই বিচার করে" [ঘ১৪]। "এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী" রয়েছে** [ঘ২৪]।

মক্কাবাসীদের বলা হয়েছে, **"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর" [ঘ৪] ও [ঘ৮]। "আমার রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা কর"**, এই কথার অর্থ হচ্ছে, যারা ঐসব রাসুলের কিতাব ও মতবাদ সম্পর্কে জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে [ঘ৬]।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বলা হয়েছে, "তোমার যদি **সন্দেহ থাকে, তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর"[ঘ৭]** আর **"বনি- ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখো"**, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম[ঘ৯]।

অন্যান্য আয়াতগুলোতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তৌরাত থেকে হুকুম উদ্ধৃত করে বলেছেন, তারা যেন **"আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুসারে বিধান দেয়" [ঘ২২] "আল্লাহ্ জবুর শরীফ থেকে আয়াত উদ্ধৃত করেছেন" [ঘ৫]।** তিনি ইহুদীদের কাছে **কামনা** করেছেন, যে হুকুম তিনি তওরাতে দিয়েছিলেন সেভাবে যেন তারা মুসলমানদের মতো এবাদত করে। তিনি ইঞ্জিল থেকে ঈসা মসীহের বীজ বপনকারীর মেসাল পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনদের লক্ষণ এ'রকই হবে [ঘ২০]।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ইহুদীদের তৌরাত আনতে বলেছেন, যেন **"উহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়"[ঘ১৬]।** আরেকটি ঘটনায় তিনি তাদের বলেছেন যে, **"যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তৌরাত আনো এবং পাঠ কর"[ঘ১৮]।**

আল্লাহ্ হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে জিজ্ঞেস করছেন, কেন ইহুদীরা তার কাছে বিচারভার ন্যস্ত করে অথচ **"তাহাদের নিকটে রহিয়াছে তৌরাত যাহাতে আল্লাহ্র আদেশ আছে" [২১]।** আর খ্রীষ্টানদের বলা **হয়েছে, "ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয় [ঘ২৩]।"**

আল্লাহ্ বলেছেন যে, "তৌরাত ও ইঞ্জিল, যাহা তাহাদের নিকট আছে"**[ঘ১২]। এখানে উল্লেখিত** সর্বশেষ সূরা যা **১০**ম হিজরীতে হজরত মোহাম্মদের কাছে নাজিল হয়েছিল- সূরা মায়িদায় - ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বলা হয়েছে, "**'হে কিতাবীগণ!** তৌরাত, ইঞ্জিল **ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে** তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নাই [ঘ২৪]।'

একজন তফসিরকারক- ইবনে ইসহাক এই আয়াতের [গ২৪] সাথে সংশ্লিষ্ট নিচের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

হজরত রাফি ইবনে হারিতা ও হজরত সালাম ইবনে মাসকুম ও আরো দুইজন লোক একদিন হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর কাছে এসে তাঁকে বললেন, "হে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি কি দাবী

করেন না যে, আপনি হযরত ইব্রাহিম- এর ধর্ম ও তাঁর বিশ্বাস অনুসরণ করেন। **আর তওরাতের যেসব আয়াত আমাদের কাছে আছে, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন না, আর আপনি কি সাক্ষ্য দেন না যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে।'**

তিনি উত্তর দিলেন,' হ্যাঁ, এই কথা তো সত্যি, কিন্তু তোমরা নতুন নতুন মতবাদ তৈরি করেছো, আর, তার মধ্যে যে-বিষয়গুলো তোমরা তা অস্বীকার কর, বিশেষভাবে তোমাদের নিকট থেকে যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল; আর মানবজাতিকে দেখানোর জন্য যে যে হুকুম তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা তা গোপন কর। তাই আমি তোমাদের নতুন ধারণা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি।'

"তারা বললো,' আর আমাদের জন্য যা আমাদের হাতে আছে, তাকেই আমরা আঁকড়ে ধরেছি। আর আমরা সত্য ও পথনির্দেশ অনুসরণ করছি। আর আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি না, আর আমরা আপনাকে অনুসরণ করবো না।'

তখন মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ ওহী নাজিল করে বললেন,', 'হে কিতাবীগণ! তৌরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নাই।'।[১১]

যদি একে **সহি হাদিস** বলে মেনে নেয়া হয়, তবে এই **হাদিসটি** প্রমাণ করে যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তৌরাত কিতাব বিশ্বাস করতেন আর এই কিতাবটি দশম হিজরীতে মদিনায় ইহুদীদের কাছে ছিল। আর এমনকি যদি এটি সহি **হাদিস** নাও হয়ে থাকে, তবু এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ সত্য তুলে ধরে যে, হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলমানরা জানতেন যে, আরব দেশেই বৈধ, অকাট্য সুযুক্তিপূর্ণ তৌরাত ও ইঞ্জিল তাঁদের কাছে রয়েছে।

ওপরের হাদিসটি গ্রহণ করি বা না করি এই অংশে আমরা যে ২৪টি, আর আগের অংশ থেকে ১৩টি কোরআনের আয়াতসমূহ আমরা আমরা পড়েছি, সর্বমোট এই ৩৭টি আয়াতসমূহ একথাই সত্য বলে প্রমাণ করে যে, যখন হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বেঁচে ছিলেন, তখনি মক্কা ও মদিনায় খাঁটি তৌরাত ও ইঞ্জিল লোকদের কাছে পাওয়া যেত।

অনেক মুসলমান এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন যে, নির্ভুল তৌরাত ও নির্ভুল ইঞ্জিল যা আরবে ছিল, বর্তমানে যে তৌরাত ও ইঞ্জিল পাওয়া যায়, এখনকার চেয়ে আগের কিতাবগুলো আলাদা ছিল। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আগের কিতাবগুলো বর্তমানে কোথায় আছে?!

অবশ্যই এই কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এমনকি যদি কেবলমাত্র ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাহায্য করার জন্য কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মান্য করার জন্য "তৌরাত, ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ইসলামী দুনিয়ার কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করে রাখার কথা।" আরও বলা যায় যে, আমরা তখন এই সব পাণ্ডুলিপির সাথে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দ্বারা সংরক্ষিত কিতাবগুলোর সাথে তুলনা করে দেখতে পারতাম।

---

[১১] *The Coran,* Sir W. Muir, S.P.C.K., E. & J.B. YOUNG & Co, 1896, পৃষ্ঠা -২০৯, তফসিরকারক আলেম তাবারিও উল্লেখ করেছেন।

আসলে কোরআনের কোনো পুরানো পাণ্ডুলিপি নেই। কোনো পুরানো পাণ্ডুলিপি কোনো মুসলমান সংগ্রহ করে রাখেননি। অন্যদিকে, সারা দুনিয়ায় ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে একই তৌরাত আর একই ইঞ্জিল এখনও আছে, যা পুরানো পাণ্ডুলিপি অনুসারে লেখা হয়েছে।

ঙ. এই আয়াতগুলো দেখায় যে, তৌরাত ও ইঞ্জিল নির্ভুল ছিল, কিন্তুএই আয়াতগুলোতে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়।

প্রথম অংশের ভূমিকাতে আমি বলেছি যে, একটি বিষয় সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে হলে, সে বিষয়ে যত আয়াত আছে, আমাদের সবগুলো আয়াত নিয়েই পড়াশোনা করতে হবে। তৌরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে আরো প্রায় ৫৫টি কোরআনের আয়াত রয়েছে, কিন্তু যেহেতু সেই আয়াতগুলো হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সময়ে এই পাক-কিতাবগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে **স্বীকার** বা অ**স্বীকার** করেনি, তাই কেবল সেই আয়াতগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো।

এই ধরনের আয়াতগুলোর উদাহরণ হিসেবে, আমরা সূরা নিসা (৪:১৩৬) থেকে একটি আয়াত দেখবো। এই সূরা ৫-৬ হিজরীতে নাজিল হয়েছিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রাসূলে, **তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব (তৌরাত) তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন।"**

এই আয়াতে অনুসারে আমরা এই কথা বলতে পারি না যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মুসলমানদের হুকুম দিচ্ছেন তাদের কাছে যে তৌরাত আছে তা বিশ্বাস করার জন্য, অথবা যখন হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলছেন. অথবা বিশ্বাস করছেন যে, আল্লাহ্ মূসাকে যে নির্ভুল তৌরাত দিয়েছেন, "যে কিতাব (তৌরাত) তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন," যা পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে।

এখানে কোরআনের আয়াত নাজিলের সময়ের ধারাবাহিকতা অনুসারে আয়াতের তালিকা নিচে দেওয়া হলোঃ

৭৪:৩১, ৮৭:১৮, ২৫:৩৫, ৩২:২৫, ৩৪:২৩-২৪, ৫৪:৪৩, ৩৭:১১৪-১১৭, ১৯:২৮-২৯, ২১:৪৮, ২৯:২৭, ২৯, ৪৬-৪৭, ৩২:২৩, ৪০:৫৩-৫৫, ৪১:৪৫, ৪২:১৫, ৪৫:১৬-১৭, ৪৫:২৮-২৯, ৪৬:১০.১১:১৬-১৭, ২৮:৪৩, ২৮:৪৮-৪৯, ২৮:৫২, ৫৩, ২৩:৪৯, ১৩:৩৬, ১৭:২, ১৭:৪-৭, ১৭:৫৫, ৬:২০, ৬:১১৪, ৬:১২৪, ৯৮:১, ২:১-৫, ২:৫৩, ২:৮৭, ২:১২১, ২:১৩৬, ২:১৪৪-১৪৫, ২:১৭৬, ২:২১৩, ২:২৮৫, ৩:৬৫, ৩:৮১, ৩:৮৪, ৩:৯৯, ৩:১১৯, ৩:১৮৩-১৮৪, ৩:১৮৭, ৬২:৫, ৪:৫১, ৪:৫৪, ৪:১৩১, ৪:১৩৬, ৪:১৫০-১৫৩, ৪:১৭১, ৫৭:২৫, ৫:৬২, ৫:৮৫-৮৬,

পাঠক ওপরের প্রতিটি আয়াত নিজে **স্বাধীন**ভাবে কোরআন থেকে দেখে নিতে পারেন আর যদি তিনি মনে করেন যে, সেগুলো আমাদের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে, তবে তাদের মধ্য থেকে একটি আয়াত বা সবকটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

চ. এই আয়াতগুলো দেখায় যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, আর তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে।

চ১. সূরা শূরা ৪২:১৩-১৪, মক্কী যুগের শেষে নাজিল হয়েছিল।

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহারা নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ (লা তাতাফার্‌রাকূ لَاتَتَفَرَّقُوا) করিও না— **উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেশ বশতঃ উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়**। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। **উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহারা সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।**

চ২. সূরা বায়্যিনাঃ ৯৮:৪ মদিনা যুগের শুরুতে নাজিল হয়েছিল।

যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত (তাফার্‌রাক্বা تَفَرَّقَ) হইল তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

চ৩. সূরা বাকারা (গাভী) ২:২৫৩ ২ হিজরী

মরিয়ম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্না দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরর্বর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও **পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত** হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ (আখতালাফূاخْتَلَفوا) **ঘটিল**। *ফলে তাহাদের কতক ঈমান আনিল এবং কতক কুফরী করিল।*

চ৪. সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:১৯ ২-৩ হিজরী

"যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা **পরস্পর বিদ্বেষবশত** তাহাদের নিকট জ্ঞান (আল্লাহ্‌র সত্য) আসিবার পর **মতানৈক্য** (আখতালাফা اخْتَلَفَ) ঘটাইয়াছিল।"

চ৫ সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:১৫-১৬ ১০ হিজরী

যাহারা বলে, "আমরা খ্রীষ্টান", তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু **তাহারা** তাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার **এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে**। সুতরাং, আমি **তাহাদের মধ্যে** কিয়ামত পর্যন্ত **স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ** জাগরূক রাখিয়াছি; তাহারা যাহা করিত আল্লাহ্ তাহাদিগকে অচিরেই তাহা জানাইয়া দিবেন।

> হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, **তোমরা কিতাবে যাহা গোপন করিতে** সে উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে (যা বলার এখন আর কোনো প্রয়োজন নেই)।

আমরা এই আয়াতগুলো থেকে দেখি যে, পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে [চ২, চ৪] খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত [চ১, চ২] কারণ তাদের মধ্যে মতানৈক্য বা মতভেদ রয়েছে [চ৩, চ৪] সুতরাং, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে **স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ** সৃষ্টি করেছেন [চ৫] আর তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে [চ৩]।

তাদের কিতাব ও তাদের চুক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এর কিছু কিছু অংশ ভুলে গিয়েছিল [চ৫]। তারা বেশিরভাগ গোপন করতো [চ৫] আর তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আছে [চ১]।

কিন্তু আমরা দ্বিতীয় অংশে ও এখানে [চ৩] দেখেছি যে, "তাদের মধ্যে **"কিছু লোক বিশ্বাস করেছিল।"** খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই মতপার্থক্য ও তাদের একদল আরেকদলের লোকদের মেরে ফেলার কথা লোকায়ত ঐতিহাসিকদের লেখা বই থেকে আর পাশাপাশি জামাতের ইতিহাস থেকেও জানা যায়। রোমীয় ও বাইজেন্টাইন খ্রীষ্টান জামাত মিশরের কপটিক খ্রীষ্টান জামাতকে ভণ্ড জামাত বলেছে। কিন্তু তাদের সকলের কাছে একই কিতাবুল মোকাদ্দস ছিল; যেভাবে শিয়া ও সুন্নী মুসলমানদের একই কোরআন থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

এখানে কোনো আয়াতই বলে না যে, এমনকি অবিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা তাদের কিতাব পরিবর্তন করেছে। আর এই কথা তো নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা তা পরিবর্তন করতেই পারে না।

ছ. যে আয়াতগুলো দেখায় যে, ইহুদীরা কোরআনকে অস্বীকার করেছে, পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে অথবা তাদের নিজস্ব কিতাব তওরাতের আয়াত গোপন করেছে আর এই আয়াতের অর্থ ছুঁড়ে ফেলেছে।

ছ১. সূরা আন্'আম (গবাদি পশু)৬:৮৯-৯২ মক্কী যুগের শেষে নাজিল হয়েছিল।

> আমি উহাদিগকেই **কিতাব**, কর্তৃত্ব, নবুয়ত দান **করিয়াছি**। অতঃপর যদি ইহারা এইগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলোর ভার অর্পন করিয়াছি যাহারা এইগুলো প্রত্যাখ্যান করিবে না— তাহারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধী করে নাই, যখন তাহারা বলে,' আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই নাজিল করেন নাই।' বলো,' কে নাজিল করিয়াছেন হজরত মূসা (আঃ)-এর আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল, **তাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহাদের অনেকাংশ গোপন রাখো এবং যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল?**

"— আমি এই কল্যানময় কিতাব নাজিল করিয়াছি, যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের (নির্ভুলতার) সমর্থক **এবং যাহা (তৌরাত) তাহাদের নিকট আছে**, তাহা দ্বারা তুমি ও মক্কা ও উহার চতুষ্পার্শ্বের লোকদিগকে সতর্ক কর।"

ছ২. সূরা হুদ (নবীর নাম) ১১:১১০ মক্কী যুগের শেষে নাজিল হয়েছিল।

"নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম **অতঃপর ইহাতে তাহাদের (ইহুদীদের) মতভেদ ঘটিয়াছিল**। এবং তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মিমাংশা হইয়া যাইত। **উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল**।" (১০:৯৩ আয়াতে একই ধারণা দেওয়া হয়েছে)

ছ৩. সূরা বাকারা (গাভী) ২:৪০-৪৪, ২ হিজরী

"হে বনি-ইসরাইল! — আমি (আল্লাহ) যাহা অবর্তীর্ন করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আনো। **ইহা তোমাদের নিকট যাহা (তৌরাত) আছে.**, উহার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই উহার **প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না** এবং **আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করিও না**।-- **তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া শুনিয়া সত্যতে গোপন করিও না**-- তোমরা মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেরাই বিস্মৃত হও, অথচ **তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো**।"

ছ৪. সূরা বাকারা (গাভী)২:৮৫, ২ হিজরী

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো, **কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর**? সুতরাং, তোমাদের যাহারা এইরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীণতা ও কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ছ৫. সূরা বাকারা (গাভী)২:৮৯, ২ হিজরী

তাহাদের নিকট যাহা আছে (তৌরাত) আল্লাহ্‌র **নিকট হইতে তাহার (নির্ভুলতা) সমর্থক কিতাব আসিল;—তখন** তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। -- উহা কত নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে।"

ছ৬. সূরা বাকারা (গাভী) ২:৯৭, ১০১, ২ হিজরী

"বলো,'যে কেহ জিবরাইলের শত্রুএইজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কোরআন পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পুর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভসংবাদ— **যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রাসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা (তৌরাত) রহিয়াছে উহার (নির্ভুলতার) সমর্থক**, তখন **যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল** (ফারীক্ব فَرِيق) আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলো, যেন তাহারা জানে না (উহার মধ্যে কি ছিল)।"

ছ৭. সূরা বাকারা (গাভী) ২:১৪০, ২ হিজরী

তোমরা কি বলো, 'ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ অবশ্যই ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টান ছিল?' ভালো, 'তোমরা কি বেশী জানো না আল্লাহ?' **আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে, তাহা যে গোপন করে,** তাহার অপেক্ষা অধিকতর যালিম আর কে হইতে পারে?

ছ৮. সূরা বাকারা (গাভী) ২:১৪৬, ২ হিজরী

"আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি, তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং **তাহাদের একদল জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে।**

ছ৯. সূরা বাকারা (গাভী) ২:১৫৯, ২ হিজরী

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের নিকট কিতাব উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা (কোনো কোনো ইহুদী) গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লা'নত দেন।

ছ১০. সূরা বাকারা (গাভী) ২:১৭৪, ২ হিজরী

আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতিত আর কিছু পুরে না—

ছ১১ সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৬৯-৭১, ২-৩ হিজরী

কিতাবীদের একদল (ত্বা'য়িফা طَآءِفَةٌ) *চাহে যেন* তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারে, অথচ তাহারা নিজদিগকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধী করে না। "হে কিতাবীগণ! **তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতকে Aস্বীকার করো, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর।"**

"হে কিতাবীগণ! **তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন করো, যখন তোমরা জানো।**

ছ১২ সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৭৫, ২-৩ হিজরী

কিতাবীদের মধ্যে *এমন* লোক রহিয়াছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে (যে কোনো সময়ে চাইলে, দেওয়ার জন্য প্রস্তুত); আবার *এমন লোকও* আছে, যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পেছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না।"

ছ১৩ সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:১৯৯, ২-৩ হিজরী

কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া তাহার প্রতি এবং তিনি যাহা তোমাদের (বহুবচন) ও **তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন** তাহাতে অবশ্যই **ঈমান আনে** এবং **আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ-মূল্যে বিক্রয় করে না।** ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরুষ্কার রহিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

এই আয়াতগুলোতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। তৌরাত সম্পর্কে "তাদের মতভেদ আছে" আর এ-সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে [ছ২]

ইহুদীরা মুসলমানদের যদি কিছু দেখাতে চাইতো তখন তারা আলাদা কাগজে তাদের কিতাবের আয়াত লিখে, সেই কাগজ দেখাতো (ছ১)।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হলো, তারা কোরআনের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছে (ছ৩, ছ৪)। তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে (ছ১১)। **তারা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে (ছ৩, চ১০, ছ১৩)।** তারা সত্যকে গোপন করে - কোরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব কিতাবের সাক্ষ্য গোপন করেছে (ছ৩, ছ৭, ছ৮, ছ৯, ছ১০, ছ১১)- **তারা কোরআন সম্পর্কে সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করে এবং সত্য গোপন করে** (ছ৩, ছ১১)। কোরআনের যে অংশ তাদের সন্তুষ্ট করে সেটুকু তারা বিশ্বাস করে আর বাকী অংশ তারা অস্বীকার করে (ছ৪) অথবা আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে (ছ৬)।

অন্যদিকে কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের কাছে তৌরাত আছে (ছ৩, ছ৫, ছ৬); তাদের নিকট (তাদের সামনে) যে তৌরাত আছে. কোরআন তার নির্ভুলতার সমর্থক (চ১, ছ৬)। আল্লাহ্‌র নিকট হতে ইহুদীদের কাছে প্রমাণ আছে, (ছ৭); তারা হলো সাক্ষী (ছ১১); তাদের জ্ঞান আছে (ছ৮ছ১১)' আর তারা কিতাব অধ্যয়ন করে (ছ৩)।

এই কথাকে আমরা অল্পকথায় বলতে পারি, যদি আমরা আবারও ছ৩এ বর্ণিত আয়াত লক্ষ্য করি। ২ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা (গাভী) ২:৪০-৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে, "হে বনি-ইসরাইল! — আমি (আল্লাহ) যাহা অবর্তীর্ন করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমাণ আন। **ইহা তোমাদের নিকট যাহা (তৌরাত) আছে., উহার প্রত্যয়নকারী।** আর তোমরাই **উহার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না** এবং **আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করিও না।-- তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিওনা এবং জানিয়া শুনিয়া সত্যতে গোপন করিও না--** তোমরা মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেরাই বিস্মৃত হও, অথচ **তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর।"**

কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে এবং প্রত্যয়ন করেছে যে, **ইহুদীদের কাছে নির্ভুল তৌরাত কিতাব ছিল, আর তারা এই কিতাব অধ্যয়ন করত।** অবিশ্বাসী ইহুদীরা অন্যদের ধার্মিক জীবন-যাপনের জন্য বললেও তারা নিজেরা তা পালন করতে ভুলে যেত; কারণ, যখন তারা কোরআনকে অস্বীকার করেছে, আর তাদের কিতাবের মধ্যে থাকা সত্যকে গোপন করেছে, তখন তারা মিথ্যের মধ্যে ছিল।

কোরআন এই সাক্ষ্যও দিয়েছে যে, আহলে কিতাবীদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যারা সম্পূর্ণ সৎ লোক ছিলেন (ছ১২)। আর তাঁরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তওরাতের পাশাপাশি কোরআনও বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু এখানে এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যে, এমনকি অবিশ্বাসী ইহুদীরা তাদের তওরাতের লিখিত শব্দ পরিবর্তন করেছে। আর আব্দুল◌াহ ইবনে

সালাম ও মুখাইরিখের মতো অনেক ইহুদী নবীর বাণী গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল, তাঁরা অবশ্যই কিতাব পরিবর্তন করেননি।

জ. নিচের আয়াতগুলি বিশেষভাবে “তহরিফ” সম্পর্কে বলেছে:

কোরআনে চারটি আয়াতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পরিবর্তন বা রদবদলের) হার্‌রাফা (حَرَّفَ অভিযোগ করা হয়েছে। একটি আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে জিহ্বা ঘুরিয়ে কিতাব পাঠ করার বিষয়ে দোষারোপ করা হয়েছে। আমরা এই আয়াতগুলো কী প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল ,সেই সার্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে আয়াতগুলো এখানে আলোচনা করবো। অবশ্য ,আমরা এই কথাটি মনে রাখবো যে ,আগে আমরা আগে যে ৫০-৬০টি আয়াত আলোচনা করেছি ,সেগুলোর পাশাপাশি এই আয়াতগুলোও গোটা কোরআনের মধ্যে বিরাজমান একই পরিবেশে নাজিল হয়েছিল।

জ১. সূরা আলি-’ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৭৮, ২-৩ হিজরী

> “আর নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে **একদল (ফারীক্ব فَرِيْق) লোক আছেই যাহারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে** (يَلْوُنَ السِنَتَهُم) যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে, ‘উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে’; কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নহে। তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

এই আয়াতে আহলে কিতাবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা যখন কিতাব পাঠ করে, তখন তারা কিতাবের আয়াতকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে উচ্চারণ করে, তাদের এভাবে আয়াত পাঠ করার কারণ হচ্ছে, শ্রোতারা যাতে মনে করে এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র কালাম - কিতাব (তৌরাত)-থেকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু এই আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, এটি “উহা কিতাবের অংশ নহে” অথবা “উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নহে।”

জ২. সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:১৩-১৪, ১০ হিজরী

> আর আল্লাহ্‌ তো বনি- ইসরাইলের অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলাম— তাহাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমি তাহাদিগতে লানত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি; **তাহারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে** (**يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ**) এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। তুমি সর্বদা *উহাদের অল্পসংক্ষক* ব্যতিত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিতে পাইবে, সুতরাং, উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়নদিগকে ভালোবাসেন।

অবিশ্বাসী ইহুদী, অংগীকার ভেঙ্গে ফেলার কারণে তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছে, “তাহারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে” আর “তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে” তারা তাদের শরিয়তের একটি অংশ (উদ্দেশ্য) ভুলে গিয়েছে।

এই আয়াতটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এই আয়াতের অর্থ মনে হতে পারে যে, দিয়ে কিছু কিছু আয়াত পরিবর্তন করা আর অন্যান্য আয়াত সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলার জন্য তাদের কিতাবের অংশবিশেষ ইহুদীরা একটি ছুরি দিয়ে কেটে ফেলেছে। কিন্তু ওপরের ঘ এবং ঙ অংশে ও নিম্নে জ৬এ বর্ণিত আয়াতগুলোতে তৌরাত সম্পর্কে কোরআন বলেছে, তৌরাত ইহুদীদের **কাছে** আছে, তারা তা **অধ্যয়ন** করে আর এই কিতাবের মধ্যে আল্লাহ্‌র হুকুম **আছে।**

সুতরাং, এই আয়াতের একটিই অর্থ হচ্ছে, ইহুদীরা কিছু কিছু আয়াত আড়াল করে রেখেছে। আর অন্যান্য আয়াতগুলো প্রসঙ্গের বাইরে থেকে বলেছে। উদাহরণ হিসেবে পাথর মারার আয়াতের কথা বলা যায়, আরবীতে এই ধরণের পরিবর্তনকে বলা হয়, "আল-তাহ্‌রীফ আল-মা'নাওয়ী" (**التَّحْرِيف المَعْنَوِي**) অর্থাৎ "অর্থের পরিবর্তন" ।[১২]

এখানে এই বাক্যাংশের প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন, "তাদের মধ্যে *অল্পসংক্ষক."* / তাহলে দেখা যায় যে, কিতাবীদের মধ্যে খুবই পরহেজগার, অবিচলিত বিশ্বাসী একদল লোকও ছিলেন, তাঁরা বিশ্বাস করতেন, কোরআন এই দলের লোকদের সম্পর্কে নিচের আয়াতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা কখনই তাঁদের তওরাতের কোনো আয়াত বা এর অর্থের কোনো পরিবর্তন করেননি।

জ৩. সূরা আলি-'ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:১১৩-১১৪, ২-৩ হিজরী

> তাহারা সকলে একরকম নহে। *কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে;* তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। তাহারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎ কর্মের নিষেধ করে এবং তাহারা কল্যানকর কাজে প্রতিযোগিতা করে, তাহারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

> পরবর্তী ৩টি আয়াতে আমি বিশ্বাস করি যে, কোরআন অল্পসংক্ষক ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা কেবল তাদের তওরাতের আয়াত পরিবর্তন করেনি, এমনকি তারা হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন বা ব্যাখ্যা করতেন তাঁর কথাকেও তারা বিকৃত করে বা ঘুড়িয়ে-পেঁচিয়ে বলেছে।

জ৪. সূরা বাকারা (গাভী) ২:৭৫-৭৯, ২ হিজরী

> তোমরা (হে মুমিনেরা) এই আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে- *যখন তাহাদের একদল* (ফারীক্ব **فَرِيق**) আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে অতঃপর **তাহারা উহা বিকৃত করে** (**يُحَرِّفُوبَهُ**), অথচ তাহারা জানে না। "তাহারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সহিত মিলিত হয় তখন বলে,' আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দাও? ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে; তোমরা

[১২] প্রকৃত শব্দের পরিবর্তনকে আল-তাহরিফ আল-লফজি (**التَّحْرِيف اللَفْظِي**) বলা হয়।

কি অনুধাবন কর না?' "তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাহা জানে। "তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতিত কিতাব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে। "সুতরাং, তাহাদের জন্য যাহারা নিজহাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে,' ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে, তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

অল্পসংক্ষক ইহুদী (সব ইহুদী) **কোরআন** শুনে আর মুসলমানদের নিকটে গিয়ে বলে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি', তারপরে তারা কীভাবে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) - এর কাছ থেকে ব্যাখ্যা জানার পরে কীভাবে তারা তাঁর কথা বিকৃত করে, তা আমরা সূরা নিসার পরবর্তী আয়াতসমূহে দেখতে পাবো। কিন্তু তারা একজন আরেকজনকে তীব্রভাবে তিরষ্কার করে বলে যে, "কেন তুমি তাদের কাছে তওরাতের আসল আয়াত বলে দিয়েছ?" পরবর্তী সময়ে তারা এই আয়াত তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।"

জ৫. সূরা নিসা (নারী) ৪:৪৪-৪৭, ৫-৬ হিজরী

"তুমি কি তাহাদিগকে দেখো নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও- **ইহুদীদের মধ্যে কতকলোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে (يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)**এবং বলে 'শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম'; এবং শোন না শোনার মতো; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বলে,'রাইনা', কিন্তু তাহারা যদি বলিত, 'শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম' এবং 'শ্রবণ কর ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর.' তবেই উহা তাহাদের জন্য ভালো ও সংগত হইত কিন্তু তাহাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে লানত করিয়াছেন। **তাহাদের অল সংখ্যকই বিশ্বাস করে**। ওহে তাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, **তোমাদের নিকট যাহা আছে (তৌরাত) তাহার সমর্থক রূপে** আমি যাহা অবর্তী করিয়াছি (কোরআন) তাহাতে তোমরা ঈমান আন, আমি মুখমন্ডলসমূহ বিকৃতি করিয়া অতঃপর সেইগুলোকে পেছনের দিকে ফিরাইয়া দেওয়ার পূর্বে— ।"

আগের অনুচ্ছেদের মতোই অভিযোগ করা হয়েছে, "সেই সব (কতক লোক) ইহুদীদের বিরুদ্ধে" কথাগুলো বিকৃত করে "কিন্তু এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে- সে হযরত মোহাম্মদের কথাকে বিকৃত করে বলেছে। মৌলানা ইউসুফ আলী তাঁর তফসিরে লিখেছেন,

"ইহুদীদের চালাকী হলো, যে শব্দ বা ব্যাখ্যা তারা বলছে, তা তারা বিকৃত করে বলে, একইভাবে তারা ঈমান সম্পর্কে পরম গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষা আছে তাও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলে। যেখানে তাদের বলা উচিত, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম ', সেখানে তারা জোরে জোরে বলে, 'আমরা শুনলাম 'আর ফিস-ফিস করে তারা বলে 'আমরা মানি না'। যখানে তাদের শ্রদ্ধার সাথে বলা উচিত, 'আমরা শুনলাম 'সেখানে অন্য লোকদেরকে তারা ধাঁধাঁয় ফেলে ফিসফিস করে বলে যে,' শোন না শোনার মতো'। যেখানে শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়, তারা এই

সময়ে দ্ব্যর্থক শব্দ বলে, যে মনে হয়, তারা খারাপ কিছু বলেনি, কিন্তু তাদের মনে খারাপ মনোভাব নিয়েই তারা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেই কথাটি বলে। আরবীতে যখন শ্রদ্ধার সাথে' রায়না' শব্দটি বলা হয়, তখন এর অর্থ হচ্ছে, 'দয়া করে আমার কথা শুনুন' (অথবা 'দয়া করে আমার দিকে তাকান'), কিন্তু তাদের জিহ্বা ঘুড়িয়ে তারা অপমান করার মনোভাব নিয়ে বলে, যেমন' তুমি আমাদের চারণভূমিতে নিয়ে যাও' অথবা হিব্রু ভাষায় বলা হয় যে, 'আমাদের খারাপ লোক।'"

জ৬. সূরা মায়িদা (অন্নপাত্র) ৫:৪১-৫১, ১০ হিজরী

হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় তাহারা কুফরীর দিকে দ্রত ধাবিত হয়- যাহারা মুখে বলে, 'ঈমান আনয়ণ করিয়াছি' অথচ তাহাদের অন্তর ঈমান আনে না এবং ইহুদীদের মধ্যে যাহারা অসত্য শ্রবনে তৎপর, তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে কাপ পাতিয়া **থাকে। শব্দগুলো যথাযথ সুবিনস্ত থাকার পরও তাহারা সেইগুলোর অর্থ বিকৃত করে।** (**يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ**)

তাহারা বলে,' এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা না দিলে বর্জন করিও।' — তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা করো, তবে তাহারা তোমার কোনো ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার যদি বিচার নিষ্পত্তি করো, তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিও; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়নদিগকে ভালোবাসেন। **তাহারা (ইহুদী) তোমার (মুহাম্মদ) ওপর** কীভাবে **বিচার ন্যাস্ত করিবে। অথচ তাহাদের নিকট রহিয়াছে তৌরাত যাহাতে আল্লাহ্র আদেশ আছে**। ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা মু'মিন নহে। **নিশ্চয়ই আমি তৌরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, উহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো**; নবীগণ যাহারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তাহারা ইহুদিদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত, রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল। এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং, (হে ইহুদীরা) মানুষকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।

আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম, অতঃপর কেহ উহা **ক্ষমা** করিলে **উহাতে** তাহারই পাপমোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।

"মরিয়ম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার **পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরুপে, যাহা তাহাদের কাছে আছে (তাদের সামনে)** এবং **মুত্তাকীদের জন্য** পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইঞ্জিল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথের **নির্দেশ ও আলো**।

ইঞ্জিল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই ফাসিক।

আমি তোমার (মুহাম্মদ) প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, **ইহার পূর্বে অবতীর্ন কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে, যাহা তাহাদের কাছে (তাহাদের সামনে) আছে।** সুতরাং, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়াত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং, সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন।

এই শেষের অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা হয়েছে। অল্প সংক্ষক "ইহুদী", যারা যে কোনো মিথ্যে কথা - শুনবে, এমনকি এমন লোকদের নিকট থেকে হজরত মুহাম্মদ এর কথা উদ্ধৃত করবে, যারা কেউ তার কথা কখনও শুনেনি- "তারা কথা বিকৃত করবে। "তারা বলবে, "যদি হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তোমাদের এই এই কাজ করতে বলে, তোমরা তা করবে, যদি না করো, তবে তোমরা সাবধান।" হজরত মোহাম্মদের ব্যাখ্যা পরিবর্তন করা হয়েছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তারা তাদের তৌরাত পরিবর্তন করেনি।

অবশ্য, এমনকি এই আয়াতের ব্যাখা আমার ভুলও যদি হয়, কিন্তু এই শেষের তিনটি আয়াত 'আল-তহরিফ আল-মানাউয়ি' বা অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছে যে, কোথায় ইহুদীরা তাদের নিজস্ব পাককিতাবের অর্থ পরিবর্তন করেছে। এই আয়াতগুলোর প্রসঙ্গ খুব স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত সত্যগুলো তুলে ধরে।

১. কিছু কিছু লোক? অনেক লোক? সম্ভবতঃ হতে পারে বহুসংখ্যক? ইহুদীরা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু কিছু **কিছু লোক আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছিল, আর তারা আল্লাহ্র ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করতে চেয়েছিল।**

২. কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তওরাতের **মধ্যে সত্য রয়েছে, আর এই তৌরাত তাদের সাথে রয়েছে।**

৩. আল্লাহ্ বলেছেন যে, ইহুদীদের কাছে তৌরাত আছে, যে **কিতাবের মধ্যে আল্লাহ্র হুকুম আছে।**

৪. তৌরাত কিতাব (হিজরত সিপারা) থেকে সরাসরি আয়াতে তুলে ধরে বলা হয়েছে, "প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ" এগুলো হচ্ছে বৈধ আইন। আর যদি না তারা ক্ষমা করে, তবে ইহুদীদের বিচারের সময়ে এই আইনের ওপর ভিত্তি করে, বিচার করতে বলা হয়েছে।

৫. ইঞ্জিল শরীফের অনুসারীদের বলা হয়েছে, **আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারে যেন তারা বিচার করে।**

আমরা এই আয়াতগুলি থেকে যা বিশেষভাবে "তহরিফ" সম্পর্কে বলে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, -সেই আয়াতগুলো যে, হজরত মোহাম্মদের সময়ে অনেক অবিচলীত, ধার্মিক ইহুদী ও খ্রীষ্টান ছিল, যাদের কাছে নির্ভুল তৌরাত ও ইঞ্জিল ছিল, তাঁরা এই পাক-কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতো, আর এই পাক-কিতাবগুলোতে দেওয়া আল্লাহ্র হুকুমগুলো নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করতেন।

উপসংহার

আমরা তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফ ও আহলে কিতাবীদের সম্পর্কে কোরআন কী বলে, এই সম্পর্কে বিভিন্ন অংশে বর্ণিত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতে পারি,

গ্রুপ ক. হজরত ইয়াহ্য়া, হজরত মরিয়ম, ঈসা মসীহ্ ও তাঁর সাহাবীদের কাছে নির্ভুল তৌরাত ছিল।

গ্রুপ খ. কোরআন এই কথা স্বীকার করেছে যে, ৩০০-৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সন্নাসবাদের শুরুতে বিশ্বস্ত ধার্মিক খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরা ছিলেন। এই তথ্য থেকে এই কথা সঠিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে, এই সব বিশ্বস্ত ধার্মিক বিশ্বাসীরা তাঁদের কাছে থাকা নিজেদের পাক-কিতাব পরিবর্তন করেননি। এই কাজ করলে কোরআন তাদের ভণ্ড বিশ্বাসী বলতো।

গ্রুপ গ. কোরআন তার আগের কিতাবের সমর্থক, যা "তাদের নিকটে ছিল", "তাদের সামনে ছিল", "তাদের চোখের সামনে" ছিল। এই পাক-কিতাবগুলো মক্কার লোকদের **কাছে** ছিল। কিন্তু আরবী কোরআন তাদের জন্য এই কারণে দরকার ছিল যে, মক্কাবাসীরা আগের কিতাব যা অন্যভাষায় লেখা ছিল, তা বুঝতে পারতো না।

গ্রুপ ঘ. কোরআনের শিক্ষা অনুসারে, আল্লাহ, অথবা হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র হুকুমমতো ২০ বারেরও বেশী তৌরাত ও ইঞ্জিল অনুসারে বিচার মিমাংসা করার কথা্া করেছেন। কোরআন শরীফে হজরত দাউদের জবুর শরীফও তৌরাত থেকে আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) একটি বিরোধের মিমাংসা করার জন্য তৌরাত আনার জন্য ইহুদীদের অনুরোধ করেছেন। লোকেরা তাদের **কাছে থাকা** তৌরাত ও ইঞ্জিল **অধ্যয়ন** করতো।

গ্রুপ ঙ. খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ ছিল, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যদিও তারা তাদের কিতাবের কিছু অংশ ভুলে গিয়েছিল, তবু কোরআনে এমন কোনো আয়াত নেই, যে আয়াত বলে যে, তৌরাত, জবুর শরীফ বা ইঞ্জিল শরীফের কোনো আয়াত পরিবর্তন করা হয়েছে, রদবদল করা হয়েছে, বা বিকৃত হয়েছে।

গ্রুপ চ ও গ্রুপ ছ দেখা যায় যে, কিছু কিছু ইহুদী "আল-তাহ্রীফ আল-মা'নাওয়ী" বা অর্থের পরিবর্তনে দায়ে দোষী। কারণ, এভাবে তারা তাদের কিতাবের সত্যকে গোপন করেছিল। যে আয়াতগুলো তাদের পক্ষে কথা বলে না, যেগুলো তাদের যুক্তি সমর্থন করে না, সেগুলো তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারা কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কোরআন সম্পর্কে মিথ্যে দোষারোপ করেছে, আল্লাহ্র নিদর্শণকে স্বল্পমুল্যে বিক্রি করেছে, তাহরিফের বিষয়ে তাদেরকে দু'বার দোষী করা যায়, কারণ তারা হজরত মোহাম্মদের ব্যাখ্যাকেও পরিবর্তন করার দায়ে দোষী। কিন্তু এগুলো সত্ত্বেও এমন একটি আয়াত পাওয়া যায় না, যেখানে দেখা যায় যে, এসব অবিশ্বাসী ইহুদীরা তাদের নিজেদের কিতাব তওরাতের লিখিত আয়াত পরিবর্তন করেছিল। আর অবশ্যই এই কথা সত্যি যে, বিশ্বাসী ইহুদীরা নিজেরা তো পাককিতাবের আয়াত পরিবর্তন করেননি, এমনকি অন্যদেরও আয়াত পরিবর্তন করতে দেননি।

সূরা আন-আমের (গবাদি পশু) ৬:৩৪ বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না," আর অন্যদিকে সূরা ইউনুসে (নবীর নাম) ১০:৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই।"

কোরআন সম্পর্কে গবেষণা করে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খাঁটি তৌরাত ও ইঞ্জিলের অনুলিপি হজরত মোহাম্মদের সময়ে মক্কা ও মদিনায় ছিল। এছাড়াও বলা যায় যে, কোনো মুসলমান আজ পর্যন্ত বিখ্যাত কোনো প্রাচীন লাইব্রেরী থেকে অথবা পুরানো পাণ্ডুলিপি থেকে আলাদা কোনো তৌরাত বা ইঞ্জিল নিয়ে এসে দেখাতে পারেননি। এমনকি পুরাতত্ত্বীয় আবিষ্কারও পাককিতাবের এমন কোনো পরিবর্তিত বা বিকৃত আয়াত আমাদের দেখাতে পারেনি, যা আজকে আমাদের কাছে থাকা তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফের আয়াত থেকে আলাদা। তাই **আমি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সময়ে মক্কা ও মদিনা নগরীতে যেসব তৌরাত ও ইঞ্জিল পাওয়া যেত, তা আজকে আমরা যে তৌরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করি, তা একই পাক-কিতাব, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদিস ও সুন্নাহ

আগের অধ্যায়ে তৌরাত ও ইঞ্জিলের নির্ভুলতা সম্পর্কে কোরআনের সাক্ষি পরীক্ষা করে দেখেছি। আমাদের সেই পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। কারণ, আমরা জানি যে, মুসলমানদের বিশ্বাসের আরেকটি উৎস হচ্ছে **হাদিস।**

হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে, ভাষণ বা কথা বা আলোচনা। কিন্তু ইসলামী ধর্মতত্ত্বের মতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কথা, কাজ যা তারা সাহাবীরা উল্লেখ করেছেন, তাকেই হাদিস বলে। এই হাদিসগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ নিজেই কথা বলেছেন। আর **হাদিসে নবীতে** মুহাম্মদ (দঃ) এর কথা, রীতিনীতি ও কাজের ওপর ভিত্তি করে (সুন্নাহ) লিখা হয়েছে।

এক সময়ে হাদিস ও সুন্নাহকে প্রায় একই সমার্থক শব্দ বলে ধরা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সুন্নাহ শব্দটি বলতে একটি বিশেষ ধর্মীয় শব্দ বুঝানো হয়ে থাকে। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর কথা ও কাজ, বিশ্বাসীদের রুহানি নৈতিক উন্নতির জন্য একটি আইনগত বৈধতার অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসেবে সুন্নাহ ব্যবহার হতে থাকে। এভাবে এটি কোরআনে দেয়া আইনের পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য বৈধ ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎসে পরিণত হয়। নিচের গল্পটি এর গুরুত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

আমি কিছু সময় তিউনিসিয়ায় ছিলাম। এই সময়ে আমি একজন মুয়াদ্দিবের সাথে সাক্ষাৎ করি। মুয়াদ্দিবের কাজ হচ্ছে, তিনি মৃতের কবরের পাশে কোরআন পাঠ করেন, এছাড়াও তিনি মৃতলোকের জন্য শোক করার সময়ে মৃতের আত্মীয়-স্বজনকেও সাহায্য করেন। যদিও সেই লোকটির পরনে ময়লা পোষাক ছিল, কিন্তু তিনি অনেক কিছুই জানতেন। তিনি যে কেবল তার নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানতেন তাই নয়, ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও তিনি অনেক বিষয় জানতেন- তিনি অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির সাথে আব্রাহাম লিংকনের উদ্ধৃতিও বলতে পারতেন।

আমরা যখন কথা বলছিলাম, আমাদের আলোচনা ধীরে ধীরে ধর্মের দিকে চলে গেল। ইসলাম নিয়ে কথা বলার সময়ে তিনি মন্তব্য করলেন,

> "আমাদের ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে, **কোরআন** ৫০% ও **হাদিস** ৫০% ।"

হাদিসের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, সমপ্রতি একটি খবরে জানা গেছে, ২০০০০০ কোরআন ও হাদিস উরুগুয়ে ভাষায় এখন চীন দেশে ছাপা হচ্ছে। আমরা আশা করছি যে, নাস্তিক কমুনিষ্ট ও রেডগার্ডদের নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানরা আবার কোরআন ছাপাতে চাচ্ছেন, যেভাবে চৈনিক খ্রীষ্টানরা কিতাবুল মোকাদ্দস ছাপাচ্ছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে,

এর পাশাপাশি তারা হাদিসের[১] আরও অনেক কিতাব (এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদিস সংগ্রাহক ঈমাম আল-বোখারীর বোখারী শরীফের পাশাপাশি ঈমাম মুসলিম (ইনি হাদিস সংগ্রাহকদের মধ্যে সেরা একজন) শরীফ ছাপাতে চাচ্ছেন।

আলোচনার সময়ে মুসলমানরা কোনো মতবাদ প্রমাণের জন্য কোরআনের পাশাপাশি তারা হাদিসেরও উল্লেখ করেন। একজন বন্ধু আমাকে বিষয়টি এ'ভাবে বলেছেন, "কোরআনে মৌলিক বিষয়গুলো রয়েছে। কোরআনে স্পষ্ট করে যে বিষয়গুলো বলা হয়নি, কোরআনের সেই বিষয়গুলো হাদিস শরীফে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

কোরআন ও নবীর হাদিস[২] বইয়ের সংকলক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, "কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম- যা হযরত মোহাম্মদের ওপর নাজিল হয়েছে, হাদিস হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর কথা ও কাজ এবং অনুমোদন, এই দুটোই হচ্ছে ইসলামের উৎস, এই দুই ধরনের কিতাব ছাড়া ইসলাম ধর্মের জ্ঞান বুঝা অসম্ভব।

কাব্যিকভাবে, অবশ্যই হাদিসকে আয়াত হিসেবে বলা খুব সুন্দর মনে হবে। আর প্রতিটি মুমিনের তাই করা উচিত, তবে হাদিসকে আয়াত হিসেবে ধরে নিলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে হাদিসের সীমাবদ্ধতা আছে, আর এই সীমাবদ্ধতা হচ্ছে প্রত্যেকেরই হাদিসে উল্লেখিত বিষয়ের সাথে একমত হতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। এই মুহুর্তে আলাদা একটি খুবই জটিল সমস্যার কথা আমরা আলোচনা করবো, আর তাহলো কীভাবে জানা যায় যে, **কোন হাদিসগুলো প্রকৃত প্রামাণিক বা সহি আর কোনগুলো প্রামাণিক বা সহি নয়।**

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সম্পর্কে অনেক বছর ধরে অনেক কথা হাদিসের নামে বলা হয়েছে। এক সময়ে লোকেরা বুঝতে শুরু করলো যে, সব হাদিস প্রামাণিক বা সহি নয়; সুতরাং, তারা বিশেষভাবে পুরানো হাদিসগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে ও গবেষণা করতে শুরু করলো। কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব ই, কে আহম্মদ কুট্টি, ঈমাম বোখারীর সংগৃহিত হাদিসগুলো সম্পর্কে বলেন,

> "তিনি ৬০০০০ হাদিস বিচার-বিবেচনা করে, শেষ পর্যন্ত ৭৩৯৭টি হাদিস গ্রহণ করেন, বিভিন্ন অধ্যায়ে একই হাদিস প্রায়ই বারবার বলা হয়েছে। এই পুনরুল্লেখ করা হাদিসগুলো বাদ দিলে নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র হাদিসের সংখ্যা কমে দাঁড়াবে মাত্র ২৭৬২।[৩]

এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেবল ৩০০০ বা ৪০০০ হাদিসকে প্রামাণিক বা সহি হাদিস বলা যায়; অন্য হাদিসগুলো হচ্ছে যইফ বা দুর্বল হাদিস। এগুলোকে খ্রীষ্টানদের এপোক্রিফার মতো বলা যায়।

---

[১] যখন একটি বা কয়েকটি হাদিসের কথা বলা হয়, তখন বাংলা বা ইংরেজী ভাষার মতোই একবচন বা বহুবচন ব্যবহার করা হয়। আর যখন সবগুলো হাদিসের কতা বলা হয়, তখন সমষ্টিবাচক বিশেষ্য হিসেবে শুধু হাদিস বলে উল্লেখ করা হয়।

[২] কোরানটি হাদিস অব আল-নবিয়ী, সাদ এডিশন, তিউনিস, ১৯৮০

[৩] "The Six Authentic Books of Hadith," *World Muslim League Journal*, April-May 1983, p 20.

জাল হাদিসগুলো কেন লেখা হয়েছিল? আমি মনে করি, ইসলাম ও হজরত মুহাম্মদ-এর গৌরব বৃদ্ধির জন্য অথবা কোনো লোক তাঁর নিজস্ব প্রিয় মতবাদকে সমর্থন করার জন্য তা লিখেছেন। *"ইসলাম"* নামক বইয়ে জনাব ফজলুর রহমান নিম্নের উদাহরণটি উল্লেখ করেছেন,

> সুফি সমপ্রদায়ের সাথে গোত্রগত আন্তঃবিভক্তি দেখা দিল—একদিকে এবং অন্যদিকে বিকাশমান গোঁড়া মতবাদ এই দুইয়ের সংঘাতে নতুন এক ধরনের হাদিসগুলো দেখা যাচ্ছিল। সুফীরা তাঁদের মতবাদ সঠিক তা বুঝানোর জন্য নিজেরা সেগুলো আবিষ্কার (মৌখিক আবিষ্কার) করেছেন, মন্তব্য করেছেন, কখনো কখনো একবারে খেয়ালখুশি মতো আবার কখনও কখনও বা **ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ কাল্পনিক**। অথচ এ হাদিসগুলো সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন যে, নবী নিজেই এ হাদিসগুলো বলেছেন।[8]

কিন্তু কেবল সুফীরাই নয়, ৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি এসব জাল হাদিস সম্পর্কে নবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে,

> "যদি সেই সব হাদিসে কোনো ভালো কথা থাকে, তবে মনে করবে যে, আমিই সেগুলো বলেছি।"

জনাব রহমান আরো বলেছেন,

> "অন্য কোনো অনুমান ছাড়া এর সাহায্যেই আমরা এই সত্য ব্যাখ্যা করতে পারি যে, **নবীর পরবর্তীকালে** -মানুষের স্বাধীনZv, স্বর্গীয় গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে ধর্মতত্ত্বীয় **দৃষ্টিভংগীর যে স্পষ্ট উন্নয়ন** হয়েছে- তা মৌখিকভাবে নবীর ওপরেই আরোপিত হয়েছিল।"

খূঁত ধরার জন্য এই প্রশ্ন তবু করা যায় যে, "কোন কোন হাদিসগুলো সহি?"

কাওকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, কীভাবে তিনি জানেন যে, কোন কোন হাদিসগুলো সহি? এক লোক বলেন যে, "যেগুলো আমার কাছে অর্থবোধক বলে মনে হবে, সেগুলো সহি হাদিস। "আর তাহলে দেখা যায় যে, প্রতিটি হাদিসকে সত্য বলে ধরে নেওয়ার মাপকাঠি থাকবে। আরেকজন লোক, এক স্কুল শক্ষক বলেন যে, "দশ বছর ধরে এই একই প্রশ্ন আমি নিজেকে করে আসছি, আর আমি এখন পর্যন্ত এর কোনো উত্তর জানি না। "অন্য মুসলমানরা এ'ভাবে এই ধাঁধার সমাধান করেছেন যে, হাদিসকে তাঁরা আল্লাহ্‌র ওহী বলে স্বীকার করেন না।

এখানে কিন্তু কিছু সমস্যা রয়ে যায়। ধর্মীয় নেতারা ও বক্তারা সব সময়ে জাল হাদিস তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করেন। ঈমাম আল-নাওবী হিজরী ৭ম শতাব্দীতে বা চতুর্দশ খৃস্টাব্দে *৪০টি হাদিস* বাঁছাই করেন, আর ৪০টি হাদিস বাঁছাই করা ও মুখস্থ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি ভূমিকায় বলেন যে,

> আমাদের বলা হয়েছে, হজরত আলি ইবনে আবু তালিব, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ, হজরত মাআদ ইবনে জাবাল, হজরত আবু আল-দর্দা, হজরত ইবনে ওমর, হজরত ইবনে

---

[8] University of Chicago Press, Chicago, 2nd Ed., 1979, p 133-34.

আব্বাস, হজরত আনাস ইবনে মালিক, হজরত আবু হুরায়রা এবং হজরত আবু সাইদ আল-খুদরী (রাঃ) বিভিন্ন রাবির ধারাবাহিক বর্ণনার [৫] মধ্য দিয়ে ও বিভিন্ন লোকের বিবরণ অনুসারে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ বলেছেন,

> “ধর্মীয় কারণে বা আমাদের সমাজের মঙ্গলের জন্য যারা ৪০টি হাদিস হাদিস মুখস্থ করবে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তাঁদেরকে ধর্মীয় আলেম ও ইসলামী আলেম-ওলেমাদের সাথে একই মর্যাদায় একই সারিতে স্থান দিবেন।”
>
> আরেকটি অনুবাদে বলা হয়েছে যে, ‘আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তাঁকে একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, পরিপূর্ণ জ্ঞানী, ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে মুত্যুর পরে জীবিত করে তুলবেন।” আবু আল-দর্দা আরেকটি অনুবাদে বলেছেন,’ কেয়ামতের দিনে আমি তার জন্য একজন সাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।’ ইবনে মাসুদ তাঁর বইয়ে লিখেছেন, তাঁকে বলা হবে. “তুমি তোমার ইচ্ছামতো বেহেস্তের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।” সবশেষে, ইবনে ওমরের বর্ণনা অনুসারে ‘লেখা আছে, ‘সে ধর্মীয় শিক্ষকের মর্যাদা পাবে, আর তাকে শহীদদের সাথে জড়ো করা হবে।’”

আমরা যখন ওপরের এই সব কথা পড়ার পরে নিচের এই কথা পড়ি, তখন আমরা কত না বেশী আশ্চর্য হই! এখানে বলা হয়েছে,

> ‘অবশ্য, যদিও এখানে বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও কীভাবে তিনি এই হাদিস সংগ্রহ করেছেন, তা উল্লেখ করার পরও ধর্মীয় আলেম, বিশেষভাবে যারা মুহাদ্দিস-অভিজ্ঞ হাদিস শিক্ষক, তাঁরা বলেছেন যে এই হাদিস হচ্ছে একটি যইফ বা দুর্বল হাদিস।[৬] (অনুবাদ লেখক করেছেন)

তিনি আরো বলেছেন “যদিও আলেমরা একমত যে, একজন ভালো কাজের জন্য একটি **যইফ (দুর্বল বা সন্দেহজনক) হাদিসের** উল্লেখ করতে পারেন।” কিন্তু তিনি ঠিক করেছেন যে, কেবলমাত্র **প্রামাণিক সহি হাদিস** উল্লেখের সময়ে তিনি যেগুলো বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, তিনি কেবল সেই হাদিসগুলোর উল্লেখ করবেন।[৭]

আমরা যখন পড়ি যে, যইফ হাদিস সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যদিও তা এক লোকের কাছ থেকে অন্য লোকের কাছে বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে চলে এসেছে, আমরা এখন শেষে এই কথা বলতে পারি যে, অবশ্যই সাধারণ ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন একজন লোকের পক্ষে একটি হাদিস বিচার বিশ্লেষণ করে তা যইফ কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যখন দেখি যে, কোনো বিষয়ের ওপর যেখানে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করতে পারেন, তখন তা অবশ্যই একজন সাধারণ মুসলমানকে নিরুৎসাহিত করবে। দি এন্টিক্রাইস্ট-বিটুইন ট্রুথ এন্ড ফ্যান্টাসি নামক প্রবন্ধে আহম্মেদ আল-নাজ্জাসা [৮] তিনজন লেখকের কথা উল্লেখ

---

[৫] যখন একটি হাদিস মুখস্থ করা হয়, তখন সনদ বা হাদিসের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে রাবিদের নামও উল্লেখ করা হয়। ওপরের উদ্ধৃতিতে লেখক কেবলমাত্র মূল আয়াত উল্লেখ করেছেন। আর তিনি ধারাবাহিকভাবে রাবিদের নাম উল্লেখ করেননি।

[৬] An-Nawawi, ওপরে উল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা-৮-১০

[৭] ওপরে উল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা-১১-১৪

[৮] দেখুন ম্যাগাজিন *Manar Al-Islam,* Jan-Feb 1981, p 109-112.

করেছেন, যাঁরা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত দাজ্জাল সম্পর্কে লিখেছেন, এদের মধ্যে দু'জনের উদ্ধৃতিতে লেখক কীভাবে একটি হাদিসকে সহি প্রমাণ করার জন্য, যে-মাণদন্ড ঠিক করে দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখ করা হলো,

"আব্দুর রাজ্জাক নাওফেল বলেছেন যে, কোরআনে দাজ্জালের কোনো উল্লেখ নেই, এরপর আরো কিছু আলোচনার পরে তিনি লিখেছেন যে, যেসব হাদিসে সন্দেহ রয়েছে সেগুলোর কোনো বৈধতা নেই বলে কেন তিনি মনে করেন, তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, "**কোরআন থেকে যে হাদিসগুলোর সমর্থন পাওয়া যায় না,** সেগুলো কীভাবে আমরা তুলে ধরতে পারি— ?"

পরবর্তী সময়ে একই প্রবন্ধে **তিনি** মুস্তাফা মাহমুদের কথা উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে,

"মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস দুটো উৎস থেকে লাভ করছেন: কোরআন ও সুন্নাহ, এদের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করেনি, কারণ, জোরালো সহি সুন্নাহর মর্যাদা ওহীর সমান।"

(তারপর তিনি কোরআনের সূরা নাজম (নক্ষত্র) ৫৩:৩-৪ আয়াত উদ্ধৃত করে তা

প্রমাণ করেন।) এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

"সে (মুহাম্মদ) মনগড়া কথাও বলে না; ইহা** তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৯]

সুতরাং, আমরা যখন **একটি সহি হাদিস খুঁজে পাই, তখন আমরা অবশ্যই তা গ্রহণ করবো, কোরআন থেকে তার প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক।** কিন্তু একটি সহি হাদিস যদি কোরআনের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে, তাহলে তা অন্য বিষয়— আর তাহলে হাদিসের ভাষ্য বা টিকার ব্যাখ্যার দরকার পড়বে এর একটির ওপরে আরেকটির পূর্ববর্তিতার ওপর আলোচনা করতে হবে— ।"

আর এজন্যই আমরা দেখি যে, আরেকজন হাদিস বিষেশজ্ঞ, জনাব নাওফেল বলেছেন, হাদিসের সমর্থন কোরআন থেকে থাকতে হবে, দ্বিতীয়টিতে মাহমুদ বলেছেন, এর কোনো প্রয়োজন নেই: রাসূল যা-কিছু করেছেন বা বলেছেন তা ওহী অনুসারেই বলেছেন, তা কোরআনের আয়াত হোক বা হাদিস হোক। এখানে একটি সম্ভাবনা থাকে যে, একটি জোরালো হাদিস যা খুব ভালোভাবে প্রত্যয়ন করা হয়েছে, তা কোরআনের সাথে বিরোধপূর্ণ হলে তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

কতগুলো সহি হাদিস আছে, যেগুলো সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, এগুলো সত্য। কমপক্ষে একটি হাদিস আছে যা কিতাবুল মোকাদ্দসকে সমর্থন করে যা আমরা এই অধ্যায়ের শেষে দেখবো। জনাব হামিদুল্লাহ প্রমাণের কারণে বিশ্বাস করেছেন যে, ঈমাম আল-বোখারীর সংগৃহিত হাদিস সহি, তিনি তাঁর অনুদিত কোরআনের ভূমিকায় লিখেছেন,

"মনে করুন, ঈমাম আল-বোখারী বলেছেন, "আমি আহম্মদ ইবনে হাম্বালের কাছে শুনেছি যে, যিনি আব্দুর রাজ্জাকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, তিনি মামরের কাছ থেকে, তিনি হাম্মামের

---

[৯] আমার কাছে মনে হয়েছে "ইহা" যা ** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, ইহা বলতে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। প্রসঙ্গ (১০ আয়াত) থেকে মনে হয়,যাহা তিনি তাঁহার বান্দার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, একথা বলতে হাদিস বুঝানো হয়েঝে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না

কাছ থেকে পেয়েছেন, তিনি হজরত আবু হোরায়রার কাছে শুনেছেন যে নবী এই এই কথা বলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হাম্মাম, মামর ও আব্দুর রাজ্জাকের অনুলিপি পাওয়া যায়। (যদিও তিনি এই সব অনুলিপি পাওয়ার তারিখ উল্লেখ করেননি) বহুদিন ধরেই ঈমাম আহম্মদের বই সবার কাছে পরিচিত। এভাবে, ঈমাম আল-বোখারীর পূর্বে উৎসগুলোর সন্ধান করে আমরা দেখি যে, তিনি মিথ্যে বলেননি, বা তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত কোনো লোককথা সংগ্রহ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর বইয়ের জন্য প্রামাণিক লিখিত উৎসের ওপর নির্ভর করেছেন।[১০]

কিন্তু, হাদিসের পক্ষে হামিদুল্লাহর সমর্থন সত্ত্বেও, তবু প্রতিটি মুসলমানের জন্য অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। তাছাড়া এর প্রভাব খ্রীষ্টধর্মের ওপর গিয়েও পড়েছে।

সুখবর সিপারাগুলো কি হাদিস?

হজরত মথি, হজরত মার্ক, হজরত ইউহোন্না লিখিত ইঞ্জিল শরীফ তাঁরা যখন পড়েন, তখন কখনো কখনো মুসলমানরা অভিযোগ করে বলেন যে, "**এই সব বিবরণ কেবলমাত্র হাদিস**। এগুলো কোরআনের মতো নয়।" আমি তাদের এই কথা শুনে বুঝি যে, তাঁদের কাছে কোরআন হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নাজিল করা শরিয়ত। এর মাধ্যমে তারা কীভাবে জীবনযাপন করবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে হাদিস হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলি- বিশেষভাবে যেসব ঘটনা ব্যাখ্যা করে যে কেন, কোন পরিস্থিতিতে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসও কোরআনের মতো হওয়া উচিত। আর যখনি তাঁরা দেখেন যে, সুখবর সিপারার অনেকাংশ জুড়েই কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে, তখন তাঁরা বলেন যে, **এগুলো আসলে হাদিস**। এর সাথে তাঁরা অনুমান করে বলেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র আসল কালাম নয়, অথবা এগুলো কিছুটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্মমাণের লেখা।

উদাহরণ হিসবে বলা যায় আমরা লূক লিখিত সুখবর থেকে ৮:১৯-২১ আয়াত পাঠ করবো। এখানে লেখা আছে,

> "পরে ঈসার মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন কিন্তু ভীড়ের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। তখন একজন লোক তাঁকে বললো, "আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সাথে দেখা করার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

এতে ঈসা লোকদের **বললেন, "যারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে সে'মতো কাজ করে তারাই আমার মা ও আমার ভাই।"**

আমি যেভাবে বুঝেছি, মুসলমানরা চান যে, সুখবরের ঈসা মসীহের বলা কথাগুলো অংশটুকু গাঢ় অক্ষরে লেখা থাকবে, যা ঈসা মসীহের কাছে নাজিল হওয়া আল্লাহ্‌র কালাম বলে গণ্য হবে। আর

[১০] হামিদুল্লাহ, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা xiii

অন্য একটি আলাদা কিতাবে হাদিস হিসেবে আল্লাহ্‌র কালাম নাজিল হওয়ার কারণ এভাবে উল্লেখ করা হবে,

"ঈসা মসীহের বৈপিত্রেয় ভাই, হযরত ইয়াকুব বর্ণনা করেছেন, লূক ৮:২১ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ এই-

আমার মা, ভাই ও আমি নিজে ঈসাকে দেখতে গেলাম; কিন্তু জনতার ভিড়ের কারণে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারলাম না, কেউ একজন হজরত ঈসাকে বললো, "আপনার মা, ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরা আপনার সাথে দেখা করতে চায়,

তখন এই আয়াত নাজিল হলো, **"যারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে সেইমতো কাজ করে তারাই আমার মা ও আমার ভাই।"**

এই হাদিসটি লূক ও মার্ক তাঁদের কিতাবে (মথি ও ইউহোন্নার সাথে একত্রে) যা সংগৃহিত হাদিসগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। (বাঁকা অক্ষরে লেখাগুলো আমি সাজিয়েছি বা আমি যোগ করেছি)

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে খাবারের বিষয়ে মার্ক ৭:১৫ আয়াতে উল্লেখিত ঈসা মসীহের হুকুমটি আমি উল্লেখ করতে পারি। যেখানে তিনি বলেছেন,

'বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে যায়, তা মানুষকে নাপাক করতে পারে না, বরং মানুষের মধ্য থেকে যা বের হয়ে আসে, তা-ই মানুষকে নাপাক করে।"

একে আমরা কোরআনের মতো আয়াত বলে বিবেচনা করতে পারি। অন্য একটি কিতাবে হাদিস হিসেবে আমরা দেখতে পারি,

ঈসা মসীহের ঘনিষ্ট সাহাবীদের একজন হযরত পিতর বর্ণনা করেছেন, খাবারের বিষয়ে হজরত ঈসা মসীহের শিক্ষা মার্ক ৭:১৫ ও ২-২৩ আয়াতে দেখতে পাই। আর এই আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার কারণ এই:

ফরীসী ও আলেমরা জেরুসালেম থেকে এসে দেখেন যে আমাদের কেউ কেউ নাপাক অবস্থায়- অর্থাৎ মুরুব্বীদের দেওয়া যে নিয়ম পুরানো দিন থেকে চলে আসছে, সেই নিয়ম না মেনে- তারা হাত না ধুয়ে খাচ্ছে।

তাই ফরীসী ও আলেমরা যাঁরা জেরুসালেম থেকে এসেছিলেন, তাঁরা ঈসা মসীহের কাছে জানতে চাইলেন, "কেন আপনার উম্মতেরা পুরানো দিনের মুরুব্বীদের দেওয়া নিয়ম পালন করার পরিবর্তে নাপাক অবস্থায় - হাত না ধুয়ে খাচ্ছে?—"

আবারও ঈসা মসীহ্‌ লোকদেরকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "আপনারা সবাই আমার কথা শুনুন ও বুঝুন। **'বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যা যায়, তা মানুষকে নাপাক করতে পারে না, বরং মানুষের মধ্য থেকে যা বের হয়ে আসে, তা-ই মানুষকে নাপাক করে।"**

তারপর, তিনি লোকদেরকে ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর সাথে সেই ঘরে গেলাম। আর আমরা তাঁর কাছে এই মেসালটির অর্থ জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, "তোমরা কি এতোই অবুঝ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "তোমরা কি বোঝ না যে, বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে যায় তা মানুষকে নাপাক করতে পারে না, বরং মানুষের মধ্য থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।"

অতঃপর তিনি সেই এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন। আর এইভাবে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিল: **বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে ঢুকে, তা তাকে 'নাপাক' করতে পারে না? কারণ, মানুষের ভিতর অর্থাৎ অন্তর থেকেই খারাপ চিন্তা, সমস্ত রকম ব্যাভিচার, চুরি, খুন, লোভ, অন্যের ক্ষতি করবার ইচ্ছা, ছলনা, লম্পটতা, হিংসা, নিন্দা, অহংকার এবং মূর্খতা বের হয়ে আসে। এই সব খারাপি মানুষের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে আর মানুষকে 'নাপাক' করে।"**

এই হাদিসটি হজরত মার্ক নিজেও বর্ণনা করেছেন, তিনি হজরত পিতরের কাছ থেকে শুনে লিখেছেন, হজরত মথিও তাঁর কিতাবে হাদিদসটি বর্ণনা করেছেন।

আবারও বলি, বাঁকা অক্ষরে লেখাগুলো আমি সাজিয়েছি বা আমি যোগ করেছি; কিন্তু আর সব কথাই মার্ক ৭:১-২, ৫, ১৪-২৩ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে।

সুতরাং, এই কথা সবার কাছে স্পষ্ট যে, যারা এটি পড়েছেন তারা জানেন যে, সুখবর কখনই মুসলমানদের প্রত্যাশার অনুরূপ নয়। যেহেতু এই উদাহরণগুলো দেখায় যে, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া ঈসা মসীহের কথা ও ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যামূলক বিবরণী একসাথে যোগ করা হয়েছে।

এই অবস্থা আমাকে দীর্ঘদিন ধাঁধায় ফেলে রেখেছে, আর আমি আসলে জানি না কীভাবে এর উত্তর দেব, কেউ যখন বলেন, "সুখবরে বর্ণিত এই বিবরণীগুলো কেবল হাদিস হিসেবে গণ্য করা যায়।" অধিকাংশ মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, হাদিস কখনো কোরআনের আয়াতের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। একজন ব্যক্তি যেভাবে বুঝে, কেবল সেভাবেই একটি হাদিসকে গ্রহণ বা বর্জন তিনি করতে পারেন। অন্যান্য মুসলমানরা মনে করেন, এই সমস্যার কারণে হাদিসকে ওহী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যেহেতু এই দু'টো দৃষ্টিভংগী কোনোটাই কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসের সাথে মিল নেই, তাই আমি তাঁদের কোনো দলের সাথেই একমত হয়ে বলতে পারি না যে, সুখবর কেবলমাত্র হাদিস।

আর একটি বিষয় আমাকে ধাঁধায় ফেলে, তা হলো, কোরআনেও অনেক 'হাদিস' বা ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে। হজরত দাউদের পাপে পতন, হজরত আদম ও বিবি হাওয়ার কাহিনী, হজরত নূহ, ঈসা মসীহের মা হজরত মরিয়ম ও বিশেষভাবে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত মূসা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের পুত্র হজরত ইসহাকের জন্মের সুখবর কোরআনে বিশদভাবে তিনটি ভিন্ন অংশে -উল্লেখ করা হয়েছে- প্রাথমিক মক্কী যুগের সূরা ৫১:২৪-২৫ ও শেষ মক্কীযুগের সূরা ১১:৬৯-৮৩ ও ১৫:৫১-৭৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো বলা যায় যে, এমনকি কোরআনে ২৮ নং সূরার নাম হয়েছে, গল্প বা কিসাস। তাহলে আমার প্রশ্ন, একজন লোক

কিসের ভিত্তিতে অভিযোগ করতে পারে যে, সুখবরে ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে, যেখানে কোরআনেও কোনো কোনো ঘটনার প্রচুর ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে।

দুর্বোধ্য প্রশ্ন বুঝার চাবিকাঠি

আগেই বলেছি যে, এগুলো খুবই দুর্বোধ্য প্রশ্নের মতো। একদিকে মনে হয়, হাদিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে মনে হয় এগুলোর সত্যতা কোনো লোকের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে এবং এর কোনো মূল্য নেই। পরে আমি জনাব ফজলুর রহমানের লেখা বই "ইসলাম" পড়লাম। সেই বইতে তিনি লিখেছেন,

> "যদি *সমস্ত* **হাদিসকে** বাদ দেয়া হয়, তাহলে এক আঘাতেই হাদিসের সাথে **কোরআনের ঐতিহাসিক ভিত্তির** মধ্যে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হবে।"[১১] (বাঁকা অক্ষরগুলো তাঁর, আর গাঢ় অক্ষরগুলো আমার)

কোনো কোনো পাঠক ওপরের মন্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু যদি তারা সযত্নে তা বিবেচনা করেন, আমি মনে করি যে, তারা আমার সাথে একমত হবেন যে, ওই কথা একেরারেই সত্যি। কেননা, যদিও কোরআনে কোনো কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ রয়েছে, কিন্তু সেখানে হজরত মোহাম্মদের জীবনী, তাঁর জিহাদে অংশ নেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে খুব কম কথাই বলা হয়েছে।

সুতরাং, এই কথা সত্যি যে, যদি **সমস্ত হাদিসকে** সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একেবারে সামান্যই জানবো যে, কীভাবে তিনি রোজা রেখে হেরা পর্বতে ধ্যান করতে যেতেন, কীভাবে প্রথম ওহী তাঁর কাছে নাজিল হয়েছিল, কীভাবে তিনি মদিনায় হিজরত করেছিলেন। যদিও বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু ২-৩ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-ইমরানের ৩:১২৩ আয়াতে কেবলমাত্র একবার এই নামের উল্লেখ রয়েছে। কেন এই যুদ্ধ হয়েছিল, এই যুদ্ধের গুরুত্ব কী তা জানার জন্য আমাদের অবশ্যই হাদিস পড়তে হবে। এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে বর্ণিত কোরআনের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রায় সব উপকরণ হাদিস থেকে নেয়া হয়েছে।

তাহলে যুক্তিসংগতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, কোনো কোনো মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, কেবলমাত্র কোরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা নির্ভুল ওহী, আর হাদিসের মতো মানবীয়[১২], কম নির্ভরযোগ্য উপকরণ দ্বারা এই খাঁটি ওহীকে প্রমাণ ও সমর্থন করা যায়। সুতরাং, প্রতিটি মুসলমান, এমনকি যিনি হাদিসের একবারে কমই গুরুত্ব দেন, তিনি কি হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব ও অন্যান্য সাহাবীদের সাক্ষ্য যা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, তা যথেষ্ট নির্ভুল মনে করেন এবং এগুলো যথেষ্ট সঠিকভাবে একজন আরেকজন রাবীর কাছে বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁরা হজরত

---

[১১] রহমান, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৬৬

[১২] "মানবীয়" এজন্যে বলা হয়েছে, "সত্য" না "যইফ" হাদিস , তা যাঁচাই করার জন্য মানুষের সিদ্ধানে-র ওপর নির্ভর করতে হয়।

মোহাম্মদের কাছে কোরআন নাজিল সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, তা তিনি বিশ্বাস করবেন কি-না এই বিষয়ে তাঁকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হাদিসের সন্দেহাতীত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই বিভিন্ন মতের নিষ্পত্তি দেখায় যে, তৌরাত ও ইঞ্জিলে কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ আছে এসম্পর্কে কোনো মুসলমানেরই অভিযোগ করার কোনো ভিত্তি নেই। **যদি কোরআন নাজিল হওয়ার বিষয়ে এই পরম সত্যকে যদি মানুষের বর্ণিত হাদিস - যা ওহী নয়- দিয়ে প্রমাণ করতে হয়,** যেখানে হাদিসগুলোর বিশদ বর্ণনা নিয়ে সবাই একমত হতে পারে না, কখনো কখনো দেখা যায় যে, হাদিসে বৈজ্ঞানিক ভুলগুলোও রয়েছে: **তাহলে কিসের ভিত্তিতে একজন মুসলমান বলবেন যে, আমাদের পাপের কারণে ঈসা মসীহের মৃত্যুর মতো পরম সত্যকে, আল্লাহ্‌র ওহী সুখবরকে, "হাদিসের মতো উপকরণ "-যা সুখবর সিপারাগুলোর মধ্যে রয়েছে, তার দ্বারা প্রমাণ করতে হবে।**

আল্লাহ্‌র ওহী- ইঞ্জিল শরীফের সুখবর সিপারাগুলোর ব্যাখ্যামূলক উপাদান

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যেসব লেখক সুখবর সিপারাগুলো লিখেছেন, তাঁরা হাদিসের মতোই কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ লেখার সময়ে পাক-রূহ্ দ্বারা পরিচালিত হয়েই লিখেছেন। একইভাবে তাঁরা ঈসা মসীহের কথা লেখার সময়েও পাক-রূহ্ দ্বারা পরিচালিত হয়েই লিখেছেন,

ঐতিহাসিক সত্য বিবরণী হচ্ছে,

বিবি মরিয়মের সাথে হজরত জিবরাইল কথা বলেছেন;
কুমারী গর্ভে ঈসা মসীহের জন্ম;
চিহ্ন ও মোজেজার মাধ্যমে তিনি নিজেকে রাসূল,
মসীহ্ ও "কলেমাতুল্লাহ" বলে প্রমাণ করেছেন;
আমাদের পাপের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়েছে;
মৃত্যু থেকে তাঁর জীবিত হওয়া
এবং তাঁর বেহেস্তে গমন;

এই তথ্যগুলো পাক-রূহের পরিচালনায় লেখা হয়েছে; একইভাবে ঈসা মসীহের পর্বতের ওপরে দেওয়া শরিয়ত সম্পর্কে শিক্ষা আর কীভাবে আল্লাহ্ আমাদের সাথে বাস করতে চান, মেসালের মধ্য দিয়ে বলা তাঁর এই শিক্ষাগুলোও পাক-রূহ্ দিয়েছেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায় যে, আমরা বিশ্বাস করে ধরে নিতে পারি যে, **"আল্লাহ্ বলেছেন"** (ক্বালা আল্লাহ্ **قَالَ اَللّٰهُ**) এই কথা প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে রয়েছে।

এই বইয়ে কেন হাদিসের গুণ বিচার করা হচ্ছে

এই সময়ে পাঠক নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ***কিতাবুল মোকাদ্দস, কোরআন ও বিজ্ঞান বইয়ে*** কেন হাদিস শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? এ'জন্য তা করা হয়েছে, কারণ, আমরা একটু আগেই দেখেছি যে, অনেক মুসলমানদের ঈমানের ভিত্তির অর্ধেক উৎস হচ্ছে কোরআন। তাই ওপরোক্ত বিষয়ে যে কোনো বই লিখলে, খুব সম্ভব সেই বইয়ের নাম দেওয়া উচিত, কিতাবুল মোকাদ্দস, কোরআন-হাদিস ও বিজ্ঞান।

সুতরাং, তৌরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে কোরআন কী বলে এটি আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়! আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, ওই কিতাবগুলো সম্পর্কে হাদিস কী বলে? বিশেষভাবে আমরা দেখাতে চাই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাঁদের কিতাব পরিবর্তন করেছেন, এই অভিযোগ করাকে কি হাদিস সমর্থন করে?

আরো বলা যায় যে, অনেক হাদিসে বিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে। ডঃ বুকাইলি এই কথা স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করেছেন। তিনি অনেক সহি হাদিসের মধ্যেও ভুল খুঁজে পেয়েছেন। এটি ধর্মতত্ত্বীয় জটিলতার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ভুল তুলে ধরেছে। আমরা পরে যখন বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেই সময়ে এর একটি উদাহরণ বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখবো।

কিতাবুল মোকাদ্দসের নির্ভুলতা সম্পর্কে হাদিসের সাক্ষ্য[১৩]

প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখেছিলাম যে, তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফ সম্পর্কে কোরআনে একশোর বেশী সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যদি আমরা বিভিন্ন হাদিসে একই বিষয়ের উল্লেখ দেখতে পাই। এইরূপে *মিসকাতুল মসাবি*[১৪] কিতাব ১, অধ্যায় ৬তে লেখা আছে,

> হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ্ বলেছেন, "শেষকালে মিথ্যেবাদী দাজ্জাল বের হবে, যে তোমাদের এমন হাদিস শুনাবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতারা কেউ কোনোদিন শুননি। সুতরাং, তাদের থেকে সাবধান থেকো। তারা তোমাদের ধ্বংস করতে পারবে না, বা তোমাদের প্রতারণা করতে পাররে না।" বর্ণনায়- মুসলিম।
>
> তিনি আরো বলেছেন, আহলে কিতাবীরা হিব্রু ভাষায় তৌরাত পাঠ করে আর মুসলমানদের কাছে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে; সুতরাং, রাসুলুল্লাহ বললেন, "আহলে কিতাবীদের তোমরা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কর না বরং বলো, "তোমরা বল [হে মুসলমানগণ], আমরা আল্লাহতে ঈমান

---

১৩ এই অংশের বেশিরভাগ তথ্য গিয়াসউদ্দিন আডেলফি ও আনের্ষ্ট হান রচিত দি ইনট্রেগেটি অব দি বাইবেল একরডিং টু দি কোরআন এন্ড দি হাদিস বই থেকে নেয়া হয়েছে। হেনরি মার্টিন ইনস্টিটিউট, হায়দরাবাদ,১৯৭৭, পৃষ্ঠা-২৯-৩৮, লেখকের অনুমতিক্রমে বইটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৪ *Mishkat al-Masabih,* tr. By James Robson, Ashraf, Lahore, 1963, p 42.

রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাজিল হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।" (কোরআন ২:১৩৬) (বর্ণনায়- বোখারী)

আহলে কিতাবীদের ব্যাখ্যাকে হজরত মুহাম্মদ কখনও স্বীকারও করেননি বা অস্বীকারও করেননি। তিনি তওরাতের আসল আয়াত সম্পর্কে কখনও কোনো মন্তব্য করেননি। ঈমাম বোখারীর তফসীর কিতাবে আলেম আইনী ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আহলে কিতাবীরা যে ব্যাখ্যা দেয় তা তওরাতের প্রকৃত ব্যাখ্যার সাথে মিল আছে কি নেই মুসলমানরা কখনও তা বুঝতে পারতো না। তিনি আরো বলেছেন, একটি মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করা বা সত্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র গজব নাজিল হয়।

কিছুটা একই ধরনের কথা মিসকাতুল মসাবিতে কিতাব ১, অধ্যায় ৬, পৃষ্ঠা.৪৯ ও কিতাব ২০, অধ্যায় ১, ৮৯২ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে:

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, "একবার রাসুলুল্লাহ উবাই উবনে কাবকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নামাজের সময় তিনি কীভাবে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন? এই কথা শুনে তখন তিনি **উম্মুল কোরআন** তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এর সাথে তুলনা হতে পারে এমন কিছু কথা তৌরাত, ইঞ্জিল বা জবুর শরীফে পাওয়া যায় না। অথবা আল-কোরআন, আর এর সাতটি আয়াত যা পুনঃপুনঃ মুখস্থ বলতে হয় ও মহৎ কোরআন যা আমি দিয়েছি— ।" (তিরমিযি)

জাবির বর্ণনা করেছেন যে, হজরত ওমর বিন আল-খাত্তাব রাসুলুল্লাহ্‌রকাছে তওরাতের একটি অনুলিপি এনে বললেন, "হে রাসুলুল্লাহ! এটি তওরাতের একটি অনুলিপি।" তিনি যখন কোনো উত্তর পেলেন না, তখন তিনি তা থেকে পড়তে শুরু করলেন। আর এ'জন্য রাসুলুল্লাহ স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট হলেন। তাই দেখে হজরত আবু বকর বললেন,' তুমি গোল্লায় যাও। তুমি কি দেখছো না, রাসুলুল্লাহ কীভাবে তোমার দিকে তাঁকাচ্ছেন।' এই কথা শুনে হজরত ওমর, রাসুলুল্লাহ্‌রমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,' আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও রাসুলুল্লাহকে নবী হিসেবে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট।' তখন রাসুলুল্লাহ বললেন,' যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, যদি হজরত মূসা তোমার সামনে আসে আর তুমি আমাকে ত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করো, তবে তুমি সঠিক পথ ছেঁড়ে ভুল পথে যাবে। যদি তিনি জীবিত হয়ে আমার নবুয়ত স্বীকার করেন, তবে তাঁকেও আমাকে অনুসরণ করতে হবে।"(বর্ণনায়- দারিমী[১৫])

[১৫] এই হাদিসটি খ্রীষ্টানদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। হজরত ওমর যখন তওরাত আনলেন, তখন কেন হজরত মোহাম্মদ রাগ করেছিলেন? কেন তিনি হজরত মূসাকে যে আল্লাহ্ কালাম দিয়েছিলেন, সেজন্য খুশি হননি? ঈসা মসীহ সব সময়ে তওরাত-পুরাতন নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে তওরাতে যে-কথা লেখা আছে, তা পড়েননি বলে তিনি ইহুদী আলেমদের তিরস্কারও করেছেন। ইউহোন্না ৫:৩৯-৪০,৪৫-৪৭ আয়াত দেখুন।

হজরত সালমান বলেছেন,

“তিনি তওরাতে পড়েছেন যে, খাবার পরে ওজু করলে বরকত পাওয়া যায়।” তিনি যখন নবীকে এই কথা বললেন, তখন নবী বললেন, “খাবারের আগে বা পরে ওজু করলেও বরকত পাওয়া যায়।” (বর্ণনায়- তিরমিযি ও আবু দাউদ)

এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, হজরত মুহাম্মদ তৌরাত পড়তে নিষেধ করেননি বা এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি। তাঁর নীরবতা আসলেই এ সত্যটি নিশ্চিত করে যে, তওরাতের অস্তিত্ব সেই সময়ে ছিল। একইরূপে, মিসকাতুল মসাবিতে কিতাব ২৬, অধ্যায় ২৬, অধ্যায় ৩৪১, ১৩৭১, ১৩৭২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে:

হজরত খায়তামা বিন আবু সাবরা বলেছেন,

“আমি মদিনায় আসার পরে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলাম যেন তিনি আমাকে একজন ভালো সঙ্গীর সাথে বসার সুযোগ করে দেন। আর আল্লাহ্ আমাকে আবু হোরায়রাকে আমার সংগী করে দিলেন। আমি তাঁর পাশে বসে তাঁকে বললাম, ‘আমি আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করেছিলাম যেন তিনি আমাকে একজন সৎ সঙ্গী দান করেন, যেন আমি তার সাথে বসার সুযোগ পাই। আর তিনি আমার মোনাজাত কবুল করেছেন।’ তিনি জানতে চাইলেন যে, আমি কোথা থেকে এসেছি। এই কথার উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, ‘আমি কুফা শহরে বাস করি। আমি ভালো কিছু জানতে ও খুঁজতে এসেছি।’ তখন তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে কি সাআদ বিন মালিক নেই- যিনি মোনাজাতের উত্তর পান, ইবনে মাসুদ-যিনি রাসুলুল্লাহ্‌রঅজুর পানি ও জুতার দেখাশোনা করতেন, হুজায়ফা-যিনি রাসুলুল্লাহ্‌রবিশ্বস্ত লোক ছিলেন, আমর-যাঁকে নবীর অনুরোধে শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এবং সালমান-যিনি দুই কিতাবে- ইঞ্জিল ও কোরআনে বিশ্বাসী ছিলেন।’” (বর্ণনায়- তিরমযি)

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এই হাদিসে দুটো কিতাবের (কুতুবিহি) - ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআন- কথা বলা হয়েছে। তৌরাত বা পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফ বা নতুন নিয়মের কথা বলা হয়নি। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এই হাদিসটি ধরে নিয়েছে, সেই সময়ে নির্ভুল ইঞ্জিল শরীফের অস্তিত্ব ছিল।

নিম্নের হাদিসটি মিসকাতুল মসাবিতে কিতাব ২, অধ্যায় ১, ৬২, ৬৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়:

“হজরত জায়েদ বিন লাবিদ বলেছেন, নবী একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, ‘এমন এক সময় আসবে যে সময়ে জ্ঞান মরে যারে।’ আমি জানতে চাইলাম,’ কীভাবে জ্ঞান মরে যাবে, আমরা যখন নিজেরা কোরআন পাঠ করছি, আমরা আমাদের সন্তানদের কোরআন শিক্ষা দিচ্ছি, যে পর্যন্ত কেয়ামত না হয় তারাও তাদের বংশধরেেদের কোরআন শিক্ষা দেবে।’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘জিয়াদ! আমি তোমার কথা শুনে আশ্চর্য হ’লাম, আমি মনে করতাম যে, মদিনার মধ্যে তুমি সবচেয়ে বড় পণ্ডিত লোক।’ এই ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তৌরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে কিন্তু তারা এর আসল বিষয় জানে না।’ বর্ণনায়- আহম্মদ ও ইবনে মাজা।

কোরআনের মতোই হাদিসেও ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অজ্ঞতার জন্য সমালোচনা করা হয়েছে। যদিও হজরত মুহাম্মদ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তৌরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে, আর তারা কোনো বিকৃত বা রদবদল করা তৌরাত বা ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করে না।

সম্ভবতঃ তিনি আরবীয় ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফের ভাষা বুঝতে পারতেন না। এখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, শতকরা কয়জন লোক যে কোনো পাক-কিতাব পড়ে এর অর্থ বুঝতে পারে?

কিন্তু হজরত ওরাকা বিন নাওফেল সম্পর্কে কী বলা যায়? তিনি যে পড়তে পারতেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। "কীভাবে প্রথম ওহী নাজিল হয়েছিল" এই অধ্যায়ে ঈমাম বোখারী বলেছেন যে, কীভাবে হজরত মোহাম্মদের কাছে কোরআনের সূরা ৯৬-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত প্রথমে নাজিল হয়েছিল, আর নাজিল হবার পর কীভাবেই বা তিনি বিবি খাদিজার কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। এই কথা বলার পর তিনি যে-হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি।

> বিবি খাদিজা তাঁর চাচাতো ভাই হজরত ওরাকা বিন নাওফেলের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন। হজরত ওরাকা বিন নাওফেল আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি হিব্রু কিতাবের অনুলিপি তৈরি করতেন। তিনি হিব্রু ভাষা থেকে ইঞ্জিল অনুবাদও করতে পারতেন। কারণ, আল্লাহ্ তাঁকে সেই যোগ্যতা দিয়েছিলেন। সেই সময়ে হজরত ওরাকার অনেক বয়স হয়েছিল আর বয়সের কারণে তিনি চোখে ভালো দেখতে পেতেন না।[১৬]

এই হাদিসটি বলে যে, **"আল-কিতাব"** বলতে সম্ভবতঃ তৌরাত- পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের কথা বলা হয়েছে এবং এমনকি আরবের প্রত্যন্ত এলাকায়ও লোকদের কাছেও এই কিতাবগুলো পরিচিত ছিল।

নিম্নের হাদিসটি মিসকাতুল মসাবি- কিতাব ৬, অধ্যায় ৬৩, ২৮৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়:

> হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, "আমি তুর পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখানে হজরত কাআব আর হজরত আহবারের সাথে দেখা করি। তাঁর পাশে বসি। তিনি আমাকে তৌরাত সম্পর্কে আর আমি তাঁকে রাসুলুল্লাহ সম্পর্কে বলছিলাম। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি কথা আমি তাঁকে বলেছিলাম, রাসুলুল্লাহ বলেছেন,' সবচেয়ে ভালো দিন হচ্ছে শুক্রবার। যেদিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছিল। এদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, এদিন শেষ সময় আসবে। শুক্রবারে প্রতিটি পশু, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেষ সময়ের ভয় থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু জিন্ন ও মানুষরা নয়। আর এমন এক সময় সেখানে আছে, যে-সময়ে মানুষ কিছু না চাইলেও মোনাজাত না করলেও আল্লাহ্ তাঁকে তা দিবেন।" হজরত কাআব বললেন, "প্রত্যেক বছরে এই দিন একবারই আসে। "কিন্তু আমি যখন জোর দিয়ে বলছিলাম, "এটি প্রতি শুক্রবারেই ঘটে, " তখন হজরত কাআব তৌরাত পাঠ করলেন, আর বললেন, "রাসুলুল্লাহ সত্যিই কথাই বলেছেন।" হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন,

[১৬] লেখকদের অনুবাদ- Adelphi and Hahn

"আমি আব্দুল্লাহ বিন সালামের সাথে দেখা করে তাঁকে হজরত কাআব আল-আহবারের সাথে সাক্ষাতের কথা সব খুলে বললাম। আমি শুক্রবারের বিষয়ে যে-কথা বলেছিলাম, তাও তাঁকে জানালাম। তাঁকে বললাম, "হজরত কাআব বলেছিলেন,' এদিন প্রত্যেক বছরে একবারই আসে।' তখন হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম বললেন,' হজরত কাআব মিথ্যে কথা বলেছেন।' কিন্তু আমি যখন তাঁকে জানালাম যে, তৌরাত পাঠ করে হজরত কাআব বলেছেন যে, প্রতিটি শুক্রবারই হচ্ছে এই দিন। তখন তিনি বললেন,' হজরত কাআব সত্যি কথাই বলেছেন।' মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসাই এই হাদিসটি বর্ণনা করে আহম্মদ কাআব সত্যি কথাই বলেছেন, এ-পর্যন্ত লিখেছেন।

হজরত কাআব শুরুতে তওরাতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি আল-তাহরিফ আল-মানাওয়ীর দোষে দোষী। হজরত কাআব পরে তওরাতের সূত্র উল্লেখ করেন, তিনি কোনো বিকৃত তওরাতের আয়াত উল্লেখ করেননি, আর তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন।

*মিসকাতুল মসাবি*তে উল্লেখিত বিভিন্ন হাদিসে (কিতাব ২৬, ১৮ অধ্যায়, ১২৩২, ১২৩৩ পৃষ্ঠা ও ১৯ অধ্যায়, ১২৪৪ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে যে, তওরাতে হজরত মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে,

'হজরত আতা বিন ইয়াসার বলেছেন, "আমি হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস এর সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আমাকে বলুন, তওরাতে রাসুলুল্লাহ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?" তিনি আমাকে তা জানাতে চাইলেন। আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে তিনি বললেন, "তওরাতে তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর কিছু অংশ কোরআনে রয়েছে।" কোরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ও সাধারণ লোকদের প্রহরীরূপে।" (আল-আহ্‌যাব ৩৩:৪৫)। (নিম্নে তৌরাত-পুরাতন নিয়ম (ইশাইয়া ৪২:১-৩, ৬-৭) থেকে তা তুলে ধরা হলো।)[১৭] "দেখো, আমার গোলাম, ও আমার রাসূল: আমার বাছাই করা বান্দা, যাঁর ওপর আমি সন্তুষ্ট। সে চিৎকার করবে না বা জোরে কথা বলবে না; সে রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার আওয়াজ শোনাবে না। সে মন্দের বদলে মন্দ করবে না। কিন্তু সে ক্ষমা করবে এবং দয়া করবে। আল্লাহ্‌ তাকে তুলে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁকে দিয়ে সে বক্র ধর্মমতকে সরল করবেন। ফলে লোকেরা বলবে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আর সে অন্ধদের চোখ খুলে দিবে, কালাদের কান খুলে দিবে ও কঠিন হৃদয় খুলে দিবে।

ঈমাম বোখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত দারিমিও প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি হজরত আতার কাছ থেকে সনদ পেয়েছেন, আর হজরত আতার কাছ থেকে হজরত ইবনে সালাম সনদ পেয়েছেন।

হজরত আনাস বলেছেন, "একবার এক ইহুদী যুবক - যিনি নবীর চাকর ছিলেন- অসুস্থ হয়েছিলেন। নবী তাকে দেখতে গেলেন। নবী সেখানে গিয়ে দেখেন যে, রোগীর মাথার পাশে বসে তার পিতা বসে বসে তৌরাত পাঠ করছেন। রাসুলুল্লাহ রোগীর পিতাকে বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র

[১৭] বন্ধনীভুক্ত আমি করেছি

কসম দিয়ে বলছি, যিনি হজরত মূসার কাছে তৌরাত নাজিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার সম্পর্কে কোনো বিবরণ দেখতে পাও? অথবা আমার আগমন সম্পর্কে কি কিছু বলা হয়েছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি খুঁজে পাইনি।" তখন যুবকটি বললো, "নিশ্চয়ই আছে, রাসুলুল্লাহ, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তওরাতে আপনার সম্পর্কে সেখানে বলা আছে, আপনার আগমন সম্পর্কেও বলা হয়েছে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই আর আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।" তখন রাসুলুল্লাহ তাঁর সাহাবীকে বললেন, "তাঁর মাথার কাছ থেকে এই লোকটিকে সরিয়ে দাও আর তোমরা এই ভাইয়ের দেখাশোনা করো।"

হজরত বায়জাবী এই হাদিসটি *দালাইল আল-নবুয়া* কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য হাদিসগুলোও একই ধরনের কথা বলেছেন, যা *মিসকাতুল মসাবিতে* (১২৩৭, ১২৪৯ পৃষ্ঠা) লেখা আছে। আবার এই সব হাদিসও ধরে নিয়েছে যে, আসল তৌরাত আছে। পিতা ও অসুস্থ যুবক পুত্র, তৌরাত যা বলেছে, সে সম্পর্কে একমত হতে পারেনি, কিন্তু এই সব হাদিসের মধ্যে একটি হাদিসও দাবী করেনি যে, ইহুদীরা তাদের কিতাব তওরাতের আয়াত বিকৃত করেছে।

সম্পাদকের মন্তব্য: তৌরাত -পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত বিষয় উপরে উল্লেখিত দুটি অংশের প্রথমটিতে যা আবার বলা হয়েছে, তা হজরত আতা বিন আসর বৈধ বলে গ্রহণ করেছেন; আর এখনও এটি পাওয়া যায়, ঈসা মসীহের জন্মের ৭০০ বছর আর হজরত মোহাম্মদের জন্মেরও ১৩০০ বছর আগে ইশাইয়া নবী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখানে লেখা আছে,

"দেখো, আমার গোলাম, যাঁকে আমি সাহায্য করি;
আমার বাছাই করা বান্দা, যাঁর ওপর আমি সন্তুষ্ট।
আমি তার ওপরে আমার রূহ্ দেব
আর তিনি জাতিদের কাছে ন্যায়বিচার নিয়ে আসবেন।
তিনি চিৎকার করবেন না বা জোরে কথা বলবেন না;
তিনি রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার স্বর শোনাবেন না।
তিনি থেৎলে যাওয়া নল ভাংবেন না —
আমি মাবুদ তোমাকে ন্যায়ভাবে ডেকেছি; —
আমি তোমার হাত ধরে রাখব। আমি তোমাকে রক্ষা করবো
এবং আমাদের বান্দাদের জন্য তোমাকে একটি ব্যবস্থার মতো করবো—
তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দিবে,
জেলখানা থেকে বন্দিদের মুক্ত করবে
আর সেখানকার অন্ধকার গর্তে রাখা লোকদের বের করে আনবে।
- ইশাইয়া ৪২:১-৩, ৬ক, ৭

এভাবে দুটো সাক্ষী আছে- **তৌরাত-পুরাতন নিয়ম থেকে ইশাইয়া নবীর উদ্ধৃতি আর হাদিস।** যেহেতু উভয়ই চুক্তির শর্তের কথা জানায়, এটি প্রকাশ করে যে, ঈশাইয়া কিতাবের লেখা পবিবর্তন হয়নি আর আমরা এখান থেকে এই ধারণা পেতে পারি যে, বাকী হাদিসগুলোতেও সম্ভবতঃ আলাপচারিতার সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য রেকর্ড রয়েছে।

এটি অবশ্যই আলাদা প্রশ্ন যে, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর কি হজরত মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে সঠিকভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে পেরেছিলেন? ইঞ্জিল শরীফে মথি সিপারার ১২:১৮-২১ আয়াতে বলা হয়েছে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে। আর কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফ উভয়ই বলেছে যে, কেবল ঈসা মসীহ্ অন্ধদের চোখ ভালো করেছেন। এটি একটি জোরালো প্রমাণ। এই প্রমাণকে সহজেই অগ্রাহ্য করা যায় না!

মিসকাতুল মসাবি, কিতাব ১৬, অধ্যায় ১, ৭৫৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে:

> "হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেছেন যে, ইহুদীরা রাসুলুল্লাহ্রকাছে এসে তাঁকে জানালেন যে, এই পুরুষ ও এই মহিলা ব্যভিচার করেছে। তিনি তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, তওরাতে পাথর-মারা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? তাঁরা বললেন যে, তওরাতের বিধান অনুসারে, "উভয়কে অপমান করা ও প্রহার করা উচিত।" তখন হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "তোমরা মিথ্যে কথা বলছো। সেখানে নির্দেশ দেওয়া আছে, তাদেরকে পাথর-ছুঁড়ে মারতে হবে। তাই তোমরা তৌরাত নিয়ে এসো।" তারা তৌরাত এনে খুললেন। তাদের মধ্যে একজন পাথর-ছুঁড়ে-মারার আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে আয়াতটির ওপরের অংশ আর শেষের অংশ পড়লেন। হজরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম লোকটিকে হাত উঠাতে বললেন, আর লোকটি যখন হাত উঠালো, তখন দেখা গেল যে, পাথর-মারার আয়াতটি সেখানে রয়েছে। তারা তখন বললো যে, "তিনি সত্যি কথাই বলেছেন, হে মুহাম্মদ! পাথর-মারার আয়াতটি এখানে রয়েছে।"
>
> তখন নবী দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রায় দিলেন আর তাদেরকে পাথর-মারা হলো। অন্য একটি কিতাবে বলা হয়েছে, তিনি লোকটিকে হাত তুলতে বললেন। আর তিনি যখন তা করলেন, তখন দেখা গেল যে, পাথর-মারার আয়াতটি সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে। তখন লোকটি বললো, "হে মুহাম্মদ! এখানে পাথর মারার হুকুমটি রয়েছে। কিন্তু আমরা একে গোপন করেছি। "তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। আর তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মারা হলো। (বোখারী ও মুসলিম)

এখানে হজরত মুহাম্মদ খোলাখুলিভাবে তওরাতের হুকুম বিনা আপত্তিতে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এখানে কোনো কিছু বলা হয়নি যে, তওরাতের আয়াত বদবদল করা হয়েছে বা বিকৃত করা হয়েছে। এটি একটি দৃষ্টান্ত যা কোরআনে উল্লেখ করে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ইহুদীরা মৌখিকভাবে তওরাতের আয়াত গোপন করে অথবা রদবদল করে, কিন্তু আসল আয়াত তারা গোপন করে না বা রদবদল করে না।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব যখন খলিফা ছিলেন (১৩-২৩ হিজরী) সেই সময়ের দুটি হাদিস আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্ক রয়েছে মিসকাতুল মসাবি, কিতাব ১৭, অধ্যায় ৩, ৭৯৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে:

হজরত ওমর বিন খাত্তাব ও হজরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ এই কথা বলেছেন, "তওরাতে এই কথা লেখা আছে, "কারও মেয়ের বয়স যখন বারো বছর হয়, আর যদি তার মেয়েকে সে বিয়ে না দেয়, তাহলে সে পাপ করে আর এই পাপের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। বর্ণনা- বায়হাকি-সুয়াব আল-ঈমান।

হজরত সাইদ বিন আল-মূসাইব বলেছেন যে, "একদিন একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী একটি বিরোধ মিমাংসার জন্য খলিফা হজরত ওমরের কাছে এলেন। হজরত ওমর মনে মনে গভীর চিন্তা করে দেখলেন যে, ইহুদীর কোনো দোষ নেই; তাই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন; কিন্তু ইহুদী যখন বললো যে,'আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যে আপনি ন্যায়বিচার করেছেন।' তখন খলিফা তাঁকে চাবুক দিয়ে আঘাত করেন। আর তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কীভাবে এই কথা জেনেছো?'

তখন ইহুদী বললো, "আমরা তওরাতে দেখেছি যে, কোনো ন্যায়বিচারক ন্যায়বিচার করতে পারেন না, যদি না তাঁর ডানে ও বামে একজন করে ফেরেশতা থাকেন। যাঁরা তাকে নির্দেশ দেন সত্য কী তা জানতে প্রভাবিত করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ন্যায্যতার প্রতি অনুগত থাকেন। কিন্তুতিনি যখন ন্যায্যতা পরিত্যাগ করেন তাঁরা তাঁকে ছেড়ে উর্দ্ধে আরোহন করেন।" বর্ণনায়- মালেক

দ্বিতীয় হাদিসটি সুসান শহরের দারিমি, তাঁর মুকাদ্দীমা গ্রন্থে ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হজরত আব্বাস বিন আব্বাস আবু আতাবা খলিফা ওমর বিন আল-খাত্তাবের লেখা চিঠি উদ্ধৃত করে বলেছেন:

যদি ইহুদীদের মধ্যে জ্ঞানী আলেম ও দরবেশেরা তাঁদের সম্মান ও পদমর্যাদা হারানোর ভয় না করতেন, যদি পাককিতাবের হুকুম পালন করতেন, সঠিকভাবে আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন, তবে পাককিতাবের আয়াত জাল (হার্‌রাফূ حَرَّفُوا) করতেন না বা লূকাতেন (কাতামু كَتَمُوا) না। কিন্তু তাঁরা যা করেন, তাতে তাঁরা কিতাবের নির্দেশের বাইরে কাজ করেন, আর এভারে লোকদের বোকা বানানোর চেষ্টা করেন। লোকদের কাছে তাঁদের সম্মান নষ্ট হবে আর তাদের বিকৃতি প্রকাশ পাবে, এই ভয়ে কিতাব ব্যাখ্যার সময়ে তাঁরা মিথ্যে কথা বলেন।"

এই হাদিস দুটোর প্রথমটিতে কোনো ইঙ্গিত নেই যে, খলিফা ওমর ইহুদীদের অধিকার অস্বীকার করেছেন যে, তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তের জন্য তৌরাত ব্যবহার করতে পারবেন না। দ্বিতীয় হাদিসটিতে তিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, **আয়াত ব্যাখ্যা করার সময়ে তাঁরা মিথ্যে বলেন** আর যেখানে মিথ্যা বলতে পারেন না, **সেখানে তাঁরা গোপন করেন।** তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁদের কাজ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই না বলে নীরব থাকেন, আর তাঁরা তাঁদের লোকদের- তাঁদের কুকর্মের সাথী- সম্পর্কেও নীরব থাকেন। আর আল্লাহ্‌ সত্যি তাঁদের সাথে

অংগিকার করেছিলেন, যাঁদের কাছে পাক-কিতাব এসেছে। আর কিছুই গোপন না করে লোকদের সেই কথা জানানো তাঁদের উচিত ছিল। কিন্তু এই বিষয়ে লোকদেরকে তাঁরা ঠকিয়েছেন আর এই কাজে তাঁরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন।

কোরআনের মতোই এই শেষের হাদিসটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবীরা পাককিতাবের ভুল ব্যাখ্যা করেন। (আল-তাহরিফ-আল-মানাওয়ি) কিন্তু কখনো এই কথা বলা হয়নি যে, তাঁরা পাককিতাবের আসল আয়াত বিকৃত করেছেন (আল-তাহরিফ- আল-লফজী)।

এই দুটো হাদিস যখন আগের হাদিসের- তৌরাত এনে হজরত মোহাম্মদের সামনে হজরত ওমর পাঠ করেছেন- সাথে বিবেচনা করা হয়, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হজরত ওমর নিজেও মনে করতেন যে, তিনি নির্ভুল তৌরাত থেকেই পাঠ করছেন।

একটি ব্যতিক্রম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর এই ব্যতিক্রমী হাদিসটি বোখারী শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে। এই হাদিসে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবীরা তাঁদের কিতাবের মূল আয়াত বিকৃত করেছে। এই হাদিসটি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তাঁর যখন ১৪ বছর বয়স, তখন হযরত মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেন। পরর্বর্তীকালে খলিফা হযরত আলী তাঁকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওতরা বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন যে,

> “হে মুসলমান সম্প্রদায়, কীভাবে তোমরা আহলে কিতাবীদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো, যখন তোমাদের কিতাব- যা আল্লাহ, তাঁর নবীর মাধ্যমে নাজিল করেছেন- যাতে আল্লাহ্ সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে। তোমরা নির্ভুলভাবে তা পাঠ করছো। আর আল্লাহ্ তোমাদের বলেছেন, আহলে কিতাবীরা আল্লাহ্ যা লিখেছিলেন, তা পরিবর্তন (বাদ্দালূ بَدَّلُوا) করেছে; তারা নিজেদের হাতে তাদের কিতাব জাল (গাইয়্যারূ غَيَّرُوا) করেছে। আর তারা তুচ্ছ পুরস্কার পাওয়ার জন্য বলেছে, “এটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে।” তিনি কি তোমাদের তাদের কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেননি। আল্লাহ্‌র শপথ আমরা কখনো দেখেনি, তোমাদের কাছে যা নাজিল হয়েছে, এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কেউ এসে কোনো কিছু জানতে চেয়েছে।[১৮] বর্ণনায়- তিরমযি

আগের কিতাব সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে যদি এটিই কেবল একমাত্র সূত্র হয়, তবে এটি নিশ্চিতভাবেই মুসলমানদের এই অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করে যে, আহলে কিতাবীরা তাদের কিতাব বিকৃত করেছে। যদিও আমাদের জানা মতে এটিই একমাত্র হাদিস, যা নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করে, যেখানে প্রচুর হাদিসের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যে হাদিসগুলোতে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমান সমপ্রদায়ের কাছে নির্ভুল তৌরাত ও নির্ভুল ইঞ্জিল ছিল।

এই কথা সত্যি যে, হাদিস সম্পর্কে যাদের সামান্যই আস্থা আছে, হাদিস থেকে কিছু প্রমাণ করা হয়তো সেই সমস্ত মুসলমানদের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে। যদিও হাদিসের গুরুত্ব সম্পর্কে

---

[১৮] Bukhari, *Sahih, Kitab al-Shahada,* No 29, as noted in J.W. Sweetman, *Islam and Christian Theology,* Part One, Vol. II, Lutterworth Press, London, 1947, p 139.

অমনোযোগী যে কারও জন্য এই বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন যে, মিসকাতুল মসাবিতে এক বারের জন্যও উল্লেখ করা হয়নি যে, আগের কিতাবসমূহ রদবদল করা হয়েছে। এছাড়াও বলা যায় যে, আমরা প্রাসঙ্গিক সূত্র সম্বলিত একটি হাদিসও বাদ দেইনি। এই কথা স্পষ্ট যে, সবগুলো হাদিস, একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, আগের কিতাবগুলোর বিকৃতি সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি।

এটি খুবই সম্ভব যে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তাদের কিতাবের আলাদা কোনো আয়াত অথবা কোনো শব্দ তারা বোকামী করে বিকৃত করতে পারে, আর তাই যদি হয়, তবে এটি হচ্ছে প্রকৃত কিতাবের আয়াত বিকৃত করার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা আমাদেরকে অন্যান্য হাদিসগুলো যা আগের কিতাবগুলোর নির্ভুলতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে, তার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, যে হাদিসগুলো আমরা পরীক্ষা করেছি, সেই সব হাদিস অনুসারে আমরা বলতে পারি যে, হজরত ওরাকা "হিব্রু কিতাবের" অনুলিপি তৈরি করতেন, অনুবাদ করতেন, কিন্তু তিনি কোনো বিকৃত কিতাবের অনুলিপি তৈরি করেননি; হজরত মুহাম্মদ বলেছেন যে, "ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তৌরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে, " তিনি কোনো বিকৃত তৌরাত ও ইঞ্জিলের কথা বলেননি। তওরাতের একটি অনুলিপি হাতে নিয়ে হজরত মুহাম্মদ তওরাতের হুকুম অনুসারে বিচার করেছেন, আর একটি ঘটনায় তিনি তৌরাত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর এটি যে বিকৃত তৌরাত তা কিন্তু তিনি বলেননি।

এভাবে, আমরা বিগত অধ্যায়ে কোরআন অধ্যয়নের সময়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, হাদিস সম্পর্কেও সেই একই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। আর সিদ্ধান্ত এই, **হিজরতের প্রথম শতাব্দীতে মক্কা ও মদিনা নগরীতে নির্ভুল তৌরাত ও নির্ভুল ইঞ্জিল শরীফ মোহাম্মদের কাছে ছিল।**

তৃতীয় খণ্ড

কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন: দুই কিতাব যার সংকলনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে

প্রথম অধ্যায়

তৌরাত ও কোরআনের ওপর “অনুমিত পরিকল্পনা দলিল” (Documentary Hypothesis) মতবাদের আরোপিত প্রভাব

১ম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা “প্রাথমিক অনুমিত বিষয় বা বেসিক এসাম্পসন নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রাথমিক অনুমিত বিষয় বা বেসিক এসাম্পসন নিয়ে সর্বশেষ আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, ডঃ বুকাইলি বিশ্বাস করেন যে, তওরাতের উৎপত্তি ও উন্নয়নের জন্য “অনুমিত পরিকল্পনা দলিল” মতবাদ সত্য কথাই বলেছে। এই “অনুমিত পরিকল্পনা দলিল” মতবাদকে, কখনো কখনো “বা “হাইয়ার ক্রিটিকাল থিওরী” বা গ্রাফ-ওয়েলহাউসের তত্ত্ব বলা হয়। কারণ, এঁরা দু’জনেই ১৮৮০ সালের দিকে সর্বপ্রথম এই তত্ত্বের প্রস্তাব করেন ও উন্নয়ন করেন। এই মতবাদ **নিম্নলিখিত প্রাথমিক অনুমিত বিষয়ের (বেসিক এসাম্পসন) ওপর ভিত্তি করে** গড়ে উঠেছে:

১) **বহুআল্লাহবাদ (শিরকী) অবস্থা থেকে এক আল্লাহবাদে (তৌহিদে) বিশ্বাসের বিবর্তন হয়েছে।** এর ফলে ধরে নেয়া হয় যে, কমবেশী হিব্রু জাতির ধর্মীয় সচেতনতার ফল হিসেবেই পুরাতন নিয়ম উদ্ভুত হয়েছে। **এখানে ফেরেশতা বা পাক-রূহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র নিজেকে প্রকাশ করার কিছুই ছিল না।**

২) যেহেতু হযরত ইব্রাহিমের জীবনে যেসব প্রথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো তওরাতের বাইরে আর কোনো উল্লেখ করা হয়নি (যেমন সৎ বোন সারাকে বিয়ে করা, সারার কথামতো নিজের দাসী-স্ত্রী হাজেরাকে দূর করে দেওয়া) এবং যেহেতু হিত্তীয় জাতির লোকদের কথা তওরাতের বাইরে উল্লেখ করা হয়নি; **সেহেতু** হযরত **ইব্রাহিম,** হযরত **ইসহাক,** হযরত **ইয়াকুব যাঁদেরকে গোষ্ঠীপিতা বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কাল্পনিক চরিত্র, ঐতিহাসিক নয় আর এগুলো হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনী বা গল্প।**

৩) **হযরত মূসা (আঃ) ও হিব্রু জাতির লোকেরা লিখতে পারতেন না, কারণ লিখন-প্রনালী তখনও আবিষ্কার করা হয়নি।**

৪) **সুতরাং, ১৪০০ বা ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তওরাতের পাঁচটি কিতাব হজরত মূসা (আঃ) লিখেননি, যেভাবে কিতাবুল মোকাদ্দস (এবং কোরআন) বারবার দাবী করে আসছে।** কিন্তু এই কিতাবগুলো ১৩০০ বা ১৪০০ বছর পরে ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অজানা সংকলক ও লেখকের দ্বারা সংকলিত হয়েছিল।

এই তত্ত্ব অনুসারে এই সব লোকদের মধ্যে প্রথম লোক ৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আল্লাহ্‌কে ইয়াওয়েহ বা জিহোবা বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াওয়েহ বা *জিহোবার* অর্থ হচ্ছে, “অনাদি, অনন্তকালীন আল্লাহ।” মনে করা হয়, পাককিতাবের অন্যান্য অংশগুলোর সাথে তিনি পয়দায়েশ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ও লিখেছেন।

এর ঠিক একশো বছর পরে দ্বিতীয় লেখক, আল্লাহ্‌র নামের জন্য *এলোহিম* ব্যবহার করেন। তিনি তওরাতের বাকী বড় অংশ লেখেন বলে ধরা হয়। তারপর ৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে এই দুটো বইকে একসাথে সংকলিত করে একটি কিতাব রচনা করা হয়। এই তত্ত্ব বলে যে, পাককিতাবের মধ্যে যেখানে যেখানে জিহোবা (জে ধারা) বা ইলোহিম (ই ধারা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেই সব অংশ চিহ্নিত করে এই দুই লেখকের রচনার মধ্যে পার্থক্য ধরা যায়। আসলে আল্লাহ্‌র নাম হিব্রু জাতির লোকদের কাছে এতো শ্রদ্ধার বিষয় ছিল বলে, তাঁরা তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু পাককিতাবের ভাষা, রচনারীতি, ধর্মতত্ত্বীয় ধারণা- তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সমালোচকরা বিভিন্ন কিতাবকে চিহ্নিত করেছেন।

৬২১ খ্রীষ্টাব্দে তওরাতের পঞ্চম *কিতাব-দ্বিতীয় বিবরণ* (একটি সম্পূর্ণ বানানো- মিথ্যে কিতাব) (ডি ধারা) লিখা হয়েছিল।

সবশেষে, কয়েকজন ইহুদী ঈমাম যাদেরকে ঈমাম সংকলক (পি ধারা) বলা হয়, তাঁরা নিজেরা চতুর্থ কিতাব যোগ করেন। সৃষ্টিকার্যের বিবরণ পয়দায়েশ **১** দিয়ে এটি শুরু হয়েছে। তারপর তারা ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৌরাত একসাথে একত্র করে বর্তমান তওরাতের মতোই রূপ দিয়েছিলেন। এটি হজরত **মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ১০০০ বছর পরে লেখা হয়েছিল।** গাঢ় অক্ষরে লেখা ওপরের ধারণাকে “অনুমিত পরিকল্পনা দলিল” (ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস)” বা ইংরেজীতে J.E.D.P. Theory বলা হয়।

আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখি যে, “অনুমিত পরিকল্পনা দলিল” মতবাদ গোটা পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। **যে-কেউ এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে, যদি সমালোচকদের ধারণা সত্য হয় তবে পুরাতন নিয়মের মধ্যে এক বিশাল সাহিত্যিক প্রতারণা রয়েছে।**

৫. **এর পাশাপাশি** আরো বলা যায়, তারা বলুক, আর নাই বলুক, **যিনি প্রথমে এই তত্ত্বের প্রস্তাব করেন, তিনি মোজেজায় বিশ্বাস করতেন না।** তাঁরা হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত ঈসা মসীহের মোজেজার ওপরে বিশ্বাস করেননি- তাঁরা ওহী বা প্রত্যাদেশের ওপর বিশ্বাস করেননি যে, আল্লাহ্‌ নিজেকে তাঁর কালামের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মত অনুসারে আল্লাহ্‌ কখনও হজরত মূসা (আঃ) বা হজরত ঈসা মসীহের সাথে কথা বলেননি, আর তাঁদেরকে তাঁর কালাম বলতে বলেননি। আর অন্যদিকে তারা যদি আন্তরিকতার সাথে কোরআন পাঠ করে, তবে তারা বলবে যে, হজরত মোহাম্মদের সাথেও আল্লাহ্‌ কথা বলেননি।

আমরা এমন কথাও বলতে পারি **যে, মোজেজা এবং ওহী বা প্রত্যাদেশের ওপর এই ধরনের অবিশ্বাস হচ্ছে সমস্ত থিওরী তৈরির পেছনে তাদের প্রাথমিক অনুমিত বিষয় (বেসিক এসাম্পসন) ছিল।**

ডঃ বুকাইলি তাঁর লেখা বইয়ের অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে এই তত্ত্বের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রচুর স্ববিরোধী, অবাস্তব কথায় পূর্ণ। যুগের পর যুগ ধরে মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে যে, আমরা

ঈসায়ীরা আমাদের কিতাব পরিবর্তন করেছি। সুতরাং, ডঃ বুকাইলি যিনি ঈসায়ী পরিবেশ থেকে এসেছেন, তিনি যখন একই কথা বলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, তিনি একেবারে সত্যি কথাই বলেছেন। আর তাঁরা খুশী মনেই তাঁর এই কথা গ্রহণ করে।

যখন আমি ওরষ্টার কলেজে প্রাক-চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনা করছিলাম, তখন আমি শিখেছিলাম যে এই তত্ত্ব সঠিক। কলেজটি প্রেসবিটিরিয়ান চার্চের সাথে জড়িত ছিল। আমার অধ্যাপক, ধর্মের ওপর পি. এইচ. ডি করেছিলেন। একদিন, আমার পাশে একজন ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করেছিল,

> "কিন্তু, যা আপনি বলছেন, তা যদি সত্য হয়, তবে কিতাবুল মোকাদ্দস মিথ্যে।"ছয় বছরের বাচ্চার সাথে যেন কথা বলছেন এমনিভাবে তিনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, যদি তুমি চাও, তবে তুমি কিতাবুল মোকাদ্দসও বিশ্বাস করতে পারো।"

অধ্যাপকের কথা অনুসারে যদি ধরে নেয়া হয় যে, হজরত মূসা (আঃ) তৌরাত লেখেননি, তবু এমন কোনো সত্য তথ্য নেই, যার দ্বারা তিনি এই কথা প্রমাণ করতে পারবেন। এমনকি যদিও হজরত ঈসা মসীহ্ নিজেও এই কথা বলেছেন যে, হজরত মূসা (আঃ)ই তৌরাত লিখেছেন, তবু তখন আমি অধ্যাপকের কথা বিশ্বাস করেছি, যে-কথাগুলো এখন আমি মিথ্যে বলে মনে করি। কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে আমার আস্থা তাঁর কথাগুলো নষ্ট করে দিয়েছিল। আমি আর বিশ্বাস করতাম না যে, কিতাবুল মোকাদ্দস আল্লাহ্র কাছ থেকে নাজিল হওয়া ওহী। তাই আমি আমার খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে আমি একজন অজ্ঞেয়বাদী হলাম। আমি আল্লাহ্র বিপক্ষতা করিনি, কিন্তু আমি আগে বিশ্বাস করলেও এখন আমি জানতাম না যে, তাঁর সম্পর্কে আমি কী বিশ্বাস করবো।

আল্লাহ্র প্রশংসা হোক! "তিনি চান, যেন সকলে পাপ থেকে উদ্ধার পায়, এবং মসীহের বিষয়ে সত্য গভীরভাবে বুঝতে পারে,"[১] তিনি আমাকে অজ্ঞতার মধ্যে ছেঁড়ে দেননি। তিনি একজন মহিলা আর একজন পুরুষের কাছে আমাকে নিয়ে যান, যাঁরা আমাকে এছাড়াও অন্যান্য অনেক সত্য তথ্য দেখিয়েছিলেন। সত্য তথ্য হচ্ছে, যা তৌরাত ও নবীদের কিতাবের নির্ভুলতা স্বীকার করে-যে সত্য তথ্যগুলো এখন আমরা এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করবো।

কোরআনের ওপরে এই মতবাদের প্রভাব

দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায় ক-তে আমরা দেখেছিলাম যে, কোরআন বলেছে, ৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মরিয়ম, ইয়াহিয়া আর ঈসা মসীহের কাছে নির্ভুল তৌরাত ছিল, এই কিতাবের কোথাও কোনো রববদল করা হয়নি। যদিও অনেক পাঠক আমার সাথে একমত হবেন না, আমাদের কাছে যে-

[১] ইঞ্জিল শরীফ, ১ তীমথিয় ২:৪

তৌরাত আছে, সেই একই তৌরাত তাঁদের কাছেও ছিল। কিন্তু কোরআনের এই আয়াতগুলোর মধ্যে এমন কিছু সত্য তথ্য আছে, যেগুলোর সাথে আমরা সকলেই একমত হতে পারি।

কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, হযরত ইব্রাহিম একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন, তাঁর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) অনেক মোজেজা করেছিলেন, আর আল্লাহ্ নিজ হাতে পাথরে খোদাই করে লেখা তৌরাত তাঁর হাতে দিয়েছিলেন।

উদাহরণ হিসেবে শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৪৪-১৪৫ আয়াত লক্ষ্য করবো।

> "তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্টত্ব দিয়াছি;— আমি তাহার জন্য **ফলকে** সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি— ।"

কোরআনের সাথে পরিচিত লোকেরা বলবেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কিতাব এই বিষয়গুলোতোই শিক্ষা দেয়।" এমনকি যে ভালো শিক্ষা পায়নি, এমন মুসলমানও এই দুটো সত্য জানে। তাহলে এ'গুলোর উল্লেখ কেন করা হচ্ছে? কারণ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসমাইল, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের কাহিনী যদি তওরাতে রূপকথা হয়, তবে কোরআনেও অবশ্যই তা রূপকথা হবে। যদি ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে যদি লেখার প্রচলন না হয়ে থাকে, তবে হযরত মূসা (আঃ) বা অন্য কেউ পাথরের ফলকে লেখা পড়তে পারবেন না। আর কোরআন যা বলছে যে, আল্লাহ্ নিজের হাতে তৌরাত লিখে হযরত মূসা (আঃ)কে দিয়েছিলেন, তওরাতের পাশাপাশি এই কথাও সম্পূর্ণ ভুল করে বলা হয়েছে।

এই কারণে "**"অনুমিত পরিকল্পনা দলিল"** মতবাদ খুবই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা দরকার। মোজেজা সম্পর্কে শীর্ষ সমালোচক বা হাইয়ার ক্রিটিকরা কী বলেছেন, সে বিষয়টি আমরা এখন পরীক্ষা করে দেখবো।

মোজেজা ও ওহী অসম্ভব

এ.কুয়েনেন তাঁর লেখায় *(ডি প্রুফেটেন এন ডি প্রফেটি অন্ডার ইসরাইল, ভলুউম.১, .৫, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)* অতি প্রাকৃত বিষয়টি ব্যখ্যা করেছেন:

> "আজ পর্যন্ত যেভাবে আমরা ইসরাইলীদের ধর্মীয় জীবনের এক অংশকে সরাসরি আল্লাহ্র দিকে আরোপিত করি, আর **অতিপ্রাকৃত বা সরাসরি ওহী (প্রত্যাদেশ) নাজিল হয়েছে, এমনকি যে কোনো ঘটনায় আল্লাহ্র হস্তেক্ষেপের বিষয়টি আমরা মেনে নিয়েছি, যেভাবে** আজ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিভংগী রয়েছে, আমরা নিজেদের দেখি ঐতিহাসিক বর্ণনা সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে মূল বিষয়ের এখানে সেখানে উগ্র 'হস্তক্ষেপ করতে আইনগতভাবে বাধ্য। এটি কেবল ধরে নেয়া হয়েছে, সমস্ত ঘটনার বর্ণনার জন্য **স্বাভাবিক** f\‡eB **এর উন্নয়ন** হয়েছে।"

ডি গডস ডি আনষ্ট ভেন ইসরাইল (ভলুউম ১. ১১১ পৃষ্ঠা) বইয়ে কুয়েনেন স্বীকার করেছেন যে,

> "আমাদের সুপরিচিত বনি-ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদের সাথে আল্লাহ্ বা ফেরেশতাদের কথা বলার বিষয়টি আমার মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, আমি স্থির নিশ্চিত যে, **ওই কিতাবের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না।"**

প্রথম উদ্ধৃতিতে কুয়েনেন বলেছেন যে, এমনকি একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনাও আমাদের দৃষ্টিভংগীকে ভুল **প্রমাণ** করে দিবে।

দ্বিতীয়টিতে তিনি বলেছেন, বনি-ইসরাইলদের গোষ্ঠী পিতা হযরত ইব্রাহিম, বিবি হাজেরা, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, এইজন্য এগুলো **প্রমাণ** করে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর লেখা কিতাবগুলো ঐতিহাসিক নয়।

জুলিয়াস ওয়েলহাওসেন, যিনি গ্রাফ-ওয়েলহাওসেন মতবাদ তৈরির পেছনে একজন স্রষ্টা ছিলেন, তিনি বলেছেন, **তুর পাহাড়ে আল্লাহ্ যখন মূসা (আঃ)কে (পাথরের ফলকে) শরিয়াত লিখে দিয়েছিলেন,** তখন যেসব মোজেজা ঘটেছিল, সেগুলো যেভাবে ধাঁধার মতো বর্ণনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বিশ্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, **"কে আসলে সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করবে?**[২]

অনেক আধুনিক শিক্ষক এই ধারণা আজো পোষণ করেন, তাঁরা একই ধারণা

শিক্ষা দিয়ে থাকেন, কারণ তাঁরা নিজেরা মোজেজায় বিশ্বাস করেন না। হিজরতের সময়ে গোটা সিনাই পর্বতের ঘটনার অভিজ্ঞতা কিতাবুল মোকাদ্দসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ল্যাড়ন বি গিলকে, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন,

> "বনি-ইসরাইলরা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ্ কাজগুলো করতে পারেন, আল্লাহ্ কথা বলতে পারেন, তিনি তা করেছেনও, তা বলেছেনও- **কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, তিনি কখনো তা করেননি বা বলেননি।**

কীভাবে বনি-ইসরাইলরা শুকনা পথে সাগর পাড়ি দিয়েছিল, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তিনি বলেছেন,

> **"আমরা এর মধ্যে কোনো মোজেজার বিষয় দেখতে পাই না।** তিনি বলেছেন, এটি কেবল পূবালী বাতাসের দ্বারাই ঘটেছিল। তারপরও আমরা একে বনি-ইসরাইলীদের বিশ্বাসের অসাধারণ সাড়া হিসেবে দেখেছি।"[৩]

এই কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে, তাঁরা বিশ্বাস করেছেন মোজেজা ঘটা অসম্ভব বলেই; যেসব গুরুত্বপূর্ণ মোজেজা আমরা উল্লেখ করেছি, এগুলো ঘটার কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন।

> এটি অসম্ভব যে, হজরত ইব্রাহীমের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন।

---

[২] *Israelitische und Juedische Geschitchte,* p 12.

[৩] *Cosmology, Ontology, & the Travail of Biblical Language,* Concordia Theological Monthly. Mar. 1962, Vol. 33, p 148-150.

এটি অসম্ভব যে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হজরত মূসা (আঃ) শরীয়ত পেয়েছিলেন।

আল্লাহ্ যখন তাঁর শক্তিতে সাগরের পানিকে দু'ভাগ করেছিলেন, আর ফেরাউন ও তাঁর বাহিনী পানির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে পানি আবার ফিরে এসে তাঁদের ডুবিয়ে মেরেছিল, এই মোজেজা আর কখনও ঘটেনি।

মৌলানা ইউসুফ আলী তাঁর অনুদিত কোরআনে এই ধরনের তত্ত্বের যৌক্তিক ফল যে খারাপ, ২৮৩ পৃষ্ঠায় সে সম্পর্কে সতর্ক করে লিখেছেন,

"এই মতবাদে বিশ্বাসী সমালোচকদের এই ধরণের অভিমত হচ্ছে, আসলেই ধ্বংসাত্মকমূলক। রেনানের মত অনুসারে হযরত মূসা (আঃ)-এর নামে যে রূপকথা প্রচলিত আছে, যে কোনো দিক দিয়ে এরূপ ধারণা বিশ্বাস করতে আমাদের দ্বিধাগ্রস্থ করে।

"— আমরা যেসব ওয়াদা প্রত্যাখ্যান করছি, যেগুলো সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস করি যে, এগুলো মিথ্যে। অর্থাৎ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর অনুপ্রাণীত রাসূলদের কাছে অনুপ্রাণীত কিতাব পাঠাননি।

আবারও এই বিষয়টির ওপর আমাদের জোর দিতে হবে যে, যদি ওহী বলতে কোনো কিছু না থেকে থাকে, যদি ধরে নেয়া হয় যে হজরত (আঃ) নামে কোনো নবীর কোনো অস্তিত্বই কোনোকালেই ছিল না, তাহলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পাশাপাশি কোরআনেরও পতন হবে।

কিতাব লেখার সময়কাল নিয়ে অবিশ্বাস

মোজেজার ওপর এসব লোকের অবিশ্বাস **পুরাতন নিয়মের** কিতাবের লেখার সময়কালের ওপরও প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণ হিসেবে, আমরা দানিয়েল নবীর কথা বলতে পারি। নবুখদনিৎসর রাজার সাথে তাঁর কথোপকথনকে আল্লাহ্ দানিয়েল নবীকে লিখে রাখতে বলেছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দস ও ইতিহাস উভয়ই বলে যে, রাজা নবুখদনিৎসর ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং, আমরা আশা করতে পারি যে, এই কিতাব সেই সময়ে লেখা হয়েছিল।

কিন্তু শীর্ষ সমালোচক বা হাইয়ার ক্রিটিকরা এই কথা বিশ্বাস করেন না। কেন? কারণ হচ্ছে এই যে, অনেক মোজেজার কথা লেখার পরে দানিয়েল ৮:২০-২১ আয়াতে পরবর্তী ৩০০ বছরের রাজনৈতিক ভবিষৎ নিয়ে বিসতৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লেখা আছে.

"তুমি দুই শিংয়ের যে ভেড়া দেখেছো, তা হচ্ছে, মিডিয় ও পারসীক বাদশাহরা। সেই লোমশ ছাগল হলো, গ্রীস রাজ্য, এবং তাঁর দু'চোখের মাঝখানে বড় শিং হলো সেই রাজ্যের প্রথম বাদশাহ।"

রাজা নবুখদনিৎসরের নাতি রাজা বেলশৎসর যখন ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, মিডিয় ও পারসীক জাতি ব্যাবিলন দখল করবে। পরবর্তীকালে গ্রীকরা তাদের পরাজিত করে এই সাম্রাজ্য দখল করবে। এই

ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট আলেকজান্ডারের সময়ে পূর্ণ হয়েছিল। হজরত দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রায় ৩০০ বছরের মধ্যেই তা পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু শীর্ষ সমালোচক বা হাইয়ার ক্রিটিকরা ওহীর মোজেজার ওপর বিশ্বাস করেন না। তাই তাঁরা এই রকম একটি সুন্দর ওহী নিয়ে তাঁরা কী বলেছেন?

তাঁরা বলেছেন যে, যদি হযরত দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পূর্ণ হয়েছিল তাহলে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে **৩৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরে কিতাবটি লেখা হয়েছিল।** এই কিতাবের লেখক হিসেবে হযরত দানিয়েলের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে তাঁর কথা লোকেরা বিশ্বাস করে। অন্য কথায় বলা যায় যে, যেহেতু মোজেজা ঘটা সম্ভব নয় বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন, তাই হযরত দানিয়েলও ভবিষৎ সম্পর্কে বলতে পারেন না। সুতরাং, তাঁর নামে যে কিতাব আছে, তা জাল।

ডঃ বুকাইলি শীর্ষ সমালোচকদের মধ্যে একজনের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, দানিয়েল কিতাব, "অসময়ের অসংলগ্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।"[৪] কিন্তু এটি অসংলগ্ন, এই কথা বলার কারণ হচ্ছে, এটি শত বছরের ইতিহাস সম্পর্কে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।

আরেকটি কারণ হচ্ছে, এটি অসংলগ্ন, এখানে এমন বিষয়ের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা মসীহের আগমন ও বেহেস্তে আরোহন না করা পর্যন্ত ঘটেনি। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জেরুসালেম ও এর প্রথম এবাদতখানা ধ্বংস হওয়ার ৩০ বছর পরের কাহিনী বলা হয়েছে। এখানে **ভবিষ্যদ্বাণী** করা হয়েছে, (১) **জেরুসালেম ও এবাদতখানা আবার নির্মাণ করা হবে।** (২) **মসীহ্ আসবেন।** (৩) তবে **তাঁকে মেরে ফেলা হবে, তবে তিনি নিজের জন্য মরবেন না।** (৪) **সরকারের লোকজন এসে শহর আর এবাদতখানা ধ্বংস করবে।** রোমীয় সেনাপতি তিতের সৈন্যরা এসে ৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল।

শীর্ষ সমালোচকরা ও ডঃ বুকাইলির এসব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে বলার কিছুই নেই। বিশেষভাবে শেষের ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত দানিয়েলের লেখার ২০০ বছরেরও বেশী সময় পরে সফল হয়েছিল। ডঃ বুকাইলি নিজে স্বীকার করেছেন যে, হযরত দানিয়েল এই ভবিষৎদ্বাণী লিখেছিলেন।[৫] তাঁরা এই বিষয়গুলোকে অবজ্ঞা করেছেন। তবে, আমরা এই ভবিষৎদ্বাণীগুলোকে অবজ্ঞা করতে পারি না। কিতাবুল মোকাদ্দসের নির্ভুলতা প্রমাণ করার জন্য পরের অধ্যায়ে আমরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

---

৪ বুকাইলি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৩৫

৫ বুকাইলি, উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৩৫, তিনি লিখেছেন, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ম্যাকাবিয়ান আমলে এটি রচিত হয়ে থাকবে। দানিয়েল কিতাবের অংশবিশেষ ডেড সি স্ক্রোল এর মধ্যে পাওয়া যাওয়ায় আমাদের এই অসম্ভব কথাকে প্রমাণ করেছে। আগের পাণ্ডুলিপির অনুলিপি যা আমাদের হাতে আছে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগের লেখা নয়। কমকরে হলেও ম্যাকারিয়ানদের ২০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল।

১. ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবর্তন

যেভাবে ডারউইন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ও হেগেল ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের ধারণা প্রয়োগ করেছেন, সেভাবেই শীর্ষ সমালোচকরা বলেছেন আর বিশ্বাস করেন যে, বিবর্তনের মাধ্যমে ধর্মীয় বিকাশ ঘটেছিল, আর আদি মানুষের আত্মার ওপর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এর শুরু হয়েছিল, আর এর শেষ পরিণতি হলো, এক আল্লাহবাদ বা তৌহিদে বিশ্বাস করা। ওয়েলহাউসেন প্রাক-ইসলাম ও ইসলাম পরবর্তী যুগে আরবে হেগেলের মতবাদ ব্যবহার করেছেন, এমনকি ইসরাইলের ধর্মের বিকাশ বুঝানোর জন্য একটি পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করেছেন।

ওয়েলহাউসেন ও অন্যান্য সংস্কারবাদী সমালোচকদের দৃষ্টিভংগীকে জি.ই. রাইট এ'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> "গ্রাফ-ওয়েলহাওসেন ইসরাইলের ধর্মীয় ইতিহাসকে নতুনভাবে গঠন করেন। কার্যতঃ তিনি স্বীকার করেছেন যে, পুরাতন নিয়মের মধ্যেই আমরা পরিপূর্ণ বিবর্তনের উদাহরণ দেখতে পাই। এখানে গোষ্ঠীপিতাদের আমলে সর্বপ্রাণবাদ থেকে শুরু হয়ে এক আল্লাহবাদে (তৌহিদ) বিশ্বাসের বিবর্তন রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই মতবাদ পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। **গোষ্ঠীপিতারা (খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ সালে হযরত ইব্রাহিম ও তাঁর সন্তানের আমলে) গাছপালা, পাথর, ঝরনা, পর্বত ইত্যাদিতে অবস্থিত রূহের এবাদত করতো**। প্রাক-নবীদের আমলে (খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালে) আল্লাহ্ ছিল, তাঁদের গোত্রীয় আল্লাহ, তাঁর ক্ষমতা ইসরাইলের মধ্যেই সীমিত ছিল— নবীরা ছিলেন প্রকৃত প্রবর্তক, এক আল্লাহ্ মতবাদের (তৌহিদ) উদ্ভাবক— ।[৬]

এভাবে, তাঁদের তত্ত্ব অনুসারে, প্রথমে ছিল সর্বপ্রাণবাদ, তারপর গোত্রীয় আল্লাহ, সবশেষে ইসরাইলের ইতিহাসে সার্বজনীন, সুস্পষ্টভাবে এক আল্লাহবাদ (তৌহিদ) প্রচলিত হয়।

শীর্ষ সমালোচক বা হাইয়ার ক্রিটিকরা এই ধারণা থেকে শেষে বলেছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষার কোন স্তরে তা ব্যবহৃত হচ্ছে এর ওপর ভিত্তি করে সেই সাহিত্যকর্ম কোন সময়ে রচিত হয়েছে, সেই কথা বলা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে যে **উচ্চ ধারণা হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর সন্তানদের ছিল বলে তওরাতে দেখানো হয়েছে, বাস্তবে এ ধরনের চিন্তা করা তাদের পক্ষে *অসম্ভব* ছিল।**

আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে মানষিক ও রূহানি দিক দিয়ে তাদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এক আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে ওয়েলহাওসেন মন্তব্য করেছেন যে, *"প্রাথমিক যুগে এমন ধর্মতত্ত্বীয় সারকথা তাদের শুনার কথা নয়।"*[৭]

---

[৬] *The Study of the Bible Today and Tomorrow.* Edited by Harold R. Willoughby. U. of Chicago Press, Chicago, 1947, p 89-90.

[৭] *Prolegomena to the History of Israel,* Julius Wellhausen, Adam and Charles Black, Edinburgh, 1885, p 305.

এ থেকে একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত এভাবে নেয়া যেতে পারে। যেহেতু আগেই ধরে নেয়া হয়েছে যে, **ধর্মে বিবর্তন** হয়েছিল, তাই তওরাতে হযরত ইব্রাহিমের যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তা বাস্তবের সাথে খাপ খাওয়ানো যায় না। পয়দায়েশ ২২:১৮আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আর তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি রহমত পাবে।"

কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের জন্য এটি সত্য হতে পারে না। সেই তত্ত্ব অনুসারে তাঁদের চেতনা এতটা উন্নত ছিল না, তিনি জানতেন না যে, সারা দুনিয়ায় সমস্ত জাতিদের জন্য একজন মাত্র আল্লাহ্ আছেন। **সুতরাং, তওরাতের এই আয়াত ১০০০ বছর পরে লেখা হয়েছিল।**

কিন্তু যদি এই যুক্তি সঠিক হয়, তাহলে কোরআন সম্পর্কে কী বলা যায়? শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আন আম ৬:৭৯ আয়াতে হযরত ইব্রাহিম বলেছেন,

> "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নহি।"

শীর্ষ সমালোচনা তত্ত্ব বা হাইয়ার ক্রিটিকাল থিওরী বলে যে, হযরত ইব্রাহিম এই কথাগুলো বলতে পারেন না, কারণ তিনি গাছপালা ও পাথরের মধ্যে *থাকা রূহের এবাদত করতেন। সুতরাং, যদি* "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" *মতবাদকে সত্য বলে ডঃ বুকাইলি গ্রহণ করেন; তাহলে এই কথা* বলা যায় যে, তওরাতের পাশাপাশি কোরআনেও অসত্য কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া, আদিম সংস্কৃতির ওপর সমপ্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে যে, "ধর্মে বিবর্তনবাদ ''মতবাদ একেরারেই মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। ডন রিচার্ডসন তাঁর লেখা Eternity in Their Hearts[৮] বইয়ে উপসংহারে দেখিয়েছেন যে, সর্বপ্রাণবাদ ও বহু আল্লাহবাদের পাশাপাশি, প্রায় সব আদিম গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, একজন সর্বোচ্চ মহান সৃষ্টিকর্তা - আল্লাহ্ আছেন, যিনি আসমান ও দুনিয়া সৃষ্টি করছেন। এর সাথে আরও বলা যায়, এই গোত্রগুলোর মধ্যে প্রায় সময়ে দেখা যায় যে, একটি কাহিনী আছে, এই কাহিনীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন সেই সর্বোচ্চ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল।

আসলে সত্যিকার অর্থে এই পরিস্থিতি কি হজরত মোহাম্মদের সময়ে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে ছিল না। হজরত মোহাম্মদের পিতার নাম ছিল আব্দুল◌াহ। আর কোরআনে এই কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্ হলেন সর্বোচ্চ দেবতা। অন্যরা হলেন, ছোটখাটো দেবতা, যারা কুরাইশদের পক্ষে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করতো।

সুতরাং, নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য ধর্মে বিবর্তন মতবাদের বিপক্ষে কথা বলে। এটি **কিতাবুল মোকাদ্দসের** শিক্ষাকে সমর্থন করে, যেখানে বলা হয়েছে, মানুষ প্রথম থেকেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে জানতো। তারপর পাপের কারণে তারা নিজেদেরকে পৃথক করেছিল।

---

[৮] Regal Books, Ventura, California, 1981

২ক. হযরত ইব্রাহিমের সমকালীন সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথা

ওপরে ২ নং পয়েন্টে আমরা দেখেছি যারা সমালোচনা করে বলেছে, হযরত ইব্রাহিমের সামাজিক প্রথা কেবলমাত্র রূপকথা আর কল্পকাহিনী, কিন্তু তাঁদের চিন্তা ভুল ছিল। কারণ ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের নাজি ফলকে এই প্রথা যথাযথভাবে লেখা আছে।

ক. এই ফলকে অনেক বন্ধ্যা মহিলার কথা লেখা আছে। যেমন একজন বন্ধ্যা মহিলা দাসীর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের একজন সন্তান পাওয়ার জন্য তাঁর স্বামীকে তাঁদের দাসীকে বিয়ে করতে বলেছিলেন। যেভাবে বিবি সারা তাঁর দাসী হাজেরাকে বিয়ে করার জন্য হযরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন। "নূজী ফলকে প্রাপ্ত একটি বিয়ের চুক্তিতে দেখা যায়, যদি কনে কেলিম-নিনু কোনো সন্তান জন্ম দিতে না-পারেন তবে তাঁর স্বামীর জন্য শেনিমা নামে একজন দাসীকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য লিখিতভাবে অনুমতি দিচ্ছেন। তিনি আরো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, এই মিলনের ফলে যে সন্তানের জন্ম হবে, তাকে কোনোমতেই তার অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত করে তাড়িয়ে দেবেন না।[৯] যেভাবে বিবি হাজেরা ও হজরত ইসমাইলকে বিবি সারা তাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

খ. হযরত ইব্রাহিম কলদয়েমর ও মেসোপটিমিয়ার রাজাদের পরাজিত করেছিলেন বলে তওরাতের পয়দায়েশ সিপারার ১৪ অধ্যায়ে লেখা আছে। এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে শীর্ষ সমালোচক বা হাইয়ার ক্রিটিকরা বলেছেন, এগুলো "বানানো" আর যে পাঁচটি শহর, (সাদুম, আমুরা, অদমা, সবোয়িম ও সোয়র) এগুলোও কাল্পনিক। যদিও এবলা সংগ্রহশালায় (পরবর্তী অংশে আলোচনা করবো) এই পাঁচটি শহরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, পয়দায়েশ কিতাবে ১৪ অধ্যায়ে যেভাবে শহরগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা আছে, ঠিক একই ক্রম অনুসারে সাজিয়ে আর একটি ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০]

আরো বলা যায় যে, পয়দায়েশ ১৪ অধ্যায়ের ভাষায় কতগুলো অনন্য অথবা এমন শব্দ রয়েছে, যা পরবর্তীসময়ে হিব্রু ভাষায় লেখা কিতাবে খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে। "এই ধরনের একটি শব্দ হচ্ছে, 'হানিখ', এটি ১৪ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, "যোদ্ধা-দাস বা যুদ্ধের শিক্ষা পাওয়া দাস"। কিতাবুল মোকাদ্দসে এই শব্দটি কেবল একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শব্দটি হযরত ইব্রাহিমের বাড়িতে জন্ম নেয়া যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাসদের বুঝিয়েছে। কিন্তু এই শব্দ খ্রীষ্টপূর্ব ১৯-১৮ শতাব্দীতে প্রাপ্ত মিসরের "ঘৃণার দলিলে" পাওয়া যায়। এই সময়ে হযরত ইব্রাহিম জীবিত ছিলেন। প্যালেষ্টাইনের তানাখ থেকে প্রাপ্ত ১৫ শতাব্দীর প্রাচীন কুনিফর্ম লেখায় এই শব্দ পাওয়া গিয়েছে।[১১]

---

[৯] *More Evidence That Demands a Verdict,* Josh McDowell, CCFC, San Bernardino, CA 1975, p 74.

[১০] *Evidence That Demands a Verdict,* Josh McDowell, Here's Life Publishers Inc., San Bernardino, p 68.

[১১] *Understanding Genesis,* Naham Sarma, McGraw-Hill, New York, 1966, p 111.

গ. পয়দায়েশ ২৯ অধ্যায়ে হযরত ইব্রাহিমের নাতি হযরত ইয়াকুবের পেছনে পেছনে লাবনের ধাওয়া করে আসার কথা বলা হয়েছে। কারণ, লাবন ভেবেছিলেন, হযরত ইয়াকুব তাঁর গৃহদেবতার মূর্তিগুলো বা "প্রাচীন ইহুদী ধর্মে ভাগ্য গণনার কাজে ব্যবহৃত দেবতার মূর্তি" চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তফসীরকারকেরা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলেন যে, কেন লাবন এত কষ্ট করে এইগুলো উদ্ধার করার জন্য হজরত ইয়াকুবের পেছনে পেছনে ছুঁটে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি তো স্থানীয় দোকান থেকে তা কিনে আগের মূর্তিগুলোর বদলে সেগুলোকে রাখতে পারতেন। নুজি ফলক আমাদের একজন জামাতার অধিকারের কথা বলে, "যদি তার কাছে শ্বশুরের গৃহদেবতাগুলো থাকে, তবে সে শ্বশুরের সম্পত্তি দখল করতে পারবে।" এই নতুন সূত্র আবিষ্কার আমাদের লাবনের দুশ্চিন্তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তিনি এই ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে, হযরত ইয়াকুব একদিন ফিরে আসতে পারেন আর সেই গৃহদেবতাগুলো ব্যবহার করে, তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন।[১২]

মধ্যপ্রাচ্যের পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস পড়ার পরে সাইরাস গর্ডন "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" বা ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস মতবাদকে ত্যাগ করেছেন, তিনি লিখেছেন,

> "নজু থেকে আবিষকৃত কুনিফর্ম চুক্তিপত্র দেখিয়েছে যে, গোষ্ঠীপিতাদের (হযরত ইব্রাহিম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ইত্যদি) সামাজিক প্রথাগুলো সত্যি ছিল আর হযরত (আঃ)-এর আমলের আগের সময়ে এগুলো লেখা হয়েছিল। এগুলো হযরত (আঃ)-এর আমলের পরে কোনো লোকের বা **জে, ই, ডি বা পি** দ্বারা আবিষকৃত কোনো চরিত্র নয়। "[১৩]

২খ. হারানো হিত্তীয় জাতি

এই নেতিবাচক যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে, যেহেতু হিত্তীয় জাতির লোকদের কথা কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরে আর কোথাও বলা হয়নি, তাহলে কিতাবুল মোকাদ্দস অবশ্যই মিথ্যে, আর এই কথাটি আমাকে ওরষ্টার কলেজে ১৯৪৬ সালে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। যদিও হুগো উইঙ্কলার ১৯০৬ সালেই মধ্য তুরস্কে হিত্তীয় রাজধানী বোগহাজ-কোইতে আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানে কাদা মাটির ফলকের সংগ্রহশালার মধ্যে উইঙ্কলার একটি সামরিক চুক্তির বিবরণী খুঁজে পান। ঈসা মসীহের জন্মের প্রায় ১৩০০ বছর আগে এই চুক্তি মিসর আর হিত্তীয় জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল।

এর সাথে আরো বলা যায় যে, মিসরের মাটির ফলকে লেখা থেকে জানা গেছে, ১২৮৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ওরেন্টস নদীর তীরে কাদেশে দ্বিতীয় রামেসীসের সাথে হিত্তীয়দের এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।[১৪]

---

[১২] "Archeology and the Bible," J. P. Free, *His Magazine,* May 1949, Vol. 9, p 20.
[১৩] "The Patriarchal Age," *Journal of Bible and Religion,* October 1955, Vol. 21, No. 4, p 241.
[১৪] McDowell, *More Evidence,* p 309-311.

৩. হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সময়ে লেখার পদ্ধতি আবিষকৃত হয়নি

আমরা আগে দেখেছি যে, সমালোচকরা এই অনুমান করেছিলেন যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) লিখতে পারতেন না। জুলিয়াস ওয়েল হাউসেন ১৮৮৫ সালে লিখেছিলেন যে, ইসরাইলীদের অবশ্যই শরিয়াত ছিল,

> "কিন্তু সেগুলো লিখিত আকারে ছিল না।"[১৫]

আর হারম্যান স্কুলটস্ ১৮৯৮ সালে বলেছেন,

> "হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর আগের আমলে যেসব কিংবদন্তী চরিত্রের কথা বলঅ হয়েছে, তাঁরা, মৌখিক বর্ণনাকারী ছিলেন (তাঁরা লেখক ছিলেন না), যে সময়ে তাঁরা কথা বলেছেন, তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। তাঁরা এমন সময়ের কথা বলেছেন, যে সময়ের আগে জ্ঞান লিখে রাখার নিয়ম তাঁরা জানতেন না।"[১৬]

তারপর ১৯০২ সালে, জ্যাকুইস ডি মরগ্যান এর নেতৃত্বে ফরাসী পুরাতত্ত্বীয় খনন কাজের ফলে মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকে প্রাচীন সুসা নগরীর পাশে একটি "হাম্মুরাবির আইন সংহিতা" পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০০-২০০০ সালের মধ্যে পাথরে লেখা এই আইন সংহিতা পাওয়া গিয়েছিল। এই বইয়ে ২৮২ টি অংশ বা অনুচ্ছেদ ছিল, এখানে দেখা যায় যে, এই সংহিতার অনেক আইনের সাথে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর শরিয়তের অনেক হুকুমের মধ্যে মিল রয়েছে।

তারপরও, অনেক পুরাতত্ত্বীয় আবিষ্কারের ফলে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-র আমলে তো বটেই এমনকি তারও অনেক অনেক দিন আগেও লোকেরা লিখতে পারতেন। এখানে সেই সব আবিষ্কারের আংশিক তালিকা তুলে ধরা হলো। এই তালিকার মাধ্যমে এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি তুর পাহাড়ে খোদাই করে লেখা পাওয়া গিয়েছে।

১. "১৯১৭ সালে মিসর সম্পর্কে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ এলান গার্ডিনার খোদাই করে সেমিটিক লেখার আদিরূপ প্রথমে তুর পাহাড়ে খুঁজে পেয়ে এই সংকেতলিপীর পাঠোদ্ধার করেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (১৫০০) কেনানীয়রা ছবির মতো অক্ষর দিয়ে খোদাই করে লিখেছিলেন। এ থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সময়ের আগেই বর্ণমালার সাহায্যে লেখা প্রচলিত ছিল।"[১৭]

২. ১৯২৫ সালে শুরু করে ৪০০০ এর বেশী মাটির ফলক ইরাকের প্রাচীন নিনবীর কাছে নুযি শহরে আবিষকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টপুর্ব ১৫০০-১৪০০ সালের মধ্যে এগুলো লেখা হয়েছিল।

৩. ১৯২৯ সালে সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে জিগরেট ও রাস-সমারায় লেখা পাওয়া গিয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪-১৩ শতাব্দীর মাঝে এগুলো লেখা হয়েছিল। এগুলো একেবারেই হজরত

---

[১৫] Wellhausen, op. cit., 1885, p 393.

[১৬] *Old Testament Theology,* Edinburgh, T. & T. Clark, 1898, p 25.

[১৭] "Recent Illumination of the Old Testament," S. H. Horn, *Christianity Today,* June 21, 1968, Vol. 12, pp 925-929.

ইব্রাহিম (আঃ)-এর সমসাময়িক কালে লেখা হয়েছিল। **তওরাতের পুরাতন নিয়মের** কবিতার ভাষার সাথে এই ভাষার মিল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, হিজরত ১৫:২০ আয়াতে বর্ণিত হজরত মরিয়মের গজল ও আর কাজীগণ কিতাবের ৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত দবোরার বিজয় হামদে (খ্রীষ্টপুর্ব ১২ শতাব্দী) যেভাবে ছন্দময় কবিতা লেখা হয়েছিল, তেমনিভাবেই এই ফলককে লেখা হয়েছিল।

৪. ১৯৩৩ সালে সিরিয়ার মধ্য ইউফ্রেটিস এলাকায় মারীতে পুরাতত্ত্বীয় খনন কাজ হয়েছিল। তিন বছর পরে কুনিফর্ম লেখার হাজার হাজার ফলক আবিষকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টপুর্ব ১৭ শতাব্দীতে এগুলো লেখা হয়েছিল।

৫. ১৯৬৪ সালে উত্তর সিরিয়াতে "এবলার ধ্বংসাবশেষ" আবিষকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টপুর্ব ২২ শতাব্দীতে লেখা ১৭০০০ এরও বেশী কাদা মাটির ফলক ১৯৭৪ সালের মধ্যে আবিষকৃত হয়েছিল।

৬. সবশেষে, আমি নিজে ১৯৬১ সালে পেরিসে থাকার সময়ে ডি লা কনকর্ড প্রাসাদে মিসর থেকে আনা ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠা, লম্বা চারকোণা পাথরের স্তম্ভের গোড়াতে বসে দেখেছিলাম যে, এই স্তম্ভের চারদিক হায়ারোগ্লিফিক্স লেখায় ভরা ছিল। ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসীসের আমলে এগুলো লেখা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে, ডব্লু; এফ, অলব্রাইট অক্ষর-বিহীন বিভিন্ন লেখার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর আমলের আগে গোষ্ঠীপিতাদের আমলে এ'ভাবে লেখা হতো। তিনি লিখেছেন,

> "এই বিষয়ে এই কথা বলা যেতে পারে যে, গোষ্ঠীপিতাদের আমলে (মধ্য ব্রঞ্জ যুগে, খ্রীষ্টপুর্বাব্দ ২১০০-১৫০০ সাল) **প্যালেষ্টাইনে** ও সিরিয়ায় লেখার পদ্ধতি কোনো অজানা বিষয় ছিল না। **কমপক্ষে পাঁচ ধরণের লেখার পদ্ধতি লোকদের মাঝে প্রচলিত ছিলঃ** (১) কেনানীয়রা ব্যক্তি বা কোনো স্থানের নাম মিসরীয় হায়ারোগ্লিফিক্স পদ্ধতিতে লিখতেন। এছাড়াও (২) আক্কাদীয় কুনিফর্ম পদ্ধতি (৩) ফোনেশিয়ার হায়ারোগ্লিফিক্স নকশার সাহায্যে গঠিত বর্ণমালা পদ্ধতি (৪) সিনাইয়ের খাড়া অক্ষরের বর্নমালা (৫) উগারিটের কুনিফর্ম বর্ণমালা, যা ১৯২৯ সালে আবিষকৃত হয়েছিল।"[১৮]

---

[১৮] "Archaeology Confronts Biblical Criticism," W. F. Albright, *The American Scholar,* April 1938, Vol. 7, p 186.

[**] এই অংশ Josh McDowell-এর *More Evidence that Demands a Verdict* থেকে সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই বইয়েতে সমালোচকদের অনেক উদ্ধৃতি দেয়া আছে এবং তার সঙ্গে প্রমাণ যে এদের documentary hypothesis ভুল এবং যে তৌরাত ও ইঞ্জিল নির্ভরযোগ্য। যারা এই সব বিষয় আরো বিস্তারিতভাবে জানতে আগ্রহী, তাদের এই বই পড়া উচিত।

সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য আরও প্রমাণ দরকার [**]

যে-কেউ এভাবে আরো বলতে পারেন,

শীর্ষ সমালোচক বা হাইয়ার ক্রিটিকরা বলেছেন যে, তওরাতের হিজরত, লেবীয় এবং দ্বিতীয় বিবরণ সিপারায় যে সব শরিয়ত রয়েছে, তা হজরত মূসার জ্ঞানের তুলনায় অনেক জটিল বিষয় ও আরো বেশী নতুন ধারণা ছিল। পরে “হাম্মুরাবির আইন সংহিতা” আবিষকৃত হয়, এই আইনগুলোও জটিল ছিল, আর এই আইনগুলো কিন্তু হজরত মূসার আমলের ৩০০-৪০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল। [** পৃষ্ঠা ৬৩]

আরো বলা হয়েছে, হজরত ইব্রাহিমকে ব্যাপক ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেমন তাঁকে উর থেকে কলদী (ইরাক) তারপর তাঁকে প্যালেষ্টাইনে আসতে হয়েছিল (পয়দায়েশ ১১ ও ১২)। কিন্তু এই পথ সে-সময়ের মানুষদের অজানা ছিল। কিন্তু, বেবীলনীয় খননকারীরা (মারীতে) হজরত ইব্রাহিমের সমকালীন সময়ের একটি কাদা মাটির ফলক খুঁজে পেয়েছিলেন। এই কাদা মাটির ফলকে একটি গাড়ি ভাড়া করার চুক্তির কথা লেখা আছে। গাড়িটির মালিক এক লোকের সাথে চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তিতে এমন শর্ত লেখা ছিল যে, তিনি গাড়িটি প্যালেষ্টাইন দেশের উত্তরে ভূমধ্য- সাগরীয় তীরে কিত্তীম বন্দরে নিয়ে যেতে পারবেন না। [**পৃষ্ঠা ৭৫]

গুটানো তাঁবু, যাকে মিলন-তাম্বু বলা হয়, এবাদতের জন্য আল্লাহ্ হজরত মূসাকে তা তৈরি করতে বলেছিলেন (তৌরাত- হিজরত ৩৬)। ওই মতবাদে বিশ্বাসীরা আবাসতাম্বুকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, মিলন-তাম্বু সম্পর্কে হজরত মূসার আমলের মানুষের চিন্তার বাইরে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ সালেও, হজরত মূসার সময়ের ১২০০ বছর আগে মিসরীয়দের ভ্রাম্যমান একটি চাঁদোয়া-যুক্ত-শয্যা ছিল, যা তাঁরা রানীর জন্য ব্যবহার করেছেন। এর চারদিকে লম্বা খুঁটি ছিল, ওপরে আনুভূমিক ছাদ কড়িকাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সেটি সোনা দিয়ে মোড়ানো ছিল এবং তাঁবুটি দ্রুত স্থাপন করা ও গুটিয়ে ফেলার জন্য খুঁটিগুলো চুঙ্গির মধ্যে ঢুকানো ছিল। [**পৃষ্ঠা ১১০]

ওয়েলহাওসেন বলেছেন, “অজুর পাত্র তৈরি করার জন্য ইহুদী মহিলারা যে ব্রঞ্জের আয়না দান করেছিলেন (তৌরাত, হিজরত সিপারা ৩৮:৮) তা অসম্ভব ছিল; কারণ, অনেকদিন পরেও লোকদের কাছে আয়না একটি অজানা বিষয় ছিল। কিন্তু এখন সুনির্দিষ্টভাবে পুরাতত্ত্বীয় আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১৪০০ বছর আগে মিসরীয় সম্রাটদের সময়ে লোকেরা আয়না ব্যবহার করতেন।[১৯]

এই সব আধুনিক প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কারের আলোকে, এটি দুঃখজনক যে ডঃ বুকাইলি ই. জ্যাকবের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই উদ্ধৃতিতে তিনি বলেছেন,

---

[১৯] বুকাইলি, *বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান*, পৃষ্ঠা ৪

“পুরাতন নিয়মে হজরত মূসা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীপতিদের যে কাহিনী বলা হয়েছে, তাতে খুব সম্ভব ধারাবাহিক ইতিহাসের ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে-একান্ত প্রক্ষিপ্তভাবেই—" (গাঢ় অক্ষর আমি করেছি)।[২০]

ডঃ বুকাইলির এই উদ্ধৃতির সাথে নিম্নের উদ্ধৃতির মাঝে কী উল্টো কথাই না বলা হয়েছে। আমাদের সমকালীন সময়ে বিখ্যাত তিনজন পুরাতত্ত্ববিদদের মধ্যে অন্যতম- নেলসর গ্লইক, যিনি, সিনাসিনাটি রাজ্যের ওহিও শহরের ইউনিয়ন কলেজে যিয়ুইশ থিওলজিকাল সেমিনারীর ভুতপূর্ব সভাপতি ছিলেন, তিনি এই কথা বলেছেন:

“—আমরা সমস্ত পুরাতত্ত্বীয় গবেষণায় আমি একটিও নৃতাত্বিক জিনিস যা আল্লাহ্‌র কালামকে মিথ্যে প্রমাণিত করে এমন কোনো কিছু আজ পর্যন্ত কখনও খুঁজে পাইনি **(তৌরাত, পুরাতন নিয়ম)**।[২১]

৪. হজরত মূসার অনেক পরে অনেকগুলো কিতাব একত্রিত করে তৌরাত লেখা হয়েছিল

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা খসড়া রূপরেখায় আমরা দেখেছি যে, গ্রাফ ও ওয়েলহাওসেন বলেছিলেন যে, কমপক্ষে ৪টি কিতাব একসাথে গ্রথিত করে বর্তমান যে তৌরাত রয়েছে তা লেখা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে লোকেরা ধারণা করেছে যে, আরো অনেক বেশী -১০, ১৫, ২০টি কিতাব একসাথে মিলিয়ে তা লেখা হয়েছে বলে প্রমাণ খুঁজেছে। শব্দ ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে তারা এই বিভাগ করেছে।

এদের সবচেয়ে সুপরিচিত উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এই বিভাজন করা হয়েছে। এলোহিম, এই নামটি পয়দায়েশ সিপারার ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। আর জিহোবা নামটি ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে, যখন এলোহিম লেখকরা বলেছেন “**ই**”, এবং যিহোবা লেখকরা বলেছেন “**জে**”, আর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে একজন একই ঘটনা কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে একজন সংকলক সবগুলো বিবরণকে একই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন খন্ডে বা রুকুতে বর্ণনা করেছেন। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা হজরত ইসহাকের নাম রাখার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি। ইসহাক নামের অর্থ হাসি।

পয়দায়েশ সিপারার ১৭ অধ্যায়ে আমরা পড়ি যে, কীভাবে আল্লাহ্‌ ফেরেশতার মধ্য দিয়ে হজরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি ছেলে হবে। ১৫-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

---

[২০] McDowell, *Evidence*, পৃষ্টা ২২

[২১] ওপরে উল্লেখিত বই, Presses Bibliques Universitaires, rue de l'Ale 29, 1003 Lausanne, Switzerland, 1979, p 234 (লেখকের অনুবাদ)

"আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলে ডেকো না; তার নাম সারা [রানী] হলো। আর আমি তাকে আশীর্বাদ করবো এবং তা থেকে এক পুত্রও তোমাকে দেবো; আমি তাকে আশীর্বাদ করবো, তাতে সে জাতিদের [আদি-মাতা] হবে, তা থেকে নানা দেশের বাদশাহ্দের জন্ম হবে।"

তখন ইব্রাহিম সিজদায় পড়ে হাসলেন, মনে মনে বললেন, 'একশো বছর বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হবে? আর নব্বই বৎসর বয়স্কা সারা কি প্রসব করবে?'

—তখন আল্লাহ্ বললেন, "তোমার স্ত্রী সারা অবশ্যই তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে এবং তুমি তার নাম ইস্হাক [হাসি] রাখবে, আর আমি তার সাথে আমার চুক্তি কায়েম করবো, তা তার ভবিষৎ বংশধরের জন্য চিরস্থায়ী চুক্তি হবে।" (হিব্রু ভাষায় ইসহাক শব্দের অর্থ সে হাসে)।

কিছু দিন পরে আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিমের সাথে আবারও কথা বলেন, বিবি সারাকে শুনিয়ে আবারও সেই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন। এটি পয়দায়েশ ১৮:১০-১৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

তখন তাঁদের একজন বললেন, "এই ঋতু আবার এলে আমি অবশ্যই তোমার কাছে ফিরে আসবো; আর দেখো, তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র হবে।"

সারা তাঁবুর দরজার পেছন থেকে এই কথা শুনলেন। সেই সময়ে ইব্রাহিম ও সারা বৃদ্ধ ও গতবয়স্কা ছিলেন; সারার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। **এই কারণে সারা মনে মনে হেসে বললেন**, 'আমার এই ক্ষয়ে যাওয়া দেহে কি এ'রকম আনন্দ হবে? এবং আমার প্রভুও তো বৃদ্ধ।'

তখন মাবুদ ইব্রাহিমকে বললেন, 'সারা কেন এই বলে হাসলো — এমন কোনো কাজ আছে কি মাবুদের অসাধ্য? নিরূপিত সময়ে এই ঋতু আবার এলে আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো। আর সারার পুত্র হবে।"

তখন সারা Aস্বীকার করিয়া বললেন, "আমি হাসিনি; কারণ, তিনি ভয় পেয়েছিলেন।"

কিন্তু তিনি বললেন, "অবশ্যই হেসেছিলে।"

সবশেষে, হজরত ইসহাকের জন্মের সময়ে বিবি সারার হাসার কথা তৃতীয়বার বলা হয়েছে। পয়দায়েশ ২১:১-৬ আয়াতে বলা হয়েছে:

"পরে মাবুদ নিজের কালাম মোতাবেক সারার তত্ত্বাবধান করলেন; মাবুদ যা বলেছিলেন, সারার প্রতি তাই করলেন। আর সারা গর্ভবতী হয়ে আল্লাহ্র উক্ত নিরূপিত সময়ে ইব্রাহিমের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর জন্য পুত্র প্রসব করলেন। তখন ইব্রাহিম সারার গর্ভের নিজ পুত্রের নাম ইসহাক, [হাসি], রাখলেন। পরে ঐ পুত্র ইস্হাকের আট দিন বয়সে ইব্রাহিম আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার খত্না করলেন। ইব্রাহিমের একশো বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইস্হাকের জন্ম হয়।

আর সারা বললেন, **আল্লাহ্ আমাকে হাসালেন; যে এই কথা শুনবে, সেও আমার সাথে হাসবে।"**

সমালোচকরা এই সব আপাতঃদৃষ্টিতে সহজবোধ্য আয়াতগুলো নিয়ে কী করতে পারেন? তাঁরা এই তত্ত্ব বলেছেন যে, এখানে হজরত ইসহাকের নামকরণের বিষয়ে একটি ঘটনারই তিনটি ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আর পয়দায়েশ কিতাবে এই তিনটি ঘটনাকে একসাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাঁরা বিবেচনার জন্য বলেছেন যে, পয়দায়েশ ১৭ অধ্যায়ে প্রথম বর্ণনাটি *পুরোহিত লেখকেরা* করেছেন, দ্বিতীয়টি "**জে**" ডকুমেন্ট আর তৃতীয়টি "**ই**" ডকুমেন্ট বলা হয়। কিন্তু এই কথা ভাবা কি যুক্তিহীন হবে যে, আলাদা আলাদা ভাবে যখন ইসহাকের জন্মের কথা বলা হয়েছিল, তখন তাঁরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে হেসেছিলেন। আর জন্মের সময়ে তাঁরা আনন্দে একসাথে হেসেছিলেন?

Révélation des Origines--Le Début de la Genèse গ্রন্থে খব সুন্দরভাবে গোটা বিষয়টির সারাংশ হেনবী ব্লকার তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "সমালোচকরা, আধুনিক পাশ্চাত্য পাঠক হিসেবে যখন তারা (কিতাবুল মোকাদ্দসের) অভ্যন্তরীণ কোনো ঘটনায় বর্ণিত কোনো বিষয় বিচার করেন, তখন কিতাবুল মোকাদ্দসের যুগে লিখিত প্রথাসমূহ যা ব্যবহৃত হতো, যেগুলো আজ আমরা জানি, সেগুলো সমস্তই অবহেলা করেন। ঘটনার পুনরাবৃত্তির স্বাদ উপভোগ করা, সার্বজনীন বক্তব্যের ভিত্তি ও উন্নয়ন, সমার্থক শব্দগুলো দ্বারা কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি করা, বিশেষভাবে কোনো আয়াতে আল্লাহ্‌র নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা, এগুলো প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে লেখার বৈশিষ্ট্য বলে প্রত্যায়িত করা হয়েছে। — কিতাবুল মোকাদ্দসের **যেভাবে** আয়াত **আছে, সেই** সময়ে সাহিত্য বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্তর্ভূক্ত প্রামাণিক কিতাবসমূহের সাথে একমত পোষণ করে।"

যদি কোরআনের ক্ষেত্রে শীর্ষ সমালোচনা তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়?

আরবী ভাষায় খোদার নাম আল্লাহ, **আল্লাহ্** (**اَللّٰه**) শব্দটি হিব্রু **এলোহিম** ও **রাব্ব** (**الرَّبّ**) শব্দটি হিব্রু আদোনাই (মাবুদ) শব্দের সাথে তুলনা করা যায়। আর আদোনাই শব্দ দিয়ে ইহুদীরা **জিহোবাকে** বুঝাতো। আমরা যখন কোরআনে অনুসন্ধান করি, সূরা ১১, ২৪, ৪৯, ৫৮, ৬১, ৬২, ৭৭, ৮৮, ৯৫, ১০৪, এবং ১১২ সংখ্যা সূরায় **রব** শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি; সূরা ১৮, ৫৪-৫৬, ৬৮, ৭৫, ৭৮, ৮৩, ৮৯, ৯২-৯৪, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১৩ এবং ১১৪ সংখ্যা সূরায় আর **আল্লাহ্** শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। এর সাথে আরো বলা যায়, **তৌরাত- পুরাতন নিয়মের** ইষ্টের কিতাবের মতো মক্কায় প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া ছোট ছোট ১০টি সূরায় আল্লাহ্ নামটিও একবারও ব্যবহার করা হয়নি।

নিচে ৪৮-৬৪ সংখ্যা সূরায় আল্লাহ্ ও রাব শব্দটির ব্যবহার নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমি এই ১৭টি সূরা বেছে নিয়েছি, কারণ এর মধ্যে ৮টি সূরা ওপরের তালিকায় রয়েছে।

সূরার সংখ্যা	সূরা নাজিলের সময়	কতবার "আল্লাহ্" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে	আয়াত সংখ্যা	প্রতি আয়াতে কতবার ব্যবহৃত	কতবার "রব্ব" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে	প্রতি আয়াতে কতবার ব্যবহৃত
৪৮	৬ হিজরী	১৯	২৯	.৬৫	০	০
৪৯	৯ হিজরী	২৭	১৮	১.৫০	০	০
৫০	প্রাথমিক মক্কী যুগ	১	৪৫	.০২	২	.০৪
৫১	প্রাথমিক মক্কী যুগ	৩	৬০	.০৫	৫	.০৮
৫২	প্রাথমিক মক্কী যুগ	৩	৪৯	.০৬	৬	.১২
৫৩	প্রাথমিক মক্কী যুগ	৬	৬২	.১০	৭	.১১
৫৪	প্রাথমিক মক্কী যুগ	০	৫৫	০.	১	.০২
৫৫	প্রাথমিক মক্কী যুগ	০	৭৮	০.	৩৬	.৪৬
৫৬	প্রাথমিক মক্কী যুগ	০	৯৬	০.	৩	.০৩
৫৭	৮ হিজরী	৩২	২৯	১.১০	৩	.১০
৫৮	৫-৭ হিজরী	৪০	২২	১.৮১	০	০.
৫৯	৪ হিজরী	২৯	২৪	১.২১	১	.০৪
৬০	৮ হিজরী	২১	১৩	১.৬১	৪	.৩১
৬১	৩ হিজরী	১৭	১৪	১.২১	০	০
৬২	২-৫ হিজরী	১২	১১	১.০৯	০	০.
৬৩	৪-৫ হিজরী	১৪	১১	১.২৭	১	১.০৯
৬৪	১ হিজরী	২০	১৮	১.১১	১	১.০৬

আমরা যখন এই তথ্য দেখি যে, সূরা ৫৫তে (আর রাহমান) রাব শব্দটি ৩৬ বার - অনুগ্রহ (আল-আলা ءِالَآ) শব্দের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আ-লা শব্দটি কোরআনে একেবারেই কম ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে মাত্র তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা নাজম ও শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আরাফে যথাক্রমে ১বার ও ২বার ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও, আমরা যখন সূরা নাজমের ১৯-২০ আয়াত পড়ি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, এখানে আল-লাত, আল-মানাত ও আল-উজ্জা নামক তিন দেবীর কথা বলা হয়েছে।

একজন শীর্ষ সমালোচক, যিনি "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" বা ডকুমেন্টারী হাইপথিসিসে বিশ্বাস করেন, এখন বলতে পারেন, "আমরা এখানে দেখি যে, মক্কী যুগে "আল্লাহ" শব্দটি কম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতি দশটি আয়াতের মধ্যে একবারের বেশী ব্যবহার করা হয়নি। অন্যদিকে,

সূরা ফাতহ্ ছাড়া মদিনার যুগে প্রতিটি আয়াতে কমপক্ষে একবার হলেও আল্লাহ্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আরো বলা যায়, আ-লা শব্দটি এবং তিনটি দেবীর কথা কেবলমাত্র মক্কী যুগে নাজিল হওয়া এই সূরাগুলোতে পাওয়া যায়। সুতরাং, আমরা এই মক্কী যুগের লেখকদের **"রা"** বলতে পারি, কারণ তারা আল্লাহ্ নামের পরিবর্তে রাব শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ-সব লেখকেরা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের বলা যায়, **"আ"** দলভুক্ত। এসময়ে খাঁটি তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর তারা আল্লাহ্ শব্দটি ব্যবহার করেছে। এই কথা অবশ্যই সত্যি যে, সূরা নাজ্‌মে মানাত, আল-লাত, আল- উজ্জার উল্লেখ করা হয়েছে যে, এদেরকে মানা যাবে না। সুতরাং, এই না মানা বিষয়টিকে পরবর্তী সময়ে **"কো"** বলা যেতে পারে, এই **"কো"** শব্দটি "কুর্‌রা'"(**قُرَّاء**)[22] নামক সংকলকদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যারা দেবীদের বাদ দিয়ে কোরআন সংকলন করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি যে, কোরআনে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, কীভাবে সম্মানিত অতিথীরা হজরত ইব্রাহিমের কাছে এই খবর জানাতে এসেছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটি ছেলে হবে। প্রাথমিক মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা যারিয়াত, ৬১:২৪-৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, হজরত ইব্রাহিমের স্ত্রী সে'কথা বিশ্বাস করেননি আর তিনি নিজেকে 'বৃদ্ধা, বন্ধ্যা' বলেছেন। এই কাজ অবশ্যই "রা" দলের লোকেরা লিখেছেন। শেষ মক্কী যুগের সূরা হিজর, ১৫:৫১-৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে, কীভাবে হজরত ইব্রাহিম সেই খবর বিশ্বাস করেননি, আর বলেছেন, "তোমরা আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও।" যেহেতু এটি শেষ মক্কী যুগের সূরা, সুতরাং, এখানে "আ" লেখকেরা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন।

শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা হূদ, ১১:৬৯-৭৪ আয়াতে "কো" সংকলকদের দ্বারা এই দুটি কাহিনীকে একত্রে জোড়া দেওয়া হয়েছে। এখানে এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছে, এই কথা শুনে হজরত ইব্রাহিমের স্ত্রী হেসেছিলেন।

সবশেষে বলা যায়, মধ্য মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা সাফ্‌ফাত (শ্রেণীবদ্ধকারীগণ) ৩৭:৯৯-১০৩ আয়াতে গুরুত্বের সাথে হযরত ইব্রাহিমের সন্তান কোরবানীর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু কোরবানীর কথা এখানে বলা হয়েছে, তাই আমরা এই দলের সংকলকদের "জ" বলতে পারি, কারণ কোরবানীকে আরবীতে আল-যাবীহ (**اَلْذَّبِيحة**) বলা হয়।

পাঠকেরা দেখেছেন যে, আমরা কোরআনে ৪ ধরনের সংকলকদের দেখতে পেয়েছি। আমরা এদেরকে **"রা"**, **"আ"**, **"কো"**, **"জ"** তত্ত্ব বলতে পারি। যদিও এই **"রা"**, **"আ"**, **"কো"**, **"জ"** **তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক**, এটি দেখায় যে, এক ধরনের খামখেয়ালী যুক্তি দেখায় যা "অনুমিত

[22] "কুর্‌রা" (একবচন--"কারী") হল তারা, যারা কোর'আনের সঠিক উচ্চারণে তেলাওয়াত করতে জানে

পরিকল্পনা দলিল” বা ডকুমেন্টারী হাইপথিসিস মতবারে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন। যদি তারা কোরআনের ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রযোগ করে তাহলে কী হবে, তা এখানে দেখানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

এই সব প্রমাণের আলোকে এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে, কঠিন হৃদয়, অবিশ্বাসী ছাড়া, কোনো বিবেকবান মানুষ এমন অবিশ্বাস্য ধারণা পোষণ করতে ও শিক্ষা দিতে পারে। সম্ভবতঃ গ্রাফ ও ওয়েলহাওসেন- তাঁদের জন্য এই অজুহাত কিছুটা থাকতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর পুরাতত্ত্বীয় আবিষ্কারের আগেই তাঁরা এই মতবাদ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক পন্ডিতরা, বিশেষভাবে ডঃ বুকাইলি কেন এই ধরনের মতবাদ প্রচার করছেন, তা বোঝা কঠিন। হেনরী ব্লকার মনে করেন যে, তাঁদের একই **প্রাথমিক অনুমিত বিষয়** থাকায় তাঁরা এই ধরনের কাজ করছেন। “তাঁরা সাধারণভাবে লেখার মধ্যে যে কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃত মতবাদ অর্ন্তভুক্তির বিরোধী ওয়েলহাউসনের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন।”[২৩]

এমন কোনো বস্তগত প্রমাণ নেই যে, জে, ই বা অন্য কোনো সংকলকদের দ্বারা তৌরাত সংকলিত হয়েছিল। আর এমন কোনো ইতিহাস বা ইস্‌নাদ (**اَلإِسْنَاد**)[২৪] নেই যে, কেউ দাবী করতে পারেন যে, সে নিজের চোখে তা দেখেছে।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক- কে, এ. কিচেন বলেছেন,

> “সাহিত্যিক সমালোচনার (জি, ই, ডি, পি ইত্যাদি মৌখিক প্রথা) প্রচলিত নিয়ম ও শূন্যের উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাদের বিচারের মাণদন্ডের গুরুত্বহীনতা প্রমাণ করা যেতে পারে। কীভাবে লেখকরা *আসলেই* কিতাবুল মোকাদ্দস লিখেছিলেন, এর সাথে তুলনা করা হলে আমরা এই তত্ত্ব যে একেবারেই ভুল তা প্রমাণ করা যায়। নিকট-প্রাচ্যের গোটা কিতাবুল মোকাদ্দসের সমাজের লোকদের কাজের ক্ষেত্রের সাথে যখন তুলনা করা হয়-তখন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, —এই চিন্তা সম্পূর্ণই বিভ্রান্তিমূলক। পুরাতন নিয়মের কিতাব ও ধর্মতত্ত্বীয় দিক থেকে যখন তাদের পুনঃপ্রকাশ, পুরাতন নিয়মের সমাজ বা লোকদের সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান কর্মক্ষেত্রের সাথে চূড়ান্তভাবে তুলনা করা হয় - **তখন এটি পুরানো হলেও যা আজো আছে এমন কিতাব (পুরাতন নিয়ম) যা নিকট-প্রাচ্যের সাহিত্যের যে কোনো বর্ণনা রীতির সাথে খাপ খায়।** আর মিথ্যে বিচারের মাণদন্ড ও মিথ্যে সূত্র যার ওপর ভিত্তি করে পুনঃনির্মিত ওপরোক্ত মতবাদের সাথে এর কোনো মিল নেই।”[২৫]

---

[২৩] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ২৩৬ (লেখকের অনুবাদ)

[২৪] আরবী শব্দ, এর মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন লোকের মধ্য দিয়ে হজরত মোহাম্মদের কোনো হাদিস বা কোরআন বর্লিত হয়েছে (সনদ)।

[২৫] "The Old Testament in Its Context," K.A. Kitchen, Lecturer in the School of Archaeology and Oriental Studies, Liverpool University; from the Theological Student Fellowship Bulletin, 39 Bedford Square, London, 1972, p 15.

একই সিদ্ধান্ত আমরা পরবর্তী সময়ের লেখক, ইহুদী আলেম উমবার্তো কেসেটোর লেখা বইয়ে দেখতে পাই। *দি ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস* নামক বইয়ে তিনি ছয়টি অধ্যায় জুড়ে পাঁচটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই যুক্তিগুলোকে শীর্ষ সমালোচকরা তাদের তত্ত্বে ব্যবহার করে বলেন যে, হজরত মূসা তৌরাত কিতাব লিখেননি। তিনি ৫টি যুক্তিকে একটি খুঁটি হিসেবে খুঁটি হিসেবে তুলনা করেছেন। যে খুঁটির ওপর নির্ভর করে ঘর গড়ে উঠে। **"অনুমিত পরিকল্পনা দলিল"** বা ডকুমেন্টারী হাইপথিসিসের পেছনে সমর্থনকারী এই খুঁটিগুলো সম্পর্কে কেসেটো উপসংহারে লিখেছেন,

> আমি প্রমাণ করিনি যে, খুঁটিগুলো দুর্বল ছিল অথবা এগুলো মতবাদের পেছনে সমর্থন যোগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু আমি প্রমাণ করেছি যে, এগুলো আসলে কোনো খুঁটিই নয়, এগুলোর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এগুলো কেবলমাত্র কাল্পনিক ছিল।[২৬]

আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কেবলমাত্র চারটি বিষয় বা পয়েন্ট নিয়ে বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমরা কেসেটোর মতো একই কথা বলতে পারি যে, **এগুলো আসলে কোনো খুঁটিই নয়, এগুলোর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এগুলো কেবলমাত্র কাল্পনিক ছিল।**

সবশেষে, আমাদের এই কথাটি বুঝতে হবে যে, ইহুদীদের সম্পর্কে এই তত্ত্ব কিছুটা ধরে নেয় যে, আমাদের মধ্যে মধ্যে কেউ কেউ এই প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। **এই তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে যে, হজরত মূসার সময় থেকে ঈসা মসীহের সময় পর্যন্ত সবাই অসৎ ছিল-তাঁদের মধ্যে কোনো আল্লাহ-ভীরু লোক ছিল না, যিনি নির্ভুল তওরাতের অনুলিপি সংরক্ষণ ও রক্ষা করতে পারেন।** যদিও এমনকি কোরআনও মক্কা ও মদিনা নগরীতে বসবাসকারী ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ করেনি। দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম যে, কোরআন এটি স্বীকার করেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সৎ ছিল আর তারা আন্তরিকভাবেই ধর্ম পালন করতো। শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও পৃথিবীর মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "মূসার সমপ্রদায়ের মধ্যে এমন এক দল রহিয়াছে, যাহারা অন্যকে নাজাতের পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে।"

"অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" বা ডকুমেন্টারী হাইপথিসিস মতবাদ বলেছে যে, তৌরাত কিতাব হজরত মূসা লেখেননি। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, লোকেরা তা বিশ্বাস করে, কারণ কিতাব বিশ্লেষণের সময়ে তাঁরা ভুল ধারণা তৈরি করেছেন। যখন আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন বিশ্লেষণ করি, তখন সাহিত্য বিষয়ে প্রতিভাবান সমালোচক জনাব কোলরিজের নিম্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি আমাদের অনুসরণ করা উচিত। অনেক দিন আগে সাহিত্য বিশ্লেষণ সম্পর্কে তিনি নিম্নের এই মৌলিক নীতিটি অনুসরণ করতে বলেছেন।

---

[২৬] Cassuto, op. cit., Magnes Press, Jerusalem, 1941, 1st Eng. Edition 1961, p 100.

“যখন আমাদের কাছে একজন সুলেখকের কোনো মতকে আপাতঃদৃষ্টিতে ভুল মনে হয়, আমাদের আগে থেকেই মনে মনে এই ধারণা করে নিতে হবে যে, *আমরা তাঁর কথা বুঝতে পারিনি,* যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিশ্চিত হই যে, *আমরা লেখকের অজ্ঞতাকে ধরতে পেরেছি।*”

যেভাবে এরিস্টটল বলেছেন (ডি আরটি পোয়েটিকা, ১৪৬০৬-১৪৬১৬), “**সন্দেহের সুবিধা, বইকে দেওয়া যায়, লেখককে নয়, কারণ তিনি নিজেই তা তাঁর পাঠকদের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে (একগুয়ে মনোভাব) দিয়েছেন।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের ওপর গাঠনিক সমালোচনা (Form Criticism) মতবাদের প্রভাব

গাঠনিক সমালোচনা (Form Criticism)- জার্মানিতে উদ্ভব হয়েছিল। এটি সাহিত্যিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে নতুন নিয়মের বিশ্লেষণ করেছে। অনেকটা **"অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" (ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস)** যেভাবে হজরত মূসার তওরাতের বিশ্লেষণ করে, গাঠনিক সমালোচনাও তেমনিভাবে নতুন নিয়মের বিশ্লেষণ করে। গাঠনিক সমালোচকরা ধরে নিয়েছেন যে, সুখবর বা কতগুলো স্বতন্ত্র; কিতাব বা আলাদা আলাদা সিপারা নিয়ে গঠিত ছিল আর এগুলো মৌখিকভাবে প্রচার করা হতো। ঈসা মসীহের বেহেস্তে গমন ও প্রথম সুখবর সিপারা লেখার মাঝখানে এই ৩০ বছর সময়ের মধ্যে গাঠনিক সমালোচকরা বিশ্বাস করেন যে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিপারাগুলোর নাম দিলেন **"pericopes"**। এগুলো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে লোককাহিনী **যেমন রূপকথা, গল্প, উপকথা ও দৃষ্টান্তের** রূপ নেয়। এসব একক কিতাবের গঠন ও সংরক্ষণ কাজ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে হয়নি, কিন্তু খ্রীষ্টান সমাজের প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই এগুলো নির্ধারিত হয়েছে।

অন্য কথায় বলা যায় যে, সমাজের মধ্যে সমস্যা দেখা দিলে, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ঈসা মসীহের কথা বলেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন; আবার কখনো কখনো ঈসা মসীহের নামে কোনো **নতুন কথা** চালু করেছেন। এভাবে সেই সুনির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়ার সময়ে 'ঈসা মসীহ্ এই কথা বলেছেন' বলে তাঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন।

ডঃ বুকাইলি তাঁর বইয়ের (৭১-৭৬) পৃষ্ঠায় এই পদ্ধতির সুন্দর ও বোধগম্যভাবে এর সারকথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একইসাথে এই কথা বলা যায় যে, তিনি মনে হয় বুঝতে পারেননি যে, যাঁরা এই পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন (একজন সঠিকভাবেই এগুলোকে তত্ত্ব বলতে পারেন, কারণ, এগুলোর মধ্যে প্রচুর প্রাথমিক অনুমিত বিষয় রয়েছে) তাঁরা বিশ্বাস করেননি যে, আল্লাহ্ ফেরেশতা বা পাক-রূহের মাধ্যমে নবীদের কাছে কথা বলেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেননি যে, ঈসা মসীহের বিশেষ ওহী সুখবর কিতাবে রয়েছে।

"গাঠনিক সমালোচনা" তত্ত্বের প্রবর্তক তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত জনাব রূডলফ বাল্টম্যান লিখেছেন,

> "মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার ঘটনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে, তা একবোরেই বোঝা যায় না।"[১]

[১] *Kerygma and Myth,* Rudolph Bultmann, English Trans. Harper and Row, New York, 1961, p 39.

ডব্লিও জে স্পেরো-সিম্পসন আরেকজন গাঠনিক সমালোচকের ডেভিড ট্রাউসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

> “স্ট্রাউসের স্বীকারোক্তির চেয়ে আর কোনো কথা বেশী খাঁটি হতে পারে না। তিনি **বিবেক** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, **পুনরুত্থানের বিষয়টি মেনে †bIqv/স্বীকার করা যায় না**।[২]

সারকথা এই যে, গাঠনিক সমালোচকদের মত অনুসারে ৪টি সুখবর সিপারার লেখকরা ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষী ছিলেন না। ঈসা মসীহের জীবনযাত্রা ও কথা তাঁরা নিজের কানে শুনেননি বা নিজের চোখে দেখেননি। কিন্তু তারা পুরানো উৎসগুলোকে একত্রে জোরে দিয়েছেন আর জামাত এগুলো বিশ্বাস করেছে।

তিনজন গাঠনিক সমালোচনা তত্ত্বের অন্যতম প্রবর্তক মার্টিন ডিবেলিয়াস বলেছেন,

> “— ঈসার ‘সম্পূর্ণ ইতিহাস জানেন এমন একজনও প্রকৃত সাক্ষী ছিলেন না।[৩]

আর এডুয়ার্ড এলউইন সংক্ষিপ্তাকারে বাল্টম্যান্সের ধারণা সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তা নিচে দেওয়া হলঃ

> “এই ঈসা মসীহ্ লোকটি কে ছিলেন? তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন, তিনি কোনো পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্র ছিলেন না (বাল্টম্যান্স এই কথা বলার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি কোনো মোজেজা দেখাননি)। তাঁর কোনো **মসীহের দিপ্তী ছিল না** — (একজন মানুষ) তিনি পুরাতন নিয়মের মহান নবীদের মতো, আইন দ্বারা বৈধ ও আনুষ্ঠানিক, ভ্রান্ত লোক দেখানো এবাদতের নতুন অর্থ দিয়েছেন, সংস্কার করছেন। এবং যাঁকে ইহুদীরা রোমীয়দের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল। এছাড়া আর যা-কিছু বলা হয়, তা সবই **সন্দেহজনক ও কাল্পনিক**।”[৪]

উৎসসমূহ

গাঠনিক সমালোচকদের আল্লাহ্‌র ওহীর ওপর অবিশ্বাসের বিপরীতে সব জায়গায় প্রকৃত ঈসায়ীরা, যাঁদের মধ্যে অনেক আলেম রয়েছেন, আমরা এখন যা বিশ্বাস করি, তাঁরাও তাই বিশ্বাস করতেন, মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে তাঁরা সঠিক ইতিহাস জানতেন। এই কথার মানে এই নয় যে, সুখবর সিপারার সব লেখকরা বা এদের মধ্যে কেউ কেউ যাঁরা ঈসা মসীহের কাজ নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁরা মৌখিক ও লিখিত উৎসসমূহকে ব্যবহার করে সুখবর সিপারাসমূহ

---

[২] "Resurrection and Christ," *A Dictionary of Christ and the Gospels,* Vol. 2, T.&T. Clark, Edinburgh, 1908, p 511.

[৩] *From Tradition to Gospel,* Martin Dibelius, Charles Scribner's Sons, New York, 1949, p 295.

[৪] "Rudolph Bultmann's Interpretation of the Kerygma," *Kerygma and History,* Abingdon Press, New York, 1962, p 34.

লিখেছিলেন, এই কথা খ্রীষ্টানেরা অস্বীকার করেন না। হজরত লূক এই কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,

> "প্রথম হইতে যাঁরা **স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কালামের খেদমত** করেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সমস্ত কিছু জানিয়েছেন, সেই বিষয়াবলীর বিবরণ লিখতে অনেকে হাত দিয়েছেন, সে'জন্য **আমিও প্রথম থেকে সকল বিষয় আগাগোড়া খোঁজ খবর নিয়ে**, হে মাননীয় থিয়ফিল! আপনাকে সমস্ত বিবরণ লেখা উচিত বুঝলাম; এর ফলে, আপনি যা জেনেছেন, সেই বিষয়গুলো সত্য কিনা তা জানতে পারেন।" (লূক ১:১-৪)

হযরত মুহাম্মদও যখন তিনি ৩০০ বছর ধরে পাহাড়ের গুহায় ঘুমিয়ে থাকা খ্রীষ্টানদের কথা বলেছেন, তখনও তিনি অবশ্যই উৎসসমূহকে ব্যবহার করেছেন। এই কাহিনী মধ্য মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-কাহফ (গুহা) ১৮:৯-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে। যদি কেউ এর উত্তরে বলেন যে, "আহ্! হযরত মুহাম্মদ তো এগুলো ওহীর মাধ্যমে জানার পরে কোরআনে লেখতে বলেছিলেন।" ঠিক এই কথাই আমরা খ্রীষ্টান হিসেবে আপনাদের বলতে চাই যে, হজরত লূকও পাক-রূহ্ দ্বারা পরিচালিত হয়েই এই সুখবর লিখেছেন।

যখন ডঃ বুকাইলি ৭৬ পৃষ্ঠায় গাঠনিক সমালোচকদের কথা উদ্ধৃত করে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, প্রোটো মার্ক বা প্রোটো লূক, এই দলিল বা সেই কিতাবের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল এবং যখন তারা বলেন যে, সবকিছুই সন্দেজনক ও কাল্পনিক, তখন তারা তিনটি বিষয়কে অবজ্ঞা করেন।

১. তাঁরা এই বিষয়কে অবজ্ঞা (অবিশ্বাস) করেন যে, ঈসা মসীহের সাহাবীরা যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার সত্যতার প্রমাণ তাঁরা পেয়েছিলেন।

২. তাঁরা ঈসা মসীহের মোজেজা সম্পর্কে সব সাক্ষ্যকে তারা অবজ্ঞা করেছে। যদি শত শত নাও হয়, তবু কয়েক ডজন লোক তো লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। ৫টি রুটি ও ২টি ভাজা মাছকে বরকত দান করে ঈসা মসীহ্ ৫০০০ লোককে পেটভরে খাইয়েছিলেন।

৩. তাঁরা আদি খ্রীষ্টানদের শত্রুদেরও অবজ্ঞা করেছেন; কারণ, এসব লোকেরা যে কোনো মিথ্যে কাহিনীর বিরুদ্ধে দ্রুত দুর্ণাম ছড়াতো।[৫]

---

[৫] গাঠনিক সমালোচনা তত্ত্ব সম্পর্কে আরো পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ বিশ্লেষণ ভালোভাবে জানার জন্য পড়ুন, *More Evidence that Demands a Verdict,* Josh McDowell, CCFC, San Bernardino, CA 1975, পৃষ্ঠা ১৮৩-২৯৯

পরম্পরাগত মৌখিক প্রথা সম্পর্কে অবিশ্বাস

ওপরের কথা হতে এটি স্পষ্ট যে, গাঠনিক সমালোচনা প্রবর্তকরা এই কথা বিশ্বাস করতেন না যে, পরম্পরাগত মৌখিক প্রথা যথাযথভাবে স্মরণে রাখা যায় ও অন্যদের কাছে তা হুবুহু বলাও যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেননি যে, প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টানরা ৩০-৩৫ বছর ধরে ঈসা মসীহের কথা মুখস্থ রাখতে পারেন। যথাযথভাবে তাঁর মোজেজার কথা ততদিন পর্যন্ত স্মরণে রাখতে পারেন, যতদিন না ৬২-৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম সুখবরটি লেখা হয়েছিল।

আমরা জানি যে কেন এসব ইউরোপীয় গাঠনিক সমালোচকরা যথাযথভাবে কোনো ঘটনা বা কথা মুখস্থ রাখা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করেন, কিন্তু ডঃ বুকাইলি কেন তাদের মিথ্যে ধারণা উদ্ধৃত করলেন তা আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন। কারণ, এই কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তিনি কোরআনের হাফিজদের সাথে মেলামেশা করেছেন। তিনি জানেন যে, তাঁরা গোটা কোরআনটাই মুখস্থ বলতে পারেন।

Roots- একটি লোকায়ত উদাহরণ

আলেক্স হ্যালী তাঁর জনপ্রিয় "Roots" উপন্যাসে লিখেছেন যে, ইতিহাস যথাযথভাবে মুখস্থ রাখা ও সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার সামর্থ মানুষের রয়েছে। ১৭৬৭ সালে তাঁর প্র-প্র-প্র-প্র-প্রপিতামহ একজন গ্যাম্বিয়ার লোক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল কোন্টা কিনটি। তিনি ঢোল তৈরি করার জন্য সঠিক একটি গাছ খুঁজে বের করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়েন। তাঁকে আমেরিকায় এনে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। তিনি তাঁর আফ্রিকার ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের বারবার অনুরোধ করেছেন, যেন তারা মনে রাখে তাঁর আসল নাম হলো কোন্টা কিনটি। তিনি তাঁর মেয়েকে শিখিয়েছিলেন যে, আফ্রিকায় একটি নদী আছে, যার নাম কেম্বি বোলংগো (গ্যাম্বিয়ান নদী) এবং গিটারকে বলা হয় "কো"।

এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে লেখক হ্যালী নিজেই গ্যাম্বিয়ার জোফুরী গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একজন গ্রিয়েটের দেখা পান। এই গ্রিয়ট কিনটি গোত্রের ইতিহাস খুব ভালোভাবে জানতেন। যে সব পুরুষ মানুষ, তাঁদের গোত্রের ইতিহাস মুখস্থ রাখেন, তাঁদেরকে গ্রিয়ট বলা হয়। গ্রিয়টরা হলেন মৌখিক ইতিহাসের জীবন্ত সংগ্রহশালা। হ্যালি বলেছেন, এমন কয়েকজন কিংবদন্তি তুল্য গ্রিয়টরা আছেন যারা আফ্রিকার ইতিহাসের সত্য ঘটনাকে বর্ণনা করতে পারেন।[৬]

হ্যালী যখন জুফরী গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন গ্রিয়ট কিনটি গোত্রের ইতিহাস বর্ণনা শুরু করলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ মালী থেকে এসেছিলেন। তাঁরপর একে একে সেই পুর্বপুরুষের সব ছেলেমেয়েদের নাম, তাঁদের বিয়ের কথা, তাঁদের সময়ে সংঘটিত ইতিহাসের সত্য ঘটনা তুলে ধরলেন। প্রায় ২ ঘন্টা পরে গ্রিয়ট বললেন, **"সেই সময়ে রাজার সৈন্যরা এসেছিলেন, ৪ ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়**

[৬] Haley, op. cit,. p 715. চমৎকারভাবে লেখা হয়েছে, এনং তা পড়া উচিত

কুন্টা কাঠ কাটার জন্য বনে গিয়েছিলেন, আর তারপর থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি।[৭] জনাব হ্যালী অশ্রুভরা নয়নে তাঁর জীবনের মহাকাব্যের বর্ণনা শুনছিলেন।

লন্ডনে ফিরে গিয়ে পরবর্তী সময়ে, "রাজার সৈন্য" যাদের গ্যাম্বিয়াতে পাঠানো হয়েছিল হ্যালী সেই রেকর্ড খুঁজে পান। পরে তিনি আফ্রিকায় গ্রিয়টের কাছে লিখেছিলেন, তিনি এত সঠিকভাবে ইতিহাস বলেছেন যে, আমি লজ্জা পেয়েছিলাম; — আমি তাঁকে না জানিয়ে গোপনে তাঁর কথা সঠিক কি-না তা যাচাই করেছিলাম। যে জাহাজ তাঁর পূর্বপুরুষকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল, হ্যালী অনেক অনুসন্ধানের পরে লন্ডনে সেই জাহাজের নামটিও খুঁজে পেয়েছিলেন। — আর আমেরিকায় "নেপলিস" (তাঁর দাদী উচ্চারণ করতেন আন্নাপলিস) বন্দরে সেই জাহাজের পৌঁছার কথা লেখা আছে।

২০০ বছর ধরে এই মূল সত্য ঘটনা আটলান্টিকের উভয় তীরে মানুষদের মাঝে মুখে মুখে একজনের নিকট থেকে আরেকজনের কাছে প্রচার করা হয়েছিল। আফ্রিকায় প্রশিক্ষিত এক গ্রিয়ট থেকে অন্য গ্রিয়টদের মাঝে আর আমেরিকায় প্রশিক্ষণবিহীন নারী-পুরুষদের মাধ্যমে তা স্মরণ রাখা হচ্ছিল।

যদি নারী ও পুরুষ এই লোকায়ত ইতিহাস মুখস্থ রাখতে পারেন আর শত শত বছর ধরে সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, আর মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের পুর্বপুরুষরা সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ রাখতে সক্ষম ছিলেন, এবং ৪০ বছর ধরে হজরত ওসমান (রাঃ)-এর আগে কোরআনের বাণী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, তাহলে কোন যুক্তিতে একজন বলতে পারে যে, খ্রীষ্টানরা ৫০-৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুখবর না লেখা পর্যন্ত ঈসা মসীহের কালাম ও তাঁর জীবনের সত্য ঘটনাগুলো ২০ থেকে ৬০ বছর ধরে যথাযথভাবে মুখস্থ রাখতে ও আরেকজনের কাছে তা বলতে পারবে না।

যদি মুসলমানরা কোরআনের সূরা ইউসুফের (১২ নং সূরা) ১১১টি আয়াত মুখস্থ করতে পারেন এবং সঠিকভাবে অন্যদের কাছে তা বলতে পারেন, তাহলে কোন যুক্তিতে একজন বলতে পারেন যে, খ্রীষ্টানরা মথি ৫-৭ রুকুতে বর্ণিত ঈসা মসীহের পর্বতে দেওয়া উপদেশের ১১১ টি আয়াত মুখস্থ করতে পারবেন না বা অন্যদের কাছে বলতে পারবেন না।

যদি মুসলমানরা বদর ও ওহুদের যুদ্ধের বিবরণ সঠিকভাবে হাদিসে বর্ণনা করতে পারেন, তাহলে কীসের ভিত্তিতে একজন লোক বলতে পারেন যে, যাঁরা ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন, তাঁরা যথাযথভাবে কেন অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করতে পারবেন না।

উহুদের যুদ্ধে হযরত মোহাম্মদের জীবন রক্ষাকারী হজরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে কে ভুলা সম্ভব! এটি চিন্তাও করা যায় না!

---

[৭] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৭১৯

তেমনিভাবে সাহাবীরা ঈসা মসীহের হাতে পেরেকের চিহ্নকে অথবা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর জীবিত হওয়ার পর তাঁদের সাথে ভাজ মাছ খাওয়ার কথা কোনো সাহাবী ভুলতে পারেন? এটি চিন্তাও করা যায় না![৮]

কোরআনের ওপর গাঠনিক সমালোচনা মতবাদের প্রভাব

ডঃ বুকাইলির প্রস্তাবিত "**গাঠনিক সমালোচনা তত্ত্ব**" মেনে নেয়ার আগে আবারও আমি মুসলমান পাঠকদের আরেকবার মনোযোগ দিয়ে ভাবতে বলছি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, ঈসা মসীহ্ যে-কথাগুলো বলেছিলেন, তা ৩০ বছর ধরে তাঁর সাহাবীরা স্মরণ রাখতে পারেননি। আসলে গাঠনিক সমালোচকরা অবশ্যই এই ধারণা করবেন যে, প্রথম সূরা মক্কায় নাজিল হওয়ার পর ২৬ হিজরীতে খলিফা হজরত ওসমানের সরকারীভাবে কোরআন সংকলনের আগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে হজরত মোহাম্মদের কথাও মুসলমানরা স্মরণ রাখতে পারেননি। আর তাহলে এই মতবাদ অনুযায়ী সূরাগুলো হবে উপকথা, কাহিনী, এগুলো সন্দেহজনক ও কাল্পনিক।

যদি খ্রীষ্টান সমাজের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য তারা "Pericopes" অলিক কাহিনী প্রবর্তন করে, তাহলে গাঠনিক সমালোচনা তত্ত্ব অবশ্যই এই কথা বলবে যে, মুসলিম জাতির প্রয়োজন অনুসারে তারাও অলিক কাহিনীর প্রবর্তন করছে। যদি মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়টি একেবারেই ধারণার বাইরে হয়, আর অন্ধদের ভালো করা যদি অসম্ভব হয়, তাহলে দশম হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা মায়িদা (অন্নপাত্র) ৫:১১০ আয়াতে মিথ্যে কথা বলেছে। এই আয়াতে বলা হয়েছে,

> “জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে।”

যদি কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ধারণার বাইরে হয়, তাহলে মধ্য মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা মরিয়ম (ধার্মিকা মহিলার নাম) ১৯:১৯-২১ আয়াতে কীভাবে ফেরেশতা জিবরাইল হজরত মরিয়মকে বলেছেন, যদিও কোনো পুরুষ হজরত মরিয়মকে স্পর্শ করেননি তবু তাঁর গর্ভে একজন পবিত্র পুত্রের জন্ম হবে এবং তিনি এও দাবী করেছেন যে, হজরত মরিয়ম কুমারী ছিলেন। ৭ম হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা তাহরিম (অবৈধকরণ) ৬৬:১২ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “ইমরান-তনয়া মরিয়মের- যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন।”

যদি পাক-রূহ্ দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর নবীদের পরিচালিত করে না থাকেন তবে ২য় হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা (গাভী) ২:৮৭ও ২৫৩ আয়াতে দু'বার অসত্য কথা বলা হয়েছে,

---

[৮] এই সব ঘটনা পাওয়া যায় লুক ২৪:৩৬-৪৯

"আমি (আল্লাহ) মরিয়ম-তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং **পবিত্র আত্মা** (পাক-রূহ্) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি।"

ওহীতে সন্দেহ?!?

এটি অবশ্যই আমাদের আশ্চর্য করে যে, নিজেদের যারা খ্রীষ্টান বলে, তারা কীভাবে এই ধরনের কথা বলতে পারে? কিন্তুমুসসলমান পাঠকদের কাছে এটা আশ্চর্যের কোনো বিষয় হওয়া উচিত নয় যে, যারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা অতিপ্রাকৃত বিষয় বিশ্বাস করেন না। যারা নিজেদের "মুসলমান" বলেন, তাঁদের মধ্যেও কি এমন ধরণের লেখক নেই?

পাকিস্তানী লেখক মাইকেল নজির আলী তাঁর সুচিন্তিত তুলনামূলক বই *"ইসলাম-এ ক্রিশ্চিয়ান পারস্পেকটিভ"* বইয়ে মুসলমান সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁন সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

> "ধর্মতত্ত্বীয়ভাবে স্যার সৈয়দ আল্লাহ্‌র দিকেই ঝোঁকে ছিলেন এবং তিনি মনে করতেন যে, আসলে আল্লাহই এই বিশ্বমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির নিয়ম সৃষ্টি করছেন। আল্লাহ্ প্রকৃতির নিয়মের ওপর হস্তক্ষেপ করেন না, এবং মানুষের বিষয়ে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপের বিষয়েও সম্পূর্ণভাবে একই কথা বলা যায়— ।
>
> "**— স্যার সৈয়দ কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী ঈসা মসীহের কুমারীর গর্ভে জন্মলাভের বিষয়টি মেনে নিতে Aস্বীকার করেছেন**। তিনি মনে করেছেন যে, এই ধরনের একটি জন্ম প্রকৃতির নিয়মের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়, আর এই কারণে এটি করা অসম্ভব। কোরআনের সাক্ষের সাথে এর সমন্বয় করার জন্য তিনি কিছুটা দুর্বল ব্যাখ্যা তৈরি করছেন। তিনি বলেছেন, "যখন কোরআন মরিয়মের কুমারীত্বের সম্পর্কে বলে, তখন এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি কেবল তাঁর স্বামীi সাথে মিলিত হয়েছেন! কোরআনের আয়াত পরীক্ষা করলে আমাদের দেখায় যে, এই ধরনের অবস্থার কথা ভাবা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর এটি আসলে সত্য যে, কোরআনের কোনো কোনো যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন তাফসীরকারী এই সত্যকে Aস্বীকার করতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু পারেননি, এর কারণ হচ্ছে কোরআন মরিয়মের কুমারীত্বের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।
>
> "— স্যার সৈয়দ বারবার কোরআনের নির্ভুলতার ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস দৃড়তার সাথে তুলে ধরেছেন। আর কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি একেবারেই স্পষ্ট, তবে আল্লাহ্‌র ওপর তাঁর এই বিশ্বাসের সাথে কোরআনের অতিপ্রাকৃতবাদকে কোনো মতেই সমন্বয় করা যায় না।[৯]

ওয়াহাবীদের মতো গোঁড়া মুসলমানরা স্যার সৈয়দের এই ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। একইভাবে গোড়া খ্রীষ্টান- যাঁরা মোজেজা ও ইঞ্জিল সত্য বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা

---

[৯] The Paternoster Press, Exeter, 1983, p 109-110.

অতিপ্রাকৃতবাদ বিরোধী **প্রাথমিক অনুমিত বিষয়, গাঠনিক সমালোচনা** ও **"অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" (ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস)** এই সব মতবাদকে শয়তানের মিথ্যে কথা বলে বিবেচনা করেন।

কিন্তু এখন এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই মতবাদ কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। উভয় কিতাবে দেখা যায় যে, ঈসা মসীহ্ মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন। এই ঘটনাকে যদি ইঞ্জিল শরীফে মিথ্যে বলা হয়, তবে কোরআনে বর্ণিত উক্ত ঘটনাও মিথ্যে। আর এতে দেখা যাবে, কোরআনে পরিবর্তন করা হয়েছে, রদবদল এবং বিকৃত করা হয়েছে। আর এই ধারণা একজন মুসলমান কখনোই গ্রহণ করতে পারে না।

পরবর্তী অধ্যায়ে কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফের এই বিকাশ আমরা দেখবো। আর আশাকরি এটি সবার কাছে স্পষ্ট হবে যে, গাঠনিক সমালোচনার ভিত্তি হিসেবে কোনো প্রকৃত দালিলিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই; কারণ, এগুলো ওপরে বর্ণিত জার্মান ধর্মতত্ত্ববীদদের কল্পনার দ্বারা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার আগে আমি একটি আধুনিক পেরিকপি বা নমুনা উপস্থাপনা করতে চাই।

সংখ্যা ছাড়াই একটি ছোট্ট অধ্যায়- কেবল একটি Pericope বা নমুনা -সমাজের প্রয়োজনের জন্য

সম্প্রতি ডঃ বুকাইলি আরও একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম *L'Homme D'Ou Vient-il?* । এই বইয়ে তিনি বিবর্তনের প্রমাণগুলো মূল্যায়ন করেছেন আর এর দুঃখজনক ভুলটি খুঁজে পেয়েছেন।

তিনি সুপরিচিত বিবর্তনবাদী জে. মনোড এর লেখা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাঁর লেখা *"Le Hasard et la nécessité"* বইয়ে স্বীকার করেছেন যে, নতুন জিন তৈরির উপাদানের উৎস কী তিনি তা ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি এই কথাগুলো বলেছেন,

"দুর্বোধ্য বিষয় হচ্ছে জেনেটিক কোডের উৎপত্তি আর কীভাবে এর স্থানান্তর ঘটে। আসলে এটি কেবল এমন একটি সমস্যা নয়, যার সমাধান কেউ না কেউ বলতে পারে বরং একটি প্রকৃতই অর্থেই ধাঁধার বিষয়।" ৮২ পৃষ্ঠা

অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে ডঃ বুকাইলি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, পরিবর্তনশীল ধারার কারণে চান্স মিউটেশন চোখের মতো জটিল অংগের ক্ষেত্রে অথবা পাখি কিংবা বানরের সহজাত সক্রিয়তার বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না। জটিল প্রোটিন অনুর বিকাশ ও ক্রমবিন্যাস যা জিনের জেনেটিক কোডের মধ্যে জমা থাকে, সেটাও ব্যাখ্যা করতে পারে না। ৫১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, নতুন অনু গঠনের ধারণা জটিল থেকে জটিলতর ব্যাপারটি, আকস্মিক ঘটনার কারণে ঘটে এই বিষয়টি বিবেচনা করার চিন্তাভাবনা কোনো প্রশ্ন না করেই বাদ দিতে পারি। আকস্মিক ও অদৃশ্য পরিবর্তনগুলো এমনকি যদিও প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা সংশোধিত হয়, তবু তা কখনই এমন একটি অগ্রগতির সম্পূর্ণ ক্রমবিন্যাস অনুসারে ঘটে এই নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।

অথবা অন্য কথায় বলা যায়, **আকস্মিক ঘটনা কোনো কারণ হতে পারে না!!!** - এই সিদ্ধান্তের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। পরে তিনি প্রশ্ন করছেন,

কেন বিবর্তনবাদকে একটি সত্য তথ্য বলে দাসের মতো গ্রহণ করা হয়?

ডঃ বুকাইলি একটি অপ্রমাণিত সত্যকে প্রায় সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, তিনি বলেছেন,

> "দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন চাঞ্চল্যকর, কিন্তু ভ্রান্ত তথ্য - প্রায় সময়েই যেগুলো তাদের চেপে রাখা মনের ভাব প্রকাশ করে আর তা তাদের অজানা, সেগুলো সমস্ত বিচারের গুরুত্বপূর্ণ রায়ের তুলনায় আরো অনেক তাড়াতাড়ি জনগনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। "পৃষ্ঠা-১১

“এটা (তথ্য) এমনকি আরো বেশী লোকদের ওপর প্রভাব ফেলে, যিনি এটি উপস্থাপন করেন আর মানুষের মনের ওপর ছবির প্রভাব আরো অনেক বেশী হয়, উদাহরণ হিসেবে প্রাইম টাইম টেলিভিশনের কথা বলা যায়।” পৃষ্ঠা-১১৮

তারপর তৃতীয় অনুচ্ছেদে তিনি নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেন,

“কিন্তু যদি আমরা আসল (প্রকৃত) জিনিস না দেখি, তাহলে এমনকি যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানও আমাদের মিথ্যে ধারণা তৈরি করতে পরিচালিত করে। কতগুলো নির্দিষ্ট তত্ত্বের ক্ষেত্রে তা ঘটে, উদাহরণ হিসেবে আমরা নিও-ডারউইনিজমের কথা বলতে পারি— । পৃষ্ঠা ৪৮

ডঃ বুকাইলি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখেছেন। এই কথাগুলো সমভাবে **“অনুমিত পরিকল্পনা দলিল”ও গাঠনিক সমালোচনা** মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সব লোকেরা এই তত্ত্বের সৃষ্টি করেছেন- **তাঁরা প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পারেননি।** তাঁদের এতো সব যুক্তি খাটানো সত্ত্বেও এর **ফল হচ্ছে মিথ্যা।**

যারা আধুনিক যুগে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ-হ্যাকাররা তাঁদের কম্পিউটার সম্পর্কে কিছুটা কম মার্জিত ভাষায় একই কথা বলেন। তাঁরা সমাজের প্রয়োজনে নিম্নের পেরিকোপি প্রবর্তন করেছে।

এতে জঞ্জাল (মিথ্যে তথ্য) ভরো,

আর জঞ্জাল (মিথ্যে সিদ্ধান্ত) বের হয়ে আসবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যে তুলনা

কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফের ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যে তুলনা করার সময়ে দ্বিতীয় অংশে ইঞ্জিল শরীফের তাহরিফ বা উদ্দেশ্যমূলক রদবদল সম্পর্কে কোরআন কী বলেছে তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। আর আমরা দেখেছি যে, কোনো কিতাবই এই অভিযোগ সমর্থন করেনি। উভয় কিতাব এই তথ্যকে সমর্থন করেছে যে, **মক্কা ও মদিনায় ১ম হিজরীতে মোহাম্মদের কাছে নির্ভুল কোরআন ও ইঞ্জিল শরীফ ছিল।**

এই অধ্যায়ে ষষ্ঠ অংশে আমরা অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা এই বিষয়টি দেখতে চাই। আমরা এখন কোরআনের মূল কিতাবের সাথে কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল কিতাব কীভাবে বর্তমান অবস্থায় এসেছিল এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে যাচ্ছি। আমরা দেখবো যে, এই ধরনের রদবদল করা সম্ভব ছিল কি-না, যদি তাই করা হয়ে থাকে তবে কখন আর কোথায় এই পরিবর্তন করা হয়েছিল?

ক. কোরআন ও ইঞ্জিলের প্রচারের শুরু

আমরা এই আলোচনা একটু উল্টোভাবে শুরু করবো। ইংরেজী প্রবাদের বাংলায় এভাবে বলা যায়, “যুক্তির খাতিরে পাল্টা যুক্তি দাঁড় করানো।” আমি দাবী করতে চাই যে, যেহেতু আমি কোরআন সম্পর্কে কিছু বলছি না, তাই কোরআন বলতে পারে যে, অবশ্যই আপনি- আপনারা মুসলমান পাঠকদের পূর্বপুরুষরা কোরআন পরিবর্তন করেছেন। আপনার খুশি মতো আপনি যা বলতে চান, আপনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরআন পরিবর্তন বা রদবদল করেছেন।

তাহলে আপনার কী বলা উচিত? এই ধরনের অভিযোগের উত্তর দিতে আপনারা কীভাবে চেষ্টা করবেন?

প্রথমে আপনার বলা উচিত যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাজিল হয়েছে। তারপর আমি যখন আপনাকে প্রশ্ন করবো, আপনি কীভাবে তা জানেন? তখন কীভাবে, কোরআন ঐতিহাসিকভাবে সংকলিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে তা আপনি আমাকে বলবেন।

কোরআন সংকলণের প্রাথমিক ধাপ

আমি যাঁদের সাথে আলোচনা করেছিলাম, তাঁদের মত অনুসারে হিজরতের ১৩-১৪ বছর আগে অথবা বলা যায় যে, ৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হযরত মোহাম্মদের কাছে কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছিল। মদিনায় হিজরত না করা পর্যন্ত পরবর্তী ১৩ বছর ধরে কোরআনের **প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ**

সূরা ওখানে নাজিল হয়েছিল। সেই সময়ে কোরআনের আয়াত গরুর কাঁধের হাড়ের ওপর, হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথরে, হাতের নাগালে যা-কিছু পাওয়া যেত তাতেই লেখা হতো, এছাড়াও আয়াত মুখস্থও করা হতো।

আমি যখন প্রশ্ন করেছিলাম, কয়জন সাহাবী হজরত মোহাম্মদের সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, ৭৫ জন, কেউ কেউ বলেছেন, ১৫০ জন। কোরআন আমাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে হিজরতকারীদের কোনো সংখ্যা জানায় না। কিন্তু দ্বিতীয় হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) ৮:২৬ আয়াতে এসব বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "স্মরণ করো, তোমরা ছিলে স্বল্প সংক্ষ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; তোমরা আশংকা করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

জে এম রডওয়েল তাঁর ইংরেজীতে অনুদিত কোরআনে এই ধারণার সাথে একমত পোষণ করে বলেছেন যে, "হজরত মোহাম্মদের সাথে যাঁরা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, এঁদের সংখ্যা ছিল ১৫০ জন।[১] এই সাথে আরও বলা যায় যে, অবশ্যই মদিনায়ও সেই সময়ে কিছু বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ, এঁরাই হজরত মুহাম্মদকে মদিনায় আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর সম্ভবতঃ আরও কিছু লোক মক্কায় ছিলেন-বিশেষভাবে ক্রিতদাসরা- তাঁরা হজরত মোহাম্মদের সাথে মক্কা ছেঁড়ে যাননি। তবে, আলোচনার জন্য আমরা এই **১৫০ জন অটল ঈমানদার** ধরে নিচ্ছি, যাঁরা তাঁদের ঈমানের জন্য তাঁদের বাড়ি-ঘর ছেঁড়ে যেতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

এই তথ্যটি মনে রেখে এখন আমরা অবশ্যই এই প্রশ্নটি করবো যে, কীভাবে **আপনি জানেন যে, যখন কেবল ১৫০ জন অটল বিশ্বাসী ছিলেন, তখন** কীভাবে **কোরআন যথাযথভাবে প্রচার করা হয়েছে?** হতে পারে চামড়ায় লেখা কিছু আয়াত হারিয়ে গিয়েছিল। হতে পারে কাঠের ফলকে লেখা দুটি সূরা উঠের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। এই কথা ভাববেন না যে, আমি হাসছি বা কোনো কৌতুকের কথা বলছি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কীভাবে **আপনি জানেন যে, এখানে কোনো রদবদল করা হয়নি।**

কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনি আমাকে বলবেন, "কিন্তু তাঁরা কোরআন মুখস্থ করেছিলেন, আর যখন হজরত মুহাম্মদ আবার সূরা তেলাওয়াত করেছেন, তখন ১৫০জন বিশ্বাসীর মধ্যে কেউ না কেউ উপস্থিত ছিলেন। আর যে কোনো উপায়েই সূরাগুলো সংশোধন করার জন্য হজরত মুহাম্মদ তাঁদের সাথে ছিলেন।

আমি বলছি না, "নাহ! তা হয়নি, " কিন্তু আমি চাই আপনি বুঝার চেষ্টা করুন। আপনি যা বলছেন, তা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না। আপনার কাছে একটিও কাঠের ফলকে লেখা মূল সূরা নেই, কিন্তু আপনি এগুলোকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। আর আমরা এটিকেই **প্রাথমিক অনুমান** বলেছি।

---

[১] Koran, trans. by J. M. Rodwell, Everyman's Library, 1978, p 228. Note 1.

হিজরতের সময় থেকে হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কোরআন সংকলন

হিজরতের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বৎসরে মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন, এ যুদ্ধে মুসলমানদের ৩০০ সৈন্য মক্কা থেকে আগত এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। আল্লামা ইউসুফ আলী তাঁর অনুদিত কোরআনে[২] বলেছেন, "মুসলমানদের মাত্র ৩১৩ জন পুরুষ সৈন্য ছিল। আবার এঁদের অধিকাংশের কাছেই কোনো অস্ত্র ছিল না। অন্যদিকে মক্কার সেনাবাহিনী ছিল তুলনামূলকভাবে সশস্ত্র ও সুসজ্জিত ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশী। যদি আমরা ধরে নেই যে, প্রতিটি সৈনিকের বাড়িতে একজন স্ত্রী ও কয়েকজন ছেলেমেয়ে ছিল, তাহলে এটি ধরে নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে, সেই সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। সংখ্যা এর চেয়ে কিছুটা কমবেশী হতে পারে, তবে তা আমাদের আলোচনার বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলবে না।

ষষ্ঠ হিজরীতে হজরত মুহাম্মদ হজ্ব করার জন্য মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করেন। হুদায়বিয়া নামক প্রান্তরে কুরাইশদের সাথে তাঁর দেখা হয়, এ সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সাক্ষর করা হয়। এই সময়ে ১৫০০ পুরুষ তাঁর সাথে ছিলেন। সুতরাং, আমরা ধরে নিতে পারি যে, সর্বমোট ৬০০০-৮০০০ মুসলমান সেই সময়ে ছিল।[৩]

হিজরতের পর প্রথম দশ বছরে কোরআনের অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সূরা নাজিল হয়েছিল। সুতরাং, এখানে অবশ্যই আমরা জানতে চাইবো যে, কীভাবে **আপনি জানেন যে, এই দশ বছর ধরে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ** মক্কায় কখনো তা শিক্ষা দেওয়া হয়নি, সম্ভবতঃ বদরের যুদ্ধ হয়নি, সম্ভবতঃ এদের মধ্যে কোনো কোনোটি হারিয়েছিল। **আপনি** কীভাবে **জানেন যে, এটি পরিবর্তিত হয়নি?**

আবারও উত্তরে আপনি আমাকে বলবেন, "কিন্তু তাঁরা কোরআন মুখস্থ করেছিলেন, আর হজরত মুহাম্মদ সেই সময়ে বেঁচে ছিলেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে হয়তো ২০০-২৫০ জন তখনো বেঁচে ছিলেন। তাঁরা সেই যুদ্ধের সাক্ষী ছিলেন এবং হজরত মোহাম্মদের কথা নিজেরা শুনেছিলেন।" এবারও আমি এই সম্ভাবনা সম্পর্কে না বলবো না। কিন্তু আমি আপনার কাছে সেই একই সত্য তুলে ধরবো।

আপনার কাছে দশম হিজরীর কোরআনের কোনো পাণ্ডুলিপি নেই। আপনি বিশ্বাস করেন যে, যা এখন আপনার হাতে আছে তাতে সেভাবে সূরাগুলো লেখা আছে, যেভাবে মুসলমানরা প্রাথমিক যুগে কোরআন মুখস্থ করেছিলেন। যে হাদিসগুলো কোরআনের উৎপত্তি, বদরের যুদ্ধ বা হোদায়বিয়ার সন্ধির বিষয়ে বলে, আপনি সেই হাদিসগুলো বিশ্বাস করেন।

---

[২] ইউসুফ আলী, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২১৫, সূরা ৩:১৩ এর টিকা ৩৫২

[৩] হামিদুল্লাহ ওপরে উল্লেখিত বই , ভুমিকা, পৃষ্ঠা xiii

কোরআনের প্রথম সংগ্রহ

আমরা এখন বিবেচনা করে দেখবো যে কীভাবে ছড়িয়ে থাকা কোরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতগুলোকে কীভাবে একটি কিতাবে সংকলিত করা হয়েছিল। আল-ঈমাম বোখারী আমাদের জানিয়েছেন যে, হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর এক বছর পরে হজরত যায়েদ বিন সাবিত খলিফা হজরত আবু বকরের নির্দেশে কোরআনকে প্রথমে সংকলিত করেন। হজরত যায়েদ ইবনে সাবিতের কথাকে উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন,[৪]

"আল-ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক শহীদ হবার পর হজরত আবু বকর আমার কাছে এলেন। আর দেখো, হযরত ওমর ইবনে আল-খাত্তাবও তাঁর সাথে আছেন। হযরত আবু বকর বললেন: "সত্যি সত্যি ওমর আমার কাছে এসে বললেন,' আল-ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কোরআনে হাফিজ শহীদ হয়েছেন, আর আসলে আমার ভয় হচ্ছে যে, কোরআনে হাফেজরা এভাবে যুদ্ধে শহীদ হলে কোরআনের বেশীরভাগ অংশই নষ্ট হবে (হারিয়ে যাবে) আর আমি মনে করি যে, কোরআন সংকলনের জন্য আপনার হুকুম দেওয়া উচিত।'"

(হজরত আবু বকর আরও বললেন), "আমি হযরত ওমরকে বললাম,' কীভাবে আপনি আমাকে এমন একটি কাজ করতে বলছেন, যা রাসুলুল্লাহ করেননি?'

"তখন হযরত ওমর বললেন,' আল্লাহ্‌র কসম, এই কাজ করা উত্তম হবে', আর আল্লাহ্ এই ধারণা গ্রহণ করার জন্য আমার মন খুলে না দেওয়া পর্যন্ত হযরত ওমর অনবরত আমাকে অনুরোধ করছিলেন। আর পরে আমিও হযরত ওমরের মতো একই ধারণা পোষণ করলাম।

(তারপর) হযরত আবু বকর বললেন (আমাকে),' সত্যি সত্যি তুমি একজন জ্ঞানী যুবক, আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করি না, আর তুমি আগেও রাসুলুল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহি লিখেছ। তাই, কোরআনের (বিভিন্ন রুকু ও আয়াত) খুঁজে বের কর আর ওগুলোকে একসাথে জড় কর।'

আর আল্লাহ্‌র কসম, যদি তিনি আমাকে একটি পাহাড়ও সরাতে বলতেন, তবে তিনি কোরআন সংগ্রহ করার যে ভার আমাকে দিলেন, তার চেয়ে পাহাড় সরানো আরো সহজ হতো। আমি জানতে চাইলাম,' কীভাবে তিনি এমন একটি কাজ করতে চান, যে কাজ রাসুলুল্লাহ নিজেও করেননি।'

তিনি বললেন,' আল্লাহ্‌র কসম, এই কাজ করা ভালো হবে'। পরে যেভাবে হজরত ওমর এই কাজে জড়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার পর তাঁর মন খুলে গিয়েছিল ঠিক সেভাবেই হজরত আবু বকরের মনের মতো আমার মন খুলে না যাওয়া পর্যন্ত হযরত আবু বকর বারবার আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

পরে সেই হুকুম অনুসারে আমি কোরআনের আয়াত খুঁজতে লাগলাম। আমি পত্রহীন খেজুর শাখা হতে, পাতলা সাদা পাথর হতে, আর মানুষের বুক থেকে আমি সংগ্রহ করলাম। আমি আবু

---

[8] Mishkat al Masabih, p 185. Also Al Suyuti, *Tarikh al Khulafa,* Muhammadi Press, Lahore, 1304 AH, p 53.

> খোজায়মা আনসারির কাছ থেকে সূরা আল-তওবা (৯:১২৮-১২৯) শেষ অংশটি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত, আমি খুঁজতে ছিলাম। আমি তাঁর কাছে ছাড়া আর কারও কাছে সূরা তওবার শেষের এই আয়াতটি পাইনি, যেখানে বলা হয়েছে, "অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল আসিয়াছে।" আর হজরত আবু বকরের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই কোরআনটি তাঁর কাছেই ছিল। পরে হজরত ওমরের বেঁচে থাকা কালীন সময়ে কোরআনটি তাঁর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে কোরআনটি তাঁর মেয়ে বিবি হাফসার কাছে ছিল।

জনাব হামিদুল্লাহ তাঁর অনুদিত কোরআনের ভূমিকায় হাদিস থেকে কোরআন সংকলনের প্রক্রিয়া থেকে চমকপ্রদ তথ্য উল্লেখ করেছেন। হজরত যায়েদের একটি বক্তব্যকে তুলে ধরে তিনি বলেছেন, সূরা তওবা (অনুশোচনা)-র দুটোর পরিবর্তে তিনটি আয়াত যদি থাকে, তিনি সেগুলোকে একটি আলাদা সূরায় রেখেছেন। হামিদুল্লাহ আরো বলেছেন যে, এই কথা সর্ববাদী সম্মত যে, খলিফা হজরত আবু বকর নিজে হজরত যায়েদ বিন সাবিতকে হুকুম দিয়েছিলেন, কোনো স্মৃতির ওপর নির্ভর করে নয়, কিন্তু খুঁজে দেখতে হবে যে, প্রতিটি আয়াতের জন্য কমপক্ষে লিখিত অনুলিপি দুইজন ভিন্ন লোকের আছে আছে কি-না?[৫]

যতদূর জানা যায় যে, হজরত ওসমানের খলিফা হওয়ার আগ পর্যন্ত এটিই ছিল কোরআনের সরকারীভাবে প্রামাণ্য অনুলিপি। অনেক লোক যেমন মদিনার হজরত ওবাই বিন কাব এবং ইরাকের কুফা শহরের হজরত ইবনে মাসুদের কাছে কোরআনের সম্পূর্ণ অনুলিপি ছিল। কিন্তু বাকী বেশীরভাগ নারী-পুরুষ তাঁদের মুখস্থ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। **আমরা তাহলে বলতে পারি যে,** ২০ হিজরীতে, হিজরতের ১৩ বছর আগে যখন প্রথম সূরা নাজিল হয়েছিল সে সময় থেকে হজরত ওসমানের সংশোধিত অনুলিপি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত **৪০ বছর ধরে কোরআন প্রায় সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে প্রচার করা হচ্ছিল।**

সুতরাং, আবারও এই প্রশ্ন করা যেতে পারে কীভাবে আপনি জানেন যে, এই দীর্ঘ সময় ধরে কোরআন অপরিবর্তিত ছিল। যখন প্রায় গোটা কোরআনটাই মৌখিকভাবে প্রচার করা হচ্ছিল। হতে পারে এ সময়ে কোনো কোনো আয়াত পশু খেয়ে ফেলেছিল। সম্ভবত কেউ কোনো অংশ ভুলে গিয়েছিল। কীভাবে **আপনি জানেন যে, এর কোনো রদবদল করা হয়নি।**

হাদিসে এই সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। খলিফা হজরত ওমরের কথা উদ্ধৃত করে বিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক ঈমাম মুসলিম বলেছেন,

> "সত্যি সত্যি আল্লাহ্ হজরত মুহাম্মদকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর তাঁর ওপরে কিতাব নাজিল করেছেন। আল্লাহতায়ালা যে-কিতাব নাজিল করেছেন, তার মধ্যে পাথর মারার আয়াতটি ছিল। রাসুলুল্লাহ পাথর মেরে শাস্তি দিয়েছেন। আর তারপর আমরাও পাথর মেরে শাস্তি দিয়েছি। আর আল্লাহ্র কিতাবের কালাম অনুসারে ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।" মিশকাত, কিতাবুল হুদুদ, পৃষ্ঠা-৩০১।

---

[৫] হামিদুল্লাহ ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা xxix এবং xxx

অনত্র ঈমাম ইবনে মাজা হযরত আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:

> “পাথর মারার আয়াতটি ও বুকের দুধ খাওয়ানোর আয়াতটি (দেখুন চতুর্থ অংশ, অধ্যায়, ২, ৮ক, বংশগতিবিদ্যা ও দুধ-মা’ নাজিল হয়েছিল— আর যে পাতায় তা লেখা ছিল, তা আমার বিছানার নিচে ছিলঃ যখন রাসুলুল্লাহ যখন ইন্তেকাল করলেন, আর আমরা তাঁর মৃত্যুর জন্য ব্যস্ত ছিলাম, একটি পোষা প্রাণী এসে তা খেয়ে ফেলে ছিল।”

আর হামিদুল্লাহ খলিফা হজরত ওমরের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন,

> “যদি আমি কোরআনে কোনো কিছু যোগ করার ব্যাপারে অভিশাপের ভয় না করতাম, তবে আমি ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা করার বিধানটি যোগ করে দিতাম।”[৬]

আবারও আপনি আমার কথার জবাবে বলবেন, “আমি এসব হাদিসের বৈধতা, বিশেষভাবে হজরত আয়েশার কথা উদ্ধৃত করে যে হাদিসটি বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু জানি না। কিন্তু যদি এগুলো সত্য হয়, তাহলে হিজরতের ২৭ বছর পরেও হাদিসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা সম্ভব হয়নি। যদি কোনো মুসলমান কোরআনের কোনো আয়াতের কিছু অংশ ভুলে যায়, অন্যরা তা স্মরণ করিয়ে দিত। এর পাশাপাশি অনেক আনছার ও সাহাবীরা জীবিত ছিলেন, তাঁরাও যে কোনো ভুল সংশোধন করে দিতে পারতেন।

আরবের বাইরে ইসলামের প্রসার

এই সাথে আপনি আমাকে আরো বলতে পারেন যে, হিজরতের পরে এই ২৭ বছরে ইসলাম অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩ হিজরীতে দামেস্ক ও সিরিয়া দখল করা হয়েছিল। আর ২৫ হিজরীতে ইসলামের বিজয়ী সৈন্যরা উত্তর তুরস্কের আর্মেনিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল।

অনেক সৈন্য, প্রশাসক যারা ওই সব দেশে গিয়েছিলেন তাঁরা কোরআনের সূরার আয়াতের অংশবিশেষ মুখস্থ করেছিলেন। তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জানতেন যে, কীভাবে কোরআনের সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল আর সে সম্পর্কে তাঁরা সচেতনও ছিলেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের জানামতে সব সূরাই মুখস্থ করেছিলেন। তাহলে আপনি আমাকে এই কথা বলবেন, এটি অসম্ভব যে, মাত্র ২৭ হিজরীর মধ্যেই যে-কেউ কোরআনের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আয়াত পরিবর্তন করতে পারেন, এই কথা ভাবা অসম্ভব। কারণ, মিসর থেকে পারস্যে, তুরস্ক থেকে আরবে এই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল।

আবারও আমি বলবো যে, ‘না’। কিন্তু আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব যে, আপনি তা বিশ্বাস করেছেন। ১২ হিজরীতে হযরত যায়েদ বিন সাবিত যে কোরআন সংকলিত করেছিলেন, আপনার কাছে কোরআনের সেই পাণ্ডুলিপিটি নেই, যে সম্পর্কে বলা হয়েছে, “যা তোমাদের হাতে আছে” (بَيْنَ يَدَيْكُمْ)।

[৬] হামিদুল্লাহ ওপরে উল্লেখিত বই , পৃষ্ঠা xxx (আমার অনুবাদ)

এসব বিষয় বিশ্বাস করা সম্পর্কে এতে কোনো ভুল কিংবা অযৌক্তিকতা রয়েছে, তা বলা যাবে না। কিন্তু এবার বিষয়টি যখন আমরা ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক সংকলন তৈরির ইতিহাস পরীক্ষা করি, তখন আমরা দেখি যে, সেখানেও এই একই যুক্তি ও বিশ্বাস রয়েছে।

ইঞ্জিলের সংকলনের ঐতিহাসিক প্রথম ধাপ

এই দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখবো যে, খ্রীষ্টানরা জানে ও বিশ্বাস করে যে, কীভাবে ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে, কিন্তু তা দেখার পূর্বে এটা স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে, **সুখবর** বলতে আমরা কী বুঝি? ইউএনগেলিয়ন (ευανγγλεον) গ্রীক শব্দের বাংলা অনুবাদ **সুখবর** শব্দটি এসেছে। আর আরবী ভাষায় একে ইঞ্জিল (**الإِنْجِيل**) বলে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ইউএনগেলিয়ন শব্দটি নিকটপ্রাচ্য ও আরবের খ্রীষ্টান জনসাধারনের মাঝে প্রচলিত ভাষায় প্রবেশ করে আর সবশেষে কুরাইশদের কথ্য আরবী ভাষায় এর রূপ দাড়ায় ইঞ্জিল। আর কোরআনেও এই ইঞ্জিল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় কী ধরনের শব্দ, যাকে আল্লাহ্ **সুখবর** বলেছেন? এটি হচ্ছে সেই সুখবর যে ঈসা মসীহ্ সব মানুষের পাপের ক্ষমা লাভের জন্য ক্রুশে জীবন কোরবানী দিয়েছেন। যাঁরা তাঁকে কষ্টভোগী নাজাতদাতা হিসেবে তাঁর ওপর ঈমান আনে, তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। আমরা এই ধরনের শব্দকে বলি, "তিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন কোরবানী দিয়েছেন" "তিনি আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের মুক্তির মূল্য দিয়েছেন। "তিনি হলেন এমন একজন মেষ, যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান।"

ঈসা মসীহ্ নিজেই এই বিষয়গুলো তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন। হজরত মথি লিখেছেন, **"পরে তিনি পেয়ালা নিয়ে শুকরিয়া আদায় করে তাঁদেরকে দিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই এটা থেকে পান কর।"** মথি ২৬:২৭ আমরা একে বলবো, **"মতবাদ ক।"**

আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তিনিই কেবল এই কাজ করতে পারেন, কারণ, একজন সৃষ্টিকর্তা-আল্লাহ-পিতা, পুত্র, পাক-রূহ্ একত্রে চেয়েছেন যে, পুত্র-অনন্তকালীন কালাম- কালিমা (**الكَلِمَة**), ঈসা মসীহ্ আসবেন। তিনি মানুষকে উদ্ধার করার জন্য এ-কাজ করবেন। আমরা এই কথা বিশ্বাস করি; কারণ, ঈসা মসীহ্ এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে, বিচারের আগে মহা-ঈমাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন,

'তুমি কি সেই মসীহ, পরম ধন্যজনের পুত্র'? ঈসা **বললেন,'আমি সে-ই'** (মার্ক ১৪:৬১-৬২)।

এভাবে তাঁর নিজের কথায় ঈসা মসীহ্ দাবী করেছেন যে, তিনি ইবনুল্লাহ আর আমরা এই দ্বিতীয় মতবাদকে **বলব, "মতবাদ খ"**।

এখানে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, আমরা বিশ্বাস করি না যে, কোনো স্ত্রীর সাথে, কোনো সাহিবার সাথে অথবা বিবি মরিয়মের সাথে আল্লাহ্র রূহানিক সম্পর্ক আছে। আমরা

কোরআনের, শেষ মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-আন আম (গবাদি পশু) ৬:১১০ আয়াতের সাথে সম্পূর্ণ একমত। যেখানে বলা হয়েছে,

> "তাঁহার সন্তান হইবে কীভাবে? তাঁহার তো কোনো স্ত্রী (ছাহিবা اَلصَّاحِبَةَ) নেই তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে তিনিই সবিশেষ অবহিত।"

এই ধরনের চিন্তা হচ্ছে কুফরী। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র কালাম রূহানীভাবে অনন্ত আল্লাহ্‌র সাথে প্রথম থেকেই এক ছিলেন। নতুন বিষয় হচ্ছে, এই দুনিয়াতে আসার সময় তিনি বিবি মরিয়মের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন।

"মতবাদ ক" ও "মতবাদ খ" একত্রে আমরা **শিক্ষা সম্পর্কিত সুখবর** বলতে পারি। যেহেতু আমরা ইঞ্জিল সংকলনের ঐতিহাসিক ধাপ বিবেচনা করছি, এজন্য মৌখিকভাবে প্রচারিত **শিক্ষার অর্থের** পাশাপাশি লিখিত কিতাব কীভাবে সংকলিত হয়েছে সে সম্পর্কেও আলোচনা করবো।

সুখবর শব্দের দ্বিতীয় অর্থ প্রথম অর্থ থেকেই বের হয়ে এসেছে। এটি ঈসা মসীহের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের লিখিত বিবরণীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই লিখিত বিবরনীসমূহ থেকে এটি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ঈসা মসীহ্ লেখাপড়া জানতেন। লূক ৪:১৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আর তিনি নিজের রেওয়াজ অনুযায়ী বিশ্রাম বারে জামাতখানায় গেলেন ও **কিতাব পাঠ করার জন্য দাঁড়ালেন**। "

কিন্তু এই কথাও ঠিক যে, ঈসা মসীহ্ নিজে কোনো সুখবর কিতাব লেখেননি। চারজন আলাদা লেখক পাক-রূহ্ দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এই দুনিয়ায় ঈসা মসীহের জীবন সুখবর কিতাবে লিখেছেন। লোকেরা তাঁদের লেখকের নাম অনুসারে ইঞ্জিল শরীফের এই সব বিবরণীকে "মথি" বা লূক লিখিত সুখবর বলে। তবে সময়ের ধারাবাহিকতায় খ্রীষ্টানেরা একে **সুখবরের চারটি কিতাব** বলেন। এর অর্থ এই নয় *যে*, প্রতিটি লেখক তাঁদের নিজস্ব সুখবর লিখেছেন, আসলে এই কথা বুঝানো হয়নি। আসল অর্থ হচ্ছে, **আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈসা মসীহ্ একটি সুখবর এনেছেন-তা হচ্ছে পাপ থেকে নাজাত** কীভাবে **নাজাত পাওয়া যায়, আর এটি হচ্ছে সুখবর।**

সবশেষে, আর একটি নাম অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিল শরীফ। এই নতুন নিয়ম বলতে এমন একটি কিতাবকে বুঝায়, যেখানে ঈসা মসীহের জীবন ও শিক্ষা নিয়ে সুখবরের চারটি কিতাব আছে, এর সাথে বিভিন্ন খ্রীষ্টান জামাতের উদ্দেশ্যে লেখা উপদেশ ও হেদায়েত রয়েছে।

কোরআনে ব্যবহৃত "ইঞ্জিল" শব্দটি স্পষ্টভাবে লিখিত কোনো কিতাবের বিষয়ে বলে। কিন্ত এর মধ্যে ঈসা মসীহের সাহাবীদের দ্বারা লেখা কিতাবগুলোকে নাকি কেবলমাত্র এই শব্দ দ্বারা ঈসা মসীহের গোটা জীবন ও কাজ সম্পর্কে লেখা সুখবরকে বুঝায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

কিন্তু এখন আমরা পুরানো প্রশ্নে আবার ফিরে যাই যে কীভাবে সুখবরের লিখিত কিতাব আমরা পেলাম। আমরাও বলি যে, এই কিতাব আল্লাহ্ দিয়েছেন। "প্রকৃত আল্লাহ্‌র লোক তাঁদের লেখার

সময়ে পাক-রূহ্ দ্বারা পরিচালিত হয়েই তা লিখেছেন।” যখন প্রশ্ন করা হয় যে, কীভাবে আমরা তা জানি, আমরাও এর ঐতিহাসিক বিকাশের কথা বলতে শুরু করি।

সুখবর প্রচারের শুরু

খ্রীষ্টানরা জানেন যে, ঈসা মসীহ্ ৩০ বছর বয়সে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। লূক ৩ অধ্যায় থেকে আমরা তা জানি। সেখানে লেখা আছে,

> “আর ঈসা নিজে, যখন তিনি কাজ আরম্ভ করেন, কমবেশী ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন;” (লূক ৩:২৩)।

হিজরতের আগে হজরত মুহাম্মদ সম্পর্কে কোনো ঘটনা বলার সময়ে মুসলমানরা এই প্রাচীন তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে, কিছুটা একই ধরনের সমস্যায় ভুগেন। ঈসা মসীহের বেহেশত গমনের পরে প্রথম ৩০০ বছর ধরে বিশেষভাবে খ্রীষ্টানদের কেউ পছন্দ করতো না, তখন তাঁরা নির্যাতিত হচ্ছিলেন। সুতরাং, এই কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, রোমীয় কর্তৃপক্ষ সুখবর সম্পর্কে কোনো লিখিত বিবরণী লিখে রাখেননি। তবে, সুখবর সিপারার মধ্যে দুটো সত্য রয়েছে, যা ঈসা মসীহের আনুমানিক জন্মতারিখ জানতে আমাদের সাহায্য করে।

প্রথমটি হচ্ছে, ঈসা মসীহের জন্মের সময় মহান হেরোদ এহুদা প্রদেশের রাজা ছিলেন (মথি ২:১)। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঈসা মসীহ্ যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন, পিলাত তখনও গভর্নর ছিলেন (লূক ৩:১, ২৩)। লোকায়ত ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজা মহান হেরোদ খ্রীষ্টপূর্ব ৪ সালে মারা যান। আর পিলাত ২৬ খ্রীষ্টাব্দে গর্ভনর হয়ে জেরুসালেমে আসার পরে পরেই ঈসা মসীহ্ তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন, তাহলে দেখা যায় যে, তারিখটি সঠিকভাবে নিরূপন করা হয়েছে। সুতরাং, ঈসা মসীহের কাজের শুরুর সময় হিসেবে আমরা ২৬ খ্রীষ্টাব্দকেই আমরা ধরে নেব।[৭]

প্যালেষ্টাইনের চারদিকে গিয়ে ঈসা মসীহ্ যখন সুখবর প্রচার করছিলেন, তখন অনেক লোক তাঁর কথা শুনেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করার জন্য তিনি তাঁর শ্রোতাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর তাঁরা কেউ কেউ তাঁকে অনুসরণও করেছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ১২জন সাহাবীকে মনোনীত করেছিলেন।[৮] এই সাহাবীদেরকে প্রেরিত বলা হয়। ঈসা মসীহের ১২জন প্রেরিত ছিলেন। প্রেরিত অর্থ যাকে পাঠানো হয়েছে। ঈসা মসীহ্ বেহেস্তে আরোহনের আগেই তাঁদেরকে “সুখবর” প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কোরআন শরীফে প্রেরিতদেরকে “আল-হাওয়ারী” (اَلْحَوَارِيُونَ) বলা হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায় “খ” তে দেখেছি,

[৭] আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকা যা ঈসা মসীহের জন্মের বছর থেকে গণনা করা হয়, তা আসলে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়। আমরা এখন জানি যে, এই পঞ্জিকা অনুসারে ৪ বছর ভুল গণনা করা হয়েছে।

[৮] লূক ৬:১৩

হাওয়ারীদের উচ্চ মর্যাদার কথা কোরআনে বলা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ্ ও ঈসা মসীহকে বিশ্বাস করার জন্য অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। আর তাঁরা আল্লাহ্র সাহায্যকারীও হতে চেয়েছিলেন।

ঈসা মসীহকে অনুসরণ করার জন্য তাঁরা তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। কেউ কেউ মাছের ব্যাবসা ত্যাগ করেছিলেন। হজরত মথি তাঁর করআদায়কারীর চাকুরী ত্যাগ করেছিলেন। সাড়ে তিন বছর ধরে ঈসা মসীহের সাথে সাথে থেকে তাঁরা নানা জায়গায় ঘুরেছেন। তাঁরা নিজের কানে ঈসা মসীহের প্রচার শুনেছেন, নিজের চোখে তাঁর মোজেজা দেখেছেন। ঈসা মসীহ্ যা করেছিলেন, যা বলেছিলেন, তাঁরা এগুলোর সাক্ষী ছিলেন। পাপিয়াস একজন আলেম ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় হাদিসগুলো ১২০-১৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংকলিত করেছিলেন। তাঁর মতে ঈসা মসীহের কথাগুলো হজরত মথি হিব্রু ভাষায় সংকলিত করেছিলেন।[৯]

আমি বিশ্বাস করি যে, ঈসা মসীহের জীবনকালেই তাঁর কথা বা 'লগিয়া' হজরত মথি সংগ্রহ করা শুরু করেন। পরে তিনি বা অন্য কেউ এই কথাগুলো পুনর্বিন্যাস করেন; এবং বর্তমানে ইঞ্জিল শরীফে যেভাবে আছে, সেই নমুনায় তা সংকলিত করা হয়। যেভাবে হজরত যাইদ কোরআন সংকলিত করেছিলেন।

এই লোকেরা ঈসা মসীহের বেহেস্তে যাওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রেরিত ১:৯ আয়াতে আমরা পড়ি যে,

> "এই কথা বলার পর তাঁদের চোখের সামনে ঈসাকে বেহেস্তে তুলে নেয়া হলো এবং একটি মেঘ এসে তাঁদের দৃষ্টিসীমা হ'তে তাঁকে গ্রহণ করলো— ।" (প্রেরিত ১:৯)

কখন ঈসা মসীহের ভাইয়েরা, মা ও যাঁরা ঈসা মসীহের শিক্ষা শুনেছেন ও মোজেজার সাক্ষী ছিলেন, তাঁরাও প্রেরিতদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

> "তখন তাঁরা জৈতুন পর্বত থেকে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন।— নগরে পৌঁছে, তাঁরা যেখানে বাস করছিলেন, সেই ওপরের কামরায় গেলেন; পিতর, ইউহোন্না, ইয়াকুব ও ইন্দ্রিয়াছ, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আল্ফেয়ের পুত্র ইয়াকুব ও জাতীয়তাবাদী সিমাউন এবং ইয়াকুবের [ভাই] ইহূদা;[১০] তাঁরা সবাই মহিলাদের সঙ্গে এবং ঈসার মা মরিয়মের ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে একমনে মোনাজাত করতেন। সেই সময়ে একদিন যখন অনুমান **একশ' কুড়িজন এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন**, তখন হজরত পিতর ভাইদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, — ।" (প্রেরিত ১:১২-১৬ক)

---

[৯] পাপিয়াস ৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তখন অনেক লোক যাঁরা ঈসা মসীহের কথা শুনেছিলেন, ও তাঁকে নিজের চোখে দেখেছিলেন, তাঁরা জীবিত ছিলেন। পরে, বর্তমান তুরস্কে তিনি জামাতের বিশপ হয়েছিলেন। ১২০-১৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কোনো এক সময়ে Interpretation of the Sayings of the Lord নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই বই থেকে ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে আলেম ইরেনিয়াস উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। আলেম ইরেনিয়াস লিখেছিলেন, "পাপিয়াস হযরত রাসূল ইউহোন্নার কাছ থেকে সুখবর শুনেছিলেন আর তিনি পলিকার্পের সংগী ছিলেন।" তিনি ১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শহীদ হয়েছিলেন। ওপরে উল্লেখিত এই কথা বা খৃষ্টিয়ান হাদিসটি "ইসনাদ" সহ আলেম ইসুবিয়াস তাঁর লিখিত "চার্চ হিষ্টরী " ভুলউম ৩৩,4:১ বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

[১০] এখানে ১১ জনের নাম আছে, এহুদা ইস্কারিয়োত, হজরত ঈসা মসীহকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন বলে পরে তওবা করে নিজে আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সাড়ে তিন বছর প্রচার করার পরে ঈসা মসীহ্ যখন বেহেস্তে আরোহন করেন, **তখন কমপক্ষে ১২০ জন খাঁটি শক্তিশালী বিশ্বাসী ছিলেন, যাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের কারণে ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছিলেন।**

অন্যান্য সাক্ষীসমূহ

ঈসা মসীহের বারোজন প্রেরিতের সাথে হাজার হাজার লোক ছিলেন, যাঁরা নিজের কানে ঈসা মসীহের হুকুমগুলো শুনেছেন। তাঁরা তাঁর মোজেজাগুলো নিজের চোখে দেখেছেন। একবার সারাদিন প্রচারের পরে ৫০০০ লোকের সামনে, অসুস্থ ও ভূতে পাওয়া লোকদের সুস্থ করার পরে তিনি ৫টি রুটি ও ২টি মাছ নিয়ে বরকত দান করে ৫০০০ লোককে পেট ভরে খেতে দিয়েছিলেন। এ সময়ে বারো ঝুড়ি খাবার বেশী হয়েছিল।[১১]

কমপক্ষে তিন বার ঈসা মসীহ্ মৃত লোককে জীবিত করেছিলেন। প্রথমবার এক বিধবার একমাত্র ছেলেকে তিনি জীবিত করেছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি একজন ইহুদী নেতার মেয়েকে জীবিত করেন। তৃতীয়বার তিনি বৈৎফগী গ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন।

১০ম হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা মায়িদার ৫:১১০ আয়াতে ঈসা মসীহের এই সুস্থতা দানকারী ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,

> "জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থকে তুমি (ঈসা মসীহ) আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে।"

লিখিত সুখবরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, ঈসা মসীহ্ কমপক্ষে ৯০০-১০০০ মোজেজা করেছেন। যেগুলো প্রায় ১৫০০০ এরও বেশী লোক নিজের চোখে দেখেছেন। এর সাথে আরও ৮৬০০০ অসুস্থ রোগীদের বন্ধুরা ও পরিবারের লোকেরা সেই মোজেজাগুলোর কথা জানতেন। তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যাঁরা এক সময়ে অসুস্থ ছিলেন, অথবা মৃত ছিলেন, এখন তারা সুস্থ হয়েছেন।[১২] এর অর্থ হচ্ছে, সেই সময়ে সেই দেশের প্রতি ২০ জন লোকের মধ্যে একজন ঈসা মসীহের কথা জানতেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার প্রয়োজন এই কারণে যে, প্রচুর সংখ্যক লোক যারা ঈসা মসীহের ক্ষমতার সাক্ষী ছিল, তাদের বুঝার জন্য যে পরবর্তীতে কী ঘটছে? ঈসা মসীহের বেহেশত আরোহনের ১০ দিন পর, পঞ্চাশত্তমী ঈদ বা ঈদুল খেমিস্‌সীমের দিনে ঈসা মসীহের সাহাবীরা **মতবাদ ক** প্রচার করেছিলেন। **আর এর ফলে একদিনেই ৩০০০ লোক বিশ্বাসী হয়েছিলেন।** প্রেরিত কিতাবে বলা হয়েছে,

---

[১১] ইউহোন্না ৬:১-১০

[১২] সম্পুর্ণ মোজেজার তালিকা ও সেথনে নিজের চোখে সেই সোজেজাগুলো দেখেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা জানার জন্য পরিশিষ্ট -ক দেখুন।

> পরে ঈদুল খেমিস্‌সীমের দিন তাঁরা সবাই এক জায়গায় জমায়েত ছিলেন। তখন পিতর এগারোজনের সাথে দাঁড়িয়ে জোরে তাদের কাছে ওয়াজ করলেন, "হে ইসরায়েলেরা, এই কথাগুলো শোন। নাসরতবাসী ঈসা কুদরতি **কাজ, মোজেজা ও নিশানাসমুহ দ্বারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রমাণিত মানুষ**; তাঁরই দ্বারা আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে ঐ কাজগুলো করেছেন, যেমন **তোমরা নিজেই জানো**; সেই লোককে আল্লাহ্‌র আগে থেকে যা জানতেন সেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার পর, **তোমরা তাঁকে দুষ্টলোকদের হাত দ্বারা** সলিবের ওপর **হত্যা করেছ**। কিন্তু আল্লাহ্‌ মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে জীবিত করেছেন; কারণ তাঁকে আটকে রাখার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না" (প্রেরিত ২-১, ১৪ক, ২২-২৪)।

এটি স্পষ্ট যে, এই উদ্ধৃতি আর গোটা অধ্যায় জুড়েই হজরত পিতর ভাষণ দেয়ার সময়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, এই শ্রোতারা ঈসা মসীহের কাজ ও মোজেজার কথা জানতেন আর তারা তা অস্বীকারও করতে পারবেন না। আর যখন হজরত পিতর তাঁর ওয়াজ শেষ করলেন, তখন লোকদের মধ্য থেকে প্রচুর সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, এখন তাঁরা কী করবেন? হজরত পিতর বলেছিলেন,

> "তওবা করো এবং তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পাপ ক্ষমার জন্য ঈসা মসীহের নামে তরিকাবন্দী গ্রহণ করো; তাহলে পাক-রূহরূপ নিয়ামত লাভ করবে।
>
> —তখন যারা তাঁর কথা গ্রহণ করলো, তারা তরিকাবন্দী গ্রহণ করলো, **আর তাতে সেদিন প্রায় তিন হাজার লোক তাঁদের সাথে যোগ দিলো** (প্রেরিত ২:৩৮ ও ৪১)।"

জনসমক্ষে **মতবাদগত সুখবর বা ডকট্রিনাল গসপেলের** এটি ছিল সাহাবীদের প্রথম প্রচার। এটি ঈসা মসীহের বেহেশত আরোহনের ১০ দিন পরে ৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। আর সেদিন **৩০০০ লোক** একদিনেই ঈসা মসীহকে নাজাতদাতা হিসেবে তাঁর ওপর **ঈমান এনেছিলেন**।

কেন আমি এই সব বিষয় আলোচনা করছি? কারণ, হতে পারে, এটি এমন সময়কালে বলা হচ্ছে যখন মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসে রদবদল করেছি। সুতরাং, আমরা কোরআন সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছি, সুখবর সম্পর্কে সেই একই প্রশ্ন করতে চাই। কীভাবে **আমরা খ্রীষ্টানরা জানি যে, সুখবর যথাযথভাবে প্রচার করা হচ্ছিল, যখন মাত্র ১২০ জন অটল বিশ্বাসী ছিলেন।** হতে পারে ঈসা মসীহের সাথে প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন জায়গায় ঘুড়ে বেড়ানোর সময়ে হজরত মথির সংগ্রহ থেকে কয়েক টুকরা পেপিরাস কাগজ হারিয়েছিল। অথবা কোনো বাড়িতে থাকার সময়ে কোনো পশু একটি পৃষ্ঠা খেয়ে ফেলেছিল। কীভাবে **আমরা খ্রীষ্টানরা জানি যে, সুখবরের শিক্ষার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।**

আমরাও এই কথার উত্তরে বলতে পারি যে, ঈসা মসীহের উম্মতেরা তাঁর কথা মুখস্থ করে রাখতেন। যদিও এই কথা সত্যি যে, তিনি তাঁর কথা মুখস্থ করার জন্য সরাসরি কোনো হুকুম দেননি। দু'টো কারণে আমরা এই কথা বলতে পারি যে, সবার আগে বলি যে, ইহুদীরা তাঁদের একটি প্রচলিত প্রথা (যা এখনও তাঁরা করেন) অনুসারে, তাঁরা উৎসাহ নিয়ে তাঁদের কিতাবের

আয়াত মুখস্থ করতেন। তাঁরা চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কিতাবের মুখস্থ করে রাখতেন। একজন ইহুদী ছাত্র তার শিক্ষক বা রব্বির শিক্ষা স্মরণে রাখতো। মিশনায় বলা হয়েছে, একজন ভালো ছাত্র সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া চৌবাচ্চার মতো, যে এক বিন্দু পানিও বাইরে পড়তে দেয় না (আবোথ ১১:৮)।

দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টি অবশ্যই আসা মসীহের নিম্নের কথাগুলোর ক্ষেত্রে আরোপ করা যেতে পারে।

> "আর তোমরা কেন আমাকে "হে প্রভু, হে প্রভু, " বলে ডাকো, অথচ আমি **যা যা বলি, তা করো না? যে আমার কাছে এসে আমার কথা শুনে পালন করে, সে কার মতো তা আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি।** সে এমন এক লোকের মতো যে ঘর তৈরির জন্য মাটি গভীর করো গর্ত করলো ও পাথরের ওপরে ভিত্তি গাঁথলো; পরে বন্যা এলে সেই ঘরে পানির স্রোত বেগে বইলো, কিন্তু তা হেলাতে পারলো না, কারণ, তা শক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল।
>
> কিন্তু যে শুনে পালন না করে, সে এমন এক লোকের মতো, যে মাটির ওপরে, ভিত্তি ছাড়াই এক ঘর তৈরি করলো; পরে পানির স্রোত বেগে সেই ঘরে লাগলো, আর অমনি তাহা পড়ে গেল এবং তখনি সেই ঘরটা পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। (লূক ৬:৪৬-৪৯)

যদি আপনি ঈসা মসীহের একজন সাহাবী হতেন এবং এই কথাগুলো শুনতেন, আপনি নিশ্চয়ই ঈসা মসীহের কথাগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন, যেন আপনি তা পালন করতে পারেন; আর যাতে তাঁর কথাগুলো হারিয়ে নষ্ট হয়ে না যায়।

আর সবশেষে, আমরাও উত্তর দিতে পারি যে, ঈসা মসীহ্ যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর সাহাবীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর যে কোনো ভাবেই হোক ঈসা মসীহ্ তাঁদের সাথে ছিলেন এবং তিনি ৪ বছর ধরে তাঁদের সংশোধন করতে পারতেন। বেহেস্তে আরোহন করার ১০ দিন আগেও তিনি তাঁর সাহাবী হজরত পিতরের সাথে কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমরা তা প্রমাণ করতে পারি না। এর অর্থ হলো, আমাদের হাতে মূল পাণ্ডুলিপি নেই, হজরত মথির নিজের হাতে লেখা আল্লাহ্‌র কালাম অথবা হজরত পিতরের প্রথম ওয়াজের কোনো টেপ আমাদের কাছে নেই। **কিন্তু আমরা এই কথা বিশ্বাস করি। আর এটি হচ্ছে প্রাথমিক অনুমিত বিষয়।**

ঈসা মসীহের বেহেশত গমনের সময় থেকে লিখিত প্রথম পাণ্ডুলিপির লেখার সময়কাল

পরবর্তী কয়েক মাস ধরে বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঈসা মসীহের নামে হজরত পিতর ও হজরত ইউহোন্না একটি মোজেজা দেখানোর পরে হজরত লূক লিখেছেন,

"তবু যাহারা কথা শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে ঈমান আনিল; তাহাতে পুরুষদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইল (প্রেরিত ৪:৪)।

প্রেরিতদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, আর ইহুদী নেতারা তাদের হুকুম দিয়েছিল, কিন্তু "আর তাঁরা প্রতিদিন বায়তুল মোকাদ্দসে ও বাড়িতে নসিহত করতেন এবং ঈসা-ই যে মসীহ, এই সুখবর তবলিগ করতে লাগলেন (প্রেরিত ৫:৪২)। এর ফলে চারদিকে "আর আল্লাহ্‌র কালাম ছড়িয়ে পড়ল এবং জেরুসালেমে উম্মতদের সংখ্যা **খুবই বাড়তে লাগলো;** আর ঈমামদের মধ্যেও অনেকে ঈমান আনলো" (প্রেরিত ৬:৭)।

প্যালেষ্টাইনের বাইরে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার

হজরত পিতর যখন পঞ্চাশত্তমী ঈদের দিনে **মতবাদ সম্পর্কিত সুখবর** বা Doctrinal Gospel প্রচার করছিলেন, নানা জাতি থেকে প্রচুর ইহুদী সেখানে সমবেত হয়েছিল। হজরত লূক তাদের সম্পর্কে লিখেছেন,

> "ঐ সময়ে আকাশের নিচে সকল জাতি হইতে আগত ধার্মিক ইহুদী লোকেরা, জেরুসালেমে বাস করছিলেন। পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক এবং মিসপতামিয়া, ইহূদীয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও আশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর, এবং লিবিয়া দেশের কুরিনির কাছাকাছি এলাকাবাসী এবং বিদেশী রোমীয়, কি ইহুদী কি ইহুদী ধর্মগ্রহণকারী লোক, এবং ক্রিতীয় ও আরববাসী যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ওঁদেরকে আল্লাহ্‌র মহৎ মহৎ কাজের কথা বলতে শুনছি।" (প্রেরিত ২:৫, ৯-১১)

হজরত পিতরের প্রচার ও অন্যান্য সাহাবীদের সাক্ষ্য শুনার পরে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন। পরে তাঁরা **ইরাক, ইরান, রোম ও আরব দেশে** ফিরে গিয়ে নিজেদের লোকদের কাছে সুখবর প্রচার করেছিলেন।

তারপর, প্যালেষ্টাইনে খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শহীদ হয়েছিলেন। অন্যরা **এহুদিয়া ও উত্তরে সমরীয়াতে পালিয়ে** গিয়েছিলেন। "তখন যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা চারদিকে সফর করে সুখবরের কথা তবলিগ করলো।" হজরত ফিলিপ একজন **ইথিওপিয়াবাসী** লোকের কাছে প্রচার করেছিলেন। তিনি সুখবর ইথিওপিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ৮ অধ্যায়)।

হজরত সৌল যাঁর নাম পরবর্তীকালে প্রেরিত পৌল হয়েছিলেন, তিনি খ্রীষ্টানদের ওপর নির্যাতন করার জন্য **সিরিয়ার দামেস্কে** যেতে চেয়েছিলেন; কারণ, সেখানে ইতোমধ্যেই খ্রীষ্টান ছিল (প্রেরিত ৯ অধ্যায়)। অন্য বিশ্বাসীরা নির্যাতনের ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল,

"যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা **ফৈনীকিয়া (সোর ও সিদোন), সাইপ্রাস** ও পরে **সাইপ্রাস ও কুরিনীর (লিবিয়া)** লোকেরা **উত্তর সিরিয়ার আন্তিয়খিয়াতে** (এখন দক্ষিণ তুরস্ক) এসে প্রভু ঈসার বিষয়ে সুখবর তবলিগ করলো।" (প্রেরিত ১১:১৯-২০)।

প্রেরিত সিপারার এই ১১ রুকুতেই রোম সমরাট ক্লদিয়ের আমলের একটি দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে। তিনি ৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। সতরাং, আমরা ধরে নিতে পারি যে, প্রথম ১২-১৫ বৎসর প্রচারের ফলে খ্রীষ্ট ধর্ম এই সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরে, ৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই **মতবাদসম্পর্কিত সুখবর তুরষ্ক ও গ্রীসে** ছড়িয়ে পড়েছিল; এবং আমরা কিতাবুল মোকাদ্দাসের বাইরে থেকেই এই বিষয়ে সাক্ষ্য পাই যে, ইতোমধ্যেই **রোমে** খ্রীষ্টানরা ছিলেন। যে বৎসর সম্রাট ক্লোদিয় রোমে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন সেই কথা রোমীয় ঐতিহাসিক সোয়েটনিয়াস উল্লেখ করেছেন। ১২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছেন,

> "ক্রিষ্টাস (মসীহের গ্রীক প্রতিশব্দ) নিয়ে ইহুদীরা বারবার গোলমাল করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছিল, এইজন্য তিনি (সমরাট ক্লোদিয়) তাদেরকে রোম থেকে বের করে দিয়েছিলেন।[১৩]

প্রেরিত সিপারার ১৮:১-২ আয়াতে হজরত লূক একই কথা বলেছেন, তিনি লিখেছেন,

> "অতঃপর পাউলুস এথেন্স থেকে রওনা হয়ে করিন্থে এলেন। আর তিনি আক্কিলা নামে এক ইহুদীর দেখা পেলেন; ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্পদিন আগে তাঁর স্ত্রী প্রিস্কিল্লার সাথে ইতালিয়া থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লোদিয় সমস্ত ইহুদীকে রোম থেকে চলে যেতে হুকুম দিয়েছিলেন।"

এই দুটো সাক্ষ্য থেকে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রোমে অনেক ইহুদীরা খ্রীষ্টান হয়েছিলেন আর তাঁদের সাক্ষ্য অবিশ্বাসীদের ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল আর এজন্যেই তারা গোলমাল করেছিল।

এভাবে ৪ খ্রীষ্টাব্দে বা ঈসা মসীহের প্রচারের ২৩ বছরের মধ্যেই সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় এবং তারপর পশ্চিমে আর সবশেষে তা সুদূর রোমে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার এমনকি বলা যায়, লাখ লাখ লোক বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রেরিত কিতাবের একই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যা আরো সঠিকভাবে সময় নির্দেশ করেছে। এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

> "সেখানে তিনি দেড় বৎসর থেকে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কালাম তালিম দিলেন। আর গাল্লিয়ো যখন আখায়ার গভর্নর, তখন ইহুদীরা একযোগে পৌলের বিরুদ্ধে উঠলো ও তাঁকে আদালতে নিয়ে গিয়ে বললো—" (প্রেরিত ১৮:১১-১২)।

এই কথা লেখার জন্য এই শতাব্দীর শুরুতে অনেক পণ্ডিতেরা একজন ঐতিহাসিক হিসেবে হজরত লূকের বিশ্বস্ততার ওপর প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, গাল্লিয়ো নামে কেউ ছিলেন না। এই সাথে তাঁরা জোর দিয়ে এই কথাও বলেছেন যে, রোমান উপাধি প্রো-কনসাল বা গভর্নর কেবল গাওল-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব আক্রমণাত্মক লেখার পরে গ্রীসের ডেলফি নগরীতে একটি পাথরের টুকরা পাওয়া গিয়েছিল। যাতে লেখা আছে, "আমার লুসিয়াস জুনিয়াস

---

[১৩] *Life of Claudius* 25,4

গাল্লিয়ো, আমার বন্ধু এবং আখায়া প্রদেশের প্রো-কনসাল, হিসেবে —"। ৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই লিপি খোদাই করে লেখা হয়েছিল।"

অন্যান্য উৎস থেকে আমরা জানি যে, গাল্লিয়ো জুলাই মাসের এক তারিখে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। আর প্রোকনসাল বা গভর্নর হিসেবে তিনি এক বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এভাবে এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গাওল ছাড়াও গাল্লিয়ো নামে আরো একজন গভর্নর ছিলেন। হজরত পৌল ৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত করিন্থ শহরে ছিলেন। আর এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হজরত লূক একেবারেই সঠিক ও সত্য ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকের কোনো এক সময়ে ইফিষে থাকার সময়ে হজরত পৌল করিন্থ জামাতের কাছে আবার একটি চিঠি লিখেছিলেন। খ্রীষ্টানরা একে ১ম করিন্থীয় বলে উল্লেখ করেন। কিতাবুল মোকাদ্দস বিশারদরা এই চিঠি লেখার সময়কাল সম্পর্কে একমত, আর আমরা দুটো অংশে কিছুটা বিশদভাবে এটি পরীক্ষা করে দেখবো। এই অংশটুকুতে বলা হয়েছে,

> "**পৌল, আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে ঈসা মসীহের আহ্বানপ্রাপ্ত সাহাবী — করিন্থে অবস্থিত আল্লাহ্‌র জামাতের খেদমতে**, আমাদের পিতা আল্লাহ এবং প্রভু মসীহ্ হইতে রহমত ও শান্তি তোমাদের উপর নাজিল হোক।—আল্লাহ বিশ্বস্ত, যিনি তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের সহযোগীতার জন্য তোমাদেরকে ডেকেছেন" (**১ করিন্থীয় ১:১, ২ক, ৩, ৯**)।

> "ভাইয়েরা, তোমাদেরকে সেই সুখবর জানাচ্ছি, যে ইঞ্জিল (মতবাদ ক) তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণও করেছ, যাতে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ; আর তার দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে-কথাতে সুখবর তবলিগ করেছি, তা যদি ধরে রাখ, তবে নাজাত পাচ্ছ—
>
> আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা দিয়েছি এবং এটা নিজেও পেয়েছি যে, কিতাব মোতাবেক মসীহ্ আমাদের পাপের জন্য ইন্তেকাল করলেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, আর কিতাব মোতাবেক তিনি তৃতীয় দিনে উঠেছেন;
> আর তিনি **কৈফাকে**,
> পরে **সেই বারোজনকে দেখা দিলেন**;
> পরে **একবারে পাঁচশ'র বেশী ভাইকে দেখা দিলেন**, তাদের বেশীরভাগ লোক আজ পর্যন্ত জীবিত আছে, কিন্তু কেউ কেউ মরে গিয়েছে।
> তার পরে তিনি **ইয়াকুবকে**, পরে **সব সাহাবীকে দেখা দিলেন**। সবার শেষে জন্মেছি যে আমি, সেই আমাকেও দেখা দিলেন। (১ করিন্থীয় ১৫:১-৮)

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, কতগুলো শব্দকে গাঢ় করা হয়েছে। যখন আমরা এই শব্দগুলোকে লক্ষ্য করি, আমরা দেখি যে,

> হজরত পৌল "মতবাদ ক" বিশ্বাস করেছেন, অর্থাৎ ঈসা মসীহ্ আমাদের পাপের জন্য মরেছেন, আর তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।
>
> তিনি "মতবাদ খ" অনুসারে বিশ্বাস করেছেন যে, ঈসা মসীহ্ হলেন ইবনুল্লাহ।

৫২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি তাঁদের কাছে ছিলেন, এই সময়ে তিনি তাঁদের কাছে এই **মতবাদ সম্পর্কিত সুখবর** বা doctrinal gospel মৌখিকভাবে প্রচার করতেন, যেন তাঁরা নাজাত পেতে পারেন। এখন তিনি ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে করিন্থীয় জামাতের কাছে লেখা চিঠিতে একই বিষয় উল্লেখ করেছেন।

হজরত মথি সম্ভবতঃ ঈসা মসীহের এই দুনিয়াতে থাকার সময়ে আল্লাহ্‌র কালাম লিখেছিলেন। আর হজরত লূক বলেছিলেন যে, "প্রথম হইতে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং কালামের খেদমত করেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সমস্ত কিছু জানিয়েছেন, সেই বিষয়াবলীর বিবরণ লিখতে অনেকে হাত দিয়েছেন।"[১৪] করিন্থীয়দের কাছে লেখা প্রথম চিঠি, **নতুন নিয়মের** প্রথম অংশ যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, নতুন নিয়মের অন্য কিছু অংশ কিছুটা আগেই লেখা হয়েছিল।[১৫] আমরা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, যখন হজরত পৌল ওপরের দুটো অনুচ্ছেদ **(সুখবরের মতবাদ বা ডকট্রিনাল গসপেল)** লিখেছিলেন, যা প্রধানতঃ বেশীরভাগ সময়ে ২৫ বছর ধরে ৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌখিকভাবেই প্রচার করা হচ্ছিল, তা এখন **লিখিত সুখবরে** রূপ নিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত তা অপরিবর্তনীয়রূপে প্রচারিত হয়ে আসছে।

১ নং ছবিতে পেপিরাসের ওপর লেখা ১ করিন্থীয় ১৪ ও ১৫ অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি আপনি পরের পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন। এটি আয়ারল্যান্ডের চেষ্টারবিউটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপির আয়াত ২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল। আর এটি বর্তমানে আধুনিক অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

সুতরাং, এই প্রশ্নগুলোকে অবশ্যই আবারও করা **যায়। এই সময়ের মধ্যে** কীভাবে **আমরা জানতে পারি যে, সুখবর সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রচারিত হচ্ছিল।** হয়তো কেউ কিছু অংশ ভুলে গিয়েছিল? হয়তো কেউ কিছু অংশ ভুলে গিয়েছিল। হতে পারে যে, ঈসা মসীহ্ কাউকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেননি; এবং মিথ্যে দাবী করেছেন, "আমি পুনরুত্থান ও জীবন"? হতে পারে ঈসা মসীহ্ বেহেস্তে আরোহন করেননি। কীভাবে **আমরা জানতে পারি যে, সুখবর পরিবর্তন করা হয়নি?**

আর আমরাও এর উত্তরে বলতে পারি যে, **"ঈসা মসীহের বেহেস্তে আরোহনের পর ২৫ বছর ধরে সম্ভবতঃ সুখবরের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তন হয়নি।** ঈসা মসীহের কথাগুলো তাঁরা মুখস্থ করেছিলেন। যদি কোনো বিশ্বাসী কোনো অংশ ভুলে যেতেন, তবে অন্যরা তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এছাড়াও বলা যায় যে, হজরত ইউহোন্না, হজরত পিতর, হজরত ইয়াকুব, হজরত পৌল ও অন্যান্য বিশেষ বারোজন সাহাবী ঈসা মসীহের কথার সত্যতা অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য জীবিত ছিলেন। আর হাজার হাজার লোক সেই সময়ে বেঁচে ছিলেন, যাঁরা ঈসা মসীহের মোজেজা নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাই ইঞ্জিল শরীফের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবর্তন করা, যে-কারও পক্ষে

[১৪] লুক ১:১-২

[১৫] অনেক আলেম বিশ্বাস করেন যে, হজরত মার্ক লিখিত সুববর এবং ইয়াকুব সিপারা ৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল, কিন' এর কোনো প্রমাণ নেই।

একেবারেই অসম্ভব ছিল। ইঞ্জিল শরীফের বাণী রোম থেকে পূর্বদিকে সিরিয়া আর তুরস্ক থেকে দক্ষিণে লিবিয়া পর্যন্ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছবি-১

২০০ খ্রীষ্টাব্দের (মূল পাণ্ডুলিপির ১৪৫ বছর পরে) পেপিরাস P 46

একই পৃষ্ঠার দু'পাশেই ১ করিন্থীয় ১৪:৩৪খ-১৫:১৫ক আয়াত দেখানো হয়েছে। এখানে মসীহের এক বা একাধিক সাহাবীর কাছে ৫বার দেখা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

চেষ্টারবেটি লাইব্রেরীর অনুমতিক্রমে ছাপানো হলো।

আমরা বিশ্বাস করি যে, করিন্থীয়দের কাছে লেখা হজরত পৌলের প্রথম চিঠি সঠিক। এমনকি যদিও আমাদের হাতের মধ্যে চিঠিটির কোনো মূল পাণ্ডুলিপি নেই। আমরা এও বিশ্বাস করি যে প্রেরিত সিপারায় হজরত লূক যে ইতিহাস লিখেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস; কারণ, তিনি পাক-রূহ্ দ্বারা পরিচালিত হয়ে লিখেছেন। আরো বলা যায় যে, তাঁর লেখা ইতিহাস রোমীয় ঐতিহাসিকরা সমর্থন করেছেন; এবং দলিল দ্বারা ও পুরাতত্ত্বীয় উৎকীর্ণলিপি দ্বারা এগুলো আমরা নিজেরা আজও দেখতে পারি।

খ. কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের চূড়ান্ত সংকলন

খ. হজরত যায়েদ বিন সাবিত ও তাঁর কমিটি দ্বারা সংকলিত কোরআন

হজরত যায়েদ বিন সাবিত ও তাঁর কমিটি দ্বারা কোরআন সর্বপ্রথম সংকলিত হয়েছিল। আগের অংশে আমরা দেখেছি যে, হজরত আবু বকরের সময়ে সরকারী কোরআনের প্রথম প্রামাণ্য অনুলিপি সংকলিত হয়েছিল। অবশ্য, সেই সময়ে অন্য লোকদের কাছেও কোরআনের পাণ্ডুলিপি ছিল। হয় তাঁরা নিজেরা হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে শুনে তা লিখেছিলেন, অথবা তাঁরা যাঁদের কাছে এই সূরার সংগ্রহ ছিল, তাঁদের কাছ থেকে সূরাগুলো সংগ্রহ করে এনে কোরআনের অনুলিপি তৈরি করেছিলেন।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ। তিনি হজরত মোহাম্মদের ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। তিনি দাবী করেছেন যে, সরাসরি হজরত মোহাম্মদের মুখ থেকেই ৭০টি সূরা তিনি শিখেছিলেন। আর হাদিসে বলা হয়েছে যে, যাঁরা কোরআন বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা দিতেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই কথা সবাই জানে যে, তাঁর সংকলিত কোরআন একটু আলাদা ছিল। একজন আনসার হিসেবে হজরত মুহাম্মদ মদিনায় আসার পর তিনি তাঁর সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। হজরত উবাইয়ের হস্তলিখিত কোরআনের সংগ্রহে ২টি সূরা হজরত ওসমানের সংকলিত কোরআনে ছিল না। এই সূরা দুটো হচ্ছে, সূরা আল-কাউল এবং সূরা আল-হাফিজ, এর সাথে সূরা ১০:২৪ আয়াতে মানুষের লোভের বিষয়ে শেষে যে-কথা বলা হয়েছে, তাও ছিল না। হজরত ওসমানের সরকারী প্রামাণ্য কোরআনের অনুলিপি তৈরি হওয়ার আগে, হজরত ওবাইর সংকলিত আয়াতসমূহ বেশীরভাগ সিরিয়ায় ব্যবহৃত হতো। আর হজরত ওবাই সম্ভবতঃ হজরত ওসমানের নির্দেশে সরকারী প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হজরত যায়েদ বিন সাবিতকে সাহায্য করেছিলেন।

এই দুইজন লোকের পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস ও হাদিস থেকে জানা যায় যে, কোরআনের প্রাথমিক সংগ্রহ হজরত আলী ইবনে আবু তালিবেরও ছিল। তিনি হজরত মোহাম্মদের জামাতা ছিলেন। তিনি সূরা নাজিলের সময়ের ক্রম অনুসারে সূরাগুলো সাজিয়েছিলেন। তিনি সূরা 'আলাক্ব (ঘনীভূত শোনিত বা রক্তপিণ্ড) ৯৬ নং সূরা প্রথমে রেখেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস, যাঁর হস্তলিখিত কোরআন সংকলনের কথা হজরত আল-সুখুতি উল্লেখ করেছেন (ইতকান ১৫৪)। তিনি হজরত উবাইয়ের সংকলিত ২টি সূরা তাঁর সংকলিত কোরআনে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন (ইতকান

১৫৪) এবং মানুষের লোভের বিষয়ে আয়াতটিও তাঁর সংকলিত কোরআনে ছিল (সহি মুসলিম, ১. ২৫৮, ২৮৬)।[১]

আমরা নিম্নের হাদিসে দেখবো যে, এই সব সংকলনের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী ছিল যে, ইরাকের মুসল থেকে আগত মুসলমান সৈন্যরা হজরত ইবনে মাসুদের সংকলন আর সিরিয়ার সৈন্যরা হজরত ওবাইয়ের সংকলিত আয়াতকে অনুসরণ করেছে। এমনকি তাঁরা পরস্পরকে মিথ্যে বলার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

হজরত হুজায়ফা ইবনে আল-ইয়ামান যখন আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের যুদ্ধে জড়িত ছিলেন (২৫ বা ৩০ হিজরী) তখন সমস্যাটি এত মারাত্মক হয়েছিল যে, হজরত হুজায়ফা ইবনে আল-ইয়ামান ভবিষ্যতে কী ঘটবে সে বিষয়ে হজরত ওসমানকে সতর্ক করেছিলেন। নিম্নের হাদিসে তা উল্লেখ করা হলোঃ

> হজরত হুজায়ফা হজরত ওসমানকে বলেছিলেন, ”হে আমিরুল মোমেনিন, লোকদের সম্পর্কে সাবধান।”
>
> তিনি উত্তরে বললেন, “তুমি কী বলতে চাও?”
>
> হজরত হুজায়ফা বললেন, “আমি আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম, আর সেখানে ইরাকীদের পাশাপাশি সিরিয়ার লোকেরা ছিল। কিন্তু সিরিয়াবাসীরা হজরত ওবাই উবনে কাব সংকলিত কোরআন পাঠ করে আর ইরাকীরা তা কখনো শুনেনি, সুতরাং, ইরাকীরা সিরিয়াবাসীদের অবিশ্বাসের জন্য দোষারোপ করেছে। একইভাবে ইরাকীরা হজরত ইবনে মাসুদের সংকলিত কোরআন অনুসরণ করে, তারা এমন কিছু পাঠ করে যা সিরিয়ার লোকেরা কখনো শুনেনি। আর সিরিয়ার লোকেরা ইরাকীদের অবিশ্বাসের জন্য অভিযোগ করে। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মতো কিতাব নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার আগেই এদের বিরত করুন।”
>
> এই কথা অনুসারে হজরত ওসমান বিবি হাফজার কাছে গিয়ে বললেন, “আমাদেরকে কোরআনের সেই পাতাগুলো দিন, যেন আমরা তা অনুলিপি তৈরি করতে পারি। তারপর আমি সেই পাতাগুলো আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেব।” বিবি হাফসা সেই কথা মতো সেগুলো হজরত ওসমানের কাছে দিয়েছিলেন। তারপর, তিনি হজরত যায়েদ বিন সাবিত, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আল-যুবাইর, হজরত সাইদ ইবনে আল-আস এবং হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে কোরআন সংকলন করার জন্য হুকুম দেন। আর তাঁরা কোরআনের একটি সংকলন তৈরি করেন। আর হজরত ওসমান এই তিনজন কুরাইশের মিলিত দলকে বলেন যে, তোমরা এবং হজরত যায়েদ বিন সাবিত যখন কোরআনের কোনো অংশ সম্পর্কে একমত হতে পারবে না, তখন তোমরা কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষায় তা লিখবে, কারণ, কোরআন সত্যি সত্যি কুরাইশদের কথ্য ভাষায়ই নাজিল হয়েছে।” আর তাঁরা তাই করলেন। কোরআনের পাতাগুলো

---

[১] এই অংশে বর্ণিত বেশীরভাগ তথ্য আর্থার জেফরী , ই জে ব্রিল, লেইডেন,১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Materials for the History of the Text of the Qur'an* বই থেকে নেয়া হয়েছে।

অনুলিপি তৈরি করার পর তিনি সেগুলো বিবি হাফসাকে ফেরত দিয়েছিলেন। আর **তিনি** প্রতিটি এলাকায় তাঁদের দ্বারা সংকলিত কোরআনের অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সাথে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, এই কোরআন ছাড়া আর যে সব আয়াত লেখা পাতা এবং হস্তলিখিত কিতাব আছে, সেগুলো যেন পুড়ে ফেলা হয়।[২]

এছাড়াও আরো প্রমাণ আছে, যেগুলো দেখায় যে, হজরত যায়েদ বিন সাবিত কোরআন সংকলন তৈরি করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদিসে বলা হয়েছে:

হজরত ইবনে শাহাব বলেছেন যে, হজরত খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত আমাকে বলেছেন যে, তিনি হজরত যায়েদ বিন সাবিতের কাছে শুনেছেন, "যখন কোরআনের সংকলন তৈরি করছিলাম তখন আমরা দেখি যে, সূরা আহযাবের একটি আয়াত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না (৩৩:২৩), যা আমি রাসুলুল্লাহকে তেলাওয়াত করতে শুনেছিলাম। সেজন্য আমরা তা খুঁজতে শুরু করলাম, শেষে আমরা একজন মুসলমান আনসার হজরত খুজায়মা ইবনে সাবিতের কাছে পেলাম।— আর আমরা তা কোরআনের সংকলনে যোগ করে দিলাম।"[৩]

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে, হজরত যায়েদ বিন সাবিত কীভাবে কোরআনের সূরা সংগ্রহ ও একত্রিত করেছেন। এখন আমরা বিবেচনা করে দেখবো, ইঞ্জিল শরীফের বিবরণী কীভাবে সংগৃহিত হয়েছিল? বিশেষভাবে, হজরত লূক লিখিত সুখবর সিপারার প্রতি আমরা জোর দেব। এর কারণ হচ্ছে যে, তাঁর সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী তথ্য আমাদের জানা আছে।

ইঞ্জিল শরীফের বিবরণী লেখার ইতিহাস

ঈসা মসীহের বেহেশত গমনের পরবর্তী ২৫ বছর ধরে ইঞ্জিল শরীফের সব রকমের প্রচার কাজের ভিত্তি ছিল (ক) হজরত মূসার তৌরাত, হজরত দাউদের জবুর শরীফ ও নবীদের কিতাবে উল্লেখিত **ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী,** এর সাথে (খ) **সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ্যদর্শী প্রেরিতদের সাক্ষ্য।** সময় এগিয়ে চলার পর পাক-রূহ্ চারজন প্রচারককে ঈসা মসীহের জীবনধারা ও শিক্ষা লিখে রাখার জন্য পরিচালনা দিলেন। তবে এই কথা ঠিক যে, কোরআনের সূরার মতোই কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত কখন লেখা শুরু হয়েছিল, সেই তারিখ জানা নেই। সুতরাং, আমরা সঠিকভাবে জানি না, কখন এগুলো লেখা হয়েছিল। খ্রীষ্টান হাদিসের সংগ্রাহক হিসেবে হজরত পাপিয়াসের নাম ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, হজরত মথি প্রথমে ঈসা মসীহের বাণী লিখেছিলেন। প্রেরিত হজরত পিতর হজরত মার্ককে যা বলেছিলেন, তাই তিনি লিখেছিলেন। হজরত লূক প্রেরিত হজরত পৌলের একজন সংগী ছিলেন। আর হজরত ইউহোন্না বৃদ্ধ বয়সে ইফিষ শহরে বসে চতুর্থ সুখবর সিপারাটি লিখেছিলেন।

---

[২] তাবারীর তফসীর ১,২০

[৩] মিসকাবিত, পৃষ্ঠা ১৮৫, ঈমাম বুখারী এই হাদিসটি আনসার ইবনে মালিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

তবু এই কথা বলা যায় যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাস আমাদেরকে আনুমানিক সময় নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এভাবে, একজন রোমীয় ঐতিহাসিক টাসিটাস উল্লেখ করেছেন, সম্রাট নীরোর আমলে ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন,

> "মানুষের কাছ থেকে যত ধরনের সান্ত্বনা দেওয়া যায়, রাজার পক্ষ থেকে যত রকমের দয়া দেখানো যায়, যত রকমের কাফফারা দেবতাকে দেওয়া যায়, তার কোনো কিছুই সম্রাট নীরোর উদ্বেগের অবসান ঘটাতে পারেনি, তিনি রোমে আগুন লাগার কুকীর্তির কারণ বিশ্বাস করেছেন। তাই গুজব থামানোর জন্য, তিনি মিথ্যে অভিযোগ তুলে খ্রীষ্টানদের দোষী করেন, যাদেরকে সাধারণ লোক বলে ঘৃণা করা হতো, তাদেরকে সবচেয়ে নিখূঁতভাবে শাস্তি দিয়ে তা উপভোগ করেন। **ক্রিষ্টাস, এই সমপ্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে সম্রাট তিবেরিয়াসের সময় এহুদার গভর্নর পন্তীয় পিলাত মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন**, কিন্তু, কিছু সময়ের জন্য চেপে রাখা এই ক্ষতিকর অন্ধবিশ্বাস আবারও সবাই জেনে যায়, যেখানে এই ক্ষতিকর অন্ধবিশ্বাস শুরু হয়েছিল, কেবল সেই এহুদার গোটা এলাকায় নয়, এমনকি তা রোম শহরেও ছড়িয়ে পড়ে।"[৪]

গাঢ় অক্ষরে লেখা শব্দগুলো থেকে এটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ঐতিহাসিক টাসিটাস ও রোমীয়রা বিশ্বাস করতেন যে, সুখবর সিপারা যেভাবে লেখা হয়েছে, তেমনিভাবেই পন্তীয় পিলাতের সময়ে ঈসা মসীহকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। এর সাথে আরো বলা যায় যে, ঐতিহাসিক টাসিটাস এই সত্য সমর্থন করেছেন যে, সম্রাট নীরো খ্রীষ্টানদের ওপর প্রচন্ড নির্যাতন চালিয়েছিলেন।

পরম্পরাগত শ্রুতি হিসেবে খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, হজরত পিতর ও হজরত পৌল এই নির্যাতনের সময়ে শহীদ হয়েছিলেন। যেহেতু হজরত লূক প্রেরিত সিপারায় তাঁদের ওপর নির্যাতন বা তাঁদের মৃত্যুর বিষয়ে **কিছু বলেননি,** সেহেতু প্রচারমুখী খ্রীষ্টান আলেমরা মনে করেন যে, এই নির্যাতন নেমে আসার আগেই প্রেরিত সিপারাটি লেখা হয়েছিল। রোমে হজরত পৌলের যে দুই বৎসর ছিলেন, সেই সময়েই ওই সিপারাটি লেখা হয়েছিল। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে বলা যায় যে, প্রেরিত সিপারাটি ৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল আর প্রায় ৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্যালেষ্টাইনে হজরত পৌলের বিচারের জন্য অপেক্ষা করার সময়ে লূক সুখবর সিপারাটি তিনি লিখেছিলেন।

কিতাব সংকলক হিসেবে হজরত লূকের যোগ্যতা

কলসীয় ৪:১৪ আয়াত অনুসারে প্রেরিত হজরত পৌল তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, "লূক সেই প্রিয় ডাক্তার— তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছেন। ''এই গুণের সাথে তাঁর গ্রীক ভাষা লেখার যোগ্যতা দেখায় যে, হজরত লূক একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন।

[8] Tacitus' Annals XV.44 ৫২-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে টাসিটাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর ১১২ খ্রীষ্টাব্দের এশিয়ার (উত্তর তুরষ্ক) গভর্নর হয়েছিলেন।

হজরত লূক কমপক্ষে দু'বার প্রচার যাত্রায় হজরত পৌলের সংগী হয়েছিলেন। প্রথমবার স্বল্প সময়ের জন্য তুরস্কের ত্রোয়া থেকে গ্রীসের ফিলিপি শহর পর্যন্ত (প্রেরিত ১৬:১০ -১৬:৪০), আর দ্বিতীয়বার কয়েক বৎসরের জন্য তিনি হজরত পৌলের সাথে ফিলিপি থেকে জেরুসালেমে গিয়েছিলেন। প্যালেষ্টাইনে হজরত পৌলের ২ বছরের বেশী জেলে থাকার সময়ে তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এর পর আরও ২ বছর রোমের কারাগারে হজরত পৌলের বন্দি থাকার সময়ে তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন (প্রেরিত ২০:৬ -২৮:৩১)।

জেরুসালেমে ও প্যালেষ্টাইনে থাকার সময়ে ঈসা মসীহকে যাঁরা চিনতেন, এমন অনেক লোকের সাথে হজরত লূকের কথা বলার সুযোগ ছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন, ঈসা মসীহের ভাই হজরত ইয়াকুব, হজরত ইয়াকুবের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে হজরত লূক এই কথা কয়টি লিখেছেন,

> "পর দিন পৌল আমাদের সংগে **ইয়াকুবকে** দেখতে গেলেন; সেখানে জামাতের সব নেতারা উপস্থিত ছিলেন" (প্রেরিত ২১:১৮)। (গাঢ় অক্ষর আমি করেছি)

বিবি মরিয়ম ও হজরত ইউসুফের ছেলে হিসেবে হজরত ইয়াকুব, ঈসা মসীহের অলৌকিক জন্ম ও কীভাবে তিনি হজরত ইয়াকুবের সাথে কাঠের দোকানে কাজ করতেন তা জানতেন। হজরত লূক একমাত্র লেখক, যিনি ১২ বছর বয়সে জেরুসালেমের এবাদতখানায় আলেমদের সাথে ঈসা মসীহের কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন (লূক ২:৪১-৫০)। এই সত্য ঘটনাটি হজরত ইয়াকুবের কাছ থেকে সহজেই জেনে নেয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিল।

১ করিন্থীয় ১৫:৭ আয়াতে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ্ মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর হজরত ইয়াকুবকে দেখা দিয়েছিলেন। হজরত ইয়াকুবের সাথে হজরত লূক দেখা করার সময়ে, মসীহের এই দেখা দেওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আর ঈসা মসীহ্ এই সম্পর্কে কী বলেছিলেন, সেই কথাও অবশ্যই জানতে চেয়েছিলেন, এই কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

হজরত ইয়াকুবকে প্রশ্ন করার পাশাপাশি, যদি **বিবি মরিয়ম** তখনও বেঁচে থাকেন, হজরত লূক তাঁর কাছেও মসীহের অলৌকিক জন্ম সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করার সম্ভাবনা ছিল। কেননা, হজরত লূক লূকই একমাত্র লেখক, যিনি হজরত জিবরাইল ফেরেশতার সাথে বিবি মরিয়মের আলোচনার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "পাক-রূহ্ তোমার ওপরে আসবেন এবং আল্লাহতায়ালার কুদরতীর ছায়া তোমার ওপরে পড়বে; এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্ম গস্থহণ করবেন, তাঁকে ইবনুল্লাহ বলা হবে" (লূক ১:২৬-৩৮)।

হজরত পৌলের বন্দি থাকাকালীন সময়ে, প্যালেস্টাইনে দুই বছরেরও বেশী সময় ধরে আক্ষরিক অর্থেই তিনি **শত শত** লোকের সাথে মিশেছেন, যাঁরা ঈসা মসীহের মোজেজা নিজের চোখে দেখেছিলেন, তাঁর কথা শুনেছিলেন, মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হওয়ার পর ঈসা মসীহকে **একবার ৫০০ বেশী লোক** একসাথে দেখেছিলেন, এঁদের সাক্ষাতকার নেয়ার সম্ভাবনাও তাঁর ছিল (১ করিন্থীয় ১৫:৬)।)

শেষে, আমরা জানি যে, হজরত লূক হজরত মার্ককে চিনতেন, কারণ, তাঁরা একই সময়ে হজরত পৌলের সাথে ছিলেন। কলসীয় সিপারার শেষে হজরত পৌল লিখেছেন,

"আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ এবং বার্ণবার আত্মীয়, মার্ক, যাঁর বিষয়ে তোমরা হুকুম পেয়েছো;
— লূক, সেই প্রিয় ডাক্তার এবং দীমা, তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছেন।" (কলসীয় ৪:১০, ১৪)

হজরত পাপিয়াসের বর্ণনা অনুসারে, ঈসা মসীহের জীবনধারা ও বাণী হজরত পিতরের মুখ থেকে শুনে হজরত মার্ক লিখেছেন। অন্য দুটি সুখবর সিপারার বিবরণের সাথে তুলনা করলে আমরা দেখি যে, হজরত লূক অবশ্যই নিশ্চিতভাবেই হজরত মার্কের লেখা সুখবর সিপারার কথা জানতেন। আর এই উৎসকে নিজের লেখা সুখবর সিপারায় ব্যবহার করেছেন। হয়তো হজরত পিতরের বন্দি থাকাকালীন সময়ে তিনি হজরত মার্ক লিখিত সুখবর সিপারাটি হজরত মার্কের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এসব তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে ইংগিত দেয় যে, ইঞ্জিল শরীফের বাণী যাঁচাই করার চমৎকার হজরত লূকের সুযোগ ছিল; যেভাবে হজরত যায়েদ বিন সাবিত এবং তাঁর সহযোগীরা কোরআনের সংকলনের সত্যতা যাঁচাই করেছেন।

হজরত লূকের কিতাব সংকলনের পদ্ধতি

কোরআনের মতোই অনেক লোকের ইঞ্জিল শরীফেরও নিজস্ব সংকলন ছিল। তাঁরা ঈসা মসীহের বাণী ও কাজের কথা সংগ্রহ করেছেন। হজরত লূক এই কথা তাঁর লেখা সুখবর সিপারার ভূমিকায় লিখেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব সংকলন সম্পর্কে লিখেছেন,

"মাননীয় থিওফিল, **আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে** তা যাঁরা প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন ও আল্লাহ্‌র সুসংবাদ তবলিগ করেছেন, তাঁরা আমাদের কাছে সব কিছু জানিয়েছেন, আর তাঁদের কথামতোই **অনেকে সেই সব বিষয়গুলো পরপর লিখেছেন। সেই সব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়ে** আপনার জন্য তা একট একটা করে লেখা আমিও ভালো মনে করলাম। এর ফলে আপনি যা জেনেছেন তা সত্যি কি-না তা জানতে পারবেন" (লূক ১:১-৪)।

হজরত লূক প্রথমে আমাদের বলেছেন যে, অনেক লোক ঈসা মসীহের কথা, তাঁর মোজেজার কথা সংগ্রহ করেছেন। এই লেখকেরা তাঁদের কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছেন, যাঁরা "কালামের সেবক ছিলেন ও প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন। "এখানে কালাম বলতে ঈসা মসীহকে বুঝানো হয়েছে। ঈসা মসীহকে আল্লাহ্‌র কালাম (কালিমাতু আল্লাহ্ كَلِمَةُ اللَّهِ) এই উপাধিটি প্রথমে সুখবর সিপরায় তারপর কোরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। পরে হজরত লূক বলেছেন, "আমি নিজে **সেই সব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালোভাবে খোঁজ খবর নিয়েছি।**"

হজরত লূক বা অন্য কোনো হাদিসে দুইজন সাক্ষী থাকা দরকার সে'কথা বলা হয়নি। আমি নিজেই তৌরাত- দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৫ আয়াত থেকে এই ধারণাটি পেয়েছি। এখানে বলা হয়েছে,

"যদি কারোর বিরুদ্ধে দোষ বা অন্যায় করার নালিশ আনা হয়, তবে মাত্র একজন সাক্ষী দাঁড়ালে চলবে না; দুই বা তিনজন সাক্ষীর কথা ছাড়া কোনো বিষয় সত্যি বলে প্রমাণিত হতে পারবে না।"

যদি কোনো মানুষের অপরাধ বা দোষ প্রমাণ করার জন্য দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন, তবে আল্লাহ্‌র পবিত্র কালামের সত্যতা যাঁচাই করার জন্য দুইজন সাক্ষীর কত না বেশী দরকার। এখন আমরা তাড়াতাড়ি অন্যান্য সুখবর সিপারাগুলো থেকে কী জানতে পারি, তা দেখবো।

মার্ক সিপারা

হজরত মার্ক জেরুসালেম থেকে এসেছিলেন। যৌবনে তিনি হজরত পিতর ও অন্যান্য সাহাবীদের দেখেছিলেন। আমরা জানি যে, তাঁর জীবনের শেষের দিকে তিনি হজরত পিতরের সাথে রোম শহরে ছিলেন; কারণ, হজরত পিতর লিখেছেন,

> "আল্লাহ্‌ তোমাদের সংগে যাদের বেঁছে নিয়েছেন ব্যাবিলনের সেই জামাতের লোকেরা তোমাদের সালাম জানাচ্ছে, আর আমার সন্তান মার্কও তোমাদের সালাম জানাচ্ছে।" (১ পিতর ৫:১৩)

সুতরাং, পাপিয়াস যে বলেছিলেন, হজরত পিতর যা বলেছিলেন, হজরত মার্ক তা-ই লিখেছেন, এই কথাটি একেবারেই সম্ভব। হতে পারে হজরত পিতর অরামীয় ভাষায় বলেছিলেন, আর হজরত মার্ক একইসাথে অনুবাদক ও লেখক হিসেবে কাজ করেছেন। আমরা জানি না, কিন্তু যাঁরা অরামীয় ও গ্রীক ভাষা দুটোই জানেন, তাঁরা বলেছেন,

> "কোনো প্রমাণের অভাব নেই যে, (মার্ক লিখিত সুখবরে) মূল অরামীয় ভাষায় যেরূপ ছিল; তিনি অভ্রান্তভাবেই গ্রীক ভাষায় অরামীয় বাকধারা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।"[৫]

জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট নীরোর নির্যাতনের সময়ে হজরত পিতর শাহাদত বরণ করেন। ডঃ বুকাইলি তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, হজরত পিতরের মৃত্যুর পর হজরত মার্ক স্মৃতি থেকে এই সিপারাটি লিখেছিলেন। এজন্য তাঁর যুক্তি হচ্ছে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই সিপারাটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু হজরত লূক যিনি সম্ভবতঃ তাঁর সুখবর সিপারাটি ৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লিখেছিলেন, তিনি হজরত মার্কের সুখবরটির কথা জেনেছিলেন। তাঁর সুখবর লেখার একটি অন্যতম উৎস হিসেবে হজরত মার্কের লেখা সুখবর ব্যবহার করেছিলেন। অধিকাংশ গোঁড়া আলেম, বিশেষভাবে আদি জামাতের নেতা যেমন, হজরত ওরিগেন, হজরত জেরোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার হজরত ক্লিমেন্ট মনে করেছেন যে, ৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকেই এই সুখবর সিপারাটি লেখা হয়েছিল।

---

[৫] *The New Testament Documents: Are They Reliable,* F. F. Bruce, Intervarsity Press, Downers Grove, Ill. 5th Ed., 1960, p 37.

যদিও আমরা পরে দেখবো যে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল বলে যে ইংগিত ডঃ বুকাইলি দিয়েছেন, তা অভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এটি প্রাথমিক অনুমিত বিষয় থেকে এসেছে, এই ধারণার ভিত্তি হচ্ছে গাঠনিক সমালোচনা মতবাদ। আর এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মোজেজা ও ওহী বিশ্বাস করেন না।

মথি সিপারা

হজরত মথির লেখা সুখবর সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সিপারার লেখার তারিখও কারো জানা নেই। যদিও আমরা পরে দেখবো যে, প্রাচীন খ্রীষ্টান চিঠি ও লেখায় মথি সিপারা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। এগুলো আমাদের কাছে আছে, আর পাপিয়াস বলেছেন যে, ঈসা মসীহের কথা যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে হজরত মথি প্রথম লেখক ছিলেন।

সুখবর সিপারার বিবরণী থেকে আমরা জানি যে, ঈসা মসীহের ডাকে সাড়া দেওয়ার আগে হজরত মথি একজন কর-আদায়কারী ছিলেন। কর-আদায়কারী হিসেবে তাঁর ল্যাটিন ও অরামীয় ভাষা জানার দরকার ছিল। কারণ, রোমীয়দের পাওনা করের পরিমাণ ও করদাতাদের নামের তালিকা রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। আর সম্ভবতঃ তিনি গ্রীক ভাষাও জানতেন। কারণ, গ্রীক ছিল সেই যুগের বানিজ্যিক ভাষা। সুতরাং, এটি বিশ্বাস করার জন্য একটি ভালো কারণ হতে পারে যে, ঈসা মসীহের কালাম লিখে রাখার যোগ্যতা তাঁর ছিল। আর পাপিয়াস অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা মসীহের কালাম (লগিয়া) হিব্রু (অরামীয়) ভাষায় হজরত মথি লিখেছেন।

যেহেতু ঈসা মসীহের সাথে হজরত মথি গ্রামের পর গ্রাম ঘুড়ে বেড়িয়েছেন, তাঁর প্রচার শুনেছেন, তিনি ঈসা মসীহের শিক্ষামালা লিখেও রেখেছেন। সম্ভবতঃ এই সব টিকার কোনো তারিখ তিনি দেননি, যেভাবে কোরআনের কোনো সূরারও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তাই ঈসা মসীহ্ কী বারে বা কোন গ্রামে কী বলেছিলেন, এর ওপর কোনো তারিখ স্পষ্টতঃই কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, “তোমাদের বেহেশতী পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।” মথি ৫:৪৮। আর সহজেই বলা যায় যে, তারিখ বা সময় এই বাণীর ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

পরে হজরত লূকের মতো আর একজন লেখক, যিনি ঈসা মসীহের বাণী ও কাজের নিজস্ব সংগ্রহ তৈরি করেছেন, তিনি লেখার জন্য হজরত পিতরের কাছ থেকে শুনা মার্ক লিখিত সুখবর থেকে উপাদান নিয়েছেন, হজরত মথি সংগৃহিত ঈসা মসীহের বাণীর গ্রীক অনুবাদ থেকে তিনি পাঁচটি শিক্ষামালা তৈরি করেছেন- পর্বতে দেওয়া মসীহের শিক্ষামালা। (মথি ৫-৭)

এই উপদেশগুলোর মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহ্ মোনাজাত, রোজা, তালাক, মনে-মনে ব্যভিচার করা, আর ঈমানদারদের রূহানি জীবনে কেমন আচরণ করতে হবে, সে সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। এই অংশে তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুকুমের কথা বলেছেন।

> “কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: তোমাদের শত্রুদেরও ভালোবাস। যারা তোমাদের জুলুম করে, তাদের জন্য মোনাজাত কোরো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যি তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান।” (মথি ৫:৪৪-৪৫ক)

শত্রুরা যখন মসীহকে ক্রুশে দিয়েছিল সেই সময়ে ঈসা মসীহ্ এই হুকুম নিজে পালন করেছেন এবং পূর্ণ করেছেন।

> “পিতা এদের মাফ করো, কারণ, এরা কী করছে তা তারা জানে না।” (লূক ২৩:৩৪)

ঈসা মসীহের দেওয়া ওপরে উল্লেখিত হুকুম থেকে এটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, “বেহেশতী পিতার সন্তান” বলতে আল্লাহ্‌র সাথে ঈমানদারের রূহানিক সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। এই কথা বলতে কোনো শারীরিক সম্পর্কের কথা বুঝানো হয়নি।

কেবল হজরত মথি লিখিত সুখবর সিপারার মধ্যে অন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে, তা হলো, এই সিপারায় ইহুদী জাতির নবজাত বাদশাহ ঈসা মসীহকে সেজদা করার জন্য পূর্বদেশ থেকে পন্ডিতদের আসার কথা বলা হয়েছে। হজরত মথির সংকলিত কিতাবে এই বিষয়টি ছিল কি ছিল না, তা আমাদের জানা নেই। কারণ, ঈসা মসীহের বাণী নিয়ে হজরত মথির নিজের হাতে লেখা কোনো মূল পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে নেই, যেভাবে হজরত ইবনে মাসুদের সংকলিত কোরআনের কোনো মূল পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আজ আর নেই।

সবশেষে, বলা যায়, যেভাবে কোরআনে কোনো সূরার নাম, সেই সূরার অন্তর্ভূক্ত কোন শব্দ থেকেই দেওয়া হয়েছে; তেমনিভাবে এই সিপারার নাম দেওয়া হয়েছে, হজরত মথি লিখিত সুখবর, কারণ, সুখবর সিপারার এই বিবরণ হজরত মথি লিখেছেন।

ইউহোন্না সিপারা

৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর লেখা হয়েছিল। প্রেরিত হজরত ইউহোন্না বুড়ো বয়সে তা লিখেছেন। কিন্তু সুখবর সিপারারগুলোর মধ্যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, যার ভিত্তিতে আমরা এই সময়কাল নির্ধারণ করতে পারি। সমপ্রতি কালে, আলেমরা এই কথা বলতে চাচ্ছেন যে, এই সময়ের আগেই এই সুখবর কিতাবটি লেখা হয়েছিল।

কিতাবুল মোকাদ্দস সর্ম্পকীয় জগতের সেরা একজন পুরাতত্ত্ববিদ- উইলিয়াম ফক্সওয়েল অলব্রাইট বলেছেন, “আমরা ইতোমধ্যেই জোরালোভাবে বলতে শুরু করেছি যে, ৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নতুন নিয়মের কোনো সিপারা লেখা হয়েছিল, এই কথা আগে বললেও এখন আর এই কথা বলার কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই।"[৬]

[৬] Albright, *Recent Discoveries in Bible Lands,* Funk and Wagnalls, New York, 1955, p 136.

ডঃ বুকাইলির তারিখ ও কেন

ডঃ বুকাইলি কয়েকজন নতুন নিয়ম বিশেষজ্ঞ আলেমদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ৪টি সুখবর লেখার সময়কাল নিম্নরূপে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, হজরত মথি ৮০ খ্রীষ্টাব্দে, হজরত মার্ক ৭০ খ্রীষ্টাব্দে, হজরত লূক ৭০-৯০ খ্রীষ্টাব্দে এবং হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর ৯০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন যে, এই তারিখগুলো সবই ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে!!! কিন্ত কেন এভাবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে? এর কারণ হচ্ছে, জেরুসালেম ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস হয়েছিল। হজরত মথি, হজরত মার্ক ও হজরত লূক সবাই লিখেছেন যে, ঈসা মসীহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জেরুসালেম ও এবাদতখানা ধ্বংস হবে। হজরত মার্ক ঈসা মসীহের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে লিখেছেন,

> "ঈসা বায়তুল মোকাদ্দস থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর একজন উম্মত তাঁকে বললেন, "হুজুর, দেখুন, কত বড় বড় পাথর, আর কী সুন্দর সুন্দর দালান!"
>
> ঈসা তাঁকে বললেন, "তুমি তো এইসব বড় বড় দালান দেখছো, কিন্তু **এর একটা পাথরও আর একটা পাথরের ওপর থাকবে না;সমস্তই ভেঙ্গে ফেলা হবে।।**" (মার্ক ১৩:১২)

ডঃ বুকাইলি উদ্ধৃত করার জন্য যে সব লোকের কথা বেঁছে নিয়েছেন, তাঁরা সবাই "**অনুমিত পরিকল্পনা দলিল**" বা **ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস ও গাঠনিক সমালোচনা** মতবাদে বিশ্বাস করেন। আমরা এই বিষয়টি এই অংশে ২ ও ৩ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আপনি স্মরণ করতে পারেন যে, যাঁরা প্রথমে এই তত্ত্ব বিবেচনা করার প্রস্তাব করেছেন, তাঁদের **প্রাথমিক অনুমিত বিষয়** ছিল যে, মোজেজা ও ওহী কখনোই সফল হয় না।

সুতরাং, এই **প্রাথমিক অনুমান করে জেরুসালেম ধ্বংসের পরে** অর্থাৎ যে ঘটনা সম্পর্কে কিতাবগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা ঘটার পরে **তাঁরা এই সিপারাগুলোর লেখার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন।**

আমরা ওপরে বলেছি, ইঞ্জিল শরীফের কোনো সিপারায় মধ্যেই এমন কোনো তথ্য নেই, যা ইংগিত দেয় যে, কখন এটি লেখা হয়েছিল। হতে পারে ঈসা মসীহের মৃত্যুর পরে পরেই প্রথম দশ বছরের মধ্যে লেখা হয়েছিল। সমপ্রতিকালে, একজন লেখক, এ টি রবিনসন ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা *রিডেটিং দি নিউ টেষ্টামেন্ট* বইয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম পতনের আগেই গোটা ইঞ্জিল শরীফ লেখা হয়েছিল।[৭]

ডঃ বুকাইলি তাঁর লেখা বইয়ের ৭৬ পৃষ্ঠায় ২ টি রেখাচিত্রের সাহায্যে ইঞ্জিল শরীফের বিবরণী সংগ্রহের সময় উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দস, জোর করে হেলাফেলা করে ব্যবহার, রদবদল করা হয়েছে, পরিবর্তন করা হয়েছে। নিচের

---

[৭] Robinson, *Redating the New Testament,* London: SCM Press, 1976.

রেখাচিত্রের সাহায্যে এই বইয়ে আলোচিত ইঞ্জিল শরীফের সংকলনের সময়কাল আমরা তুলে ধরেছি।

রেখাচিত্র ১- সুখবর সংকলন

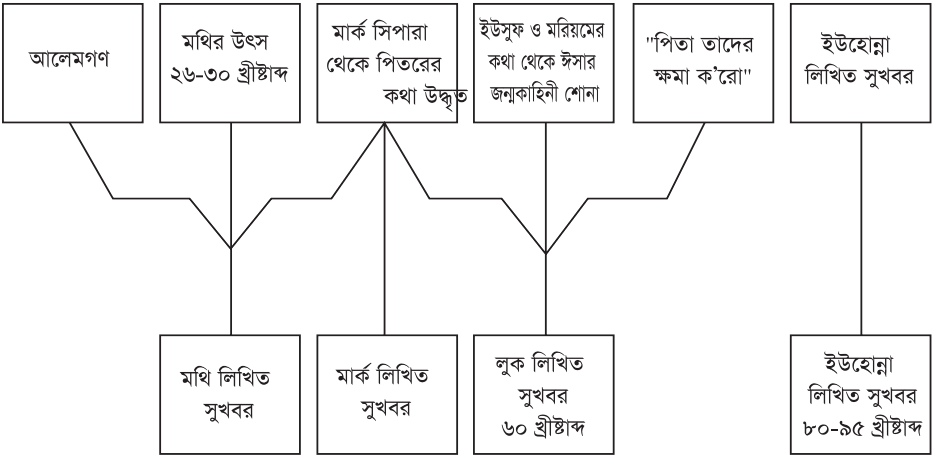

১নং রেখাচিত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে, ডঃ বুকাইলি যে সময়কাল উল্লেখ করেছেন তাঁর সাথে আমি কোনোভাবেই একমত হতে পারি না। যদি আমার দেওয়া সময়কালের পরিবর্তে তাঁর দেওয়া সময়কাল গ্রহণ করি, তবে অনেক আলেমরাই তাঁর সাথে একমত হবেন না। কারণ, আলেমরা একমত হয়েছিলেন যে, ৫০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইঞ্জিল শরীফের অনেক সিপারাই লেখা হয়েছিল, আর ৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোটা ইঞ্জিল শরীফ লেখা হয়েছিল আর নতুন নিয়মের সব লেখকরাই সুখরের শিক্ষা বিশ্বাস করতেন।

আমি জোর দিতে বলতে চাই, ৫২-৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুখবর সিপারাগুলো লেখা হয়েছিল। কারণ, ঈসা মসীহের প্রথম প্রচার শুরুর ২৬-৪৪ বছর সময়কাল নির্দেশ করছে। যখন আমরা স্মরণ করি **যে, হজরত মুহাম্মদ তাঁর প্রচার কাজ শুরু করার ৪০ বছর পরে** ২৬ হিজরীতে হজরত ওসমানের নির্দেশে কোরআনের সরকারী প্রামান্য কোরআনের অনুলিপি বিতরণ শুরু হয়েছিল। আমরা দেখি যে, লিখিত সুখবর প্রচার আর লিখিত কোরআন প্রচারের সময়কালের মধ্যে একেবারেই হুবুহু মিল রয়েছে।

আবারও আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন **যে, কিন্তু কীভাবে আপনি তা জানেন?**

আমরা উত্তরে বলবো,

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈসা মসীহের সাহাবীরা ছিলেন, ধার্মিক, সৎ মানুষ, যাঁরা আল্লাহ্‌র সত্য জানতে ও পালন করতে আগ্রহী ছিলেন। কোরআনও এই কথার সাথে একমত যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছিলেন ও আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হতে চেয়েছিলেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈসা মসীহের জীবনধারা ও মোজেজা অনেকেই নিজের চোখে দেখেছিলেন, তারা সত্য ঘটনা তুলে ধরতে পারতেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ইঞ্জিল শরীফের এই বিবরণীগুলো আগেই লেখা হয়েছিল, এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে **আমরা বিশ্বাস করি,** পাক-রূহের পরিচালনায় তাঁরা এসব লিখেছেন।

কিন্তু আমাদের কাছে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই, এই অর্থে যে, আমাদের কাছে, প্রেরিত সিপারা বা লূক লিখিত ইঞ্জিলের মূল পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে নেই।

কোরআন সংকলনের সময় হজরত ওসমানের "বিশেষ ও অতুলনীয় সাবধানতা"

বইয়ের এই অংশের শুরুতে অনেক হাদিস উদ্দৃত করা হয়েছে, যেগুলো হজরত যায়েদ ইবনে সাবিথ ও তাঁর দলের লোকদের দ্বারা কোরআন সংকলনের বিষয়ে বলেছে। আমি এসব হাদিসের মধ্য থেকে একটি হাদিসের শেষের কয়টি লাইন আবারও উল্লেখ করছি। কারণ, আমরা এখন সেই শেষের বাক্যটি নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে বলা হয়েছে,

> "যখন তাঁরা কোরআনের পাতাগুলো অনুলিপি তৈরি করেন, তখন তিনি সেগুলো হাফসার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর **তিনি** প্রতিটি এলাকায় তাঁদের দ্বারা সংকলিত কোরআনের অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সাথে তিনি হুকুম দিয়েছিলেন, এই কোরআন ছাড়া আর যে সব আয়াত লেখা পাতা এবং হস্তলিখিত কিতাব আছে, সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।"[৮]

আমরা মনোযোগ দিয়ে শেষের বাক্যটি লক্ষ্য করবো,

> —হজরত ওসমান হুকুম দিয়েছিলেন—এই কোরআন ছাড়া আর যে সব আয়াত লেখা পাতা এবং হস্তলিখিত কিতাব আছে, সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। কোরআনের যেন কোনো ভিন্ন-পাঠ না থাকে এটি নিশ্চিত হবার জন্যই হজরত ওসমান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই কাজ করার জন্য তিনি হজরত ইবনে সাবিতের অনুলিপি ছাড়া বাকী অনুলিপি পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন।

তিনি হজরত মোহাম্মদের জামাতা হজরত আলীর কোরআনের নিজস্ব অনুলিপিটিও পুড়িয়েছিলেন।

এছাড়াও তিনি হজরত উবাই ইবনে কাবের অনুলিপি পুড়িয়েছিলেন। হজরত ইবনে আলী দাউদ লিখেছেন, "যখন কয়েকজন ইরাকী উবাইয়ের ছেলের কাছে তাঁর পিতার লেখা কোরআনের সংকলন

[৮] তাবারীর তাফসীর, ১,২০

দেখতে চেয়েছিলেন, তখন ছেলেটি উত্তরে বলেছিলেন, হজরত ওসমান তা "জোর করে দখল করে নিয়েছে" (ক্বাবাদ্বাহু قَبَضَهُ)।[৯]

অনেক দূরে ইরাকে থাকা হজরত ইবনে মাসুদকে তাঁর ব্যক্তিগত অনুলিপি ধ্বংস করার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। হজরত ইবনে মাসুদ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তা রক্ষা করেছিলেন, শেষে সেই অনুলিপিটিও ধ্বংস করা হয়।

যদি হজরত ওসমান কোরআনের অন্যান্য অনুলিপিগুলো পুড়ানোর হুকুম না দিতেন, তাহলে কোরআনের বৈধতা সম্পর্কে ৪টি (বা আরো বেশী) সাক্ষ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি **এমন কোরআন পুড়িয়েছিলেন,** যেগুলো **প্রাথমিক সংকলন ছিল, আর এগুলো তাঁরা তৈরি করেছিলেন, যাঁরা হজরত মোহাম্মদের কথা নিজের কানে শুনেছিলেন, নিজের চোখে তাঁকে দেখেছিলেন।**

ওপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তওরাতে বলা হয়েছিল, কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু একের বেশী সাক্ষী নষ্ট করে কেবল একজন মাত্র সাক্ষী রেখেছেন। কমপক্ষে একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, তিনি কোরআনের অনেক অনুলিপি পেয়েছিলেন কিন্তু একটি মাত্র রাখেন। তিনি কিতাবকে ছিন্ন করেছেন।[১০]

আমার সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে, আমি এখন আমার মুসলমান পাঠকদের জানাতে চাই যে, অমুসলমানদের কথা বাদ দিয়েও কীসের ভিত্তিতে আপনি নিজের জন্য এটা প্রমাণ করতে পারেন যে, কোনো আয়াতের পরিবর্তন (আল-তাহ্রীফু-আল-ল্লাফযী اَلتَّحْرِيفُ اَللَّفْظِي) হয়নি?

আর ডঃ বুকাইলি হজরত ওসমানের এই কাজ সম্পর্কে কী বলেছেন?!? একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদে তিনি স্বযত্নে বাছাই করা বাক্য দিয়ে তিনি লিখেছেন,

> "হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এমন সব এলাকার লোকজনও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন, যাঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা আরবী ছিল না। সুতরাং, এক্ষেত্রে ওই সব এলাকার লোকজনও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে, যাদের অনেকেরই মাতৃভাষা আরবী ছিল না। সুতরাং, ওইসব এলাকার **সর্বত্র যাতে মূল সঠিক পাঠ সম্বলিত কোরআন পৌঁছতে পারে, সে বিষয়ে সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করাই ছিল সঠিক কোরআন সংকলনের মূল উদ্দেশ্য।** [১১] (গাঢ় অক্ষর আমি করেছি)

আসুন, আমরা শেষের বাক্যটি আবার পড়ি,

---

[৯] ইবনে আলী দাউদ (মৃত্যু ৩১৬ হিজরী/৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) কিতাব আল-মাসাহিফ,দামেস্কের জাহিরিয়া লাইব্রেরী থেকে হস্তলিখিত অনুলিপি থেকে আর্থার জাফলী হস্ত লিখিত অনুলিপি তৈরী করেছেন (হাদিস নং ৪০৭), পৃষ্ঠা ২৫, *for the History of the Text of the Qur'an,* Arthur Jeffrey, E. J. Brill, Leiden, 1937.

[১০] তাবারী, ১,২৯৫২,১০;১১,৫১৬,৫

[১১] বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১৬১

সর্বত্র যাতে মূল সঠিক পাঠ সম্বলিত কোরআন পৌঁছতে পারে, সে বিষয়ে **সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করাই ছিল** সঠিক কোরআন সংকলনের মূল উদ্দেশ্য।!!!

কল্পনা করুন যে, যদি খ্রীষ্টানরা এরকম একটি ছোট্ট বাক্য লিখতেন, তবে তিনি তাঁদের সম্পর্কে কী লিখতেন? আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, কথার মারপ্যাচে আমরা বক্তব্যকে ঘুড়িয়েছি। সত্য গোপন করেছি, বিশ্বাসীদের সাথে প্রতারণা করেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমরা আমাদের বইয়ে একটি নতুন চিহ্ন ব্যবহার করবো। চিহ্নটা এই রকম (-@-@-@) এটি কথার মারপ্যাচ সম্পর্কে তিনটি ডিগবাজী বুঝায়।

ডঃ বুকাইলি খ্রীষ্টানদের কঠোর ভাষায় দোষী করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "**সম্ভবতঃ** শত শত সুখবর কিতাব গোপন করা হয়েছে।"[১২] যদিও তিনি এই তথ্যের কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। আর কোনো কোনো নির্দিষ্ট আয়াত "একপাশে জোর করে সরিয়ে রাখা হয়েছে।" হতে পারে কোনো একটি স্থানীয় এলাকায় তা সম্ভব, কিন্তু অনেক বছর পরে ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনষ্টানটাইনের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত যেহেতু জামাতের নেতাদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না, সেহেতু, তাঁদের পক্ষে এমন ধরনের কাজ করা অসম্ভব ছিল।

প্রাথমিক দিকে কিছু কিছু কিতাব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, এই কথা সত্যি। কিন্তু এগুলো অবিশ্বাসী-খ্রীষ্টানরা পুড়িয়েছিল। **৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে অবিশ্বাসী সম্রাট ডায়াক্লেশিয়ান খ্রীষ্টানদের সব পাক-কিতাব পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন।** এসব কিতাবের মধ্যে প্রামাণিক কিতাব ও এপোক্রিফা সব ধরনের কিতাব ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, এর ফলে অনেক কিতাব ধ্বংস হয়েছিল, **কিন্তু জামাত কখনোই এগুলোকে ধ্বংস করেনি।**

উত্তর আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হিপ্পো সিনোডে গৃহিত সিদ্ধান্তের আগে ৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত কোনো জামাতের মহাসভা সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, কেবল প্রেরিতদের তত্বাবধানে লেখা কিতাবগুলো প্রামাণ্য কিতাব বলে গ্রহণ করা হবে। কিন্ত যখন আমরা বুঝতে পারি যে, এই সিনোড অনুষ্ঠিত হবার ৪০-৫০ বছর আগেই Codex Vaticanus ও Codex Sinaiticus লেখা হয়েছিল; আর উভয় কোডেক্স-এর মধ্যেই **সুখবর-ইঞ্জিল শরীফের** ২৭টি সিপারা রয়েছে, তখন এটি স্পষ্ট যে, এমন এক সময়ে জামাতের লোকেরা ৩০০ বছর ধরে মুক্ত আলোচনার দ্বারা এই ২৭টি কিতাব গ্রহণ করেছে, যখন এটি কার্যকরী করার জন্য জামাতের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না।

হজরত ওসমান কোরআন পুড়িয়ে যে অবিশ্বাস্য কাজ করেছিলেন সে সম্পর্কে ডঃ বুকাইলির মন্তব্য করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এ-সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তিনি সাহসী হয়ে আরো বলেছেন,

> "এই যে বিপুলায়তন রচনাকীর্তি- যেসব রচনা চার্চ কর্তৃক এপোক্রিফা বা পরিত্যক্ত বলে ঘোষিত হওয়ার পর অবলুপ্ত হল, সে বিষয়ে ফাদার বয়িসমার্ডের মতো অনেকের মনেই বেদনার সঞ্চার হতে পারে। ইতিহাসের স্বার্থেও এসব পুস্তক আলোচনার দাবী রাখে।[১৩]

---

[১২] বুকাইলি, বাইবেল,কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১১০

[১৩] বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-৭৮

“এই বিপুলায়তন রচনাকীর্তি- যেসব রচনা চার্চ কর্তৃক এপোক্রিফা বা পরিত্যক্ত ঘোষিত হওয়ার পর অবলুপ্ত হলো “এজন্য তিনি ফাদার বয়িসমার্ডের সাথে “আক্ষেপ “করেছেন, যদিও, হজরত ওসমানের দ্বারা সংকলিত কোরআনের অনুলিপি পুড়িয়ে ফেলার জন্য তিনি সামান্য আক্ষেপও করেননি। এমনকি তিনি তা উল্লেখ করারও প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি কেবল এই বিষয়ে ভদ্র ও বিনিতভাবে এই কথা বলেছেন, “**সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করাই** ছিল এর উদ্দেশ্য” (২-২-২)

ঈসা মসীহ্ বলেছেন,

> “তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে কেবল তা-ই দেখছো, অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কড়িকাঠ আছে তা লক্ষ্য করছো না কেন?” (মথি ৭:৩)

কিতাবের কিছু কিছু আয়াতকে ধ্বংস করা, যদিও তা বর্বরতার সাথে করা হয়েছে, ডঃ বুকাইলির এই মন্তব্যকে আমরা কুটার মতো বলতে পারি, আর এর সাথে কোরআনের মূল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাটিকে কড়ি কাঠের সাথে তুলনা করা যায়। আমরা জানি যে, এই মূল পাণ্ডুলিপিগুলো হজরত মোহাম্মদের ঘনিষ্ট কয়েকজন সাহাবী তৈরি করেছিলেন।

এছাড়াও এটিও বলা প্রয়োজন যে, জামাত কর্তৃক নাকচ করা যে সব কিতাবসমূহের নাম ডঃ বুকাইলি উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে কোনো কোনোটি এই অধ্যায়ের “ঘ” অংশে আমরা বিচার করে দেখবো। এগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবগুলোই ছিল **মতবাদ সম্পর্কিত সুখবর বা Doctrinal Gospel**।[১৪]

কোরআনের একআত্র ও প্রথম পাণ্ডুলিপির পরিণতি

সবশেষে, আমরা অবশ্যই উল্লেখ করবো যে, হজরত আবু বকরের হুকুমে কোরআনের যে অতুলনীয় প্রথম পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করা হয়েছিল, সেটি হজরত ওসমান বিবি হাফসাকে দেওয়া তাঁর শপথ রক্ষা করার জন্য তিনি বিবি হাফসার কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। হজরত ওসমানের মৃত্যুর পরে মদিনার গভর্নর মারওয়ান বিবি হাফসার কাছে গিয়ে কোরআনের সেই পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিবি হাফজা তা দিতে অস্বীকার করেন, আর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপিটি বিবি হাফসার কাছেই ছিল। কিন্তু মারওয়ান এটি পাওয়ার জন্য এতো বেশী আগ্রহী ছিলেন যে, বিবি হাফসার দাফন কাজ শেষ করেই, তিনি তখনি সেই পাণ্ডুলিপিটি আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। এই কাহিনী *আল-মাসাহিফে* কিতাবে ইবনে আবু দাউদ (মৃত্যু ৩১৬ হিজরী) লিখেছিলেন। তিনি হজরত সালেম বিন আব্দুল্লাহকে ইসনাদ দিয়েছেন, আর তিনি বলেছেন,

---

[১৪] এই ব্যতিক্রমটি হচ্ছে Gospel of Barnabas। এই গসপেলে কোরআনের শিক্ষার ২০ বার বিরোধিতা করা হয়েছে। হজরত মোহাম্মদকে সাত বার মসীহ বলা হয়েছে। এই গসপেলে প্রচুর বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে। ইতিহাস, ভুগোল, সামজিক প্রথা, ধর্মীয় প্রথা আর ধর্মীয় ভাষা সম্পর্কে ৩০টি ভুল রয়েছে, আর এই ভুলগুলো প্রথম শতাব্দীর ইহুদীরা করেননি। সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই জালিয়াতি করে এই গসপেল ১৫০০ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। আরো বিশদভাবে জানার জন্য দেখুন দি গসপেল অব বার্ণবা- ইটস ট্রু ভ্যালু, উইলিয়ম এফ ক্যাম্পবেল, ক্রিশ্চিয়ান স্টাডি সেন্টার, রাওয়ালপিন্ডি,১৯৮৯

“বিবি হাফজা যখন ইন্তেকাল করেন, আর আমরা তাঁকে দাফন করে ঘরে ফেরার পরে পরেই হজরত মারওয়ান কঠোর মনোভাব নিয়ে হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরের (বিবি হাফজার ভাই) কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন, তিনি অবশ্যই যেন কোরআনের সেই পাতাগুলো তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। আর হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর সেগুলো তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর হজরত মারওয়ানের হুকুমে সেই পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়। আর তিনি বলেন, আমি এ কাজ করলাম, কারণ, এর মধ্যে যা-কিছু ছিল, তা অবশ্যই কোরআনের সরকারী পাণ্ডুলিপিতে লিখিত ও সংরক্ষিত আছে। আর আমি ভয় করছিলাম লোকেরা এক সময়ে এই অনুলিপিটি সম্পর্কে সন্দেহ করবে অথবা তাঁরা বলবে যে, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা লেখা হয়নি।[১৫] (লেখকের অনুবাদ)

এই পাণ্ডুলিপির বিনাশ ও পরবর্তীকালে কুফাতে ইবনে মাসুদের পাণ্ডুলিপি বিনাশ করার পরে কোরআনের পাণ্ডুলিপির মূল উৎসগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। আর তাঁরা এই পাণ্ডুলিপিগুলোর আর কোনো অনুলিপি তৈরি করেননি। অবশ্য, হিজরতের প্রথম বা তৃতীয় শতাব্দীর এই সময়কালকে ইসলামের ইতিহাসে মৌলিক চিন্তাধারার সময়কাল (ইজতিহাদ) বলা হয়। কোরআনের শিক্ষকরা নবীর অমুক সাহাবী বা তমুক সাহাবীদের মতো করে কোরআন পাঠ শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বিষয়টি শেষে গোঁড়া মুসলমানদের কাছে এতোটাই অসহনীয় হয়ে উঠে যে, একজন খ্যাতনামা কোরআন বিশেষজ্ঞ - বাগদাদের ইবনে সানাবুধ (২৪৫-৩২৮ হিজরী) যিনি পুরানো হস্তলিখিত কোরআন থেকে তেলাওয়াত করতেন তাঁকে জনসমক্ষে তাঁর পূর্বের মত অস্বীকার করতে বলা হয়।[১৬]

ডঃ বুকাইলি তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিল শরীফের রদবদল করেছে, পরিবর্তন করেছে এবং জোর করে হেলাফেলা করে ব্যবহার করেছে। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে হজরত ওসমান ও তাঁর কমিটির লোকদের এবং হজরত মারওয়ান সম্পর্কে কী বলা যায়? তাঁরা কি জোর করে হেলাফেলা করে ব্যবহার, রদবদল এবং তাঁদের যা খুশি কোরআনে তাই করেননি? কয়েক পৃষ্ঠা পেছনে **সুখবর** সিপারার উৎস সম্পর্কে আমরা একটি রেখাচিত্র দেখেছিলাম। কোরআনের ক্ষেত্রেও একইভাবে তা করা যেতে পারে। রেখাচিত্র-২ দেখায় যে, কোরআনের উৎপত্তি ও প্রচার দেখানো হয়েছে। আমাদের এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ওপরে বর্ণিত হাদিস অনুসারে এটি তৈরি করা হয়েছে।

এই রেখাচিত্র আরো জটিল হতো, যদি অন্যান্য হস্তলিখিত কিতাব এর সাথে যোগ করা হ’তো। উদাহরণ হিসেবে আবু মূসা আল-আশারীর হস্তলিখিত কিতাবের কথা বলা যায়। এই কিতাব বসরায় ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখানে যে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুখবর ও কোরআন সংকলনের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

আমরা এখন প্রশ্ন করবো, কীভাবে আপনি জানেন আপনার কাছে যে-কোরআন আছে সেটি এবং হজরত মোহাম্মদের কাছে নাজিল হওয়া কোরআন এক?

---

[১৫] ইবনে আবি দাউদ, পৃষ্ঠা ২৪-২৫, জেফরী পুনঃউল্লেখ করেছেন, ওপরে উল্লেখিত বই

[১৬] জাফরী, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৯

রেখাচিত্র ২- কোরআনের সংকলন

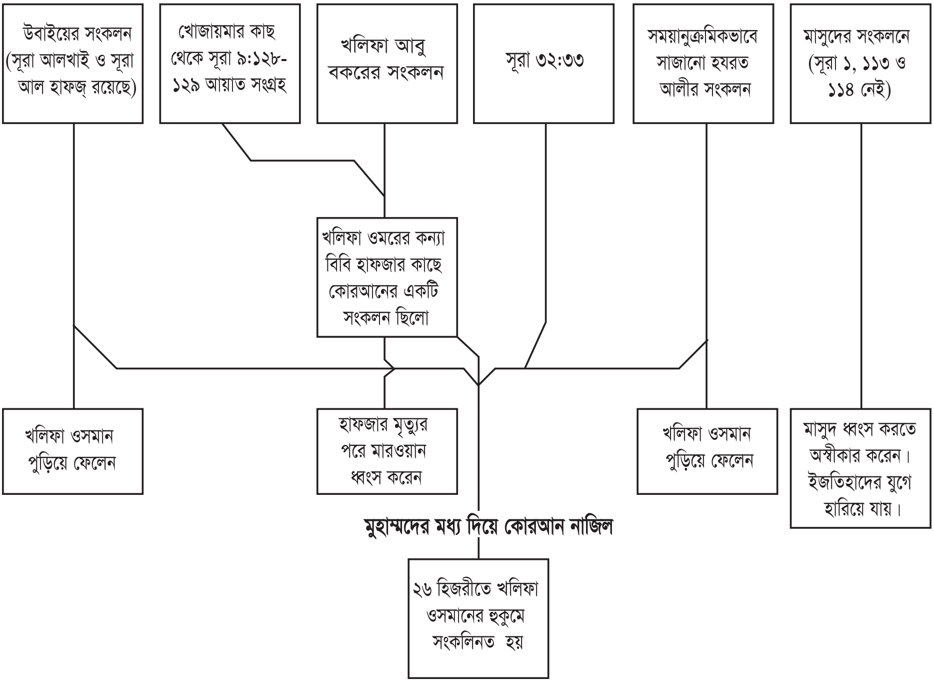

উপসংহার

কোরআনের আয়াত নিয়ে হজরত ওসমানের এই জোর করে হেলাফেলা করে ব্যবহার ও প্রমাণ গোপন করা সত্ত্বেও মুসলমানরা **বিশ্বাস** করেন যে, কোরআনের কোনো মূল শিক্ষার কোনো হেরফের হয়নি। তবে কিসের ভিত্তিতে একজন বলতে পারেন যে, ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে ঈসা মসীহের মূল শিক্ষা নেই?

৬০০ বছর পরে নাজিল হওয়া কোরআন যদি সুখবর-নতুন নিয়মের শিক্ষার সাথে একমত না হতো, তাহলে তহরিফ ছাড়া মুসলমানরা এর অন্য কারণ খুঁজে দেখতেন। খ্রীষ্টানরা তাঁদের কিতাব পরিবর্তন করেছে, হালকা ও সহজভাবে এই অভিযোগ করা হয় **প্রাথমিক অনুমিত বিষয়** থেকে, বাস্তবে এর কোনো প্রমাণ নেই।

শেষ মক্কী যুগের সূরা ইউনুসের ১০:৬৪ আয়াত খ্রীষ্টানরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন, এই আয়াতে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই।"

গ. কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের ভিন্ন-পাঠ

কোরআনে ভিন্ন পাঠ

কোরআনের কোনো আয়াতের যেন ভিন্ন-পাঠ না থাকার জন্য প্রচুর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজো অনেব ভিন্ন পাঠ খুঁজে পাওয়া যায়। আল-বায়জাবী তাঁর তাফসীর কিতাবে ৩:১০০; ৬:৯; ১৯:৩৫; ২৮:৪৮; ৩৩:৬ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। ৫-৭ হিজরীতে নাজিল হওয়া সর্বশেষ উল্লেখিত সূরা আল-আহযাব (দলসমূহ) ৩৩:৬ আয়াতটির কথা ইউসুফ আলীও উল্লেখ করেছেন। হজরত ওসমানের সংকলিত কোরআনে বলা হয়েছে,

"নবী মোমেনদিগের নিকট তাহাদিগের নিজদিগের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা।"

কিন্ত এই কথা জানা যায় যে, ওবাই ইবনে কাবের কোরআনের সংকলনে লেখা ছিল,

"নবী মোমেনদিগের নিকট তাহাদিগের নিজদিগের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর এবং **তিনি তাহাদের পিতা** আর তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা।"[১]

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনুদিত ফরাসী ভাষায় কোরআনে বিষয়টি নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করেছেন।[২] তিনি এগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১. কোনো কোনো কাতেবে ওহী কোরআনের অনুলিপি তৈরির সময়ে ভিন্ন-পাঠ ঘটাতে পারেন, স্বাভাবিকভাবেই অন্য অনুলিপির সাথে তুলনা করে সহজেই এগুলো সংশোধন করা যেতে পারে।

২. অনেকেই কিতাবের পৃষ্ঠার কিনারায় ব্যাখ্যা লিখে রাখেন। তাঁদের দ্বারা এই ভিন্ন-পাঠ হতে পারে। হামিদুল্লাহ লিখেছেন,

"কোরআনের লেখার পদ্ধতি এমন যে, কখনো কখনো সাহাবীরা নবীর কাছে কোরআনের কোনো আযাতের ব্যাখ্যা জানতে চাইতেন। কখনো কখনো তাঁর দেওয়া এই ব্যাখ্যা যাতে তাঁরা ভুলে না যান, এজন্য তাঁদের ব্যক্তিগত কোরআনের অনুলিপিতে সেগুলো লিখে রাখতেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশ্বস্তভাবে কোরআনের পুরানো অনুলিপি থেকে নতুন অনুলিপি তৈরি করার সময়ে লেখকরা মূল আয়াতের সাথে তাফসীরও লিখতেন। আমরা ওপরে হজরত ওমরের দেওয়া সেই বিখ্যাত হুকুমের কথা জানি, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোরআনের অনুলিপির মধ্যে তাফসীর যোগ করতে নিষেধ করেছেন।"

---

[১] ইউসুফ আলী, ওপরে উলেত্মখিত কিতাব, টিকা ৩৬৭৪, পৃষ্ঠা ১১০৪

[২] হামিদুল্লাহ, ওপরে উলেত্মখিত কিতাব, টিকা ৩৬৭৪, পৃষ্ঠা xxxiii (সব টিকার অনুবাদ লেখক করেছেন)

“এই ধরনের শত শত ভিন্ন-পাঠ ছিল। কিন্ত আসলে সত্য তথ্য হচ্ছে, অমুক অমুক শিক্ষকের কোরআনের নির্দিষ্ট সংকলন ছিল যা অন্যদের ছিল না। এসব সংকলনের মূল উৎস সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। এসব লেখকদের দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন-পাঠ সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে কখনো কখনো দেখা যায় যে, কোনো মিল নেই। তাঁদের কেউ কেউ নির্দিষ্টভাবে বলেছেন, কোরআনের এই এই সংকলন ছিল আর অন্যরা তা Aস্বীকার করেছেন।”

৩. কোরআনের এই সব ভিন্ন পাঠের সৃষ্টি হয়েছিল; কারণ, মক্কাবাসীরা যেভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, হজরত মুহাম্মদ নিজেই তার চেয়ে আলাদাভাবে উপভাষায় ভিন্ন উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

“হজরত মুহাম্মদ ধর্মকে সহজ ও সরল করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং, তিনি বিভিন্ন উপভাষায় কোরআন পাঠ করার বিষয়টির সাথে কোরআনের আয়াতে শব্দের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, এখানে শব্দ আসল বিষয় ছিল না, কিন্তু এর প্রয়োগ বা আত্মীকরণ ছিল আসল বিষয়। তিনি আগ্রহ নিয়ে বলতেন, ‘হজরত জিবরাইল আমাকে ৭টি ভিন্ন পাঠের কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। নিজের জন্য ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য এক ধরণের পাঠ সংরক্ষিত রেখে তিনি ভিন্ন গোত্রের লোকদের জন্য সেই গোত্রের ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা কোরআনের কোনো শব্দকে পরিবর্তন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হজরত ওসমান এটি বন্ধ করে দেন। কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলে কোরআনের যে সব অনুলিপি তৈরি করা হয়েছিল এবং তাঁদের বংশধরদের দ্বারা তা সংরক্ষিত হচ্ছিল, আগের শতাব্দীর যে সব শিক্ষকেরা ছিলেন তাঁরা এই সব শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যা সংগ্রহ করে রাখতে সমর্থ ছিলেন। এই সংকলনগুলোর সাথে সরকারী, প্রামাণ্য কোরআনের অনুলিপিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো একেবারে যথাযথভাবে কার্যত একই ছিল।

৪. এই সত্য থেকে ভিন্ন-পাঠ হয়েছে যে, হিজরতের পরে প্রথম ১৫০-২০০ বছর, কোরআনের হস্তলিখিত অনুলিপিগুলো স্বরচিহ্ন (হরকত) ছাড়াই লেখা হয়েছিল। প্রথমতঃ প্রসঙ্গ থেকেই আয়াতটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তা বুঝা যেত, কিন্তু সব সময়ে নয়।

দ্বিতীয়তঃ সমস্যা আরো জটিল হয়েছিল, আরবীতে অনেক অক্ষর আছে, যেগুলো একইভাবে লেখা হয় কিন্তু এদের ওপরে বা নিচে নোক্তা বসিয়ে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়। এটি বাংলা অক্ষর ‘ব’ এর মতো, ‘ব’ এর মতো দেখতে হলেও এর নিচে নোক্তা বসালে এটি ‘র’ হয়ে যায়। আরবীতেও তেমনি এক নোক্তা ওপরে থাকলে ‘نـ = ন’ দুই নোক্তা ওপরে থাকলে ‘تـ = তা’, তিন নোক্তা ওপরে থাকলে তাকে ‘ثـ = ছা’ এক নোক্তা নিচে থাকলে তা ‘بـ = বা’ দুই নোক্তা নিচে থাকলে তাকে ‘يـ = ইয়া’ বলে।

এছাড়াও আরো ৭ জোড়া অক্ষর আছে, এদের মধ্যে দুই জোড়া অক্ষর নোক্তার ভিত্তিতে আলাদা করা যায়। আরেক দলে তিন জোড়া রয়েছে। কেবলমাত্র ১৫টি অক্ষর দিয়ে ২৮টি আলাদা আলাদা অক্ষর লেখা যায়।

আমি এমন অনেক মুসলমানের সাথে কথা বলেছি, তাঁরা জানেন না যে, কোনো হরকত ও নোক্তা ছাড়াই কোরআনের প্রথম অনুলিপিগুলো লেখা হয়েছিল। আর সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকদের মধ্যেও অনেকেই সেই তথ্য জানেন না।

ছবি-৩-এ সূরা নূরের ৩৪-৩৬ আয়াত দেখানো হয়েছে। এটি লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কোরআনের প্রাচীন অনুলিপি থেকে নেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আয়াতগুলো খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বা প্রায় ১৫০ হিজরীর দিকে লেখা হয়েছিল।[৩]

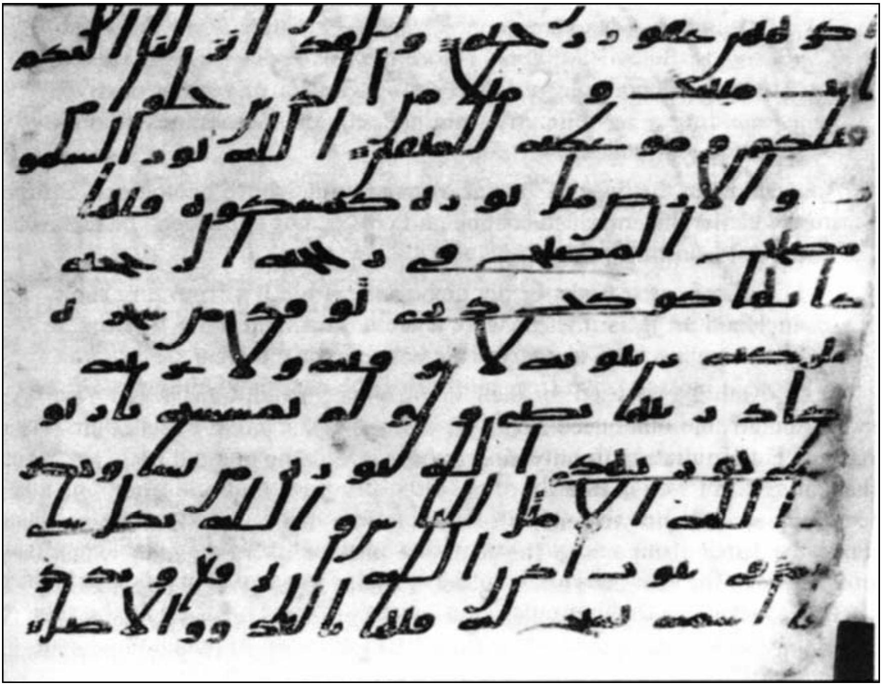

ছবি-২

১৫০ হিজরীর একটি কোরআনের ছবি, অক্ষরদের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য এখানে নোক্তা বা হরকত ব্যবহার করা হয়নি। সূরা ২৪:৩৪-৩৬ আয়াত এখানে দেখানো হয়েছে।

(বৃটিশ যাদুঘরের অনুমতিক্রমে ছবিটি ছাপানো হলো।)

[৩] আমি যে সব কোরআন ব্যক্তিগতভাবে দেখার সুয়োগ পেয়েছিলাম, এটা হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচে পুরানো অনুলিপি

আরবী ভাষা জানে না এমন লোকদের জন্য এই সমস্যা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। ওপরের ছবি থেকে আমি ৭ম লাইনটির অনুলিপি আবার আমি এখানে দেখিয়েছি।

ওপরের কোরআনে এভাবে আছে: (১৪৯ ক)

ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে নোক্তা যোগ করে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে: (১৪৯ খ)

স্বরচিহ্ন যোগ করা হয়েছে: 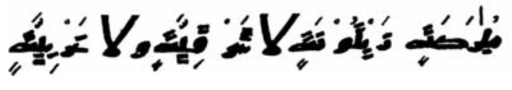 (১৪৯ গ)

হামিদুল্লাহ এই হরকত ও নোক্তা না থাকার বিষয়টি একই পৃষ্ঠার অন্য অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "সবশেষে, একটি (সর্বশেষ) ভিন্ন পাঠের উৎসগুলো প্রাচীন কালে- উচ্চারণগত চিহ্ন ব্যবহার করার আগে আরবী লিপির লেখার ধরণ থেকেই এসেছে। কখনো কখনো সম্ভবতঃ কোনো শব্দকে সকর্মক ক্রিয়া, কর্মবাচ্য, কখনো পুংলিংগ কখনো বা স্ত্রীলিংগ হিসেবে গণ্য করা হতো। আর প্রসংগই কোনো কোনো সময়ে বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছে।

এই ধরনের ভিন্ন পাঠের উদাহরণ হিসেবে আমরা ওপরের ছবিটিকে ব্যবহার করতে পারি। তৃতীয় লাইনের শেষ থেকে সপ্তম লাইনের শেষ পর্যন্ত পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায়,

> "আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যেতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি **কাঁচের** আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি **উজ্জল নক্ষত্র** সদৃশ; ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয়, পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়— "

আরবী ভাষা থেকে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদের সময়ে ইউসুফ আলী ও হামিদুল্লাহ উভয়েই "ইয়ুক্বাদু" (يُوقَدُ) শব্দের অনুবাদ করেছেন অকর্মক ক্রিয়া প্রজ্জলিত করা হয়। এই পুংলিংগবাচক শব্দ, সাধারণভাবে আগের পুংলিঙ্গ বাচক শব্দ নক্ষত্র কাওকাব (كَوْكَب) বুঝিয়েছে। কিন্তু ছবির ষষ্ঠ লাইনে আমরা একটি অক্ষর দেখতে পাচ্ছি, যা পৃথকভাবে স্বরচিহ্ন যোগ করে লেখা হয়েছে। এটি হচ্ছে, ইয়াওক্বাদ (يوقد)। অক্ষরের ওপরে এই দুটো চিহ্ন যোগ করার পরে অক্ষরটি পরিবর্তিত হয়ে স্ত্রীলিংগ কর্মবাচ্যে تُوقَدُ (তূক্বাদু) পরিণত হয়েছে। আর এটি তখন স্ত্রী লিংগ বাচক বিশেষ্য "কাচ" বা যুজ্বাজ্বা (زُجَاجَة) কে বাক্যের কর্তা হিসেবে বুঝাবে।

এই কোরআনের অনুলিপিটি তৈরি করার সময়ে কোনো আলেমের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল যে, "এভাবে পড়া উচিত বলে আমি মনে করি।" আর যে লোককে অনুলিপি তৈরি করার হুকুম দেওয়া

হয়েছে বা যিনি তা তৈরি করেছেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্ত্রীলিংগবাচক অকর্মক ক্রিয়াপদই সঠিক।

যেহেতু ইউসুফ আলীর মতো একজন অনুবাদক তাঁর সমগ্র অনুবাদের মধ্যে কেবল কোরআনের দুই বা তিনটি ভিন্ন পাঠের কথা উল্লেখ করেছেন। এই কথাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, কোরআনের একেবারেই হাতে গোণা কয়েকটি ভিন্ন-পাঠ রয়েছে। আমরা ওপরে দেখেছি, কয়েকজন হাতে গোণা মুসলমান লেখকদের মধ্যে একজন, স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছেন যে কোরআনের, "শত শত ভিন্ন-পাঠ রয়েছে", আসলে প্রকৃত সংখ্যা হবে হাজার হাজার। আর্থার জেফরী তাঁর বইয়ে কোরআনের সব ভিন্ন পাঠের তালিকা দিয়েছেন। যেখানে কেবল একট বইয়ে-হজরত ইবনে মাসুদ সংকলিত কোরআনে ১৭০০এরও বেশী ভিন্ন-পাঠ রয়েছে।

এদের মধ্যে বেশীরভাগ- ৯৯.৯% হচ্ছে ওপরের উদাহরণে দেওয়া ভিন্ন পাঠের মতো, আর এগুলোর সামান্যই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েকটির মধ্যে মূল সমস্যা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১০ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আল-মায়িদার ৫:৬০ আয়াতের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই আয়াতে বলা হয়েছে,

> "বলো, আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? **যাহাকে আল্লাহ্ লানত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদিগের কতককে** তিনি বানর ও ও কতককে শূকর **করিয়াছেন** এবং **যাহারা তাগুতের ইবাদত করে—**"

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

আমি নিজেই আরবী থেকে অনুবাদ করেছি। আরবীতে যা বলা হয়েছে, আমি তাই অনুবাদ করেছি। কারণ, স্বরচিহ্ন অনুসারে "এবাদত করা" এই ক্রিয়া পদের কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ! কিন্তু এটি অসম্ভব যে, কোরআনে এমন একটি আয়াত আছে, যা বলে যে, আল্লাহ্ "আল-তাগুদের" (মূর্তি) এবাদত করেন! কোনো অনুবাদকই এভাবে অনুবাদ করবেন না। আর আমি নিজেও জানি যে, এটি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং, কোথাও একটি ভুল রয়েছে।

আমার আরবী ভাষায় জ্ঞানের অভাবে এটি সন্দেহের প্রথম কারণ হতে পারে, যদি কেবল আমি এই সমস্যায় পড়তাম। তবে, আমরা যখন আর্থার জাফরীর *Materials for the History of the Qur'an* বইয়ে দেখি, এটি মূল-কারণ নয়। জাফরী দেখিয়েছেন, এর ১৯টি বিকল্প পাঠ রয়েছে; ইবনে মাসুদের সংকলনে রয়েছে ৭টি, উবাই বিন কাবের সংকলনে ৪টি রয়েছে, ইবনে আব্বাসের সংকলনে রয়েছে ৬টি, উবায়েদ বিন উমায়ের ও আনাস বিন মালিকের বিন মালিকের সংকলনে ১টি করে ভিন্ন-পাঠ রয়েছে।[৪]

---

[৪] জাফরী, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৩৯,১২৯,১৯৮,২১৬ এবং ২৩৭

অবশ্যই একজন সংকলকের কেবল একটি বিকল্প পাঠ থাকা উচিত। কিন্তু ভিন্নপাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি এই সম্ভাবনা দেখায় যে, আলেমরা এই সমস্যাটি চিহ্নিত করেছেন।

এখানে ইবনে মাসুদের পাঠগুলো উল্লেখ করা হলো,

** ওয়া মান 'আবাদূ আল-ত্বাগূতা — وَمَنْ عَبَدُوا الطَّاغُوتَ

ওয়া 'আবাদাতা আল-ত্বাগূতি — وَعَبَدَةَ الطَّاغُوتِ

ওয়া 'ওবাদা আল-ত্বাগূতু — وَعُبَدَ الطَّاغُوتُ

ওয়া 'আবুদা আল-ত্বাগূতু — وَعَبُدَ الطَّاغُوتُ

ওয়া 'উবুদা আল- ত্বাগূতি — وَعُبُدَ الطَّاغُوتِ

ওয়া 'ওবায়দাতি আল-ত্বাগূতু — وَعُبِدَتِ الطَّاغُوتُ

'ওবাদা আল-ত্বাগূতা — وَعُبَّدَ الطَّاغُوتَ

যাঁরা আরবী জানেন না, তাদের জন্য এই বিশদ পাঠগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, যদি ক্রিয়া বহুবচন হয়, তবে বানর ও শূকরীগুলো তাগুতের এবাদত করে, ক্রিয়া যদি কর্মবাচ্যে হয়, তবে এর অর্থ হবে, বানর ও শুকরীগুলোর দ্বারা তাগুদের এবাদত করা হয়। অথবা আবাদা শব্দ যদি বিশেষ্য হিসেবে ধরা হয় তবে, বানর ও শূকরদেরকে 'দাস' বানানো হবে, অথবা আল-তাগুতের এবাদতকারী বানানো হবে।

এই সাথে আরো বলা যায় যে, কোরআনের ১৯টি ভিন্ন পাঠের মধ্যে স্বরচিহ্ন (হরকত) যোগ করার দ্বারা ১৪টি পরিবর্তিত হয়েছে, অন্য ৫টি ক্ষেত্রে একটি বা দু'টো ব্যঞ্জনবর্ণ যোগ করার মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি ইবনে মাসুদ সংকলিত কোরআনের ভিন্ন-পাঠ বেঁছে নিয়েছি, কারণ, তাঁর প্রথম পাঠ (**) টি সব অনুবাদকরা পছদ করেছেন। তাহলে আয়াতটির অর্থ হচ্ছে,

> "— (আল্লাহ) যাঁহাদিগের কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন এবং **যাহারা তাগুতের ইবাদত করে—**",

এই কথা ঠিক যে, এই ভিন্নপাঠগুলো যা এখানে আছে, তা একটি বা দুইটি স্বরচিহ্ন যোগ করে সহজেই দূর করা যেত। **এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, স্বরচিহ্ন যোগ করার পরে খুবই যত্নের সাথে পরবর্তীকালে অনুলিপিগুলো তৈরি করা হয়েছে।**

তবে, খ্রীষ্টান এপোক্রিফা সম্পর্কে ডঃ বুকাইলির একই মন্তব্যকে আমরা শব্দান্তরে প্রকাশ করে আমরা বলতে পারি,

> "একজন লোক কোরআনের প্রাথমিক সংকলনগুলো বিনষ্ট হওয়ার জন্য কেবল আক্ষেপ করতে পারেন, যেগুলো হজরত ওসমান অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। যদিও আজকের দিনে মুসলমানদের কোরআনের সঠিক মূল পাঠ বিশেষভাবে আল-তাগুত সর্ম্পর্কিত জটিল আয়াতগুলো জানার জন্য অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।"

উপসংহার

এখন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করবো, আবারও আমাদের পাঠকদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, কীভাবে **আপনি জানেন যে, প্রথম নাজিল হওয়া সূরা থেকে আমাদের জানামতে সবচেয়ে পুরানো অনুলিপির তৈরির এই দীর্ঘ ১৬৩ বছরের মধ্যে কোরআনের আয়াতের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাছাড়া কোরআনের এই ভিন্নপাঠগুলো সম্পর্কেই বা আপনি কী বলবেন?** কীভাবে **আপনি জানেন যে, হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে শুনে কোরআনের আয়াতগুলো সঠিকভাবে লেখা হয়েছিল?**

আবারও আপনি আমাকে উত্তরে বলবেন যে, কোরআনের এই সব ভিন্নপাঠগুলোকে কেবলমাত্র ছোটখাটো পরিবর্তন বলা যেতে পারে। আপনি বলতে যাচ্ছেন, যদি কোরআনে প্রথমে অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করে, নোক্তা বিহিন ও হরকত বিহিনভাবে লেখা হয়ে থাকে, তবে তা লোকদের মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

আর সবশেষে, আপনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাতে পারেন যে, ১৫০ হিজরীতে অনেক লোক বেঁচে ছিলেন, যাঁরা হজরত মোহাম্মদের জীবনধারা, শিক্ষা সম্পর্কে অন্য লোকদের কাছ থেকে শুনেছিলেন এবং কোরআন শিক্ষা পেয়েছেন সরাসরি তাঁদের পিতা বা এমন লোকদের কাছ থেকে যাঁরা হজরত মুহাম্মদকে বা তাঁর কোনো সাহাবীকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। সুতরাং, কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভুল এসব সংকলনে থাকা সম্ভব ছিল না।

আর আপনার এই যুক্তি হামিদুল্লাহর কথার সাথে একেবারেই মিলে যায়। তিনি লিখেছেন,

> "এছাড়াও, সব ভিন্ন-পাঠ একত্র করে এবং মনোযোগ দিয়ে তা অধ্যয়ন করে আমরা নিশ্চিত যে, সাধারণ মূল পাঠ বা মূল আয়াত এতো মনোযোগ দিয়ে হাতে লেখা হয়েছে যে, তাদের কোনো একটি আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়নি।"[৫]

কোরআনের আধুনিক খ্রীষ্টান অনুবাদক, ডি ম্যাসন, তিনিও একই সিদ্ধান্ত পোষণ করেছেন। ফরাসী ভাষায় অনুদিত কোরআনের ভুমিকায় তিনি বলেছেন,

> "সবশেষে, এই সব বিতর্কিত বিষয়গুলো থাকা সত্ত্বেও, আমরা বলতে পারি যে, বর্তমানে আমাদের কাছে কোরআনের যে মূল পাঠ বা মূল আয়াত আছে, এদের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বস্ততার নীতি রয়েছে।[৬]

এই সিদ্ধান্তে এসে আমরা এখন দেখবো যে, ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে ভিন্নপাঠ সম্পর্কে কী জানা যেতে পারে?

---

[৫] হামিতুল্লাহ, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা xxxiii

[৬] *Le Coran*, trad. de D. Masson, Editions Gallimard, 1967, p xl.

সুখবর-ইঞ্জিল শরীফে ভিন্নপাঠ

কোরআনের মতোই ইঞ্জিল শরীফের ভিন্ন ভিন্ন অনুলিপিতে ভিন্ন ভিন্ন-পাঠ রয়েছে। প্রিন্সটন থিওলজিকাল সেমিনারীর, নিউ টেষ্টামেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার-এর অধ্যাপক, ডঃ ব্রুস এম.মেটজার, *The Text of the New Testament*[৭] বইয়ে, পুরো এক অধ্যায় জুড়ে এই সব ভিন্ন ভিন্ন-পাঠ কীভাবে এসেছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নের অনুচ্ছেদে আমরা এর কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করবো,

১. বিভিন্ন কিতাব লিপিকারদের দ্বারা তৈরি ভিন্ন-পাঠ

ক) ক্ষীণ দৃষ্টি-শক্তির জন্য

সুখবর-ইঞ্জিল শরীফ আসলে গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল, গ্রীক ভাষায় সিগমা, এপসিলন, থেটা এবং ওমিক্রন প্রায় সময়েই একটির সাথে আরেকটি তালগোল পাকিয়ে যায়। যদি কোনো কিতাব লেখক কোনো ভুল অক্ষর কপি করেন তাহলে এই ভিন্ন-পাঠ দেখা যায়। আরবী ভাষায়ও একই সমস্যা রয়েছে, সেখানে ‘রা’ সহজেই ‘দাল’ এর সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

কোনো নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপিতে একটি সম্পূর্ণ লাইন বাদ পড়ে যেতে পারে। কারণ, দুটো লাইনেই একই শব্দ বা শব্দগুলো রয়েছে। অনুলিপিকারের চোখ লাফ দিয়ে নিচের লাইনের দ্বিতীয় শব্দে চলে যেতে পারে আবার দেখা যায় যে, মাঝখানের লাইনটি বাদ পড়ে গেছে। আমি নিশ্চিত যে, কখনো কখনো স্কুলে পড়ার সময়ে কোনো উদ্ধৃতি বা কবিতা অনুলিপি করার সময়ে প্রতিটি পাঠকেরও একই অভিজ্ঞতা রয়েছে।

খ) ভুল শোনার জন্য

কিতাব লিপিকার যখন শ্রুতলিপি শুনে অনুলিপি করেছেন, তখন কখনো কখনো শব্দ শুনা নিয়ে তালগোল পাকিয়ে যেত। যেগুলোর একই রকম উচ্চারণ কিন্তু বানান আলাদা (ইংরেজী ভাষায় their, their এবং grate বা great)। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রকাশিত কালাম ১:৫ আয়াতের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদকরা এভাবে অনুবাদ করেছেন,

“তিনি আমাদের ভালোবাসেন এবং নিজের রক্ত দিয়ে গুনাহ থেকে *আমাদের ধৌত* করেছেন।”

অন্যদিকে পুরানো গ্রীক মূল পাঠ বা আয়াত থেকে অনুবাদ করে আধুনিক অনুবাদকরা সঠিকভাবে অনুবাদ করেছেন, “তিনি আমাদের ভালোবাসেন এবং নিজের রক্ত দিয়ে গুনাহ থেকে *আমাদের মুক্ত* করেছেন।”এই ধরনের পার্থক্য ou ও iu -এর কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই এই কথা বলা যায় যে, এতে রূহানিক অর্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

---

[৭] Oxford University Press, New York, Second Edition, 6th printing, 1968.

গ) কিতাব অনুলিপি করার সময়ে অনুলিপিকারের মনের মধ্যে কোনো শব্দগুচ্ছ ধরে রাখার জন্য কখনও কখনও এটি শব্দ-বিন্যাসকে পরিবর্তন করে দেয়। অন্য সময়ে লিপিকার অনুরূপ আয়াতে যে শব্দগুচ্ছ পান, তাই লিখে দেন। হামিদুল্লাহ কোরআন সম্পর্কে বলেছেন, লিপিকাররা সহজেই অন্য অনুলিপির সাথে তুলনা করে প্রায় সবগুলো ভুল সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।

২. পাতার কিনারায় লেখা টিকা থেকে অথবা অন্য অনুলিপি তুলনা করার জন্য ভিন্ন-পাঠ ঘটতে পারে

শব্দ বা টিকা পুরানো অনুলিপির পাতার কিনারে লেখে রাখা টিকাগুলো নতুন অনুলিপি তৈরির সময়ে যোগ করা হয়। কোনো কঠিন শব্দের সমার্থক বা কোনো ব্যাখ্যা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এইজন্য লিপিকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য কঠিন শব্দটির সাথে সমার্থক শব্দটি অথবা ব্যাখাটি নতুন অনুলিলিতে যোগ করে দিয়েছেন।

একই ধরনের বিচ্যুতি পরবর্তী বছরগুলোতে ঘটেছিল। যখন একজন অনুলিপিকারের সামনে একাধিক ইঞ্জিল শরীফের অনুলিপি ছিল। একজন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লিপিকার তখন কী করবেন, যখন তিনি দেখেন যে, একটি আয়াতের অংশ ভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে? এই দুটোর পরিবর্তে একটিকে বেঁছে নেয়া ও দুটো ভিন্ন পাঠের মধ্যে একটি গ্রহণ করার পরিবর্তে, হতে পারে সেই লিপিকার দুটো পাঠই নতুন অনুলিপিতে যোগ করে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইঞ্জিল শরীফের অনেক পাণ্ডুলিপিতে লূক লিখিত সুখবর এই কথা বলে শেষ হয়েছে,

সাহাবীরা "সব সময় বায়তুল- মোকাদ্দসে উপস্থিত থেকে আল্লাহ্‌র ধন্যবাদ দিতে লাগলেন": অন্যদিকে, কোনো কোনো পাঠে আছে "সব সময় বায়তুল- মোকাদ্দসে উপস্থিত থেকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগলেন।" এই পাঠের মধ্যে একটিকে বেঁছে নিয়ে লিপিকার দুটো পাঠকে একত্রে যোগ করে লিখেছেন, সব সময় বায়তুল-মোকাদ্দসে উপস্থিত থেকে আল্লাহ্‌র ধন্যবাদ দিতে ও প্রশংসা করতে লাগলেন।"

৩. সংস্করণের জন্য

ধরা যাক একজন লিপিকার ঈসা মসীহের বক্তব্যের মধ্যে ফাঁক পূরণের জন্য কিছু শব্দ যোগ করে দিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মথি ৯:১৩ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা ধার্মিক তাদের আমি ডাকতে আসিনি বরং পাপীদেরই ডাকতে এসেছি। লূক ৫:৩২ আয়াতের সাথে মিল রেখে এর সাথে এই শব্দগুলো যোগ করেছেন, "পাপ থেকে মন ফিরাবার জন্য।"

রোমীয় ১৩:৯ আয়াত অনুসারে লেখক শরিয়তের দশটি প্রধান হুকুমের মধ্যে কেবল চতুর্থ হুকুমটি উল্লেখ করেছেন তখন একজন লিপিকার তাঁর স্মৃতি থেকে পঞ্চম হুকুমটি যোগ করেছেন, "*তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না*"।

৪. জটিলতা সমাধানের প্রচেষ্টার ফল হিসেবে

মার্ক ১৬ অধ্যায় হচ্ছে এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। যেখানে ইঞ্জিল শরীফের শেষ অংশটুকু হারিয়ে গেছে। মহিলারা সুগন্ধি মলম ঈসা মসীহের দেহে মাখানোর জন্য নিয়ে আসার পরে সাদা কাপড় পড়া এক যুবক (ফেরেশতা) তাঁদের বলেছিলেন, "তিনি উঠেছেন, তিনি এখানে নেই'। এই কথা লেখার পরে সবচেয়ে পুরানো পাণ্ডুলিপি কোডেক্স সিনাইটিকাস ও কোডেক্স ভেটিকানাসে এই কথা বলা হয়েছে,

'তাঁরা শিহরিতা ও আশ্চর্যান্বিতা হয়েছিল। তাঁরা বের হয়ে কবর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন কারণ—।

'কারণ' সংযোজক অব্যয়ের গ্রীক শব্দ হচ্ছে 'গার'। আর মেটজার বলেছেন যে, সমগ্র গ্রীক সাহিত্যেই "একটিমাত্র উদাহরণও নেই, যেখানে কোনো শব্দের শেষে 'গার' শব্দটি রয়েছে, যেটি এই ক্ষেত্রে দেখা যায়।[৮]

মেটজার পরামর্শ দিয়েছেন যে, হজরত মার্ক সুখবর সিপারা লেখার সময়ে এবং সুখবর সিপারা শেষ করার সময়ে বাঁধা পেয়েছিলেন (সম্ভবতঃ মৃত্যুর কারণে), অথবা অন্য অনুলিপিগুলো তৈরির আগেই শেষের অংশটি হারিয়ে গিয়েছিল। এসব জানা যায় যে, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে কিছু কিছু খ্রীষ্টান ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর অন্যদের দেখা দেওয়ার বিষয়টি অন্য সুখবর থেকে যোগ করে দিয়েছেন। শেষে পাতার কিনারায় লেখা মন্তব্যগুলো যেভাবে আমরা ওপরে আলোচনা করেছি মূল পাঠের অংশ হয়েছিল, ঠিক একইভাবে কোরআন বা ইঞ্জিল শরীফের মতোই এগুলো মূল আয়াতের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

লিপিকারদের নির্ভুলতা

অবশ্য, যেভাবে আমরা কোরআনে এই সত্য তথ্য দেখেছি যে, কোরআনের জটিল আয়াতগুলো অক্ষতভাবেই রাখা হয়েছিল, আর আজ পর্যন্ত সেভাবেই রয়েছে। লিপিকাররা তাঁদের কাজ খুবই মনোযোগ দিয়ে করেছেন। যদি তাঁরা মনোযোগ দিয়ে কাজ না করতেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করতে গিয়ে ভয় না পেতেন তাহলে তাঁরা যেগুলো দুর্বোধ্য বিষয় বলে মনে করতেন, তার সবগুলোই বাদ দিয়ে দিতেন।

এমনকি আনুষঙ্গিক বিশদ বিবরণীর মধ্যে যে-কেউ তাঁদের বিশ্বস্ততা লক্ষ্য করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কোডেক্স ভেটিকানাসে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হজরত পৌলের লেখা চিঠিগুলোতে বিভিন্ন অংশের ধারাবাহিক সংখ্যা দেওয়া শুরু হয়েছিল। তখন গালাতীয় ও ইফিষীয় সিপারার মাঝে ইবরানী সিপারা ছিল। লিপিকাররা সযত্নে এই অধ্যায়ের আয়াতের সংখ্যাগুলো কপি

[৮] মেটজারের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পড়ুন, Metzger, op. cit., p 226-229. Also Bucaille, BQ&S, p 65.

করেছেন যেভাবে আগে তারা করেছেন, এমনকি যদিও সেগুলো উল্লেখ করা সঠিক ছিল না, কারণ, কিতাবগুলোর সাজানোর বিন্যাস পরিবর্তন হয়েছিল।[৯]

আমাদের কৌতুহল বৃদ্ধি করেছে, **ইঞ্জিল শরীফ - নতুন নিয়মের** এই যথাযথ অনুলিপি নিয়ে ডঃ বুকাইলি চ্যালেঞ্জ করে তিনি লিখেছেন,

> **"এসব বাইবেলের বিভিন্ন রচনার সঠিকত্ব নিয়েও কথা উঠেছে, এমনকি সবচেয়ে নাজুক যে পাণ্ডুলিপিটি, সেই কোডেক্স ভ্যাটিকানাস নিযেও কম বিতর্ক হয়নি।** এর যে হুবুহু নকল কপিটি ১৯৬৫ সালে ভ্যাটিকান সিটি থেকে সম্পাদিত হয়ে পুনঃমুদ্রিত হয়েছে, সেখানে সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, 'কয়েক শতাব্দী পরে নকলকৃত এই কপিতে একজন লিপিকার সব অক্ষরের ওপর দিয়ে নিজের কলম ঘুড়িয়েছেন। এই কলম-ঘুড়ানোর কালে শুধুমাত্র সেই সব অক্ষরই বাদ গেছে, যে-অক্ষরগুলো লিপিকারের কাছে ভুল মনে হয়েছিল।' পুস্তকটিতে এমন অনেক পরিচ্ছেদ রয়েছে, যে সব স্থানে পাণ্ডুলিপির মূল বা আদি অক্ষরসমূহ হালকা খয়েড়ী রঙের-এখনও স্পষ্ট বুঝা যায়; এ সবের ওপর দিয়ে লিপিকার এমন সব ভিন্ন শব্দ বা বাক্য লিখে গেছেন, যে সব শব্দ বা বাক্যের রঙ গাঢ় খয়েরী। সুতরাং, প্রতিটি অক্ষরের ওপর দিয়ে শুধুমাত্র **'বিশ্বস্তভাবে কলম ঘুড়ানো হয়েছিল' বলে যা বলা হয়েছে, তার প্রমাণ এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।**[১০] (গাঢ় অক্ষর আমি করেছি)

নতুন নিয়মের গ্রীক ভাষাতত্ত্ববিদ- মেটজার, যিনি "উৎস দলিল" অধ্যয়ন করে তাঁর সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন এবং তিনি *The Text of the New Testament* নামে একটি পাঠ্য বই লিখেছেন, যে বই থেকে এই অধ্যায়ের বেশীরভাগ অংশ নেয়া হয়েছে, তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী সময়ে লিপিকারদের নতুন করে কালি দিয়ে লিখার সময়ে অক্ষরের ওপর দিয়ে কলম ঘুড়ানো হতে পারে, আর তিনি এই তথ্যটি লুকাননি। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে,

> "এতে (কোডেক্স সিনাইটিকাস) যে মূল পাঠ আছে, তা অনেক আলেম মনে করেন যে নতুন নিয়মের আলেকজান্দ্রিয়ার ধরনের লেখার উত্তম নমুনা।"[১১]

তিনি তাঁর নিজস্ব মূল্যায়নের সারাংশ হিসেবে নিম্নের মন্তব্য করেছেন,

> "গ্রীক কিতাবুল মোকাদ্দসের সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি কোডেক্স ভেটিকানাস।[১২]

ডঃ বুকাইলি সমস্ত বিষয়টির সারাংশ হিসেবে এই কথা বলতে চেয়েছেন, "এসব রচনার সঠিকত্ব নিয়েও কথা উঠেছে, এমনকি সবচেয়ে নাজুক পাণ্ডুলিপি-কোডেক্স ভ্যাটিকানাস- নিযেও বিতর্ক কম হয়নি।" আর, **"বিশ্বস্তভাবে কলম ঘুড়ানো হয়েছিল' বলে যা বলা হয়েছে, তার প্রমাণ এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।"**

---

[৯] Metzger, op. cit., footnote 1, p 48.

[১০] বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, ডাঃ বুকাইলি, অনবাদ, পৃষ্ঠা-১১১

[১১] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৪৮

[১২] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৪৭

যদিও ডঃ বুকাইলি একটি উদাহরণ দিতে পারেননি যে, কলম ঘুড়ানোর ফলে একটি শব্দও ভুলভাবে সংশোধন করা হয়েছে। আর যদি সেখানে তা হয়েও থাকে, তবে শতকরা কয়টি শব্দ ভুলভাবে সংশোধন করা হয়েছে, সে সংখ্যাও তিনি উল্লেখ **করেননি। তিনি ধারণা করেছেন, কলম বিশ্বস্তভাবে ঘুড়ানো হয়নি।** আর যেন অন্যরা তাঁকে এই কথা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন। এর সাথে অবশ্যই প্রমাণ করে দেখাবেন, হয়তো, সম্ভবতঃ, **মতবাদ সম্পর্কিত সুখবর বা ডকট্রিসাল গসপেলের সঠিকত্বও** প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ।

আমরা যখন ছবি-৩ পরীক্ষা করে দেখি, আমরা দেখতে পারি যে, এমনকি ফটোগ্রাফিক অনুলিপির মধ্য দিয়ে মূল অক্ষরের ছবি ও অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে নতুন কলম ঘুড়ানোর ফলে সৃষ্ট অক্ষর দেখা যায়। এভাবে আমাদের কাছে মূল অক্ষর ও কলম ঘুড়ানোর ফলে উদ্ধারকৃত অক্ষর দুটোই আমাদের হাতে আছে। এখন গ্রীক শেখার জন্য যদি পাঠক সময় ব্যয় করতে চান, তিনি নিজের জন্য সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন যে, বিশ্বস্তভাবেই এই কলম ঘুড়ানো হয়েছিল।

সমস্যা হচ্ছে এই ধরনের সন্দেহ, আক্রমণাত্মক বক্তব্য এতো সহজেই ডঃ বুকাইলি এক টুকরা কাগজের পাতায় যা লিখেছেন তা যে কোনো দলিল এমনকি ছবি -২ এ কোরআনের আয়াতের ছবি সম্পর্কে করা যায়।

"এসব রচনার সঠিকত্ব নিয়েও কথা উঠেছে, এমনকি সবচেয়ে নাজুক যে পাণ্ডুলিপিটি, সে সম্পর্কেও কম বিতর্ক হয়নি। "সুতরাং, এই কথা বললে আমাদের কাছে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, কোরআনের পূর্ণাঙ্গ প্রথম পাণ্ডুলিপিটি সঠিক ছিল!

ছবি ৩

৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোডেক্স ভেটিকানাসের ছবি। ইউহোন্না ৮:৪৬-৯:১৫ আয়াতে বর্ণিত জন্মান্ধ ব্যক্তিকে সুস্থ করার বিবরণ

(ভেটিকান লাইব্রেরীর অনুমতিক্রমে ছবিটি ছাপানো হলো।)

আমি একজন খ্রীষ্টান এবং কোনো কোনো বিষয়ের প্রতি আমার নিজস্ব পক্ষপাত রয়েছে। নিজেকে কতটা আমি এই বইয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, তার বিচারের ভার পাঠকের হাতে রইলো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ডঃ বুকাইলি দুর্বোধ্য সত্য নিয়ে কথা বলবেন, কোডেক্স ভেটিকানাসের তথাকথিত দুর্ণাম সমর্থন করবেন, আমিও ততই নিজেকে আলাদা করে বিশেষজ্ঞ ডঃ মেটজার ও কিতাব-লিপিকারকদের পক্ষ নেব, যাঁরা দাসের মতো কিতাবের অংশের সংখ্যাগুলোও নকল করেছেন, যদিও সংখ্যাগুলো নকল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ৩নং ছবিতে দেওয়া চতুর্থ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি কোডেক্স ভেটিকানাস যেমন খ্রীষ্টানদের জন্য ইঞ্জিল শরীফের একটি বৈধ ও

উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য, ঠিক তেমনি ২ নং ছবিতে দেওয়া হস্তলিখিত কোরআনের পাণ্ডুলিপিটিও মুসলমানদের কাছে বৈধ সাক্ষ্য।

অপরিচিত নাম ও শব্দ ভাষান্তরের সময়ে লেখকদের সাবধানতা অবলম্বনের আরো প্রমাণ

পুরাতন নিয়মে ইব্রীয় ও বিদেশী রাজাদের নাম খুবই বিশ্বস্ততার সাথে ভাষান্তর করা হয়েছে। যদিও তাঁরা মৃত ছিলেন। শত-শত এমনকি হাজার হাজার বছর আগে তাঁরা রাজত্ব করছেন। মিসরের রাজা ফেরাউন রামেসীসকে নিয়ে আলোচনা করার সময়ে তাঁর বইয়ে ডঃ বুকাইলি নিজেই এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

"রামেসীস শব্দটার প্রায় অবলুপ্তি হলেও, সেই সময়ে কেবল বাইবেলের পৃষ্ঠাতেই এই শব্দটি অবিকৃতভাবে রয়ে গিয়েছিল, যদিও কিছু সংখ্যক গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তকে এই শব্দটি প্রায় অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছিল— যাই হোক, বাইবেলে কিন্তু এই নামটি নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত ছিল এবং এই শব্দটি বাইবেলের তৌরাত বা পেন্টাটোক অধ্যায়ে চার-চারটি জায়গায় উল্লেখিত রয়েছে।"[১৩]

আরেকটি উদাহরণ দেখা যায়- তৌরাত-পুরাতন নিয়মের **১ শামুয়েল ১৩:২১** আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে,

"যদিও তাদের কোদালের জন্য **উখা** (পিম) ছিল— ।"

হিব্রু শব্দ পিম এর অনুবাদ করা হয়েছে উখা বা রেত। এর অর্থ লোকদের কাছে অজানা ছিল এবং প্রসঙ্গের ওপর ভিত্তি করে আনুমানিক অনুবাদ করা হয়েছিল। তারপর, পুরাতত্ত্বীয় খনন কাজের ফলে লোকেরা এমন একটি মুদ্রা খুঁজে পায়, যা তারা আগে কখনও দেখেনি। যখন এটি পরিষ্কার করে মুদ্রার ওপরে লেখা অর্থ উদ্ধার করা হলো, তখন দেখা গেল যে, এটি ছিল একটি পিম মুদ্রা। সুতরাং, আয়াতটির অর্থ এখন বুঝা গেল যে, কাঁটা বসানো লাঠিটি শান দেবার জন্য এটি মূল্য হিসেবে দেওয়া হতো। তারপর অনুবাদ করা হলো যে,

"কুদাল, ফাল—শান দেবার জন্য এক শিকলের দুই-তৃতীয়াংশ (পিম) দিতে হতো।"

"পিম" শব্দটির আসলে আমাদের কাছে কোনো গুরুত্বই নেই। এটি কোনো বিশ্বাস প্রকাশ করে না। কিন্তু এই শব্দটি সঠিকভাবে লেখকরা পাককিতাবের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-২০০০ পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ২০০০ হাজার বছর ধরে কিতাব লিপিকাররা কপি করছিলেন। যদিও এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে কেউই জানতেন না যে, এর অর্থ কী? পাঠক, আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, তৌরাত ও ইঞ্জিল শরীফের এই ভিন্ন-পাঠ যা আমরা আলোচনা করছি, এগুলো কোরআনের ভিন্ন পাঠের মতোই যা আগে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। এগুলোর পাক-কালামের বৈধতার ওপর

---

[১৩] বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, ডাঃ বুকাইলি, পৃষ্ঠা-৩১২

কোনো প্রভাবই ফেলতে পারেনি। অন্যদিকে লূক ২৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা আয়াত, *আল্লাহ্‌র প্রশংসা, আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া* বা *আল্লাহ্‌কে প্রশংসা করা ও ধন্যবাদ দেওয়া* বললে মূল শিক্ষার কোনো কিছুই পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে এই কথা বললে যে, ঈসা মসীহ্‌ আমাদের পাপ থেকে *ধৌত* করেছেন, অথবা আমাদের পাপ থেকে *মুক্ত* করেছেন, এই কথা বললেও দেখা যায় যে, **মতবাদগত** সুখবর বা Doctrinal Gospel এর শিক্ষার কোনো পরিবর্তন হযনি।

এখন কেবল গ্রীক ভাষায়ই ৫৩০০র বেশী ইঞ্জিল শরীফের পুরানো পাণ্ডুলিপি বা এর অংশ বিশেষ রয়েছে। সতরাং, এই কথা জেনে আমাদের আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই যে, এসব হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে হাজার হাজার ক্ষুদ্র পার্থক্য রয়েছে। 'লূক' ম্যাগাজিনে একবার এই শিরোনামে খবর ছাপা হয়েছিল যে, ৫০,০০০ এরও বেশী ভুল রয়েছে। কিন্তু আসলে এই শিরোনামটি ছিল মিথ্যে। একইভাবে যদি কেউ বলেন যে, কোরআনে ৫০০০ ভুল রয়েছে, তবে তিনিও মিথ্যে বলছেন। ভিন্ন-পাঠ শব্দের পরিবর্তে লেখক ভুল শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর পাঠককে এই কথা বলা হয়নি যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য পাঠের সাথে তুলনা করে, এগুলোকে সংশোধন করা যায়। ডঃ বুকাইলিও এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "এ থেকে বুঝতেও বেগ পেতে হয় না যে, এক পাঠের সাথে আরেক পাঠের, এক অনুবাদের সাথে আরেক অনুবাদের এই যে পার্থক্য, তা সংশ্লিষ্ট বাইবেলগুলির সংশোধনজনিত কর্মকান্ডের অবিবার্য পরিণতি। এভাবে বিগত দু'হাজার বছর ধরে ক্রমাগতভাবে সংশোধনী চালিয়ে যাওয়ার ফলেই বাইবেলের মূল বাণীর পাঠ' সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৪]

কিন্তু দুই হাজার বছর নিয়ে আলোচনা করার আমাদের দরকার নেই। আমাদের বর্তমান কিতাবুল মোকাদ্দস দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা সুখবর অনুসারেই লেখা হয়েছে।

৯০০ খ্রীষ্টাব্দের একজন কিতাব-লিপিকারের ভুলের কোনো প্রভাব আমাদের বর্তমান-সুখবর-নতুন নিয়মের পাণ্ডুলিপির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। কারণ এটি ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা পাণ্ডুলিপি কোডেক্স সিনাইটিকাস ও কোডেক্স ভেটিকানাস ও ২০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা পেপিরাসের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে।

গ্রীক নতুন নিয়মের সংস্করণ সম্পর্কে Westcott and Hort[১৫] যিনি ১৮৫৩ -১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে সে-সময়ে প্রাপ্ত সমস্ত গ্রীক পাণ্ডুলিপি গুলো বিশদভাবে তুলনা করে প্রায় ৬০টি অংশ পেয়েছেন (৪টি সুখবর থেকে ৭টি) যেগুলো (তাদের মধ্যে ১টি) সন্দেহ করা হয় যে, এতে সাদামাটা ভুল রয়েছে। সাদামাটা ভুল বলতে তাঁরা এমন ধরনের ভুল বুঝিয়েছেন যা বর্তমান পাণ্ডুলিপির সাক্ষের চেয়ে পুরানো। আজগুবি কথার কী গড়মিল! নুতন নিয়মে যে ৫০০০০ ভুল রয়েছে, এর বদলে তাঁরা বলছেন মাত্র ৬০টি অংশ সম্পর্কে সন্দেহ করা যায়। ১৮৮১ সালে এই কথা লেখার পরে গ্রীক ভাষায় লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি বা পেপিরাসের ওপর লেখা অনুলিপি পাওয়া

---

১৪ বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, ডাঃবুকাইলি, পৃষ্ঠা-১৬

১৫ Westcott and Hort, *The New Testament in the Original Greek,* Cambridge, 1881. মেটজার ৬০টি সূত্র উল্লেখ করেছেন, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৮৪

গিয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নব-নব আবিষ্কার বার-বার দেখিয়েছে যে, বর্তমান ইঞ্জিল শরীফের মূল পাঠের ওপর ওয়েস্টকোট ও হোর্ট-এর আস্থা দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কিতাবুল মোকাদ্দসের রিভাইজ ষ্ট্যান্ডার্ড ভারসনের সম্পাদকবৃন্দ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন যে,

> "১৯৪৬ সালেও মনোযোগী পাঠকের কাছে এটি স্পষ্ট ছিল যে, ১৮৮১ বা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মতোই সংশোধনের দ্বারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের শিক্ষার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি। এর কারণ বুঝা খুবই সহজ। পাণ্ডুলিপির হাজারো ভিন্ন পাঠের মধ্যে কোনো খ্রীষ্টীয় শিক্ষাকে সংশোধনের প্রয়োজনে উল্টিয়ে ফেলা হয়নি।

অধ্যাপক মেটেজার ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পরিস্থিতিকে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করে বলেছেন:

বেশীরভাগ লোকই এটি স্বীকার করে যে, মেধাবী সম্পাদকদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার মূল পাঠ (মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টানরা) সংকলিত হয়েছিল, যাঁরা ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের পরিবেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। — সমপ্রতি এই ধরনের নমুনার দুটো প্রধান সাক্ষী কোডেক্স ভেটিকানাস ও কোডেক্স সিনাইটিকাস আবিষকৃত হয়েছে। এই কোডেক্স বা হস্তলিখিত কিতাব চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল।

> "অবশ্য পেপিরাসে লেখা এই আবিষ্কারের (পৃষ্ঠা ৬৬) দ্বারা (ছবি-৯, ষষ্ঠ অংশ, চতুর্থ অধ্যায়) এবং পেপিরাস (৭৫ পৃষ্ঠা) (ছবি ৫, এই অংশে III E [১৬] এগুলো প্রায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে এবং তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে লেখা হয়েছিল) এখন হাতের কাছেই প্রমাণ রয়েছে যে, (এই মূল পাঠ) এগুলো দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা হয়েছিল।[১৭]

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অথবা তৃতীয় শতাব্দীর শুরু বলতে আমরা ২০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলেছি। ঈসা মসীহের বেহেশত গমনের পরে ১৭০ বছর পর এবং হজরত ইউহোন্নার সুখবর লেখার মধ্যে মাত্র ১১০-১২০ বছরের সময়কালকে বুঝায়। এই সময়ে অনেক লোক জীবিত ছিলেন, যাঁরা **মতবাদ সম্পর্কিত সুখবর** বা ডকট্রিনাল গসপেল শুনেছিলেন। এঁরা তাঁদের পিতা বা অন্য লোকদের কাছ থেকে শুনেছিলেন, আর তাঁদের পুর্বপুরুষরা প্রেরিতদের ব্যক্তিগতভাবে জানতেন।

তাহলে সবচেয়ে ভালো সাক্ষ্য হচ্ছে, আমরা যে মূল পাঠ এখন পাঠ করছি, তা মৌলিকভাবে সেই মূল পাঠ, যা ঈসা মসীহের সাহাবীরা আসলে আমাদের দিয়েছেন।

---

[১৬] দেখুন, ৭২, ওখানে প্যপিরাসের পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে

[১৭] মেটজার , ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ২১৫-২১৬

সিদ্ধান্ত

হাদিস ও অন্যান্য মুসলমান তফসীরকারকদের প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, নবীর সাহাবীদের দ্বারা তৈরি কোরআনের অনেক ভিন্নপাঠ ছিল। আর এই কথা বলার মধ্য দিয়ে, প্রায় সময়েই মুসলমানদের এই দাবীর বিরোধিতা করা হয়। তাঁরা দাবী করেন যে, বর্তমান কোরআনের মূল পাঠ, কোরআনের প্রথম মূল পাঠের একেবারে হুবুহ ছবির মতো এক। তবু কোরআনের এসব ভিন্ন-পাঠ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে যে, তাঁদের কাছে কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ সেই মূল বাণীটি রয়েছে, যা হজরত মুহাম্মদ ঘোষণা করেছিলেন।

ঠিক সেভাবেই **ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়মের** বেলায়ও একই কথা বলা যায়। এই কথা সমর্থন করা অসম্ভব যে, যদি কোনো খ্রীষ্টান যুক্তি দেখিয়ে দাবী করেন যে, **ইঞ্জিল শরীফ- নতুন নিয়ম** বর্তমানে যা আছে তা মূল পাণ্ডুলিপির হুবুহু ছবির মতো এক, তবু ইঞ্জিল শরীফের এসব ভিন্ন-পাঠ থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে যে, আমাদের ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেই মূল বাণীটি বয়েছে, যা ঈসা মসীহ্ ঘোষণা করেছিলেন।

ঘ. প্রাথমিক যুগের সংঘাত ও বিরোধীতার সাথে ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংঘাত ও বিরোধীতার তুলনা

ডঃ বুকাইলি তাঁর লেখা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাথমিক খ্রীষ্টান সমাজের অভ্যন্তরিণ সংঘাত তুলে ধরে বলেছেন যে, এই সংঘাত ইঞ্জিল শরীফের **ধর্মীয় শিক্ষার** সঠিকত্বের ওপর প্রভাব ফেলেছে। তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. এই সংঘাতের সাথে হজরত পৌলের অনুসারী এক ধরনের খ্রীষ্টান জড়িত ছিলেন, আর এই মতবাদের সাথে জড়িতদের জুডিও-খ্রীষ্টান বলা হয়েছে। এই দলের নেতা ছিলেন, হজরত পিতর, হজরত ইউহোন্না, এঁদের সাথে ছিলেন ঈসা মসীহের ভাই ইয়াকুব।

২. এই সংঘাতের ফল হিসেবে অনেক ইঞ্জিল শরীফের-নতুন নিয়মের- কিতাবগুলো লেখা হয়েছিল।

৩. জুডিও-খ্রীষ্টান দল শেষে হারিয়ে যায় এবং তাঁদের কিতাবগুলো বা জাল-কিতাব এবং জামাত এই কিতাবগুলোকে লুকিয়ে ফেলে গোপন করে ফেলে।

ডঃ বুকাইলি এই তিনটি পয়েন্টকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে নিম্নের কথাগুলো লিখেছেন:

১. ঈসা মসীহের অন্তর্ধানের পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মের **দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র সংঘাত অব্যাহত ছিল**। এর একটা গোষ্ঠী ছিল 'জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি' এবং দ্বিতীয়টি ছিল যাকে বলা যেতে পারে' পৌলিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি'বা পৌলপন্থী খ্রীষ্টধর্ম। ধীরে ধীরে খ্রীষ্টানদের দ্বিতীয় ধর্মীয় মতবাদটি প্রথমটির স্থান দখল করে নেয়; **জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির ওপরে বিজয় সূচীত হয় পৌলীয় খ্রীষ্টীয় মতবাদের**।"[1]

পরে তিনি দাবী করেছেন,

"৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান ধর্মই বেশীরভাগ গির্জায় অনুসৃত হয়ে আসছিল। এবং হজরত পৌলের মতবাদ ছিল একটি বিচ্ছিন্ন্ ঘটনা মাত্র। সেই সময়ে খ্রীষ্টান সমপ্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু বা নেতা ছিলেন ঈসা মসীহের জনৈক আত্মীয়, হজরত ইয়াকুব। (শুরুতে) হজরত পৌল, হজরত ইউহোন্না ও হজরত ইয়াকুবের সাথে ছিলেন। তখন এই হজরত ইয়াকুব ছিলেন জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। পৌলীয় খ্রীষ্টান মতবাদের বিরোধীতার

[1] ডাঃ বুকাইলি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৭৫

কারণেই হজরত ইয়াকুবের এই গোষ্ঠী তখন স্বেচ্ছায় আরো বেশী করে ইহুদী ধর্মমতের দিকে আরো বেশী করে ঝুঁকে পড়েছিল।"[২]

এবং পরের পৃষ্ঠায় আবারও তিনি বলেছেন,

"বস্তুতঃ হজরত পৌল হচ্ছেন খ্রীষ্টধর্মের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। ঈসা মসীহের পরিবারের সদস্যদের নিকট তো বটেই, ঈসার যেসব সঙ্গী-সাথী ও প্রেরিত জেরুসালেমে হজরত ইয়াকুবের সাথে ছিলেন, তাঁদের নিকটও হজরত পৌল বিবেচিত হয়েছেন ঈসার ধর্মীয় মতবাদের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবেই। আসলে ঈসা মসীহ্ যে সব লোককে তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য নিজের নিকট জড়ো করেছিলেন, তাঁদের বর্জন করেই হজরত পৌল এক আলাদা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন।"[৩]

এভাবে ডঃ বুকাইলি হজরত পৌলকে ঈসা মসীহের ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখিয়েছেন। আর পরিস্থিতিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, একজন পাঠক যিনি কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পর্কে ভালো শিক্ষা পাননি, সেই পাঠকের মনে এই ছাপ ফেলবে যে, খ্রীষ্টানরা তাদের কিতাব বদবদল করেছে, বিকৃত করেছে আর গোপন করেছে এবং প্রকৃত ইঞ্জিল শরীফকে লুকিয়ে ফেলেছে।

ডঃ বুকাইলির দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো এই যে, এই সংঘাতের ফলে নতুন নিয়মের অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। তিনি নিম্নের কথা দ্বারা তা বুঝাতে চেয়েছেন।

২. অবশ্য, কিতাবুল মোকাদ্দসের সুসমাচারসমূহের ব্যাপারে একটা কথা প্রায় সন্দেহাতীত বলা যায় যে, তখনকার বিভিন্ন সমপ্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের এই পরিবেশ যদি না থাকত তাহলে আজ আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের সুসমাচার নামে যেসব কিতাব পাচ্ছি, তা পেতাম না। মনে রাখা দরকার, এসব সুসমাচার রচিত হয়েছিল তখন- যখন খ্রীষ্টানদের দুই ধর্মীয় সমপ্রদায়ের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছিল। ফাদার কানেনগিয়েসার যাকে বলেছেন, 'বিরুদ্ধপক্ষীয়দের মোকাবেলায় রচিত' ঈসা মসীহ্ সংক্রান্ত নানা ধরনের বিতর্কের মোকাবেলায় তখন সে ধরনের পুস্তক প্রচুর পরিমানে লেখা হয়েছিল।

তারপর তিনি তৃতীয় পয়েন্টটি উল্লেখ করেন

৩. পরবর্তীকালে এই অফিসিয়াল সুসমাচারসমূহ প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হয় এবং বাদবাকী কিতাব- যেগুলি তখনকার পৌলীয় খ্রীষ্টান গির্জা সংস্থা কর্তৃক অনুসৃত ধর্মীয় মতবাদের বিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল- সেগুলি অপ্রামাণ্য হিসেবে হয় নিন্দিত ও বর্জিত।"[৪]

এই কথা অবশ্যই সত্যি যে, ইঞ্জিল শরীফের কয়েকটি কিতাব সংঘাতের সময়কালে রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় যে,

---

[২] ডাঃ বুকাইলি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৭৬

[৩] ডাঃ বুকাইলি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৭৮

[৪] ওপরে উল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা-৫৩

১. ডঃ বুকাইলি কি সত্যি কথা বলেছেন যে, হজরত পৌল ও অন্যান্য সাহাবীদের মাঝে সংঘাত ছিল?

২. এই সংঘাত থাকা কি প্রমাণ করে যে, ইঞ্জিল শরীফ -নতুন নিয়ম আল্লাহ্‌র ওহী অনুসারে লেখা হয়নি?

হজরত পৌলের সাথে হজরত পিতর, হজরত ইউহোন্না ও হজরত ইয়াকুবের মধ্যে কি আসলে ইঞ্জিল শরীফের মূল বিষয় নিয়ে দ্বিমত ছিল?

ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়মের নিম্নের অংশটি প্রমাণ করে যে, তাঁরা বন্ধু ছিলেন আর তাঁরা খ্রীষ্টীয় শিক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন।

(ক) গালাতীয় সিপারায় ২:১-২, ৯-১০ আয়াতে হযরত পৌল লিখেছেন,

"চৌদ্দ বছর পরে আমি বার্ণবার সংগে আবার জেরুসালেমে গেলাম— আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশিত হবার পরে আমি সেখানে গেলাম। যে সুসংবাদ আমি অ-ইহুদীদের কাছে তবলিগ করে থাকি তা বললাম। জামাতের গণ্যমান্য লোকদের কাছে —বললাম, কারণ, আমার ভয় হচ্ছিল যে হয়তো আমি অনর্থক পরিশ্রম করছি বা করেছি। সেই গণ্যমান্য লোকেরা, অর্থাৎ **ইয়াকুব (ঈসা মসীহের ভাই) পিতর ও ইউহোন্না** এই সব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ রহমত পেয়েছি। তাঁদের ও আমাদের মধ্যে যে যোগাযোগ সম্পর্ক আছে, তা দেখাবার জন্য **তাঁরা আমার ও বার্ণাবাসের সংগে ডান হাত মিলালেন**। —আমরা যেন গরীবদের কথা মনে রাখি— ।"

(খ) প্রেরিত ২১:১৭-২০ আয়াতে সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যুর ৫ বছর আগে হজরত পৌল শেষবারের মতো জেরুসালেম যাত্রার বিষয়ে জানতে পারি। এখানে বলা হয়েছে,

"জেরুসালেমে পৌঁছালে পর ঈমানদার ভাইয়েরা খুশী হয়ে আমাদের গ্রহণ করলো। পরদিন পৌল আমাদের সংগে **ইয়াকুবকে (ঈসা মসীহের ভাই) দেখতে গেলেন। সেখানে জামাতের সব নেতারা উপস্থিত ছিলেন**। পৌল তাঁদের সালাম জানালেন এবং তাঁর তবলিগের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ কীভাবে অ-ইহুদীদের মধ্যে কাজ করেছেন তা এক এক করে **বললেন। এই কথা শুনে তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন—** ।"

(গ) সবশেষে, ২ পিতর সিপায়ায় হজরত পিতর নিজেই লিখেছেন,

"মনে রেখো, মানুষকে নাজাত পাবার সুযোগ দেবার জন্য আমাদের প্রভু ধৈর্য ধরে আছেন। এই একই কথা **আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞানে তোমাদের লিখেছেন—সেগুলোর** মধ্যে অবশ্য কতগুলো বিষয় আছে যা বোঝা কঠিন। সে'জন্য যারা উম্মত হবার শিক্ষা

পায়নি ও যাদের মন অস্থির তারা অন্যান্য কিতাবের মতো এগুলোর মানেও ঘুরিয়ে বলে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।” ২ পিতর ৩:১৫-১৬

এই আয়াতগুলো দেখায় যে, হজরত পৌল, তাঁর প্রচারের সাথে হজরত পিতর, হজরত ইউহোন্না ও হজরত ইয়াকুবের প্রচারের মধ্যে মিল রয়েছে কি-না তা, যাঁচাই করে দেখার জন্য জেরুসালেমে গিয়েছিলেন?

এই আয়াতগুলো দেখায় যে, হজরত পৌলের লেখা চিঠিগুলো তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞানে লিখেছেন বলে হজরত পিতর উল্লেখ করেছেন। গালাতীয় ২:১-১৬ আয়াতে হজরত পৌল হজরত পিতরকে কাঠোর ভাষায় বকুনি দিয়েছেন। কিন্তু হজরত পিতরের লেখা ওপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মিল হয়েছিল।

কেন ডঃ বুকাইলি সেই আয়াতগুলোকে অবজ্ঞা করেছেন? যদি আমি কোরআন থেকে উদ্ধৃত করার সময়ে কোনো আয়াত বাদ দেই, তাহলে কি এটি সাক্ষ্য গোপন করে **প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার** মতো ব্যাপার হবে না। এই কথা হলো তেমনি, যদি আমি বলি যে, হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান- এঁদের মধ্যে অনেক বিষয়ে দ্বিমত ছিল, আর তাঁদের মধ্যকার এই সংঘাতের কথা হাদিসেও উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে একটি সংঘাত ছিল, এই কথা ঠিক, কিন্তু এই সংঘাত **হজরত পৌল, হজরত পিতর, হজরত ইউহোন্না, হজরত ইয়াকুব** একদিকে **আরেকদিকে জুডিও-খ্রীষ্টানদের মধ্যে ছিল।**

সুখবর-নতুন নিয়মের মধ্যে এই সংঘাতের ফল

প্রেরিত সিপারা ও হজরত পৌলের লেখা চিঠিগুলো তিন ধাপে এই সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছে। সবার আগে বলতে হয়-হজরত পৌল ও মূর্তিপূজারীদের মধ্যে সংঘাত ছিল। প্রেরিত ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হজরত পৌলের প্রচার শুনে লোকেরা মসীহকে নাজাতদাতা হিসেবে স্বীকার করেছে। তাঁরা **“মৃত দেব-দেবীর এবাদত ছেঁড়ে দিয়ে জীবিত আল্লাহ্‌র এবাদত করতে লাগলো”** এবং রূপার মূর্তিগুলো কেনা বন্ধ করে দিল। এই ঘটনা ইফিষ শহরের রূপার মূর্তি তৈরি করার কারিগরদের এমন ক্রুদ্ধ করে তুললো যে, তারা একটি দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিল, পরে তারা জোর করে হজরত পৌলকে শহর থেকে বের করে দিল।

দ্বিতীয়তঃ প্রেরিতদের সাথে এবং যে সব ইহুদী সুখবর গ্রহণ করেনি, তাদের মাঝে সংঘাত ছিল। প্রেরিত ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, “তারা ইউহোন্নার ভাই ইয়াকুবকে মেরে ফেললো ও পিতরকে ধরে জেলে দিল” । প্রেরিত ১৪:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

“পরে আন্তিয়খিয়া ও কোনিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে হজরত পৌল ও বার্ণবাসের বিরুদ্ধে লোকদের উসকিয়ে দিল। তখন লোকেরা হজরত পৌলকে পাথর মারলো এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে শহরের বাইরে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।”

তৃতীয়তঃ একদিকে হজরত পিতর, হজরত ইউহোন্না ও হজরত পৌলের সাথে অন্যদিকে জুডিও-খ্রীষ্টানদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল। এটি ছিল তৃতীয় ধরনের সংঘাত, যা ডঃ বুকাইলি উল্লেখ করেছেন।

পাঠক, এবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন। এই জুডিও-খ্রীষ্টান শব্দের অর্থ কী? হজরত ঈসা মসীহের ওপর ঈমান আনার আগে হজরত পিতর, হজরত ইয়াকুব ও হজরত ইউহোন্না এবং সব সাহাবীরাই কি ইহুদী ছিলেন না? তাহলে, তাঁদের মধ্যে ও অন্য দল- পরে যাঁরা খ্রীষ্টান হয়েছিলেন- তাঁদের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে?

ইহুদী-খ্রীষ্টানরা কী বিশ্বাস করতেন?

এত সব কথা বলা সত্ত্বেও আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যে, তাঁরা সবাই **মতবাদগত সুখবর বা ডকট্রিনাল গসপেলের** শিক্ষা বিশ্বাস করতেন।

ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে ডঃ বুকাইলি বেশ কয়েকবার কার্ডিনাল ড্যানিয়েলুর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ১৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

> "আদিতে খ্রীষ্টধর্ম ছিল জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি ধর্ম এই বিষয়ে কার্ডিনাল ড্যানিয়েলু প্রমুখ আধুনিক লেখক সবিশেষ গবেষণা চালিয়ে গেছেন। খ্রীষ্টধর্মের ওপর পৌলের প্রভাব বিস্তারের আগে পর্যন্ত সেই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি সমাজ কিতাবুল মোকাদ্দসের এই পুরাতন নিয়মকে নিজেদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার হিসেবে পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।"

৫০ পৃষ্ঠায় তিনি আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন,

> "তিনি (কার্ডিনাল ড্যানিয়েলু) এতদসংক্রান্ত অতীতের যাবতীয় রচনাবলী পর্যালোচনা করেন এবং ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে কিতাবুল মোকাদ্দসের সুসমাচারগুলি কখন রচিত হয়েছিল, তার সঠিক সময়কাল সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। অধুনা জনগণের মধ্যে যেসব কিতাবুল মোকাদ্দস প্রচলিত, সেগুলিতে নতুন নিয়মের সুমাচার রচনার যে-সময়কাল উল্লেখ রয়েছে, কার্ডিনাল ড্যানিয়েলুর গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত সময়কাল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।"

ওপরের এই উদ্ধৃতিগুলো এই কথা মনে ছাপ ফেলে যে, ড্যানিয়েলু জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি সমাজে একটি ভিন্ন ধরনের সুখবর খাকার কথা বলেছেন। কিন্তু কার্ডিনাল ড্যানিয়েলুর লেখা বই যখন আমরা পড়ি, তখন আমরা দেখতে পাই তিনি একেবারেই উল্টো কথা বলেছেন।

তিনি তাঁর বিখ্যাত বইয়ে '*থিওলজি ডাস জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিজম*'[৫] শিরোনামে লিখেছেন যে, এই বইয়ে প্রতিটি দলিল যেগুলো ১৯৬৪ সালে তাঁর বই লেখার সময় পর্যন্ত আবিষকৃত হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে আলোচনার পর শেষে তিনি লিখেছেন,

[৫] ইংরেজী অনুবাদ, *The Theology of Jewish Christianity,* The Westminster Press, Philadelphia, 1978.

"আমাদের এই বইয়ের শুরুতে যে কাজ আমরা ঠিক করেছিলাম তা হচ্ছে, প্রাথমিক জামাতের জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত যেসব দলিল পাওয়া গেছে তারা সবগুলো আমরা যাঁচাই করে দেখবো যাতে — জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা একটি চিত্র খুঁজে পাই—পৃষ্ঠা-৪০৫

এর সাথে, সৃষ্টির কাহিনী, সবকিছুর শুরু— থেকে শেষে অসীম আল্লাহ্‌র বেহেশত পর্যন্ত সবকিছুই জড়িত ছিল। **এই অপরিমেয় নিদর্শন ও ঘটনাগুলো একসাথে কাজ করেছে তা আমরা ঈসা মসীহের মানবরূপ ধারণের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই- মানুষের দেহে আল্লাহ্‌র আবাস এবং ইবনুল্লাহর (ঈসা মসীহ) গোপন মহিমার প্রকাশ**—পৃষ্ঠা ৪০৫।

তাদের জন্য নাজাত আল্লাহ্‌র একটি কাজ ছিল। কালামের (ঈসা মসীহের) কাজ রুহানিক দুনিয়ায় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। শিয়োল (পাতাল) থেকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিকে তা স্পর্শ করেছিল। **ক্রুশ-নাজাতের উপায়- হচ্ছে এই দুনিয়ায় দুটো বাহুর** প্রতীক, এর আড়াআড়ি বাহু দিয়ে **দূরবর্তী স্থানের সব মানুষকে হাত বাড়িয়ে একত্র করা হয়েছে**, আর খাঁড়া বাহু দিয়ে **বেহেশত ও দুনিয়া একসাথে যোগ করা হয়েছে—**৪০৭ পৃষ্ঠা।

এখানে, অনেক ঘটনার পূর্বে এমনকি ইঞ্জিল শরীফের পূর্বেও (তিনি লিখিত ইঞ্জিল শরীফের আগে ছিলেন)।

আমরা দেখি যে, **ঈসা মসীহের পূর্বঅস্তিত্ব ছিল-** নাম ছিল পুত্র, কালেমা—

আমরা পাক-রূহের খোদায়ী অস্তিত্ব দেখতে পাই—

আমরা দেখতে পাই, *ভারজিনিটিস ইন স্পার্টা* (কুমারীর গর্ভে জন্মলাভ)—

এবং জামাতের বিশদ শিক্ষামালা (বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়)—

এগুলো এবং অন্যান্য নিদর্শনগুলোতে—সন্দেহ করার অবকাশ এতোই কম **যে, "খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসের সব প্রধান বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বেশী অপ্রচলিত শব্দগুলো- যা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যবহৃত হয় না- এমনকি সেগুলো আগে থেকেই তারা ব্যবহার করেছিল—এমনটি এটি আগের চেয়ে আরও বেশী**। ৪০৮ পৃষ্ঠা। (গাঢ় অক্ষর আমি করেছি।)

কেবলমাত্র কার্ডিনাল ড্যানিয়েলু কেবল এটি দেখাননি যে, আল্লাহ্ ও ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের হজরত পৌলের মতো একই বিশ্বাস ছিল; কিন্তু তিনি তাঁর বইয়ে কমপক্ষে দশবার **তিনি ইহুদী -খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করার জন্য হজরত পৌলের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।**

প্রেরিতদের সাথে জুডিও-খ্রীষ্টানদের মতের অমিল

যদি নাজাতদাতা হিসেবে ঈসা মসীহের ওপর তাঁদের বিশ্বাস একই ছিল, তাহলে তাঁদের মধ্যে বিভেদের কারণ কী ছিল? ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়ম অনুসারে জানা যায় যে, মূর্তীপূজারীরা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করত্ম পর থেকে এই সংঘাত শুরু হয়েছিল। তখন এই প্রশ্ন উঠে যে, নাজাতদাতা হিসেবে ঈসা মসীহের ওপর ঈমান আনার পর, তাদের খৎনা করাতে হবে কি-না? আর তওরাতের উল্লেখিত

ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা তাদের পালন করতে হবে কি-না? কেউ কেউ শিক্ষা দিয়েছিল যে, তাদের এই দুটো কাজ অবশ্যই করতে হবে। অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায় যে, তোমাকে ইহুদী হতে হবে, খৎনা করাতে হবে যেন তুমি পরিপূর্ণ খ্রীষ্টান হতে পার। এখান থেকেই ইহুদী-খ্রীষ্টান শব্দটি এসেছে।

হজরত পৌল বলেছেন, "ঈসা বিনামূল্যে উপহার রহমতের দান হিসেবে প্রতিটি মানুষের পাপের জন্য মুক্তির মূল্য পরিশোধ করেছেন।

> ইহুদী-খ্রীষ্টানরা বলে, "এই কথা সত্যি যে, গোনাহ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈসা মসীহ্ আমাদের মুক্তির মূল্য পরিশোধ করেছেন, কিন্তু একজন লোককে অবশ্যই হজরত মূসার শরিয়ত পালন করতে হবে। প্রেরিত **১৫:১** আয়াতে তাদের এই শিক্ষার কথা বলা হয়েছে,

> "এহূদিয়া প্রদেশ থেকে কয়েকজন লোক আন্তিয়খিয়ায় আসলেন এবং ঈমানদার ভাইদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন, "মূসার শরিয়ত মতে **তোমাদের খৎনা করানো না হলে তোমরা কোনোমতেই নাজাত পেতে পারো না**।" (এমনকি যদিও তুমি ঈসা মসীহকে নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছো)

এই মতের অমিল থাকার কারণে, এই বিষয়টি নিয়ে অন্য প্রেরিতদের সাথে আলোচনার জন্য হজরত পৌল ও হজরত বার্ণবা জেরুসালেমে গিয়েছিলেন। সেখানে আলোচনার সময়ে হজরত পিতর ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বলেছিলেন,

> "তাহলে আমাদের পুর্বপুরুষেরা বা আমরা যে বোঝা বইতে পারিনি, সেই বোঝা অ-ইহুদী ঈমানদারদের কাঁধে তুলে দিয়ে কেন আপনারা আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, **হযরত ঈসা মসীহের রহমতে** অ-ইহুদী ঈমানদারেরা যেমন নাজাত পেয়েছে, তেমনি **আমরাও (ইহুদী) নাজাত পেয়েছি**।" প্রেরিত **১৫:১১**

আমরা হজরত পিতরের কথাকে এভাবে মূলঅর্থ পরিবর্তন না করে শব্দান্তরে প্রকাশ করতে পারি। "না! আমরা ইহুদীরা ইহুদী বলে নাজাত পাইনি। আমরা মসীহকে গ্রহণ করে খ্রীষ্টান হয়ে নাজাত পেয়েছি। সুতরাং, এটি ইহুদীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় যে মসীহকে গ্রহণ করার পরে আবার তাদের ইহুদী হতে হবে।"

আর এটি ছিল সেই মহাসভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অ-ইহুদী- যাঁরা ঈমান এনে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, তাঁদের আর খৎনা করানোর দরকার নেই।

এই আলোচনার বিশদ বিবরণ ইঞ্জিল শরীফ -নতুন নিয়মের গালাতীয় সিপারায় এবং প্রেরিত সিপারায় **১৫** ও**১৬** রুকুতে পাওয়া যায়। এটি দেখায় যে, হজরত ইয়াকুব-ঈসা মসীহের ভাই, এবং হজরত পিতর সেখানে ছিলেন আর তাঁরা হজরত পৌলের সাথে একমত ছিলেন। ইহুদী-খ্রীষ্টানরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে, এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে হজরত পৌলের হাত রযেছে, আর প্রধান নেতা হিসেবে তারা হজরত পৌলের ওপর নির্যাতন করেছিল।

ইসলাম ও এর আগের কিতাবের ওহী

ইসলাম ও আগের কিতাবের ওহীসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক মনে হয় প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মনে আসেনি। আর আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে, কেন এটি হয়নি? তত্ত্বীয়ভাবে যে-কেউ বলতে পারেন যে, আগের কিতাবে দেওয়া হুকুম বাতিল না করা পর্যন্ত ্ত তৌরাত ও ইঞ্জিলে দেওয়া হুকুমগুলো পালন করা তাদের জন্য ফরজ ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কেন আট দিনের দিন মুসলমানরা তাঁদের শিশুপুত্রকে খৎনা করান না। কারণ, আল্লাহ্ তো হজরত ইব্রাহিমকে এই হুকুমই দিয়েছিলেন। পয়দায়েশ ১৭:৯-১২ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আরো বললেন, "এই ব্যবস্থায় তোমার যা করার রয়েছে তা এই; তুমি ও তোমার সমস্ত সন্তান বংশের পর বংশ ধরে এই ব্যবস্থা মেনে চলবে। আমার এই যে ব্যবস্থা, যার চিহ্ন হিসেবে তোমাদের প্রত্যেকটি পুরুষের খৎনা করাতে হবে, তা তোমার ও তোমার বংশের লোকদের মেনে চলতে হবে। তোমাদের প্রত্যেকের পুরুষাঙ্গের সামনের চামড়া কেটে ফেলতে হবে। তোমার ও আমার মধ্যে এই যে ব্যবস্থা স্থির করা হলো, এটাই হবে তার চিহ্ন। বংশের পর বংশ ধরে তোমাদের প্রত্যেকটি পুরুষ সন্তানের জন্মের আট দিনের দিন এই খৎনা করাতে হবে। তোমার বংশের কেউ না হয়ে তোমার বাড়ির গোলাম হলেও তাদের সবাইকে এই খৎনা করাতে হবে তা তারা তোমার বাড়িতে জন্মেছে এমন কোনো গোলামের সন্তানই হোক বা টাকা দিয়ে বিদেশীর কাছ থেকে কিনে নেওয়া গোলামই হোক।"

কোরআনে বারবার গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, যেন মুসলমানরা হজরত ইব্রাহিমের খাঁটি ধর্মকে অনুসরণ করে। যদিও মুসলমানরা তাঁদের ছেলেদের একটু বড় হলে - ৩-৬ বছরের মধ্যে খৎনা করেন, এতে মনে হতে পারে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র দেওয়া স্পষ্ট হুকুম লংঘন করছেন। এই কথা বলার কারণ হচ্ছে, হজরত ইব্রাহিমকে জন্মের আট দিনের দিন তাঁর পুত্রকে খৎনা করানোর জন্য আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন।

মনে-মনে যদি আমরা কল্পনা করি যে, দুই দল মুসলমান একদলের সাথে আরেকদল তর্ক করছে। একদল বলছে, "আমরা আট দিনের দিন খৎনা করাবো; কারণ, আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমকে তা করানোর জন্য হুকুম দিয়েছেন।" -আর অন্যরা বলছে, "না! এর কোনো দরকার নেই।" এটি হচ্ছে আদি জামাতের সংঘাতের একটি অসম্পূর্ণ উদাহরণ। এটি অসম্পূর্ণ এই কারণে বলছি যে, আদি জামাতের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে আরো বেশী মতের অমিল ছিল।

আমরা কি আমাদের চেষ্টার দ্বারা বা তওরাতে দেওয়া শরীয়ত পালন করে বা কোরআনে দেওয়া শরীয়ত পালন করে নাজাত পাই। অথবা আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র অনন্য রহমতে নাজাত পাই। যিনি মসীহের মাধ্যমে আমাদের সব পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন?

এপোক্রিফা বা অ-প্রামান্য কিতাবসমূহ

সবশেষে, আমরা অবশ্যই ডঃ বুকাইলির উল্লেখিত তৃতীয় পয়েন্ট যা তিনি অ-প্রামান্য কিতাবসমূহের সম্পর্কে বলেছেন যাদেরকে তিনি এপোক্রিফা কিতাব বলেছেন, তা নিয়ে আমরা

আলোচনা করবো। এই শব্দটি গ্রীক শব্দ এপোক্রিফাস থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে, গোপন। ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, এই কিতাবগুলোকে "এপোক্রিফা" বলা হয়; কারণ, জামাত এই কিতাবগুলোকে গুম করে ফেলেছিল। ৭৬ পৃষ্ঠায় টিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

> "এসব রচনা পরবর্তীকালে 'এপোক্রিফা' নামে শ্রেণীভুক্ত করা হয়, এপোক্রিফার অর্থ হলো, বিলুপ্ত বা বাতিল। উল্লেখ্য যে, পৌলীয় খ্রীষ্টান মতবাদ জয়যুক্ত হলে এসব পুস্তক **গুম** করে ফেলা হয়— ।"

ডঃ বুকাইলি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, এপোক্রিফা শব্দের মূল অর্থ গোপন, কিন্তু আবারও তিনি মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন যে, ব্যবহারের ভিত্তিতেও শব্দের অর্থ নির্ণয় করা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এপোক্রিফস (গোপন) শব্দটি একদল লোক যারা নিজেদের নষ্টিক বলতো, তাদের বইয়ে ব্যবহার করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাঁদের লেখা একটি বইয়ের নাম হচ্ছে, "এপোক্রেফন অব জন" বা সিক্রেট অব জন। নষ্টিকরা নিজেদেরকে এপোক্রিফাল বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবী করত। আর এই জ্ঞান অন্যদের কারও কাছে ছিল না; আর জ্ঞানের দ্বারাই নাজাত পাওয়া যায়। এটি নষ্টিক জ্ঞান প্রকাশকারীর (সাধারণতঃ ঈসা মসীহ্) নিকট থেকে আসে, তবে অন্য জ্ঞান প্রকাশকারীও হতে পারে।

খ্রীষ্টানিটি ও ইসলামের তুলনায় নষ্টিক বইসমূহে সৃষ্টিকর্তাকে ঠাট্টা করে অন্ধ বলেছে। আরও একটি মহত্তর পবিত্র আল্লাহ্ সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা সচেতন নন। *এপাক্রিফন অব জন* কিতাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ দুর্বল এবং তিনি পাগলামীর কারণে অপবিত্র; কারণ তিনি বলেছেন, "আমি আল্লাহ্ আর কেউ নয়" (সূত্র ইশাইয়া ৪৬:৯)। কারণ, তিনি তাঁর শক্তি সম্পর্কে জানেন না।[৬] তিনি কোথা থেকে এসেছেন তাও জানেন না। পরবর্তীকালে চতুর্থ শতাব্দীতে এই এপোক্রিফা শব্দটি দ্বারা এমন কিতাবগুলোকে বুঝাতো, যে-কিতাবগুলো জামাতে লোকদের সামনে পাঠ করা হতো না। এর মানে এপোক্রিফার - আধুনিক অর্থ (অর্থাৎ কাল্পনিক) কেবলমাত্র ভাবার্থ দ্বারা বুঝা যায়, জামাতের ঐতিহাসিক ইউসুবিয়াস কিছু কিছু তথাকথিত গোপন (এপোক্রিফাল) কিতাবসমূহের উল্লেখ করেছেন যেগুলো জাল-কিতাব ছিল, এগুলো ভ্রান্তবিশ্বাসীদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। [৭]

এই কথা বলা যায় যে, ডঃ বুকাইলির বক্তব্যের পক্ষে কম করে বললেও একজন সাক্ষীও নেই, যিনি বলবেন, এই কিতাবগুলোকে জামাত গুম করা হয়েছে বলে, এই কিতাবগুলোকে এপোক্রিফা কিতাব বলা হয়।

---

[৬] Apocryphon of John of Nag Hammadi Codex II, page 11, lines 18-22, quoted from a review of The Gnostic Gospels by Elaine Pagels, Random House.

[৭] *Encyclopedia Britannica,* 15th Ed, 1982, vol 2, p 973 থেকে নেয়া হয়েছে

জুডিও-খ্রীষ্টানদের এপোক্রিফাল কিতাবের উদাহরণ

এই বিষয়ে এই কথা তুলে ধরা দরকার যে, **জামাত এই কারণে কোনো কিতাবকে এপোক্রিফা বলেনি যে, এই কিতাবগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে ইসলামের চিন্তাধারা মিল রয়েছে।** এটি আসলে মূল-বিষয় নয়।

(ক) **জুডিও-খ্রীষ্টান নামক "গসপেল অব পিতর** (পিতরের সুখবর)" কিতাবে স্পষ্টভাবে দাবী করা হয়েছে, ঈসা মসীহ্ হলেন আল্লাহ্‌র কালাম, যিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে জীবন কোরবানী দিয়েছেন। জামাত এই কিতাবকে প্রামাণ্য কিতাব হিসেবে গ্রহণ করেনি এই কারণে যে, সবার আগে বলতে হয় যে, এই কিতাব হজরত পিতর লেখেননি। দ্বিতীয়তঃ **ঈসা মসীহ্ যে একজন সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন, তা এই কিতাবে অস্বীকার করা হয়েছে।** এখানে বলা হয়েছে, তিনি যখন ক্রুশে ছিলেন, তখন তিনি কোনো ব্যথা পাননি।[৮] এই জাল সুখবর কিতাব সম্পর্কে ড্যানিয়েলু লিখেছেন, "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মসীহের খোদায়ী বৈশিষ্ট্যকে উদ্ধতভাবে ছুঁড়ে ফেলা" ।[৯] অবশ্যই ইসলাম এই মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না!

"এক্টস অব পৌল" নামে আর একটি কিতাব রয়েছে, এই কিতাবে খ্রীষ্টীয় মতবাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ্ আমাদের পাপের জন্য জীবন কোরবানী দিয়েছেন। কিন্তু এই কথাও বলা হয়েছে, "তুমি নিজের চরিত্র নষ্ট করলে, এবং নফস্ দ্বারা নিজেকে অপবিত্র করলে তুমি নাজাতে অংশ নিতে পারবে না।" তাদের কাছে এর অর্থ ছিল, **এমনকি বিয়ে করলেও কেউ যৌনমিলনে অংশ নিতে পারবে না।** জামাত এই ভ্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করেনি; কারণ, এটি খ্রিষ্টীয় শিক্ষার একবারে উল্টো কথা বলেছে। (একইভাবে এটি কোরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধেও বলেছে। আর এই কিতাবের লেখক নিজেই স্বীকার করেছে যে, তাঁর কিতাব ছিল জাল। পরে তাকে মিথ্যা বলার জন্য জামাত থেকে বের করে দেওয়া হয়।[১০] এমনকি বিবাহিত হলেও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ **অন্যান্য জুডিও-খ্রীষ্টান কিতাব যেমন, "গসপেল অব থমাস" এবং "গসপেল অব ইজিপসিয়ান" কিতাবে পাওয়া যায়।** [১১]

সবশেষে, আমি **জুডিও-খ্রীষ্টান কিতাব "এপিসল অব বার্ণবাস"** বা বার্ণবাসের পত্র সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই কিতাবটি ১২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল। এই কিতাবটিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর খ্রীষ্টানেরা খুবই সম্মানের চোখে দেখতেন। এই কিতাবে ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে খুবই ধর্মসম্মত শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এই কিতাবকে এপোক্রিফা কিতাব হিসেবে ঘোষণা করার কারণ হলো, প্রথমতঃ এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, হজরত বার্ণবা এই কিতাব লিখেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই কিতাবে বলা

---

[৮] *International Standard Bible Encyclopedia,* (ISBE), Eerdmns, Grand Rapids, 1955, p. 197.

[৯] *Daniélou,* ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২১

[১০] ISBE, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-১৮৮-১৯০

[১১] *Daniélou,* ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২৪

হয়েছে, **হজরত মূসার শরীয়ত হচ্ছে শয়তানের ইচ্ছা।**[১২] এই শিক্ষা ঈসা মসীহের বাণী অস্বীকার করেছে। আর **এই কথা কোরআনের বাণীও অস্বীকার করেছে।**

জুডিও-খ্রীষ্টানদের প্রতিটি কিতাবের উল্লেখ ডঃ বুকাইলি বলেছেন আর এর পাশাপাশি তিনি ড্যানিয়েলুর মন্তব্য তুলে ধরেছেন। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, যদিও বেশীরভাগ এপোক্রিফা কিতাবে মসীহ্ সম্পর্কে প্রচুর ধর্মসম্মত শিক্ষা রয়েছে, কিন্তু জামাতে এই কিতাবগুলো পাঠ না করার কারণ হচ্ছে, এগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাস শিক্ষা দেয় এবং এগুলো ঈসা মসীহের সাহাবীদের দ্বারা লেখা হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

যইফ বা দুর্বল হাদিস

আপনারা -মুসলমানরা কি হাদিস নিয়ে একই সমস্যায় পরেন না? আমরা এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিখেছি যে, ঈমাম আল-বোখারী ৬লাখ হাদিস নিয়ে তাঁর হাদিস সংকলনের কাজ শুরু করেন। পরে যাঁচাই করে দেখেন যে, এদের মধ্যে ২৭৬২ টি হাদিস প্রামাণ্য বা সহি হাদিস বলে সনদপ্রাপ্ত। একটি হাদিসকে যখন দুর্বল বা যইফ বলে ঘোষণা করা হয় তখন সেই হাদিস সম্পর্কে আপনি কি বলবেন না, "আমি আসলে বিশ্বাস করি না যে এই হাদিসটি হজরত মুহাম্মদ বা তাঁর একজন সাহাবী বর্ণনা **করেছেন।" হতে পারে এই হাদিসে সঠিক শিক্ষা রয়েছে, কিন্ত আপনার সন্দেহ হচ্ছে যে, এটি সনদপ্রাপ্ত কি -না? যখন আমরা খ্রীষ্টানরা এপোক্রিফা বা অপ্রামান্য কিতাব বলি, তখন আমরা এই কথাটি বুঝাতে চাই।**

সিদ্ধান্ত

ডঃ বুকাইলি উল্লেখিত তিনটি পয়েন্ট নিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, আমরা দেখেছি যে, এগুলো দুর্বল যুক্তি বলে বাতিল করা যায়। **এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, প্রথম শতাব্দীর সংঘাত যে কোনোভাবে তাঁর নবী ও প্রেরিতদের পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পাক-রূহের ক্ষমতা সীমিত করেছিল।** সবার ওপরে এই কথা সত্য যে, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, মানুষ কি তাঁর হুকুম ও কালাম পরিবর্তন করতে পারে?

তাছাড়া, ডঃ বুকাইলির তত্ত্ব কোরআনের শিক্ষার বিরোধীতা করে। আমরা দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি যে, ৩ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আল-সাফ (শ্রেণী) ৬১:১৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "অতঃপর বনি- ঈসরাইলদিগের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। পরে আমি মুমিনদিগকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদিগের শত্রূদিগের মোকাবিলায়;ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।"

---

[১২] *Early Christian Writings,* Penguin Books, Baltimore, 1972, p 190 & 205.

এছাড়াও আরো বলা যায় যে, আমরা অষ্টম হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-হাদিদ (লোহা) ৫৭:২৭ আয়াতে বলা হয়েছে, ইহুদী-খ্রীষ্টানিটি শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক দিন পরে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে সন্নাসবাদের শুরুতেও খাঁটি খ্রীষ্টানদের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং, **কোরআনের মত অনুসারে খ্রীষ্টান ধর্ম যা সাফল্যের সাথে লড়াই করে টিকতে সক্ষম হয়েছে, তা প্রথম শতাব্দীর সংঘাতের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না।** যেভাবে ডঃ বুকাইলি ইংগিত দিয়েছেন, তা আদৌ সত্য ছিল না।

কোরআন নাজিল হওয়ার সময়ে সংঘাত

আমরা যদি এই ধারণা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি যে, সংঘাত ও বিরোধীতা ওহীকে মিথ্যা বানাতে পারে, তাহলে কোরআন সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? যখন কোরআন দেওয়া হয়েছিল, তখনকি মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত ছিল না? মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে কি সংঘাত ছিল না? হজরত মোহাম্মদের সাথে যে সব মুসলমান নিজেদের নবী দাবী করেছিল, তাদের মধ্যে কি সংঘাত ছিল না? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। মক্কাবাসীদের সাথে সংঘাতের কথা কি কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি? সূরা আল-ইমরানের ৩:১২৩ আয়াতে বদরের প্রান্তরে মক্কাবাসীদের সাথে হজরত মোহাম্মদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

> "এবং বদরের যুদ্ধে তোমরা তো হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

আর একই সূরার ৩:১৪০-১৪৩ আয়াতে উহুদের যুদ্ধে যা ঘটেছিল তার জন্য নবীকে তিরষ্কার করেছেন, এবং বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং হজরত মোহাম্মদের সাথে ইহুদীদের সাথে সংঘাতের বিষয়ে কী বলা হয়েছে? দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, কমপক্ষে ৪০টি অনুচ্ছেদে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের সংঘাতের বিষয়ে বলেছে। মক্কী যুগের শেষের দিকে নাজিল হওয়া সূরা সূরা আনআম (গবাদি পশু) ৬:১২৪ আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট। এখানে আমরা পড়ি যে, ইহুদীরা নবীকে একটি চিহ্ন দেখানোর জন্য অনুরোধ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে,

> "যখন তাহাদিগের নিকট কোনো নিদর্শন তাহারা তখন বলে, "আল্লাহ্র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো বিশ্বাস করিব না।"

হজরত মুহাম্মদ ও যাঁরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করতেন, তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ধরনের সংঘাত ছিল। আদি খ্রীষ্টান জামাতের লোকদের সাথে ইহুদীদের সংঘাতের সাথে এর কিছুটা মিল রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মুসায়লামা একজন নেতা হিসেবে, তার গোত্রের লোকজন নিয়ে নবম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেছিল। এর পরের বছরেই একমাত্র আল্লাহ্র সত্য নবী হিসেবে সে নিজেকে দাবী করে। সে কোরআনের অনুরূপ ওহী প্রকাশ করাও শুরু করে। আবু-ই-ফরজ তার এই ওহী উদাহরণ হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন। এই ওহীতে বলা হয়েছে,

> "আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হয়ে তাকে একটি সন্তান দিয়েছেন, আর তাকে বের করেছেন, তার প্রাণ দেহের অভ্যন্তরে হৃদপিণ্ডের পর্দা ও দেহের অভ্যন্তরের মাঝখানে রয়েছে।"

হজরত মোহাম্মদের কাছে চিঠি লেখার সময়ে সে নিজেকে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে ঘোষণা করে লিখেছিল, “মুসায়লামা-আল্লাহ্‌র রাসুলের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র রাসূল হজরত মোহাম্মদের প্রতি—” । এই চিঠির উত্তরে হজরত মুহাম্মদ তাকে “মিথ্যেবাদী মুসায়লামা” বলেছেন।

এ’সত্ত্বেও মুসায়লামা ধীরে ধীরে তার প্রভাব বৃদ্ধি করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার কাজের সমাপ্তি ঘটে। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর এক বছর পরে ১১ হিজরীতে সেনাপতি খালেদের হাতে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়।[১৩]

এর অর্থ এই নয় যে, এসব সংঘাতের কারণে কোরআন পরিবর্তিত হয়েছিল। অথবা এই কারণে ওহী দুর্বল হয়েছিল বা জাল করা হয়েছিল। কোনো মুসলমানই এটি স্বীকার করবেন না। প্রকৃতপক্ষে কোরআন এর উল্টোটা বলে! কোরআন বলে যে, মানুষের কাছে নবীদের পাঠানোর পরে সব সময়ে সংঘাত ও বিরোধিতা ছিল। হতে পারে তা হজরত মূসা ও বনি-ইসরাইল জাতির মাঝে, অথবা সালেহ ও সামুদ জাতির মাঝে ছিল।

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে ইসলামে সংঘাত

সেই সময়ে কেবল মোসায়লামা একমাত্র নবুয়তের দাবিদার ছিলেন না। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে পরেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনজন ভণ্ড নবী ও একজন ভণ্ড মহিলা-নবী এসময়ে তাদের প্রচার কাজ শুরু করে। আরব উপদ্বীপের উত্তরে, পূর্ব, দক্ষিণে গোত্রের পর গোত্র নতুন গৃহিত কালেমা পরিত্যাগ করে আর মদিনা শহর আক্রমণ করেছিল।[১৪] এই ক্রান্তিকালীন সময়ে হজরত যায়েদ বিন সাবিতকে খলিফা হজরত আবু বকর প্রথম কোরআন সংকলনের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

যদি সুখবর সিপারাগুলো সম্পর্কে ডঃ বুকাইলির মন্তব্য সঠিক হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই ধরে নেব যে, এসব ভণ্ড-নবী, যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ কোনো না কোনো ভাবে কোরআন সংকলনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও আমাদের আক্ষেপ করা উচিত, মুসায়লামা ও অন্যান্য নবীর বাণী গুম করার জন্য, যে বাণীগুলোকে মুসলমানরা এপাক্রিফা বলেছে। যদিও এই বাণীগুলোর ঐতিহাসিক মনোযোগ আকর্ষণকারী বিষয় রয়েছে।

পরর্বর্তী বছর গুলোতে অন্য ধরনের সংঘাত দেখা যায়। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর পারসীক ক্রিতদাস ফিরোজের হাতে ২৩ হিজরীতে শহীদ হয়েছিলেন। আর হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর ২৫ বছরের মধ্যেই ৩৫ হিজরীতে অসন্তুষ্ট মুসলমানরা তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের প্রধান কার্যালয়ে প্রবেশ করে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করেন।

---

[১৩] ওপরে উল্লেখিত বই, Hughes, পৃষ্ঠা-৪২২

[১৪] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৬৫১

হজরত আলী -নবীর জামাতা, তাঁকে যখন খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছিল। তখন অনেকেই এই মনোনয়নের বিরোধিতা করেছিলেন। বিবি আয়েশা -নবীর বিধবা স্ত্রী, হজরত তালহা ও হজরত যুবায়ের নামক দুইজন সাহাবীকে নিয়ে হজরত আলীকে পদচ্যুত করার জন্য সৈন্য যোগাড় করে সেনাবাহিনী গঠন করেন। ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে- ৩৫ হিজরীতে হজরত আলীর সেনাবাহিনী তাঁদের দমন করার জন্য বের হয়ে আসে। এই প্রথমবার মুসলমান সেনাবাহিনী তাদের মুসলমান ভাইদের দ্বারা গঠিত বেসামরিক বিদ্রোহকে দমন করার জন্য নিয়োজিত হয়। কয়েকমাস পরে উটের যুদ্ধে হজরত আলী তৃ-পক্ষীয় সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। হজরত তালহা ও হজরত যুবায়েরকে মেরে ফেলা হয় এবং হজরত আয়েশাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই সংঘাতের আবেগময় দিকটি বুঝা যেতে পারে যদি আমরা জানি যে, এই লোকদের সাথে নবীর কী সম্পর্ক ছিল?

হজরত আলী হজরত মোহাম্মদের চাচাতো ভাই ছিলেন। হজরত মুহাম্মদ পরে তাঁকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। হজরত আলী ছিলেন, প্রথম দিকের মুসলমানদের মধ্যে একজন। পরে তিনি হজরত মোহাম্মদের মেয়ে হজরত ফাতিমাকে বিয়ে করেন।

হজরত যুবায়েরও ছিলেন হজরত মোহাম্মদের চাচাতো ভাই। তিনিও প্রথম যুগের ইসলাম কবুল করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সেই দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন। এই দশজনকে বলা হয়েছে, আশারা-আল- মুবাশ্বেরা অর্থাৎ এই দশজন সম্পর্কে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁরা অবশ্যই বেহেস্তে যাবেন।

হজরত তালহা, প্রথম খলিফা আবু বকরের ভাতিজার ছেলে। তিনি নবীর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। (সাহাবীর অর্থ যাঁরা হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে নিজের চোখে দেখেছেন, ইসলাম গ্রহণ করে নবীর সাথে-সাথে ছিলেন।) তিনি উহুদের যুদ্ধে হজরত মোহাম্মদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন আশারা-আল-মুবাশ্বেরার একজন- যাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা অবশ্যই বেহেস্তে যাবেন।[১৫]

হজরত আলী নিজেই ৬৬১খ্রীষ্টাব্দে একজন খারিজীর হাতে শহীদ হন। এই খারেজিরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

এই ছোট্ট ইতিহাস দেখায় যে, প্রাথমিক যুগের ইসলামের ইতিহাসে সংঘাত ও বিরোধীতা ছিল। কিন্তু শিয়াদের দাবী বিবেচনা না করলে, **কোনো মুসলমান কি স্বীকার করবেন যে, এই ধরনের সংঘাত থাকার কারণে কি কোরআন পরিবর্তন হয়েছে?**[১৬] অবশ্যই না! এই ধরনের মন্তব্যকে হাস্যকর বলে ধরা হবে।

---

[১৫] ওপরে উল্লেখিত তথ্যগুলো নেয়া হয়েছে এই বই থেকে, Hughes, পৃষ্ঠা-৭১৬,৬২৬ও ১৩

[১৬] শিয়ারা মনে করেন যে, নে সব আয়াতে হজরত আলীর প্রথম খলিফা হওয়ার কথা ছিল, সেই সব আয়াতগুলো কোরআন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তবে এ স্বপক্ষে কোন দালিলীক প্রমাণ নেই হজরত আলী যখন খলিফা হয়েছিলেন, এবং কোরআনে তা অন-র্ভূক্ত করতে পারকেন, তখন তিনিও তা করেননি।

তাহলে কীসের ভিত্তিতে ডঃ বুকাইলি বা অন্য কেউ বলতে পারেন যে, যদিও হজরত পৌল, হজরত পিতর বা হজরত ইয়াকুবের সময়ে প্রাথমিক জামাতের মধ্যে সংঘাত ও মতবিরোধ ছিল, কিন্তু সেই সময়েও পাক-রূহ্ তাঁদের পরিচালনা করতে পারেননি।

কোরআন বিকাশের বিষয়ে সারকথা ও সিদ্ধান্ত

আমরা এতক্ষণ কোরআনের ঐতিহাসিক বিকাশ নিয়ে নিরপেক্ষভাবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। আমরা হিজরতের ১৩ বছর আগে হজরত মোহাম্মদের প্রথম প্রচার থেকে শুরু করে শেষে ১৫০ হিজরীতে সংকলিত কোরআনের সবচেয়ে পুরানো পাণ্ডুলিপি দেখেছি। কোরআনের বিকাশের এই অগ্রগতি সহজে বুঝার জন্য আমরা রেখাচিত্র-৩-এর সাহায্যে তা সংক্ষেপিত আকারে দেখিয়েছি।

রেখাচিত্র -৩ কোরআনের ঐতিহাসিক বিকাশ

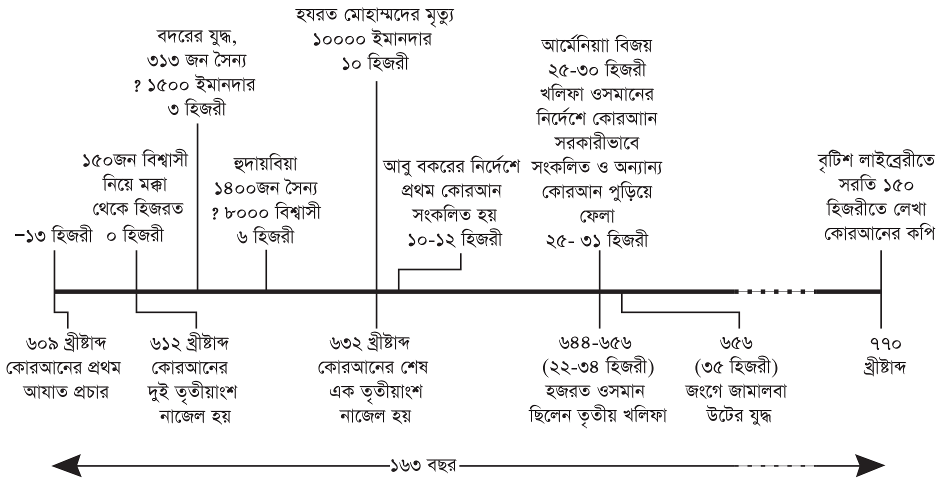

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয় কোরআনের সংকলন ও প্রচার সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাসকে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে।

যদিও আপনার হাতে কোনো মূল পাণ্ডুলিপি নেই, তবু আপনি বিশ্বাস করেন যে, হজরত যায়েদ বিন সাবিত কিংবা হজরত ওমর কোরআন যেভাবে নাজিল হয়েছিল, তাঁরা সেভাবেই সংগ্রহ করেছেন। আপনি বিশ্বাস করেন যে, হজরত ওসমান কোরআনের মূল অনুলিপি পোড়ানোর সময়ে যদি কিছু হারিয়ে গিয়ে থাকে এমনকি “পাথর মারার” আয়াত সম্পর্কে এবং দুটো অতিরিক্ত সূরার বিষয়ে হযরত ওমর এবং হজরত ওবাই সঠিক ছিলেন, তবু ইসলামের কোনো মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি কোনো প্রভেদ সৃষ্টি করে না।

আপনি বিশ্বাস করেন যে, যে সব কাতেবে ওহীরা কোরআনের অনুলিপি তৈরি করেছেন, তাঁরা সযত্নে তা করেছেন এবং কাতেবে ওহীরা যেহেতু মানুষ ছিলেন তখন তাঁদের দ্বারা সংঘটিত কোনো ভুল অন্য পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা করে সংশোধন করা যেত।

আপনি বিশ্বাস করেন যে, ঈমাম মুসলীম ও ঈমাম বোখারী সংগৃহিত হাদিসগুলো যা হজরত মোহাম্মদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ও কোরআনের সংগ্রহ সম্পর্কে বলেছে তা মৌলিকভাবে সত্য, আর তাই এইগুলোর ওপর নির্ভর করা যায়।

আপনি বিশ্বাস করেন যে, সেই সব খাঁটি মুসলমানরা কেবলমাত্র তাঁদের টাকা-পয়সা, সময় শুধু দেননি, এমনকি ইসলামের জন্য তাঁরা তাঁদের জীবন দিতে প্রস্তত ছিলেন।

সারকথা এই যে, বিশ্বস্তভাবে কোরআন প্রচার করা সম্পর্কে এত বেশী প্রমাণ রয়েছে যে, আপনি এতই নিশ্চিত যে, আপনি আস্থার সাথে তা ব্যবহার করতে পারেন।

ঙ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিলের বিকাশ

ঈসা মসীহের প্রথম প্রচারের সময় থেকে শুরু করে হজরত ইউহোন্না লিখিত সর্বশেষ সুখবর সিপারা লেখার সময়কাল (৮০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) পর্যন্ত আমরা এমন কোনো প্রমাণ পাইনি যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে রদবদল করা হয়েছে বা এতে মিথ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের ক, অংশে ছবি-১ এবং এই অংশে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে লিখিত পেপিরাসের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপি ছবি-৫ দেখানো হয়েছে। আমাদের বর্তমানে যে সুখবর-নতুন নিয়ম রয়েছে, এর ৪০% এই দুটো দলিলের মধ্যে আছে। আর ইংরেজী, ফরাসী, আরবী ভাষায় নতুন নিয়ম যা আমরা প্রতিদিন পড়ছি, তা এসব পেপিরাস কাগজে লেখা গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

পেপিরাসে লেখার এই সময়কাল হচ্ছে, ৯০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়কালের মধ্যে যখন তত্ত্বীয়ভাবে সুখবর-নতুন নিয়মে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে; সুতরাং, আমরা এখন এই সময়কালের ঘটনাবলি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবো।

প্রেরিত পরবর্তীকালীন সাক্ষ্য

রোমের ক্লিমেন্ট -৯৬ খ্রীষ্টাব্দ

এই অধ্যায়ের ক অংশে আমরা দেখেছিলাম যে, ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১ করিন্থীয় সিপারা লেখা হয়েছিল। এর চল্লিশ বছর পরে ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বিশপ ক্লিমেন্ট করিন্থ শহরের লোকদের কাছে হজরত পৌলের মতোই একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

> "তোমরা ধন্য, প্রেরিত হজরত পৌলের লেখা সিপারাটি আবার পড়ো।"[১]

ক্লিমেন্ট কোন চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন? তিনি ১ করিন্থীয় সিপারার কথা উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিতেই যথাযথভাবে প্রথম বারের মতো **ইঞ্জিল শরীফের মতবাদ** লেখা হয়েছিল। তিনি ১ করিন্থীয় ১৫:২০ আয়াত উল্লেখ করে বলেছেন,

> "আল্লাহ্ ঈসা মসীহকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠা লোকদের মধ্যে প্রথম ফল করেছেন।"[২]

---

[১] Epistle of Clement to Corinth, *Early Christian Writings,* ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৪৮, সেকশন ৪৭

[২] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৩৬, সেকশন ২৪

১ করিন্থীয় সিপারা থেকে দেওয়া উদ্ধৃতিগুলোর পাশাপাশি তিনি **জুডিও- খ্রীষ্টানদের সুখবর মথি** সিপারার আক্ষরিক অনুবাদের পাশাপাশি নতুন নিয়মের আরো পাঁচটি সিপারা যেমন, ১ পিতর, ইয়াকুব, ইবরানী ও হজরত পৌলের লেখা রোমীয় ও ইফিষীয় সিপারা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এটা স্বাভাবিক যে, তিনি রোমীয় সিপারার কথা জানতেন। কারণ, এই সিপারা রোম নগরের জামাতের লোকদের কাছে লেখা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সিপারাগুলো গ্রীসের (বর্তমান তুরস্ক) অন্যান্য শহরের জামাতের লোকদের কাছে লেখা হয়েছিল। এই তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আদি জামাতের বিশ্বাসীদের কাছে ইঞ্জিল শরীফের সিপারাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, যেভাবে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কাছে কোরআনের নুতন সূরা ও আয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

আরো বলা যায় যে, আমরা ওপরে উল্লেখিত কিতাবের উদ্ধৃতি থেকে জানি যে, ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হজরত পৌলের এই চিঠি লেখার সময় থেকে ৪০ বছর পরে যখন ক্লিমেন্ট এটি উদ্ধৃত করেন এই সময়ের মধ্যে ইঞ্জিল শরীফের **মতবাদগত শিক্ষার** মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

ফিলিপীয় জামাতের কাছে হজরত পলিকার্পের চিঠি-১০৭ খ্রীষ্টাব্দ

হজরত পলিকার্প ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াতে (কর্তমান তুরস্ক) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহাবী হজরত ইউহোন্নার কাছে সুখবর শুনেছিলেন। এইসময়ে, হজরত ইউহোন্না বৃদ্ধ বয়সে তুরস্কে বাস করছিলেন। আলেম ইরেনিয়াস বলেছেন যে, “যাঁরা মসীহকে দেখেছিলেন, হজরত ইউহোন্না তাঁদের সাথে অনেক অন্তরঙ্গ আলাপ করেছেন।[৩] পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি স্মূর্ণা নগরীর বিশপ হয়েছিলেন। এই নগরী ইফিষ শহর থেকে ৪০ মাইল উত্তরে ছিল। স্মূর্ণা নগরীটি আজো আছে। বর্তমানে এই নগরীর নাম ইজমির। লোক সংখ্যা দুই লাখের মতো। প্রায় ১০৭ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কোনো এক সময়ে, তিনি ফিলিপি শহরের জামাতের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই জামাতটি ৪৯ বা ৫০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত পৌলের প্রচারের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল।

হজরত পলিকার্প তাঁর লেখা চিঠিতে লিখেন, “প্রেরিতেরা যাঁরা আমাদের কাছে সুখবর নিয়ে এসেছেন। আর নবীরা প্রভুর (মসীহ) আগমনের কথা বলেছেন।” কমপক্ষে তিনবার তিনি হজরত পৌলের নাম উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি এই সত্যের ওপর জোর দিয়েছেন যে, হজরত পৌল ফিলিপী শহরের লোকদের কাছে প্রচার করেছেন আর তাঁদের কাছে চিঠি লিখেছেন। তিনি ইফিষ শহরের জামাতের কাছে হজরত পৌলের চিঠিকে আল্লাহ্‌র কালাম বা পাক-কিতাব বলেছেন- একইভাবে হজরত মূসার শরীয়ত-’তৌরাত’তেও পাক-কিতাব বলা হয়েছে, যা আমরা নিম্নের উদ্ধৃতিতে লক্ষ্য করি:

> “আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমরা পাক-কিতাব ভালোভাবে জানো।-- এটি বলে যে, যদি রাগ করো, তবে রাগের দরুন পাপ করো না। সূর্য ডুবার আগেই তোমাদের রাগ ছেড়ে দিয়ো (ইফিষীয় ৪:২৬ আয়াত থেকে)। সুখী লোক সে, যে তাঁর মনে রাখে, — **আল্লাহ্ এবং আমাদের**

[৩] Haer, iii 3,4

> **প্রভু ঈসা মসীহের পিতা এবং অনন্তকালীন মহা-ঈমাম ঈসা মসীহ্ -ইবনুল্লাহ** নিজে ঈমানে ও সত্যে তোমাদের বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করুন।[8]
>
> তাঁর (ঈসা মসীহ) মধ্যে ধৈর্য্য এতো বেশী ছিল যে, তিনি এমনকি আমাদের পাপের জন্য জীবন কোরবানী দিলেন।—যদিও তোমরা নিজের চোখে তাঁকে দেখোনি, তবু তোমরা এই কথা ভালোভাবে জেনে তাঁর ওপর ঈমান এনেছো যে, *আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছো। এটা তোমাদের কাজের ফল হিসেবে দেওয়া হয়নি* (ইফিষীয় ২:৮ আয়াত থেকে উদ্ধৃত)।[৫]

গাঢ় অক্ষরে লেখাগুলো দেখায় যে, তিনি দৃঢ়ভাবে ইঞ্জিল শরীফের শিক্ষায় বিশ্বাস করতেন। সাত পৃষ্ঠার এই ছোট্ট চিঠিতে তিনি হজরত মথি লিখিত সুখবর, প্রেরিত, রোমীয়, ১ করিন্থীয়, গালাতীয়, ২ থিষলনিকীয়, ১ তীমথিয়, ১ পিতর, ১ ইউহোন্না সিপারার পাশাপাশি তিনি ইফিষীয় সিপারা থেকেও আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ নতুন নিয়ম-ইঞ্জিল শরীফের ২৭টি কিতাবের মধ্য থেকে তিনি ১০টি কিতাব থেকে আয়াত উদ্ধৃত করেছেন।

এই ১০টি কিতাব যেখানে লেখা হয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে প্যালেষ্টাইন, তুরস্ক, গ্রীস ও রোমের জামাতের লোকদের কাছে এই চিঠি লেখা হয়েছিল। আর ঈমাম পলিকার্পের কাছে এই আয়াতগুলো সুপরিচিত ছিল। এই তথ্য থেকে আবারও প্রমাণিত হচেছ যে, প্রেরিত হজরত ইউহোন্নার মৃত্যুর ১০-১৫ বছরের মধ্যেই দ্রুত বিসৃতর্ণ এলাকা জুড়ে নতুন নিয়মের সিপারাগুলোর তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল।

Pliny the Younger -১১২ খ্রীষ্টাব্দ

এই শেষের জন: যাঁর কথা এখন আমরা বলছি, সেই প্লিনি দি ইয়ংগার একজন রোমীয় ঐতিহাসিক ছিলেন। ১১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিথুনিয়া প্রদেশের (উত্তর তুরস্ক) গভর্ণর ছিলেন। তিনি সম্রাট ট্রজানের কাছে পরামর্শ চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি চিঠিতে অভিযোগ করে লিখেছিলেন,

> "কদাচিৎ কোনো কোনো লোক রোমীয় দেবতার (মূর্তি) কাছে পশু কোরবানী করে। আর খ্রীষ্টানদের জন্য মন্দিরও সংষ্কার করা যাচ্ছে না। যাঁরা সম্রাটের মূর্তির কাছে পশু কোরবানী করত না, তিনি তাঁদেরকে মেরে ফেলা শুরু করেছিলেন।"[৬]

একজন মূর্তিপূজারীর এই সাক্ষ্যের মধ্যে গাঢ় অক্ষরের শব্দগুলো দেখায় যে, খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিল শরীফের শিক্ষার ওপর তাঁদের বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। এমনকি তাঁদের বিশ্বাসের জন্য তাঁরা মরতেও প্রস্তুত ছিলেন।

---

[8] *Early Christian Writings,* Polycarp, op.cit., p 149, section 12.

[৫] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৪৪, সেকশন ১

[৬] Pliny the Younger, Epistles, X, 96.

সুখবর-নতুন নিয়মের কতগুলো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

পেপিরাসের ওপর লেখা ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হজরত ইউহোন্না লিখিত ইঞ্জিল শরীফের অনুলিপি

পেপিরাসের ওপর লেখা ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হজরত ইউহোন্না লিখিত ইঞ্জিল শরীফের অনুলিপির অংশবিশেষ হচ্ছে, নতুন নিয়মের যে কোনো কিতাবের সবচেয়ে পুরানো পাণ্ডুলিপি। এর সংখ্যা হচ্ছে, পি ৫২, এটি বর্তমানে ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারের জন রিলেন্ড লাইব্রেরীতে রয়েছে। ছবি-৪ থেকে আপনি তা দেখতে পারেন। এটি আকারে খুব ছোট আর এখানে ইউহোন্না সিপারার ১৮:৩১-৩৩ আয়াতের কয়েকটি শব্দ একপাশে রয়েছে আর অন্যপাশে ৩৭-৩৮ আয়াতের কয়েকটি শব্দ রয়েছে।

অবশ্য, এই লেখার সময়কাল এবং যে জায়গায় এটি পাওয়া গিয়েছিল, এই দুটো কারণে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রিন্সটন থিওলজিকাল সেমিনারীর নিউ টেষ্টামেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ও লিটারেচার এর অধ্যাপক ড. ব্রুস মেটেজার তাঁর লেখা *"দি টেকস্ট অব দি নিউ টেষ্টামেন্ট* "বইয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "এই পাণ্ডুলিপির লেখার রীতির ওপর ভিত্তি করে, সি, এইচ রবার্টস (যিনি এই পেপিরাসের খন্ডগুলো আবিষ্কার করেছিলেন) বলেছেন, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পেপিরাসের ওপর এই আয়াতগুলো লেখা হয়েছিল। যদিও অনেক পন্ডিত তাঁর নির্ধরিত সময়ের সাথে একমত হতে পারেননি, কিন্তু বিখ্যাত প্রাচীন হস্তলিপি বিশারদ পন্ডিত স্যার ফ্রেডারিক জি কেনিয়ন, ডব্লিও স্কুবার, স্যার হ্যারল্ড আই বেল, এডলফ ডিজম্যান, উলরিস উইলক্যান এবং ডব্লুও, এইচ, পি হ্যাচ তাঁরা রবার্টস- এর সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে বলেছেন,
>
> "যদিও এই আয়াতগুলো কিছুটা অংশ অবহেলার সাথে সংরক্ষিত হয়েছিল, একদিকে এই পেপিরাসের টুকরাটি (পি ৫২) হস্তলিখিত গোটা কিতাবের মতোই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে এর যথেষ্ট মূল্য রয়েছে; কারণ, এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এই চতুর্থ সুখবর সিপারাটি (ইউহোন্না) নীল নদের তীরে একটি প্রাদেশিক শহরের লোকদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল, যদিও এখান থেকে অনেক দূরে (প্রাচীন তুরস্কের ইফিষ শহরে) এই সিপারাটি লেখা হয়েছিল।[৭]

[৭] Metzger, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৩৯

ছবি- ৪

১৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইউহোন্না ১৮:৩১-৩৩ আয়াত লেখা পেপিরাস পি ৫২।

ম্যানচেষ্টারের জন রিলেন্ড লাইব্রেরীর অনুমতিক্রমে এটি ছাপা হলো।

যদি আমরা এই পাণ্ডুলিপি লেখার সময়কাল ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ধরে নেই, তবে আমরা দেখতে পাই যে, ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারাটি লেখার ৪০-৪৫ বৎসরের মধ্যেই মিসরের নীল নদীর তীরের জনপদের অধিবাসী খ্রীষ্টানরা এটি ব্যবহার করতেন। এটি একটি জোরালো প্রমাণ যে, ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই সুখবর সিপারাটির শত শত অনুলিপি হাজার হাজার খ্রীষ্টানের হাতে ছিল।

সুতরাং, যদি কেউ ইচ্ছা করে ইঞ্জিল শরীফের শিক্ষা বা লিখিত সুখবর পরিবর্তন করতে চাইতো, কীভাবে সে এতগুলো অনুলিপিতে শব্দগুলো পরিবর্তন করতে পারতো, আর তাদের মনের মধ্যে ও অন্তরে যে শব্দগুলো ছিল, তাই বা কেমন করে মুছে ফেলা যেত?

২০০ খ্রীষ্টাব্দের পেপিরাসের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপি

এখন যে দুটো পেপিরাসের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা ২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল। প্রথমটির সংখ্যা পি ৭৫। এটি এখন জেনেভা শহরের কাছে কলোগনি শহরতলীতে বোডমার লাইব্রেরী অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার-এ সংরক্ষিত আছে। এতে হজরত লূক ও হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারার ১৪৪ পৃষ্ঠা ছিল। এর মধ্যে ১০২ পৃষ্ঠা বা ৭০% এখনও অবশিষ্ট আছে। এটি হচ্ছে আমাদের জানামতে হজরত লূক লিখিত ইঞ্জিল শরীফের সবচেয়ে পুরানো অনুলিপি এবং হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারার সবচেয়ে পুরানো অনুলিপির মধ্যে একটি।

মসীহ্ শিক্ষা অধ্যয়নকারীদের জন্য এটি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হস্তলিখিত কিতাবের মাঝখানের অংশ- যেখানে হজরত লূক সিপারার শেষ তিনটি রুকু ও এবং হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারার প্রথম তেরোটি রুকু একেবারেই অক্ষত রয়েছে। ইউহোন্না সিপারার প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আগেই কালাম ছিলেন আর তিনি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। হজরত লূকের শেষ তিনটি অধ্যায়ে ঈসা মসীহের ক্রুশে মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের পরে তিনবার দেখা দেওয়ার কথা রয়েছে। ছবি-৫ এ, লূক সিপারার ২৪:৩১-৫০ আয়াতের মধ্যে ঈসা মসীহের তিনবার দেখা দেওয়ার বিবরণ আছে। প্রথমবার, ইম্মায়ু গ্রামের পথে দুইজন সাহাবী, দ্বিতীয়বার, হজরত পিতর এবং তৃতীয়বার হজরত থোমার অনুপস্থিতে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ রয়েছে। একই পেপিরাসের ওপর লেখা হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারায় ১৪:১৬ আয়াত এই বইয়ের ষষ্ঠ অংশের প্রথম অধ্যায়ের ছবি ৭ - এ দেখানো হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যেই পি ৪৬ নামে চিহ্নিত এই অধ্যায়ের ক. অংশের ১ নং ছবিতে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি দেখেছি। এর মধ্যে ৮৬টি পাতা রয়েছে। অর্থাৎ গোটা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ৭০% এখানে রয়েছে। কারণ, মূল পাণ্ডুলিপিটির ১১৪টি পাতা ছিল। আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরের চেষ্টারবেটি যাদুঘরে এটি এখন আছে। এর মধ্যে হজরত পৌলের লেখা ১০টি সিপারা এভাবে সাজানো হয়েছে: রোমীয়, ইব্রাণী, ১ ও ২ করিন্থীয়, ইফিষীয়, গালাতীয়, ফিলিপীয়, কলসীয় এবং ১ ও২ থিষলনিকীয়। পুরানো বইয়ের বেলায় যা ঘটে, এখানেও তাই হয়েছে, অর্থাৎ সামনের ও পেছনের অংশ হারিয়ে গেছে। **তবে, ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ১ করিন্থীয় সিপারাটি প্রায় গোটাটাই অক্ষত**

ছবি ৫-

২০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে লূক ২৪:৩১-৫০ আয়াত লেখা পেপিরাস P৭৫।

এখানে মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পরে ঈসা মসীহের তিনবার দেখা দেওয়ার কথা লেখা আছে।

জেনেভার বডমার লাইব্রেরীর অনুমতিক্রমে এটি ছাপা হলো।

আছে, যে সিপারাটির কথা আলেম হজরত ক্লিমেন্ট ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ও আলেম হজরত পলিকার্প ১০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

আমি এই সত্য বিষয়টি তুলে ধরতে চাই যে, দুটো সুখবর সিপারার ৭০% ও হজরত পৌলের লেখা সিপারার ৭৫% আজও রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যে, এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা। যদি ৭০ অথবা ৭৫% পুরানো পাণ্ডুলিপি যা আমাদের হাতে আছে, যদি এগুলো পরবর্তী ১৫০ বছর ধরে গোটা কিতাবের সাথে মিল থাকে (নিচে দেখুন) তবে আমি মনে করি যে, এই চিন্তা করা সঠিক যে, বাকী ২৫-৩০% যা আমাদের কাছে নেই, সেগুলোর সাথেও মূল-কিতাবের মিল আছে। এছাড়াও বলা যায়, যখন এগুলো একসাথে বিবেচনা করা হয়, তখন দেখা যায় যে, তখন তা বেড়ে গিয়ে গোটা সুখবর কিতাবসমূহের - নুতন নিয়মের- ৪০% হবে বলে ধরা হয়।

ডঃ বুকাইলি এক কথায় এই পেপিরাসের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

> "পেপিরাসের ওপর লেখা তৃতীয় শতাব্দীর কিতাবুল মোকাদ্দস এবং অপর একটি কিতাবুল মোকাদ্দস -যা সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর, - তার মাত্র কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ আমরা পাই।"[৮]

ডঃ বুকাইলি একজন চিকিৎসক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে তিনি কি একজন মানুষের পা কেটে ফেলার পরে সেই মানুষের অবশিষ্ট ৭৫%কে কি কেবল একটি টুকরা বা খন্ডিত অংশ বলবেন।

সব সময়েই আমি এই কথা বলবো যে, হজরত লূক ও হজরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারার ৭০% অবশ্যই একটি "টুকরা বা খন্ডিত অংশ" হতে অনেক বড়। এটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে যে, আজকের মতো দ্বিতীয় শতাব্দীতেও লিখিত সুখবর ও মৌখিকভাবে প্রচারিত ইঞ্জিল শরীফের শিক্ষা একই ছিল।

আমাদের বর্তমান সুখবর কিতাবের সাথে দ্বিতীয় শতাব্দীর মূলপাঠের যে মিল রয়েছে, তার আরও প্রমাণ

অনুবাদ

১৫০ থেকে ১৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নতুন নিয়ম প্রাচীন সিরিয়া বা অরামীয় ভাষায় ও ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। এসব কিতাবের মূল অনুলিপি আমাদের হাতে নেই। তবে আমাদের কাছে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর অনুলিপি রয়েছে।

---

[৮] ডঃ বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১১০

রেখাচিত্র ৪

পেপিরাসের ওপর লেখা গ্রীক
পাণ্ডুলিপি (খ) ২০০ খ্রীষ্টাব্দ

পঞ্চম শতাব্দীর সিরিয়ার
পাণ্ডুলিপি (গ)

গ্রীক পাণ্ডুলিপি (ক) থেকে অনুবাদ
সময়কাল ১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথমে এটি মনে হতে পারে, এসব প্রাচীন অনুলিপিগুলোর সামান্যই মূল্য রয়েছে। তবে, যদি কেউ রেখাচিত্র ৪ লক্ষ্য করেন এবং একমূহূর্ত এটি নিয়ে চিন্তা করেন, এটি তাঁর কাছে স্পষ্ট হবে, যখন ৫ম শতাব্দীর একটি সিরিয়ার পাণ্ডুলিপি (গ) ২০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে গ্রীক পেপিরাসের লেখা একই রকম হবে, এই দুটো সাক্ষী স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদের সময়ে গ্রীক মূলপাঠে (ক) কী বলা হয়েছিল।

প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টান লেখকদের দ্বারা ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টান লেখকদের সাক্ষ্যের একটি উদাহরণ আমি দেব, আমি তার্তুলিয়ানের নাম উল্লেখ করছি। তিনি ১৬০-২২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ জামাতের একজন প্রেসবিটার ছিলেন। তিনি নতুন নিয়ম থেকে ৭০০০ এরও বেশী উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে ৩০০০ এর বেশী উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে ৪টি সুখবর সিপারা থেকে আর তাঁর উদ্ধৃতি দেখায় যে-আয়াতগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন বর্তমানে আয়াতগুলোর সাথে তার হুবুহু মিল রয়েছে।

৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুখবর -ইঞ্জিল শরীফের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি তৈরির সময়কাল

সবশেষে, যদিও এখন দ্বিতীয় শতাব্দীর বাইরে সময়কাল নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, তবু আমি আবারও কোডেক্স সিনাইটিকাস- আমরা এই অধ্যায়ের গ অংশে ৩ নং ছবিতে দেখিছি, আর আমরা কোডেক্স ভেটিকানাসের কথা বলবো। এই দুটোই ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল। এই দুটো হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিই সন্নাসবাদের শুরুর পরে পরেই ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়েছিল। কোরআনের সূরা হাদিদ (লৌহ), ৫৭:২৭ আয়াতে সাক্ষ্য দিয়েছে, এই সময়ে দুনিয়াতে প্রকৃত খ্রীষ্টানরা ছিলেন। ইউহোন্না লিখিত সুখবর সিপারার প্রথম রুকু ছবি- ৬ দেখানো হয়েছে।

ছবি ৬ -

৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কোডেক্স সিনাইটিকাসের ছবি

ইউহোন্না ১:১৪ আয়াত এতে দেখানো হয়েছে। "লগোস (কালাম) সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন।"

বৃটিশ যাদুঘরের অনুমতিক্রমে এটি ছাপা হলো।

বর্তমান ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়ম সিপারাগুলো অনুবাদের কাজে, এই সব হস্তলিখিত কিতাব ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আমরা ওপরে যে-সব প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কথা বলেছি, যেগুলোতে পাওয়া যায়নি। অবশ্যই এগুলোর মধ্যে **মতবাদগত সুখবর বা doctrinal gospel** ছিল।

ইঞ্জিল শরীফের ঐতিহাসিক বিকাশের চিত্র

সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আমাদের কাছে বর্তমানে যে-সুখবর আছে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঐতিহাসিক বিকাশকে স্পষ্ট করে বুঝার জন্য আমরা চিত্রের সাহায্যে দেখবো, যেভাবে আমরা কোরআনের ক্ষেত্রে দেখিছি।

রেখাচিত্র-৫- ইঞ্জিল শরীফের ঐতিহাসিক বিকাশের চিত্র

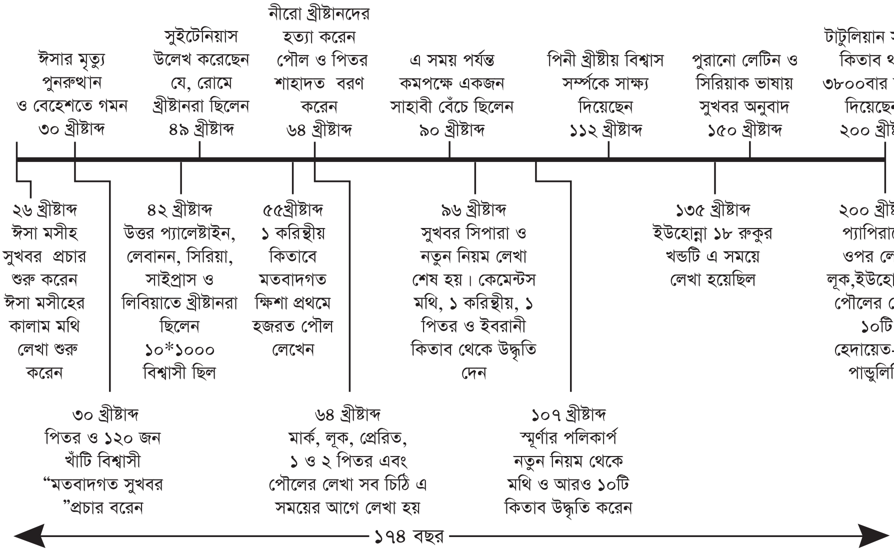

এই রেখাচিত্রের দিকে চেয়ে আমি, খ্রীষ্টানরা তাঁদের ইঞ্জিল শরীফকে পরিবর্তন করেছেন এই কথাটি পুনঃবিবেচনা করার জন্য পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদের চোখের সামনে ওপরের দেওয়া তথ্য অনুসারে আমরা আবারও নিজেদের প্রশ্ন করবো, কীভাবে খ্রীষ্টানরা জানেন যে, সুখবর পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এই সময়ে অন্য একটি প্রশ্ন করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। "আর তাহলে কখন এটি পরিবর্তন করা হয়েছিল? "

ঈসা মসীহের সাহাবীরা বেঁচে থাকতেই এটি পরিবর্তন করা হয়েছিল, এই কথা কোনো খ্রীষ্টান মেনে নেবে না। কোনো মুসলমান কখনো বলবেন না যে, হজরত আবু বকর কিংবা হজরত ওমর কোরআন পরিবর্তন করেছিলেন। আর এমনকি যদি মার্ক সিপারার শেষ পাতাটি হারিয়ে গিয়ে থাকে, খালি কবর ও ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিবরণী যে সিপরাগুলোতে আরও ভালোভাবে বলা হয়েছে, সেখান থেকে এনে যদি মার্ক সিপারার শেষে যোগ করে দেওয়া হয়, তবু একে কোনোভাবেই পরিবর্তন করা হয়েছে বলা যায় না।

সুখবর কি ৯০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছিল? তখন লাখ লাখ বিশ্বাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ কোটি কোটি খ্রীষ্টান সারা রোম সাম্রাজ্যে ছড়িয়েছিল। শত শত এমনকি হাজার হাজার বিশ্বাসী হযরত ঈসার সাহাবীদের মুখে ঈসার সুখবর শুনেছিলেন। আসলে কি ইঞ্জিল শরীফের কোনো মৌলিক বিষয় এই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করা যেতে পারে: আসলে এটি একেবারেই অসম্ভব ছিল।

তবে কি এটি ১৫০-২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছিল? অনেক অনুবাদ, উদ্ধৃতিসমূহ আরও পেপিরাসের ওপর লেখা পাণ্ডুলিপি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সব মূল পাঠই এক এবং ইঞ্জিল শরীফেও একই শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং, এসব সাক্ষী-প্রমাণ পরীক্ষা করে আমরা খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করি যে, সুখবর-নতুন নিয়ম আজ যেমন রয়েছে, অতীতেও ঠিক তেমনি ছিল।

চ. ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআনের প্রচারের পর্যালোচনা

পাঠক লক্ষ্য করে দেখবেন যে, ২৭ হিজরীতে সংকলিত হজরত উসমানের সরকারী পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ১৫০ হিজরীতে প্রাপ্ত কোরআনের বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে কোনো তুলনা করে দেখাতে আমি চেষ্টা করিনি। আমি মনে করি যে, তা করা যেতে পারে, কিন্তু এই বিষয়টি পাঠকদের নিজেদের অনুসন্ধান করে দেখার জন্য তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই।

তবে, আমি মনে করি যে, এই বিষয়টি জানার জন্য এটি পাঠকদের সাহায্য করতে পারে যে, যদি একই সময় বিন্যাসে কোরআন ও সুখবর বিকাশের বিষয়টি আমরা তুলনা করে দেখি। এখানে যে বছর হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও ঈসা মসীহ্ প্রচার কাজ শুরু করেছেন, সেই বছরকে আমরা শূন্য বছর ধরেছি। এভাবে চিত্রের সাহায্যে যে কোনো মিল বা পার্থক্য সহজেই দেখা যায়।

রেখাচিত্র-৬

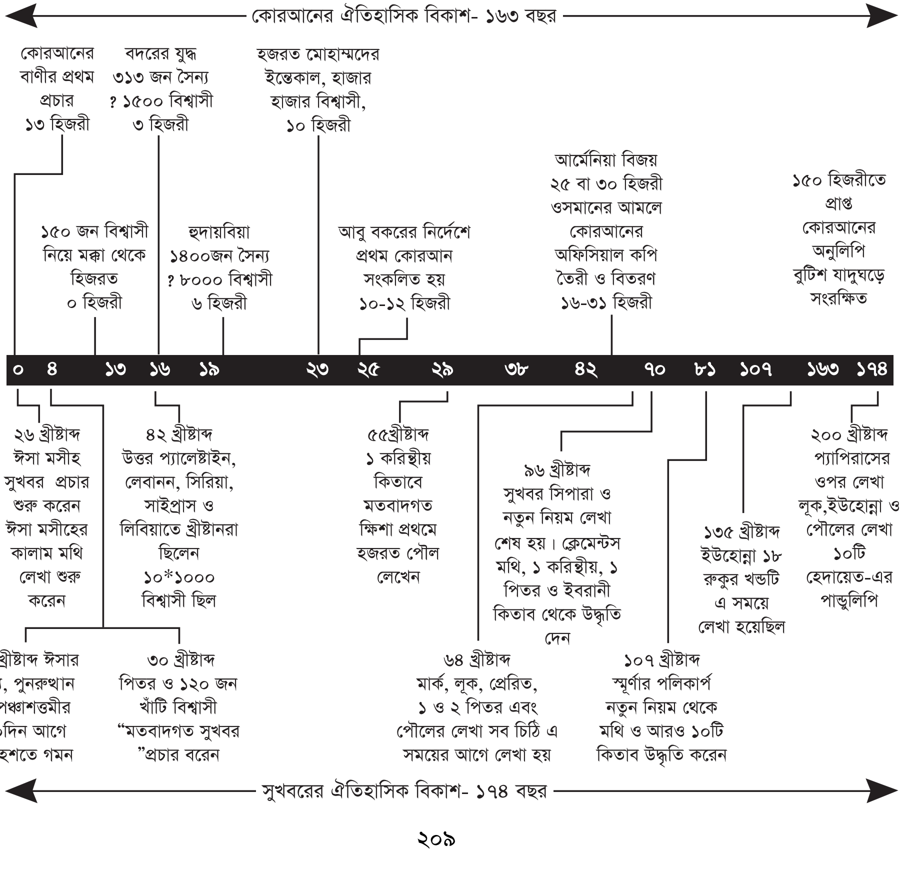

রেখাচিত্র ৬ সযত্নে পরীক্ষা করলে, আমরা কিছু পার্থক্য দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শুরুতে দ্রুতগতিতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রথম দিনেই প্রচারের ফলে ৩০০০ বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

কী আশ্চর্য মিল রয়েছে! আমরা যদি হিজরতের ঘটনার সাথে ঈসা মসীহের বেহেশত গমনের বিষয়টি তুলনা করি, তাহলে এই মিলটি দেখতে পাই। আমরা এই মিল দেখে আশ্চর্য হই যে, হজরত মোহাম্মদের মদিনা গমনের সময়ে ১৫০ জন অটল বিশ্বাসী ছিলেন, আর ঈসা মসীহের বেহেশত গমনের সময়ে ১২০ জন অটল বিশ্বাসী রেখে গিয়েছিলেন।

দশ বছর পরের অবস্থা যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাই, হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর সময়ে ১০০০০ বেশী মুসলমান ছিলেন। তাঁর সাহাবীরা তাঁর কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একইভাবে মসীহের সাহাবীরা দশ বছর প্রচার করার পরে প্রায় ১০০০০ বিশ্বাসী ছিলেন। হজরত মোহাম্মদের প্রথম আয়াত প্রচার করার পরে ৪২ বছর পরে হজরত ওসমান প্রামান্য সরকারী অনুলিপি বিতরণ করার আগে কোরআন সম্পূর্ণ মুখে মুখে প্রচার করা হতো। ঈসা মসীহের প্রথম প্রচারের ৩০-৫০ বছর ধরে প্রায় সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে সুখবর প্রচারিত হচ্ছিল। আর এই সময়ের মধ্যে ইউহোন্না লিখিত সুখবর ছাড়া ইঞ্জিল শরীফের বাকী কিতাবগুলো লেখা হয়েছিল।

সবশেষে বলছি, আমাদের জানা মতে হজরত মোহাম্মদের প্রচার শুরু হওয়ার প্রায় ১৬৩ বছর পরে সবচেয়ে পুরানো পূর্ণাঙ্গ কোরআন লিখিত আকারে পাওয়া গিয়েছে। সারবস্তুর দিক দিয়ে এই তথ্যের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় যে, ঈসা মসীহেরও প্রচার শুরু হওয়ার ১৭৪ বছর পরে সবচেয়ে পুরানো পেপিরাসে লেখা সুখবর ও ইঞ্জিল শরীফের অন্যান্য কিতাবগুলো পাওয়া গিয়েছে।

উপসংহার

আপনি যেভাবে **বিশ্বাস** করেন যে, হজরত যায়েদ বিন সাবিত এবং হজরত ওসমান সযত্নে কোরআন সংকলিত করেছেন। আমরাও তেমনি **বিশ্বাস** করি যে, হজরত লূক ও হজরত ইউহোন্না সযত্নে সুখবর সিপারা সংকলিত করেছেন।

আপনি যেভাবে **বিশ্বাস** করেন যে, যারা কোরআনের আয়াত নকল করে অনুলিপি তৈরি করেছেন, তাঁরা খুবই মনোযোগ দিয়ে তা করেছেন। আমরাও তেমনি **বিশ্বাস** করি যে, কিতাব লেখকরা খুবই মনোযোগ দিয়ে সুখবর-ইঞ্জিল শরীফের সিপারার অনুলিপি তৈরি করেছেন।

আপনি যেভাবে **বিশ্বাস** করেন যে, প্রথম শতাব্দীর মুসলমান নেতারা তাঁদের টাকা-পয়সা, সময় কোরবানী করেছেন কেবল তাই নয়, তাঁরা এমনকি নিজেদের জীবন কোরবানী করতেও রাজী ছিলেন। আমরাও **বিশ্বাস** করি যে, ঈসা মসীহের সাহাবী- প্রেরিতরা- শহীদ হতেও রাজী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হজরত পিতর ও হজরত পৌল শহীদ হয়েছিলেন।

আপনি যেভাবে **বিশ্বাস** করেন যে, বিশ্বস্তভাবে কোরআন প্রচার করা হয়েছিল, আর এইজন্য আপনি সম্পূর্ণ আস্থার সাথে তা ব্যবহার করেন। আমরাও তেমনিভাবে **বিশ্বাস** করি যে, বিশ্বস্তভাবে সুখবর প্রচার করা হয়েছিল, আর এইজন্য **আমরাও সম্পূর্ণ আস্থার সাথে তা ব্যবহার করি**।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

আমরা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বর্তমান কোরআন বা ইঞ্জিল শরীফে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি, এগুলো সারবস্তুর দিক দিয়ে আগেও যেভাবে সংকলিত হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনিভাবে আছে।

চতুর্থ খণ্ড

বিজ্ঞান এবং ওহী

প্রথম অধ্যায়

কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইতোমধ্যেই আমাদের বিশ্বাসের কারণে ও আমাদের আলোচনা এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা বিশ্বাস করেছি যে, কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের আগে যে মূল আয়াত ছিল তা আজো ঠিক তেমনি আছে। এর কোনো পরিবর্তন বা রদবদল করা হয়নি। এখন আমরা কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল পাঠের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু প্রথমেই আমরা আবারও প্রাথমিক অনুমিত বিষয় বা basic assumptions বিষয়টি দেখবো।

প্রাথমিক অনুমান বা Basic Assumptions যা ছোট খাটো গড়মিল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আমরা বড় ধরনের প্রাথমিক অনুমিত বিষয়ের (বেসিক এসাম্পসন) কথা আলোচনা করেছি। এখন আমি একটি গল্প বলছি। এই গল্পের মধ্য দিয়ে এই কথা বুঝানো হয়েছে যে, আমরা অনেক ছোটখাটো বিষয়ে কিছু কিছু বিষয় ধরে নেই যেন উভয়ে একমত হয়ে সত্যকে তুলে ধরতে পারি।

তিউনিশিয়ার বিমান বন্দর থেকে আমি একটি টেক্সি ভাড়া করেছিলাম। আমি টেক্সিচালকের সাথে যখন আলাপ করছিলাম. তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “কোরআন সম্পর্কে আমার ধারণা কী?” আমি উত্তরে বলেছিলাম, “কোরআনে বলা হয়েছে, ইহুদীরা ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেনি; এবং তারা তাঁকে ক্রুশেও দেয়নি আর তিনি মারা যাননি। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ্ মারা গেছেন। আর কেবলমাত্র তিনি মারা যাননি, বরং আপনার আমার সবার পাপের জন্য তিনি মরেছেন। এখন যদি কোরআন বলে যে, তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য মৃত লোকদের মতো কবরে পরে থাকেননি। আমি এই কথাও মানতে রাজী আছি। আর তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকে না।”

তিনি বললেন, কিন্তু এই কথাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে যুক্তি বা **প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন তৈরি করতে হবে** যে, কোনটি সত্য। তারপর তিনি এমন কথা বলে যেতে লাগলেন যা মুসলমানরা সব সময়ে বলেন, “না, ঈসা মসীহ্ মরেননি।” সূরা নিসা (নারী) ৪:১৫৭ আয়াতে এই কথা বলা হয়েছে,

তখন আমি তাঁকে বললাম, ”আপনি সূরা ইমরানের সেই আয়াতটি (৩:৫৫) সম্পর্কে কী বলবেন, যেখানে আল্লাহ্ নিজেই এই কথা বলেছেন, “**নিশ্চয়ই (ইন্না)**[১] **ঈসা** আমি তোমার কাল পূর্ণ (মৃত্যু) করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি।” এখানে কি আল্লাহ্র নিকট যাওয়ার আগে ঈসা মসীহের মৃত্যুর কথা বলা হয়নি?

টেক্সিচালক উত্তরে বললেন, “আহ! আপনি বুঝতে পারেননি! কারণ! ইন্না ‘‘শব্দের পরে কোনো কথা বলা হ’লে, সেগুলোকে সময়ের ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না।”

আমি বললাম, “কিন্তু আপনি যুক্তি বা **প্রাথমিক অনুমান** তৈরি করছেন, আর আমরা উভয়ে হেসে ফেললাম। কারণ, তিনি ও আমি আমরা দুইজনেই জেনেছিলাম যে, আমরা একই কাজ করেছি।[২]

আমার এই গল্পটি বলার কারণ হচ্ছে, কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে আলোচনা করার সময়ে তিনি তাফসীরকারককে কোনো ব্যাখ্যা দিতে বা প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন তৈরি করার সময়ে যেন দুটো মূলপাঠের মধ্যে মিল করতে যা একবার দেখেই মনে হতে পারে যে, এই আয়াতগুলো একটির সাথে আরেকটি বিরোধিতা করেছে। অন্যদিকে কোরআন নিয়ে আলোচনার সময়ে তিনি সম্পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে তা করেছেন, যা অন্য লোকের কাছে থেকেও তারা তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন তৈরি করে নিবে।

নিচের পয়েন্টগুলো বিবেচনা করলে এগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, ক) কোরআনে আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে বলেই ধরে নিতে হবে। তিনি দাবী করেছেন, খ) কোরআন কিতাবুল মোকাদ্দসের মতো নয়, কোরআনে কোনো বৈজ্ঞানিক ভুল নেই। সবশেষে, গ) তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের সমালোচনা করেছেন; কারণ, তিনি বুঝতে পারেননি যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্র ক্ষমতা ও মহিমা দেখানোর জন্য প্রকৃতির ওপর বেশী আলোচনা করা হয়নি।আমরা তাঁর এই দাবীগুলো পরীক্ষা করে দেখবো যে, তিনি যে-দাবীগুলো করেছেন এগুলো সঠিক কি না?

অবশ্য, আমরা জানি যে, একমাত্র ডঃ বুকাইলি কোরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেননি। আরো অনেক মুসলমান বিজ্ঞানী এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। সুতরাং, আমরা

---

[১] ইন্না (এখানে পরবর্তি সর্বনাম - ইন্নি- এর সাথে যুক্ত) একটি আরবী শব্দ, কখনও “সত্যি” বলে অনুবাদ করা হয় না, কিন' পরবর্তি শব্দের পের জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

[২] যাঁরা কোরআন ভালো করে জানেন না,তাদের জন্য বলছি, কোরআনের আরো অনেক আয়াতে ঈসা মসীহের মৃত্যুর কথা লেখা আছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা আল-মায়েদার ৫:১১৭ আয়াতের কথা বলা যায়। এখানে ঈসা মসীহ আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে বলেছেন, “যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে (মৃত্যু দিলে), তখন থেকে তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের অভিভাবক"। (লক্ষ্য করুন, এখানে অতীত কালের কথা বলা হয়েছে)। ‘ঈসা মরেননি,’ এই ধারণার সাথে মিল করার জন্য মুসলমানরা সময়ের ধারাবাহিকতার পরিবর্তন করে বলেন, ‘ঈসাকে বেহেসে- তুলে নেয়া হয়েছে, কিন' তিনি আবার ফিরে আসবেন, সবাইকে ইসলামে দিক্ষিত করে তারপর মারা যাবেন।

তাঁদের কিছু কিছু মতবাদ এখানে পরীক্ষা করে দেখবো- বিশেষভাবে ডঃ বেকির টর্কি যাঁদের নাম বিবেচনা করার জন্য পেশ করেছেন।

ড. টর্কি একজন তিউনিশিয়ার নাগরিক। তিনি নিউক্লিয়ার সাইন্সের ওপর পিএইচডি করেছেন। তিনি *Science et Foi* (বিজ্ঞান ও ঈমান) নামে একটি ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি "*L'Islam Religion de la Science*"[৩] নামে একটি বই লিখেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

একজন কোরআনের পক্ষসমর্থনকারী হিসেবে তিনি আধুনিক কিজ্ঞানের জ্ঞান ও কোরআনের সাথে এর সম্পর্ক খুঁজে বের করার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন। তারপর তিনি এই দাবী করেছেন, কোরআন যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এগুলো হচ্ছে তার প্রমাণ। এই ধরনের কাজ করা ভুল নয়। কিন্তু আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যেভাবে অন্যলোকেরা ইংগিত দিয়েছেন, ফলাফল তেমন প্রত্যাশা পূরণ করেনি। আর যেহেতু আমরা এই অধ্যায়ের শেষে দেখবো যে, এই দাবীগুলোর কোনো কোনোটির মধ্যে খুবই সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মতত্ত্বীয় সমস্যা রয়েছে।

১.পানি চক্র

ডঃ বুকাইলি[৪] ও ড. টর্কি[৫] উভয়েই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দাবী করেছেন যে কোরআনে এই পানি চক্র বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বলা **হয়েছে**, **(১)** সাগর ও পৃথিবী থেকে পানি **বাষ্পিভূত** হয়। **(২) মেঘ হয় (৩)** যা **বৃষ্টি** দেয়। **(৪ক)** যা **সঞ্জিবিত করে মৃত ভূমিকে (৪খ) মাটির নিচে পানি পুনরায় ভর্তি হয়**। এটি উপচে পড়া ঝরণা আর পানি ভর্তি কুয়ার মধ্য দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।

ডঃ বুকাইলি জোরালোভাবে দাবী করেছেন যে, ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত লোকেরা "পানির গতিপথ সম্পর্কে প্রচলিত যত সব ভুল ধারণাই মনে প্রাণে পোষণ করে এসেছে", আর তিনি তাই বলেছেন যে, পানি-চক্র সম্পর্কে কোরআনে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তা কোনো মানুষের কাছ থেকে আসতে পারে না।

তিনি সূরা ৫০:৯-১১, ৩৫:৯, ৩০:৪৮, ৭:৫৭, ২৫:৪৮-৪৯ এবং ৪৫:৫ আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে ধাপ **(২)**, **(৩)** এবং **(৪ক)** রয়েছে। উদাহরণ, হিসেবে আমরা শেষ মক্কী যুগের সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থান) ৭:৫৭ আয়াত লক্ষ্য করবোঃ

> "তিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ূকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহাকে ঘন মেঘ বহন করে **(২)** তখন উহা নির্জিব ভূখন্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে **(৩)** বৃষ্টি বর্ষণ

---

[৩] L'UGTT, তিউনিস,১৯৭৯

[৪] ডঃ বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান পৃষ্ঠা-১৭৩-১৭৮

[৫] টর্কি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২

করি, তৎপর উহার **(৪ক)** দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারো।

(৪খ) ধাপ দেখানোর জন্য তিনি সূরা ২৩:১৮-১৯, ১৫:২২ এবং শেষ মক্কী যুগের সূরা আল-যুমার (মানুষের দল) ৩৯:২১ আয়াত উল্লেখ করেছেন, এখানে বলা হয়েছে,

> "তুমি কি দেখো না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে **(৪খ)** নির্ঝর রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দারা বিভিন্ন বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন।"

অবশ্যই এই আয়াতগুলো তিনি যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো কি কোনো বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করছে? আর এভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে? উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই না। প্রতিটি নারী-পুরুষ, এমনকি যারা শহরে বাস করেন, তারাও **২** ও **৩** ও **৪ক** ধাপের কথা জানেন। আর প্রতিটি কৃষকের কাছে শুনা যায় যে, খরার কারণে তাদের কুয়া ও ঝরণাগুলো শুকিয়ে গেছে, এভাবে তারা **৪খ** ধাপ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে উত্তর দেয় যে, মাটির নিচের পানির উৎস হচ্ছে বৃষ্টির পানি।

কিন্তু **ধাপ (১)-এ** কী বলা হয়েছে, - **বাষ্প হচ্ছে, বৃষ্টির মেঘের উৎস?** এটি পর্যবেক্ষণ করে বুঝা কঠিন, আর **এটি কোরআনের কোনো আয়াতেও উল্লেখ করা হয়নি।**

ড. টর্কি এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন এবং মক্কী প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া সূরা নাবা (সংবাদ) ৭৮:১২-১৬ আয়াতে এর একটি সমাধান আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

> "আর নির্মাণ করেছি তোমাদিগের উর্দ্ধদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ, এবং সৃষ্ট করিয়াছি প্রোজ্জল দ্বীপ এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি তদ্দারা আমি উৎপন্ন করি শষ্য, উদ্ভিদ ও ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্যান।"

এখানে তিনি একটি **প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন** করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে "প্রোজ্জল দীপ" বলতে সূর্যকে বুঝিয়েছেন। তারপর তিনি বৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি ধাপ **(১)-এর** কথা বলেননি। এই কথা বলা যে, একেবারেই অসম্ভব তা নয়, কিন্তু উদাহরণটি কেমন যেনো খাপছাড়া মনে হয়। এখানে আল্লাহ্‌র যে রহমতের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অষ্টম ও নবম রহমত হচ্ছে সূর্য ও বৃষ্টি। এই তালিকার মধ্যে একটি রহমতের সাথে আরেকটি রহমতের কোনো মিল নেই। উদাহরণ হিসেবে পর্বতমালা ও ঘুমের মধ্যে কোনো মিল নেই। ৭ম শতাব্দীর একজন আরবীয় লোকের মতোই ও বিংশ শতাব্দীর একজন লোক বুঝে যে বৃষ্টি ও সূর্যের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। আর এই বিষয়টি না বুঝারও কোনো কারণ নেই।

অন্যদিকে যখন আমরা **তৌরাত-পুরাতন নিয়মে** দেখি, তখন আমরা এই জটিল ধাপ (১) সম্পর্কে তিনটি আয়াত দেখতে পাই।

হিজরতের ১৩০০ বছর আগে নবীদের কিতাব আমোষ ৫:৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

“যিনি কৃত্তিকা ও মৃগশীর্ষ নামে তারাগুলো তৈরি করেছেন, তিনি অন্ধকারকে আলো করেন এবং দিনকে রাতের আধার করেন, যিনি **(১) সাগরের পানিকে ডাক দিয়ে** (৩) ভূমির ওপরে ঢেলে দেন, তাঁর নাম মাবুদ।

হিজরতের ১৩০০ বছর আগে নাজিল হওয়া কিতাব ইশাইয়া ৫৫:৯-১১ আয়াতে বলা হয়েছে,

“আসমান যেমন দুনিয়ার চেয়ে অনেক উঁচু, তেমনি আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে, আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়ে অনেক উঁচু, বৃষ্টি ও তুষার **(৩)** আকাশ থেকে নেমে আসে আর দুনিয়াকে পানি দান না করে সেখানে ফিরে যায় **না (১)**, বরং তাতে ফুল ও ফল ধরায় **(৪ক)** এবং যে বীজ বুনে তার জন্য শস্য আর যে খায় তার জন্য খাবার দান করে।

ঠিক তেমনি আমার মুখ থেকে বের হওয়া কালাম নিস্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না। বরং তা আমার ইচ্ছামতো কাজ করবে আর যে উদ্দেশ্যে আমি পাঠিয়েছি তা সফল করবে।”

তৃতীয়তঃ নবীদের কিতাব আইয়ুব ৩৬:২৬-২৮ আয়াত উল্লেখ করেছে। আইয়ুব নবী আরবের উত্তর সীমান্তে বসবাস করতেন। এই আয়াতগুলো পানিচক্র সম্পর্কে একেবারেই সঠিক ও যথাযথ বিশদ বর্ণনা করেছে। এই কিতাবও হিজরতের ১০০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে,

“আল্লাহ্ যে কত মহান তা আমরা বুঝতেও পারি না। তাঁর বয়স কত তা জানাও সম্ভব নয়।

তিনি **(১) পানির ফোঁটা টেনে নেন** সেগুলো বাষ্প হয় ও বৃষ্টি **(৩)** হয়ে পড়ে। মেঘ **(২)** তা ঢেলে দেয় আর মানুষের ওপরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ে।

এই আয়াতগুলো **(৪খ)** ধাপ ছাড়া সব ধাপগুলো উল্লেখ করেছে। হোশেয় কিতাবে ১৩:১৫ আয়াতে এই ধাপের কথা লেখা আছে। এই কিতাবটি মদিনায় হিজরতের ১৪০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল।

‘‘— একটি পূবালী বাতাস মরুভূমি থেকে বয়ে আসবে, তার ঝরনাতে পানি থাকবে না ও তার কুয়াগুলো শুকিয়ে যাবে—।

শুকনা পূবালী বাতাসে কোনো বৃষ্টি হয় না ফলে ঝরণা ও কুয়াগুলো শুকিয়ে যায়। বৃষ্টি যেভাবে পানির চক্র সম্পূর্ণ করে, এক্ষেত্রে একেবারেই তার উল্টোটা ঘটে। এভাবে **তৌরাত-পুরাতন নিয়ম** উপরের জটিল ধাপ **(১)** সহ চারটি ধাপের কথাই উল্লেখ করেছে।

২. সাগরের স্রোত

ড.বেখির টর্কি[৬] ৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-নূর (জ্যোতি) ২৪:৩৯, ৪০ আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে,

---

[৬] টর্কি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৫৯

"যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরিচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নহে-

অথবা, গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যাহাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের ওপর তরংগ, যাহার উর্দ্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের ওপরে স্তর, এমনকি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোনো জ্যোতি নাই।

এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একজন পরিচালকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যিনি সাগরসমূহের ছবি তুলে বলেছেন, "মহাসাগরের গভীরে যে ঢেউ ও স্রোত রয়েছে এগুলো সাগরের ওপরের ঢেউয়ের তুলনায় আরো অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর অনেক বিশাল।" ড. টর্কি প্রস্তাব করেছেন যে, কোরআন যখন বলে যে, **"তরংগের ওপর তরংগ"** তখন এটি আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। যা দেখায় যে, অনেকগুলো মহাসাগরীয় স্রোত রয়েছে. উদাহরণ হিসেবে উপসাগরীয় স্রোত ও জাপান সাগরের স্রোতের কথা বলা যায়।

এটি হতে পারে, যদিও ঢেউয়ের সময়কাল বুঝানোর জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ঢেউ ও স্রোতের জন্য আলাদা কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। অবশ্য, এটি আমার কাছে এক ধরনের সূত্রের উল্লেখ বলে মনে হয়েছে, আসলে আল্লাহ্ সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের অন্ধকার অবস্থাকে গদ্যকবিতারূপে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু যদি ড. টর্কি সঠিক কথা বলে থাকেন, আর এটি আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে থাকে, তবে এই বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, একই ধরণের একই তথ্য **তৌরাত-পুরাতন নিয়ম** ও নবীদের কিতাব ইউনুস ও হজরত দাউদের **যবুর শরীফে** উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউনুস নবীকে ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একটি বিরাট মাছ গিলে ফেলেছিল, তিনি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের নবীদের কিতাব ইউনূস ২:১, ৩-৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

"ইউনুস সেই মাছের পেটে থেকে তাঁর মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলেন। তিনি বললেন— তুমি আমাকে গভীর পানিতে, সাগরের তলায় ফেলে দিলে আর আমি **স্রোতের** মধ্যে তলিয়ে গেলাম; তোমার সমস্ত **ঢেউ** ও ঢেউ ভেঙ্গে পৃথক হয়ে আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আমি বললাম,'আমাকে তোমার চোখের সামনে থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে; তবু আমি আবার তোমার পবিত্র ঘরের দিকে চোখ তুলবো।' সাগরের পানি আমাকে গ্রাস করে মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেল; সাগর আমাকে ঘিরে ধরলো এবং তার আগাছা আমার মাথায় জড়িয়ে গেল। আমি ডুবে গিয়ে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত গেলাম; কবর চিরকালের জন্য আমাকে আটকে রাখলো। কিন্তু হে আমার মাবুদ আল্লাহ, তুমি সেখান থেকে আমাকে উঠিয়ে আনলে।

এখানে "স্রোত" এর হিবুর শব্দ "*নাহর*" ব্যবহার করা হয়েছে এর আরেকটি অর্থ হতে পারে নদী। আরবী ভাষায়ও এই শব্দটি একইভাবে ব্যবহার করা হয়। "ঢেউ" ও ঢেউ ভেঙ্গে পৃথক হওয়া দুটো আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়। এদুটোকে প্রায় সমার্থক বলা যায়। কেবল একটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, ঢেউ ভেংগে পৃথক করা শব্দটির মূল সম্ভবতঃ ঝড়ের সময়ে বড়-বড় বিশাল ডেউয়ের কথা বুঝিয়েছে।

এমনকি এরও অনেক আগে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বা হিজরতের ১৬০০ বছর আগে, পাক-রূহের অনুপ্রেরণায় হজরত দাউদ **জবুর শরীফ** লিখেছিলেন। তাঁর অনেকগুলো প্রশংসা গজলের মধ্যে একটি গজলে ৮:৪, ৬, ৮ আয়াতে তিনি লিখেছেন,

> "যখন ভাবি মানুষ এমনকি যে তার বিষয়ে চিন্তা করো, মানুষের সন্তানই বা কি যে তুমি তার দিকে মনোযোগ কর। তোমার হাতের সৃষ্টির শাসনভার তুমি তারই হাতে দিয়েছো আর তার পায়ের তলায় রেখেছ এইসব আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখি, সাগরের মাছ আর সাগর পথে ঘুরে বেড়ানো অন্য সব প্রাণী।"

"সাগর পথে ঘুড়ে বেড়ানো" বলতে এই কথা বলা যায় যে, আগের লাইনের কাব্যিকভাবে এখানে পুনঃউল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটি নবীদের কিতাব ইউনুসের আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে আমরা মহাসাগরীয় স্রোতের একটি সঠিক বিবরণ যা আমরা বিংশ শতাব্দীতেও দেখতে পাই।

৩. লোনা ও সুপেয় পানির প্রভেদকারী অন্তরাল

প্রাথমিক যুগের নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-রাহমান (আল্লাহ্‌র নাম বিশেষ) ৫৫:১৯-২১ আয়াতে দুই ধরনের পানির মধ্যে এক **অন্তরাল** বা প্রভেদকারী সীমারেখা থাকার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,

> "তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহার পরষ্পর মিলিত হয়, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক **অন্তরাল**, **যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না**। সুতরাং, তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত Aস্বীকার করবে।"

এখানে "অন্তরাল" বলকে আরবী শব্দ "বারযাখ" ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচেছ, অভ্যন্তরিণ ফাঁক, বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, যোজক প্রভৃতি।

প্রাথমিক মক্কী যুগের আরেকটি সূরা আল-ফুরকান (কোরআন) ২৫ আয়াতে পরিপূর্ণভাবে একই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আমরা পড়ি,

> "তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন **এক অন্তরাল, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান**।

শব্দগুচ্ছ "এক অন্তরাল, এক অনতিক্রমে ব্যবধান "একই মূল থেকে উদ্ধৃত দুটো শব্দকে বুঝাচ্ছে। এটি আরবী ভাষায় যে-বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে তার ওপর জোর দেওয়ার জন্য এভাবে বলা হয়েছে। 'হিজর' শব্দের অর্থ হচ্ছে- নিষেধ, নিবারণ করা, নিষিদ্ধ। এগুলো খুবই জোরালো শব্দ। আর দ্বিতীয় শব্দটিও ক্রিয়ার অতীতকালীন অপ্রধান পদ (পাষ্ট পার্টিসিপল) একই অর্থ। সুতরাং, একেবারে আক্ষরিক অর্থে কেউ এটাকে এভাবে সঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করতে পারেন,

> "তিনি (আল্লাহ) তাদের মধ্যে একটি অন্তরাল রেখেছেন এবং তা অতিক্রম করা নিষেধ।

ডঃ বুকাইলি এই বিষয়টি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।[৭] কিন্তু ড. টর্কি এই বিষয়টি নিয়ে আড়াই পৃষ্ঠা জুড়ে আলোচনা করেছেন।[৮] তিনি বায়ূ-চাপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন, কীভাবে এটিকে ইউ-টিউবের মধ্যে অর্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে ল্যাবে প্রমাণ করা যায়, সেই কথাও বলেছেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

> হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কোনো ল্যাবরেটরীতে ছিল না, এসব রহস্যগুলো আবিষ্কার করার এবং কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত "অন্তরাল" বুঝানোর জন্য তাঁর কোনো গবেষণার যন্ত্রপাতি ছিল না। এটা আরেকবার প্রমাণ করে যে, এই কিতাবটি মানুষের হাত দ্বারা রচিত হয়নি। একমাত্র আল্লাহই এই কিতাব রচনা করেছেন।

তবে, এই প্রশ্ন আবারো করা যেতে পারে, আমরা কি দৃশ্যমান এমন বিষয়টি দেখি না, এখানে কি একটি জানা সত্য বিষয়কে আল্লাহ্‌র দান হিসেবে দেখানো হচ্ছে না? যে সব জেলে নদীর মোহনায় মাছ ধরে তারা কি এই সত্য জানে না যে, লোনা জলে গিয়ে তাদের খালি হাতে ফিরতে হয়।

বিবি খাদিজার ব্যাবসা দেখাশোনার জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে সিরিয়ার দামেস্ক নগরীর অনেক উত্তরে সূদূর আলেপ্পো নগরীতে যেতে হতো। এটি কি সম্ভব ছিল না যে, এই সফরগুলোর মধ্যে কোনো এক সময়ে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া ও লেবাননের সাগরতীরে চলে যেতেন; অথবা একজন নাবিকের সাথে কথা বলেছিলেন, যিনি জানতেন যে, ভূমধ্যসাগরে অনেক দূর পর্যন্ত পানি কখনও একত্রে মিশে না।

ডঃ বুকাইলি সমপ্রতি প্রকাশিত তাঁর বইয়ে আদিম লোকদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করার ক্ষমতার প্রশংসা তিনি নিজেই করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "প্রকৃতিবিদরা বলেন যে, কোনো কোনো নির্দিষ্ট আদিম গোত্রের মাঝে নির্ভুলতা দেখে তারা অভিভূত হয়েছেন। এই বিষয়ে বাইরের কোনো শিক্ষা তারা পায়নি। তবু তারা তাদের চারদিকে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির পশুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো। তারা একজন বিশেষজ্ঞের মতো এদের শ্রেণীবিন্যাসও করতে সক্ষম।"[৯]

এই কথা নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, যদি তাঁরা এতো দক্ষতার সাথে পশুদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তাহলে তাঁদের চারদিকে দেখা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো যেমন সুপেয় পানি সাগর থেকে অনেক দূরে থাকে, এই কথা কেন বুঝতে পারবেন না।

খোলাখুলিভাবে এই কথা বলা যায় যে, এই আয়াতগুলো যেভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রকাশ করে তা কিন্তু এই সমস্যাগুলো সমাধানের চেয়ে আরো অনেক বেশী সমস্যা তুলে ধরে। কারণ, এই ধরনের ব্যাখ্যা বিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুসারে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সত্যতার দাবী

---

[৭] ডঃ বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০

[৮] টর্কি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৫৯

[৯] ডঃ বুকাইলি, *L'Homme*, পৃষ্ঠা-২৩ (লেখকের অনুবাদ)

করে। যখন আল্লাহ্ একটি "অন্তরাল" তৈরি করেন আর "যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।" এই কথা শুনে মনে হয়, এখানে ১০০% নিষেধ রয়েছে। আমরা কি এই আয়াত থেকে এই কথা বুঝি বা এভাবে অনুবাদ করতে পারি যে, "এই পানিসমূহ একেবারেই মিশে না !?!

আসল সত্য বিষয় হচ্ছে, এখানে কোনো বাধা বা 'অন্তরাল' নেই, কোনো অর্ধভেদ্য পর্দাও নেই, সাগরের এই দুটো দরিয়ার পানি মিশ্রিত হওয়ার নিষেধ নেই আর আসলে শক্তি এক্ষেত্রে মিশ্রণের পক্ষে কাজ করে, একজন বিজ্ঞানী বন্ধু এই বিষয়ের ওপর কাজ করে মন্তব্য করেছেন,

> "এই কথা সহজেই বলা যায় যে, লোনা পানি ও সুপেয় পানি বাহ্যিক দিক দিয়ে আলাদা (নদীর প্রবাহ সাগরের পানিকে দূরে সরিয়ে রাখে)। কিন্তু এখানে কোনো অন্তরাল, প্রতিবন্ধক বা বাধা নেই। থার্মোডিনামিক্সের তত্ত্ব বা গতিতত্ত্ব অনুসারে পানির এই মিশ্রণ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক **প্রক্রিয়া, পরমতাপমাত্রায় প্রচুর পরিমানে তাপ বিশোধিত হওয়ার কারণে তা ঘটে,** একমাত্র "অন্তরাল" বা বাধা হচ্ছে, গতিশক্তি, এতে প্রচুর পানি একত্রে মিশ্রিত হতে কিছু সময় লাগে।

ডঃ বুকাইলি এই কথা স্বীকার করেছেন, সুতরাং, তিনি আরেকটি প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসনের মধ্য দিয়ে একটি মূল্যবান তথ্য যোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"এদের (নদীর) মিঠা পানি যেখানে সাগরে পড়েছে- সেখানে সাগরের নোনা পানির সাথে তা মিশে যায়নি - মিশে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে সাগরের **অনেক ভেতরে।"**

ধর্মতত্ত্বীয় সমস্যা

তবে, এই ধরনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্বীয় সমস্যা রয়েছে। কোরআনে এই বর্ণনাগুলোকে চিহ্ন বা নিশানা বলা হয়েছে। যদি কোরআন এই বর্ণনাগুলোকে চিহ্ন বা নিশানা বলে, তখন যাঁরা প্রথমে কোরআনের এই নিশানার কথা শুনেছিলেন, তাঁরা অবশ্যই আশা করেছেন যেন, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এই নিশানা তাদের কাছে বুঝিয়ে দেবেন, নইলে এই চিহ্ন বা নিশানা দেবার কোনো মানেই হয় না।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, তিনি পাপ ছাড়া আর সব কিছুই করতে পারেন। সুতরাং, তিনি অবশ্যই একটি সত্য বিষয় প্রকাশ করার জন্য ইচ্ছা করতে পারেন। যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা আর ওহী নাজিলের সাথে সাথে যদি তা বুঝা না যায়, তবে এটি কোনো নিশানা বা চিহ্ন হতে পারে না।

এই কথার উদাহরণ হিসেবে আমরা নবীদের কিতাব আইয়ুব ২৬:৭ আয়াতের কথা উল্লেখ করতে পারি। এখানে বলা হয়েছে,

"তিনি শূন্যে ওপরের আসমান বিছিয়ে দিয়েছেন,
শূন্যের মধ্যে দুনিয়াকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।"

আমরা বর্তমানে এই কথা যতটা বুঝতে পারি, হজরত আইয়ুব কেবল এই তথ্যটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে আমরা তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবের ২৩:১২-১৪ আয়াতের কথা বলতে পারি। এখানে লোকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য আল্লাহ্‌ হুকুম দিয়েছেন।

> "পায়খানার জন্য ছাউনির বাইরে তোমাদের একটি জায়গা ঠিক করে নিতে হবে। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে মাটি খুঁড়ার জন্য একটা কিছু রাখতে হবে। পায়খানা করার আগে তোমরা সেটা দিয়ে গর্ত করে পায়খানা মাটি চাপা দেবে। তোমাদের রক্ষা করার জন্য এবং তোমাদের শত্রুদের তোমাদের হাতে তুলে দেবার জন্য তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌ তোমাদের ছাওনির মধ্যে ঘুরে বেড়ান। সেইজন্য তোমাদের ছাওনি পাকপবিত্র রাখতে হবে।"

যেভাবে প্রতিটি পাঠক আজকের দিনে এই হুকুমটির অর্থ বুঝতে পারেন যে, বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জনসাস্থ্যের নিয়ম অনুসারে এটি তখনও সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। আর যে- কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কেন কোরআনে আবার তা উল্লেখ করা হয়নি। (কোনো কোনো মুসলমান যেমন দাবী করেন যে, পুরানো কিতাব থেকে সব উপকারী শিক্ষা পুনরায় কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।) এটি রোগ ছড়াতে মাছিকে বাধা দিবে। কিন্তু এই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই হুকুম দেওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শিবিরকে পবিত্র রাখতে হবে।

কিন্তু অনন্তকালীন আল্লাহ, তওরাতের- পুরাতন নিয়মের- এসব উদাহরণগুলোকে চিহ্ন বা নিশানা বলেননি। যদিও যাঁরা এই কথা শুনেছিলেন, তাঁরা এর কারণ বুঝতে পেরেছিলেন, তাই এখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

নিদর্শন

ঈসা মসীহ্‌ বলেছেন, রোগীদের ভালো করার জন্য তিনি যেসব মোজেজা করেছেন, সেগুলো 'চিহ্ন' ছিল, যেন লোকেরা এই চিহ্ন দেখে তাঁর ওপর ঈমান আনতে পারে। ইউহোন্না কিতাবে বলা হয়েছে,

> "আমার পিতার কাজ যদি আমি না করি, তবে আপনারা আমার ওপর ঈমান আনবেন না। **কিন্তু যদি করি** তবে আমার ওপর ঈমান না আনলেও **আমার কাজগুলো অন্ততঃ বিশ্বাস করুন। তাতে আপনারা জানতে ও বুঝতে পারবেন** যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।" ইউহোন্না ১০:৩৭-৩৮

> **"যে সব কাজ আর কেউ কখনো করেনি সেই কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না করতাম তবে তাদের দোষ হতো না**। কিন্তু এখন তারা আমাকে আর আমার পিতাকে দেখেছে এবং ঘৃণাও করেছে।" ইউহোন্না ১৫:২৪

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) দাবী করেছেন যে, বৃষ্টির পরে মরুভূমিতে জীবনের সঞ্চার হয়, এটি একটি চিহ্ন যেন মানুষ মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়া ও বিচার সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারে। ৮ম হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-হাদিদ (লোহা) ৫৭:১৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "জানিয়া রাখো, আল্লাহ্ ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনঃজীবিত করেন। **আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।"**

শেষ যুগের মক্কী সূরা আনআম (গবাদি পশু) ৬:৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "জানিয়া রাখো, আল্লাহই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনঃর্জীবিত করেন। আমি **নিশানাগুলি তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পারা।"**

আইয়ুব ২৮:২৩, ২৫-২৮ আয়াতে আল্লাহ্র জ্ঞানের ইংগিত হিসেবে "বাতাসে শক্তি যোগানোর কথা" বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,

> "আল্লাহ্ তাঁর পথ বুঝতে পারেন, তিনি কেবল জানেন তা কোথায় থাকে। **তিনি যখন বাতাসে শক্তি যোগালেন**, আর পানির পরিমাপ ঠিক করলেন, যখন তিনি বৃষ্টির জন্য নিয়মের ব্যবস্থা করলেন আর বাজ পড়া ও বিদুৎ চমকাবার পথ ঠিক করলেন, তখন তিনি জ্ঞানকে দেখলেন এবং তার খোঁজ -খবর নিলেন। তারপর তিনি মানুষকে বললেন, 'দ্বীন -দুনিয়ার মালিকের প্রতি ভয়ই হলো জ্ঞান, আর খারাপ থেকে সরে যাওয়াই হলো বুদ্ধি'।"

এখানে কীভাবে বায়ূচাপ মাপার জন্য ব্যারোমিটার কাজ করে কীভাবে অন্য যন্ত্রগুলো বাতাসের গতি নির্ণয় করে এগুলো নিয়ে যে- কেউ বিশদ আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু, হজরত আইয়ুব এগুলোকে আল্লাহ্র জ্ঞানের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাহলে আমরা কি বুঝবো যে, এখানে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? সম্ভবতঃ এখানে তা বলা হয়নি। সম্ভবতঃ এটি এই অর্থ বুঝাচ্ছে, এখানে একটি পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে; যা হজরত আইয়ুব বা অন্য কেউ তাঁর মুখে লাগা মৃদু বাতাস অনুভব করেই তা বুঝতে পারেন। নৌকার পালে লেগে বাতাস যেভাবে নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা দেখে যে- কেউই এই কথা বুঝতে পারে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে তা মসীহের অলৌকিক কাজ হোক বা মরুভূমিতে প্রাণের সঞ্চার হোক অথবা বায়ূ চাপ মাপার বিষয় হোক, চিহ্নকে বুঝতে হবে এবং লোকেরা কি বলা হয়েছে তা যেন বুঝতে পারে।

কোনো কিছুকে যখন চিহ্ন বলা হয় আর তা বিংশ শতাব্দীর আজকের দিন পর্যন্ত তা ভুল ভাবে বুঝা হয়, তখনি সমস্যা হয়।

একজন নবী স্পষ্ট কিছু প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন, যা শ্রোতারা ভুল বুঝতে পারেন বা শ্রোতাদের কাছে যা অজানা, তবে তা ব্যাখ্যা করা ছাড়া তার বাণী কার্যকর করার কথা চিন্তাই করা যায় না। কীভাবে তা শ্রোতাদের মন ও অন্তরের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে? **আল্লাহ্ নবীদেরকে সহজ, সাধারণ উদাহরণসমূহ দিয়েছেন, যাতে যে-কেউ তা বুঝতে পারেন।**

যদি সাগরের পানির নিচের কোনো স্রোত মক্কা বা মদিনার লোক বুঝতে না-পারে কীভাবে কোরআনে উল্লেখিত "তরংগের পরে তরংগ" শব্দগুচ্ছ তাদের কাছে কোনো অর্থ থাকতে পারে? তারা হয়তো এটিকে কবিতা হিসেবে বুঝতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্‌কে ছাড়া পাপীরা কী গভীর সমস্যার মধ্যে রয়েছে তা বলা হয়েছে, অথবা তারা এটি বুঝেনি, তবে এই কথা বলা যায় যে, আসলে এটি তাদের কাছে কোনো চিহ্ন ছিল না।

এও হতে পারে যে, তত্ত্বীয়ভাবে একটি আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে, একটি স্পষ্ট অর্থ যখন নবীরা আল্লাহ্‌র কালাম বলেছিলেন, তখন সব লোকেরা তা বুঝতে পেরেছিলেন, আবার এর আরও একটি দুর্বোধ্য অর্থ থাকতে পারে যা অন্য সময়ের শ্রোতাদের বুঝার জন্য দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা যখন লিখেছিলেন, "তরংগের উপরে তরংগ" বলতে বা দুই ধরনের পানির কথা বলা হয়েছিল সম্ভবতঃ এটা ডঃ বুকাইলি ও ড.টর্কির কাছে মনে হয়েছে।

অবশ্য, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কতগুলো কোরআনের আয়াত লক্ষ্য করবো যেগুলো ১৪০০ বছর আগে যখন নাজিল হয়েছিল তখন থেকেই একটি **ভুল** অর্থ বহন করেছিল বলে মনে হয়। আর এই আয়াতগুলো ধর্মতত্ত্বীয় ক্ষেত্রে খুবই জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআনে কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা (ভুল?!) নেই

ক) পৃথিবী ও আসমান ৬ দিনে না ৮ দিনে সৃষ্টির বিবরণ

---

১. পর্বতসমূহ

ডঃ বুকাইলির বইয়ের ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠায় একটি অংশের শিরোনাম ছিল. "ভূপৃষ্টের নকশা" এই অংশে তিনি পর্বত সৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেছেন,

কোরআনে ১ ডজনেরও বেশী আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে সৃদৃড় ও অনড় পর্বত স্থাপন করেছেন, আর এসব আয়াতের মধ্যে কোনো কোনো আয়াতে, হয় বিশ্বাসীদের জন্য আর্শীবাদ হিসেবে নয়তো অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণী হিসেবে পর্বতকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটি উদাহরণ আমরা সূরা লূকমান (ব্যক্তি বিশেষের নাম) ৩১:১০-১১ আয়াতে দেখতে পাই, এখানে পর্বতকে পাঁচটি সতর্কবাণীর একটি হিসেবে বলা হয়েছে:

> "তিনি আকাশ মন্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতিত-তোমরা দেখিতেছ; **তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন** (আলক্বা اَلْقَى) পর্বতমালা (রাওযাসিয়া), যাহাতে উহা তোমাদের লইয়া ঢলিয়া না পড়ে (তামীদা বি কুম تَمِيدَ بِكُمْ **)।।"

মধ্যযুগের নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আম্বিয়া (আল্লাহ্‌র সংবাদবাহকগণ) ২১:৩১ আয়াতে সাতটি সতর্কবাণীর একটি বলা হয়েছে,

> "এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃড় পর্বত (রাওয়াসিয়া رَوَاسِىَ) যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায় (তামিদা বিহিম**)।

সবশেষে সূরা নাহল (মৌমাছি) ১৬:১৫ আয়াতে "জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য চিহ্ন" অনেকগুলোর মধ্যে এখানে একটি বলা হয়েছে,,

> "**এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃড় পর্বত (রাওয়াসিয়া) স্থাপন করিয়াছেন**, যাহাতে পৃথিবী তোমাদের লইয়া আন্দোলিত না হয় (তামিদা বি কুম**)।"

''তামিদা বি কুম" শব্দগুচ্ছ মাদা, ইয়ামিদু থেকে এসেছে। এটি কেবল গোটা কোরআনের মধ্যে ওপরে উল্লেখিত ** চিহ্নিত তিনটি আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। "ডিক্সনারী অব রিটেন মর্ডান এরাবিক"অভিধানে হেন্স ওয়েহার বলেছেন, ক্রিয়াপদের এই "মাদা বি" শব্দগুচ্ছের অর্থ হচ্ছে,

কোনো কিছু ভীষণভাবে আন্দোলিত করা। কেবল উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে **"মাদা বি"** শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা তাহলে দেখি যে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কেই বলা হয়েছে আল্লাহ্ এই মহান কাজ করেছেন। তিনি পবর্তমালা নিক্ষেপ করে স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী ওদেরকে নিয়ে ভীষণভাবে আন্দোলিত না হয়। সুতরাং, আমরা অবশ্যই নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি হজরত মোহাম্মদের উম্মতেরা এই আয়াতগুলো কী বুঝেছিলেন?

পরবর্তী দুটো আয়াতে আরেক চিত্র দেওয়া হয়েছে,

প্রাথমিক যুগের নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-নাবা (সংবাদ) ৭৮:৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> **"আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক বা খুঁটি** (আল-জ্বিবালা আওতাদান الجِبَالَ اَوْتَاداً) ("মাটিতে তাঁবু খাটাতে যে রকম খুঁটি ব্যবহৃত হয়- এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে" ডঃ বুকাইলির অনুবাদ ১৯১ পৃষ্ঠা।

সূরা আল-গাসিয়া (আচ্ছন্নকারী প্রলয় ঘটনা) ৮৮:১৭-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "তবে কি উহারা (অবিশ্বাসীরা) দৃষ্টিপাত করে না পর্বতমালার (আল-জিবাল) দিকে, কীভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে **(তাঁবুর মতো)**? (বুকাইলির অনুবাদ ১৯১ পৃষ্ঠা।)

এখানে মানুষকে বলা হয়েছে, পর্বতসমূহকে পৃথিবীর ওপরে তাঁবুর খুঁটির মতো স্থাপন করেছেন। তাঁবুর খুঁটি তাঁবুকে শক্ত করে ধরে রাখে যেন তাঁবু নড়াচড়া করতে না-পারে। সুতরাং আবারও এখানে ওই ধারণাই তুলে ধরা হচ্ছে যে, খুঁটি, পর্বত দেওয়া হয়েছে যেন পৃথিবী না কাঁপে।

তৃতীয় একটি ছবি আমরা দেখতে পাই, রাওসিয়া শব্দ পর্বতের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েহের এই শব্দটির অনুবাদ করেছেন সৃদড় পর্বত। মুনজিদে বলা হয়েছে, (আল-জ্বিবাল ছাওয়াবাত-আল-রুওয়াসিখ الجِبَال الثَوَابَت الرُوَاسِخ) সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত, অনড় পর্বতমালা। এই শব্দটির মূল হচ্ছে, (আরসা آرسَا) এই একই মূল (আরসা) আরবী শব্দ নংগর বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। নংগর ফেলা বা নংগর নিক্ষেপ করা হচ্ছে, (আলক্বা আল মিরসাةآلقَى المِرْسَا)। সুতরাং আসলে "জাহাজ যেন নড়াচড়া না করে এজন্য নংগর ফেলা বা নিক্ষেপ করার কথা না বলে এর বদলে, আমরা বলতে পারি, পর্বতমালাকে ফেলা হয়েছে বা নিক্ষেপ করা হয়েছে, যেন পৃথিবী নডাচড়া বা আন্দোলিত হতে না-পারে।

এসব আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতেরা বুঝতে পেরেছিলেন পর্বতমালাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে:

(ক) তাঁবুর খুঁটির মতো, যেন তাঁবু নড়াচড়া না করে
(খ) নংগরের মতো যেন তা জাহাজকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখে
(গ) পৃথিবী যাতে আন্দোলিত না হয়; অর্থাৎ ভূমিকম্প কম হয়।

কিন্তু, আসলে, এই তথ্য সঠিক নয়। পর্বতমালা সৃষ্টির সময়ে ভূমিকম্প হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

যেহেতু এই আয়াতগুলো একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যাকে তুলে ধরেছে, ওপরের আয়াতগুলো উদ্ধৃত করার পরে ডঃ বুকাইলি লিখেছেন,

> "আধুনিক ভূতত্ত্ববিদদের মতে, পৃথিবী পৃষ্টের ভাঁজের ওপরে ভিত্তি করে পর্বতসমূহ দন্ডায়মান। এসব খাঁজভাজের আয়তন মোটামুটিভাবে দশ মাইল পর্যন্ত বিসতৃত হয়ে থাকে। এসব ভাঁজ-খাঁজের প্রাকৃতিক অবস্থান থেকেই ভূত্বক দৃড়তা ও স্থিরতা লাভ করেছে।"

কিন্তু এই কথা কি ঠিক? ডঃ বুকাইলির বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ড. ডেভিড এ ইয়ং বলেছেন,

> "একদিকে এটি সত্য যে, অনেক পর্বতমালা ভাঁজকরা শিলাস্তর দিয়ে গঠিত (আর এই ভাঁজটি বিশাল আকারের হতে পারে) এই কথা সত্যি নয় যে, এই ভাঁজগুলো ভূপৃষ্ঠকে স্থির রাখে। **এই ভাঁজগুলোর অস্তিত্ব পৃথিবীর অস্থিরতার একটি কারণ**।[১] (গাঢ় অক্ষরের লেখাগুলো আমি করেছি।)

অন্য কথায় বলতে হয়, পর্বতসমূহ পৃথিবীকে আন্দোলনের হাত থেকে রক্ষা করে না। তাদের গঠনের কারণে অতীতে ও আজো পৃথিবীর কাঁপার একটি কারণ।

প্লেটের নড়াচড়া

আধুনিক কালে ভূতত্ত্ববিদরা বলেন যে, ভূপৃষ্টের কঠিন উপরিভাগ বিভিন্ন অংশ বা প্লেট দিয়ে গঠিত। একটি প্লেট আরেকটি প্লেটের সাথে ধীরে ধীরে নড়ছে নখের বৃদ্ধি পাওয়ার মতো ধীরে ধীরে সাথে তা নড়াচড়া করে কখনো কখনো একটি প্লেট থেকে আরেকটি প্লেট আলাদা হয়ে যায়, আর অধিকাংশই ভূতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস করেন যে, ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা আলাদা হবার এটি একটি কারণ।

পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে প্লেটের সাথে প্লেটের সংঘর্ষের ফলে প্লেটগুলো নীচু হয়, এবরো থেবরো হয়ে একটি প্লেটের ওপর আরেকটি প্লেট উঠে যাওয়ার ফলে পর্বতের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের পর্বত সৃষ্টির উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যে দেখা যায়। যেখানে আরব থেকে শুরু হয়ে ইরানের দিকে পর্বতমালা চলে গিয়েছে, যা যাগরোস পর্বতমালায় দেখা যায়। মরক্কোর এটলাস আল্পস পর্বতমালা প্লেটের নড়াচড়ার ফলে সৃষ্ট "ভঙ্গিল পর্বতমালার" আর একটি উদাহরণ।

পৃথিবীর অনেক জায়গায় যখন কেউ সড়কপথে ভ্রমণ করেন, তখন তিনি পাহাড়ের পাশে বেলে পাথরের স্তুপ দেখতে পায়। যেভাবে অনেক অনেক বছর আগে সাগরের তলে সেগুলো জমা

[১] Professor of Geology, Calvin College, Grand Rapids, Michigan, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ

হয়েছিল, এগুলো আনুভূমিক স্তরে ঠিক একইভাবে সাজানো রয়েছে। এখন তারা পানির ওপরে বাতাসে ৩০০, ৫০০ ও ৯০০ কোণে অবস্থান করছে। রেখাচিত্র ক- এই ধরণের পাহাড়ের গঠন দেখাচ্ছে।

রেখাচিত্র ক

প্রায় ৪১২ হিজরী/১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে সিনা তাঁর "*কিতাব আল-শিফা*" বইয়ে এই স্তরসমূহের কথা লিখেছেন। তিনি এই কাত হওয়া অবস্থান সম্পর্কে কিছুই বলেননি। কিন্তু এই স্তরসমূহ সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন,

> "এটি সম্ভব যে, প্রতিবার সাগরের ভাটার ফলে ভূমি বের হয়ে পড়েছিল, একটা স্তর ফেলে রেখে গিয়েছিল, **যেহেতু কিছু কিছু পর্বতমালাকে আমাদের মনে হয়, সেগুলো স্তরে স্তরে স্তুপাকারে তৈরি হয়েছে**। এই কারণে যে-কাদামাটি থেকে এগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো স্তরে স্তরে একইভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। একটি স্তর আগে তৈরি হয়েছে, তারপর, আরেকটি স্তর তৈরি হয়েছে, এভাবে স্তুপাকারে একটির ওপর আরেকটি স্তর স্তুপাকারে জমা হয়েছে।"[২]

কখনও কখনও প্লেটগুলো একটির ওপর আরেকটি উঠে যায়। প্লেটগুলোর এই পিছলে উঠে যাওযার সময় প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। ঘর্ষণের শক্তি যখন প্রবল হয়, তখন প্লেটটি সামনের দিকে কম্পনের সৃষ্টি করে। ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। সমপ্রতি এক ভূমিকম্পে দেখা গিয়েছে মেক্সিকোতে থাকা ককোস প্লেট হঠাৎ লাফ দিয়ে তিন মিটার এগিয়ে গিয়েছিল।

অন্যান্য ভূমিকম্পের সময় প্লেটের অংশগুলো ওপর ও নিচের দিকে ঠেলা দেয়। ১৯২৩ সালে জাপানের সেগামি বেলাভূমিতে এক ভূমিকম্প হয়েছিল। এর ফলে টোকিওর অর্ধেক অংশ ধ্বংস হয়েছিল। "মাস মর্টালিটি ইন দি সি" নামে এক অধ্যায়ে ব্রংগাসমা -সেন্ডারন এই ভূতত্ত্বীয় পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন,

> "আর কোনো ভূমিকম্পের কথা আমাদের জানা নেই, যার ফলে সাগরতলে এতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ধ্বংস হয়েছে। সেগামি বেলাভূমির মধ্য অঞ্চলে বিশাল এলাকা জুড়ে এই ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সাগরতল উত্তর পশ্চিমে ৪৬০ ফুট (১৪০ মিটার), মাঝখানের কাছাকাছি এলাকায় ৫৯০ ফুট (১৮০ মিটার) ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৫৫৬ ও ৬৯০ ফুট (২০০-২১০ মিটার) ধ্বসে গিয়েছিল। উত্তর-পূর্ব অংশে সাগর তল সর্বোচ্চ ৮২০ ফুট (২৫০ মিটার) এবং

[২] *A Sourcebook of Medieval Science,* Edward Grant, Harvard University Press, 1974, p. 620.

দক্ষিণ- পশ্চিম অংশে ৩২৮ ফুট (১১০০ মিটার) সাগরতল উঁচু হয়ে উঠে। (ডেভিডসন থেকে উদ্ধৃত, ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৯৪)[৩]

ইবনে সিনা যদিও মনে করতেন যে, মাটির অভ্যন্তরে প্রবাহিত বাতাসের জন্য ভূমিকম্প হয়, তবে তিনি ওপরে উল্লেখিত প্রতিক্রিয়ার কথা যথাযথভাবে উল্লেখ করে বলেছেন,

> "পাহাড় তৈরি হতে পারে একটি প্রয়োজনীয় কারণে, — যখন অন্যান্য প্রচন্ড ভূমিকম্পের ফলে, যেমন দেখা যায়, — বাতাস ভূমিকম্পের সৃষ্টি **করে, এর ফলে ভূপৃষ্টের একটি অংশ উঁচু হয়ে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।**"[৪]

আগ্নেয়গিরী

আগ্নেয়গিরীর দ্বারা আরেক ধরনের পর্বত তৈরি হয়। লাভা ও ছাই মাটির ভেতর থেকে বের হয়ে আসে এবং একটি বিরাট পর্বতের সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত স্তরে স্তরে সজ্জিত হতে থাকে। এটি অনেক সময় সাগরের তলদেশেও ঘটে। হাওয়াই পর্বতমালা মহাসাগরের ১.৫ কিলোমিটারের বেশী (১ মাইল) গভীর তলদেশ থেকে উঠে এসেছে। মাওনাকিয়া আগ্নেয়গিরীর জ্বালামুখ ৪.২ কিলোমিচার (২.৬ মাইল) পানির বাইরে আছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ১৮৮৩ সালে আগ্নেয়গিরীর অগ্নুপাতের একটি ঘটনা ঘটেছিল। এ সময়ে দ্বীপটা ধ্বংস হয়েছিল। এতে ৩৬০০০ লোক নিহত হয়েছিল। অন্যান্য সময়ে আগ্নেয়গিরী অনেক বড়-বড় ভূমিকম্পের জন্য দায়ী। এর ফলে আশেপাশের শহরগুলো সব ধ্বংস হয়েছিল। সিসিলির মাউন্ট এটনার কাছাকাছি কেটানিয়া শহরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আট বার এই শহরটি ধ্বংস হয়েছিল। এর ৩০০০ মিটার জ্বালামুখ এখনও সক্রিয় আছে এবং ১৯৮৩ সালে ২০০ বারেরও বেশী ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। যখন এটি অগ্নুপাত শুরু করে এর লাভা আশেপাশের অনেক গ্রামের প্রায় সবটাই ধ্বংস করেছিল।

৮ নম্বর রেখাচিত্রে আমরা উভয় পদ্ধতি দেখতে পাই। বামে ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান প্লেট ডান দিকে অগ্রসর হয়ে ডান দিক থেকে আসা পেসিফিক প্লেটকে জোর করে নীচের দিকে চাপ দিচ্ছে। মধ্যভাগে দুটো সন্তানে দেখা যাচ্ছে, তরল লাভা ওপর দিকে ওঠে এসে আগ্নেয়গিরীগুলো তৈরি করছে এসব কাজের ফলে বিরাট ভূমিকম্প প্রবণএলাকা রেখাচিত্রের ডান কোণায় তৈরি হচ্ছে।

---

[৩] *Treatise on Marine Ecology and Paleoecology,* Vol 1, Geological Society of America, Memoir 67, 1957, p 976.

[৪] (ইবন-সিনা) গ্র্যাণ্ট, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৬১৯

রেখাচিত্র ৮

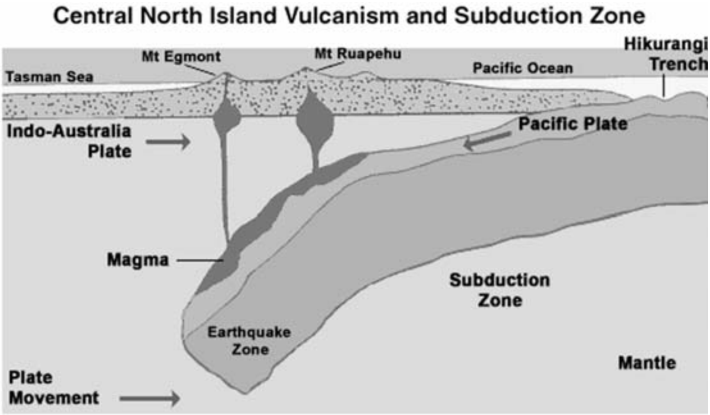

সেন্ট্রাল নর্থ আইল্যান্ড এর আগ্নেয়গিরীর নালাপথ
ক্রাইষ্ট চার্চ, নিউজিল্যান্ড হিউরিস্কো লিমিটেড-এর অনুমতিক্রমে ছাপানো হলো

এই তথ্য থেকে **আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি** যে, পর্বতসমূহ আসলে প্লেটের আন্দোলন ও নাড়াচড়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। **আর আজও এদের আন্দোলন ও নড়াচড়ার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। যখন একটি প্লেটের ওপর আরেকটি প্লেট জোর করে উঠে যায়, তখনি ভূমিকম্প হয়। যখন আগ্নেয়গিরীর অগ্নুপাত হয়, তখন ভূমিকম্পও হয়।**

পৃথিবীর ওপর পর্বতমালাকে নিক্ষেপ করার বিষয়টি হয়তো বা কাব্যিকভাবে বলা হয়েছে এটা ধরে নেয়া যায়, কিন' যদি বলা হয় যে, পর্বতমালার কারণে পৃথিবী আন্দোলিত হয় না, তাহলে এটি "মারাত্মক ভুল", কারণ আধুনিক ভূতত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে এই ব্যাখ্যার একেবারেই কোনো মিল নেই। হতে পারে যে, মুসলমান লেখক, ধর্মতত্ত্ববিদ বা বিজ্ঞানীরা পর্বতমালার তৈরির বিষয়ে নিজেরা প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন তৈরি করে নিতে সক্ষম হবেন। এবং পৃথিবীর আন্দোলন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে তাঁদেরকে সন'ষ্ট করতে পারবে। কিন' তবু এটি একটি দুর্বোধ্য বিষয় হিসেবেই রয়ে যাবে।

ড.টর্কি এই আয়াতগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর বইয়ের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বিভিন্ন জটিল আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পর্বত সম্পর্কে তিনি নিজেও তিনি সম্পূর্ণ **প্রসঙ্গের বাইরে আয়াত উদ্ধৃত করার** লোভ সামলাতে পারেননি। তারপর কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মাঝে মিল রয়েছে বলে তিনি দাবী করেছেন।

ভূপৃষ্টের প্লেটগুলোর স্থানান্তর সম্পর্কে কয়েক অনুচ্ছেদ আলোচনা করার পরে (এখানে এই সত্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে যে, বছরে এই স্থানান্তরের গতি হচ্ছে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার) তিনি বলেছেন যে, এই তথ্যটি মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-নমল (পিপিলিকা) ২৭:৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ, কিন্তু সেই দিন উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের মতো সঞ্চরমান।" (পিকথল অনুবাদ করছেন মেঘের মতো উড়বে)

কিন্তু যখন আমরা প্রসঙ্গ বুঝার জন্য আগের আয়াতটি দেখি, তখন এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এর একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,

"এবং যেদিন শিঙগায় ফু দেওয়া হইবে .— আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীতবিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকটে আসিবে বিনীত অবস্থায়। তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ, কিন্তু সেই দিন উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের মতো সঞ্চরমান।"

শিঙ্গার শব্দ, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়বে, তাতে বুঝা যায় যে, এই আয়াতগুলো ভয়ংকর টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়ার ঘটনার কথা বলেছে যা কেয়ামতের সময়ে সংঘটিত হবে- এই ঘটনায় পর্বতসমূহ উড়ে যাবে।

২. সপ্ত স্তরে বিভক্ত আকাশমন্ডলী

কোরআনে কয়েকটি আয়াতে সপ্তম স্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলীর কথা বলা হয়েছে, ড. টর্কি এই আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নলিখিতভাবে আয়াতগুলো তিনি উদ্ধৃত করেছেন,

প্রথম যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা নুহ (নবীর নাম) ৭১:১৫-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই, আল্লাহ্ কীভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশ মন্ডলী? এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে।"

মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা মূলক (রাজত্ব) ৬৭:৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ— ।

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসী) ২৩:১৭, ৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

"আমি তো তোমাদিগের উর্দ্ধে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্ত স্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নহি। "জিজ্ঞাসা করো,' কে সপ্তাকাশ ও আরশের অধিপতি?'"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা হামিম আল-সেজদা (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ ও সেজদা) ৪১:১২ আয়াতে বলা হয়েছে,

"অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন— ।"

হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা বনি-ইসরাইল (ইসরাইল সন্তানগণ) ১৭:৪৪-১ আয়াতে বলা হয়েছে,

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে অর্ন্তবর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।"

২ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-বাকারা (গাভী) ২:২৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

একজন সহজেই এই আয়াতগুলোকে কবিতা বলে ধরে নিতে পারেন। কিন্তু ড. টর্কি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, এই বক্তব্যগুলোর সাথে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের মিল রয়েছে।[৫]

এই পৃথিবীর বায়ূমন্ডল থেকে তিনি শুরু করেছেন। এই বায়ূমন্ডল প্রায় গড়ে ৪০ কিলোমিটার পুরু। একে তিনি প্রথম আকাশ ও তারপর তিনি একে ১০০০০০ দিয়ে গুণ করে দ্বিতীয় আকাশ বা উর্দ্ধ আকাশ, একে আবার ১০০০০০ দিয়ে গুণ করে তৃতীয় আকাশ বা সৌর মন্ডল এভাবে প্রতিবারই তিনি ১০০০০০ দিয়ে গুণ করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন, প্রথমে রয়েছে নিকটবর্তী তারাদের আকাশ, তারপর নীহারিকার আকাশ (যেহেতু আয়তনে তা আমাদের নীহারিকার সমান) পরে নিকটবর্তী নীহারিকার আকাশ ও সবশেষে কসমিক বা মহাজাগতিক আকাশ।

এই তালিকা অনুসারে অবশ্য দেখা যায় যে, আকাশের ৭টি স্তর রয়েছে। কিন্তু তাঁর তালিকা বিশ্লেষণ করলে এটি আমাদের তা বিশ্বাস করতে সাহায্য করে না। পৃথিবীর বায়ূমন্ডলকে প্রথম আকাশমন্ডল তারপরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, এভাবে সপ্তম স্তরে আকাশ সাজানো হয়েছে। এটা কিছুটা সঠিক হতে পারে, কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ সঠিক এই কথা বলা যায় না। এটি হচ্ছে নিজের খেয়ালখুশি মতো বলা। এই কথা ড. টর্কি নিজেই বলেছেন যে, পৃথিবীর বায়ূমন্ডলের বাইরে, মহাশূন্য সবজায়গাই গুণগতভাবে একইরকম, আর এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাজানো রয়েছে।

এটি হচ্ছে **প্রাথমিক অনুমান** বা বেসিক এসাম্পসন **যে**, নিরবিচ্ছিন্ন মহাকাশকে চন্দ্রাকাশ বা সূর্যাকাশে বিভক্ত করা।

প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন হচ্ছে সূর্যকে আলাদা করা। কারণ সূর্য নিজেই হচ্ছে একটি তারা, কাছাকাছি তারা থেকে বা সূর্য কাছাকাছি তাঁর ছায়াপথে রয়েছে।

প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন হচ্ছে আমাদের ছায়াপথ এক আকাশ মন্ডল ও অন্য ছায়াপথগুলোর আরেকটি আকাশমন্ডল রয়েছে।

এমনকি ১০০০০০ দিয়ে গুণ করা মনে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নিজের খেয়ালখুশি মতো **প্রাথমিক অনুমিত বিষয় (বেসিক এসাম্পসন)** করা, এখানে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেওয়া হয়নি এবং ড. টর্কি অন্য জায়গায় যে রূহানিক সংখ্যা-"৭"বা "১৯" উল্লেখ করেছেন এর সাথেও এই সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই।

---

[৫] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১১১-১১৪

এই ধরনের **প্রাথমিক অনুমান বা** বেসিক এসাম্পসন তৈরি করা ভুল নয়। এই অধ্যায়ে লেখক এটি দেখাতে চেয়েছেন যে, আমরা সকলেই তা করতে পারি। কিন্ত এগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আমাদের বিশ্বাস জন্মায় না।

এমনকি মুসলমানদের অবস্থান থেকে অধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে ড. টর্কির দেওয়া তত্ত্বের সাথে কোরআনের আয়াতগুলো একমত নয়। প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-সাফ্‌ফাত (শ্রেণীবদ্ধকারীগণ) ৩৭:৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির (কাওয়াকিব ٱلْكَوَاكِبِ) দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা হামিম আল-সেজদা (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ ও সেজদা) ৪১:১২ আয়াত

> "অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং **আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা** (মাছাবীহ্ ٱلْمَصَابِيح) দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত।"

মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা মূলক (রাজত্ব) ৬৭:৩, ৫ আয়াত

> "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ—আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা (মাছাবীহ্ ٱلْمَصَابِيح) দ্বারা।

১১৮ পৃষ্ঠায় ড. টর্কি বলেছেন, কোরআনে এই যে, "প্রদীপমালা"র কথা বলা হয়েছে, তা নিকটবর্তী আকাশে রয়েছে। এগুলো হচ্ছে "তারা"।[৬] যদিও তিনি এভাবে কাল্পনিক নিজস্ব শ্রেণীবিভাগ করেছেন সেখানে তিনি তারাদের **দূরবর্তী ৫টি আকাশে** রেখেছেন।

কিতাবুল মোকাদ্দসে আকাশমন্ডলীর কথা ৭০০ বার বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসে একটির বেশী আকাশের কথা কেবল ১ বার বলা হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফে-নতুন নিয়মে- হজরত পৌল একজন ঈমানদারের কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁকে তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত তুলে নেয়া হয়েছিলঃ

> "**ঈসায়ী ঈমানদার একজন লোককে আমি চিনি**। চৌদ্দ বছর আগে **তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল**। তখন সে তার শরীরের মধ্যে ছিল কি ছিল না আমি জানি না, আল্লাহ্ জানেন। আমি জানি যে সেই লোককে তৃতীয় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছিল। সে এমন কথা শুনেছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং মানুষকে তা বলতে দেওয়াও হয় না।" (২ করিন্থীয় ১২:২-৪)

---

[৬] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১১৮

এখানে স্পষ্টভাবে রূহানিক আকাশের কথা বলা হয়েছে। এটি কোনো পার্থিব আকাশ নয়। কিন্তু যদিও এখানে বেহেশত নামে একে ডাকা হয়নি, তবু আসলে এটি বেহেস্তের কথাই বলা হয়েছে। নইলে এই কথা বলার কী অর্থ হতে পারে যে, এই বিশ্বাসীকে এই ছায়াপথের বাইরে অন্য কোনো ছায়াপথে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৩. জলন্ত তারা- উল্কা এবং পতিতউল্কাপিণ্ড

আমরা এই বইয়ের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সামান্যই করেছি। এই বিষয়ে কোরআনে দেওয়া সব আয়াতগুলো আমরা এখন দেখবো।

প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-সাফফাত (শ্রেণীবদ্ধকারী গণ) ৩৭:৬-১০ আয়াত

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির (কাওয়াকিব) দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি, এবং রক্ষা করিয়াছি **প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান** হইতে। ফলে উহারা **উর্দ্ধ জগতের** কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের **প্রতি** নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে জলন্ত শিখা (শিহাবুন-ছাক্বিবুন **شِهَابٌ ثَاقِبٌ**) বিতাড়নের জন্য এবং ইহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা জিন্ন (দানব) ৭২:৮-৯ আয়াত

"জিন্নেরা বলিয়াছিল এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও **উল্কাপিণ্ড** (শুহুবান **شُهُبًا**) দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু **এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের** (শিহাব **اَلشِّهَابِ**) **সম্মুক্ষিণ হয়।**

মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-মূলক (রাজত্ব) ৬৭:৫ আয়াত

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা (মাছাবীহ্ **اَلْمَصَابِيح**) **দ্বারা এবং** উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের (রুজুমান **رُجُومًا**) উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জলন্ত অগ্নির শাস্তি।

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-হিজর (বিচ্ছেদ) ১৫:১৬-৯৮ আয়াত

"আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত-দর্শকদের জন্য; প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি, আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাৎধাবন করে জলন্ত শিখা (শিহাব **اَلشِّهَابِ**)।

প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-তারিক (নৈশ আগন্তুক) ৮৬:২-৩ আয়াত

"তুমি কি জানো রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা কী? উহা **উজ্জল নক্ষত্র** (আল-নাজ্‌ম আল-ছাক্বিব **النَّجْمُ الثَّقِبُ**)।

এই শেষের আয়াতটিতে প্রসংগ থেকে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না যে, এখানে সুনির্দিষ্টভাবে কী বস্তুর কথা বলা হয়েছে? কিন্ত যেহেতু এখানে বিশেষণ হচ্ছে, "জলন্ত" তাই আয়াতগুলোর তালিকা সম্পূর্ণ করার জন্য এই আয়াতকেও অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

লোকেরা যাকে "জলন্ত শিখা" বলে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলোকে উল্কা বলা হয়, এগুলোর মধ্যে প্রধানতঃ দুই ধরনের বস্তু রয়েছে, উল্কা ও পতিত উল্কা পিণ্ড।

ক. উল্কাঃ

কোরআনের বেশীরভাগ আয়াতে উল্কার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্কাগুলোর আকৃতি একটি পিনের মাথার চেয়ে বড় হয় না। প্রতি সেকেন্ডে ১৮.৬ মাইল বেগে বা ৩০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর বায়ূমন্ডলে প্রবেশ করার সময়ে এগুলো ঘর্ষণের কারণে শ্বেত শুভ্র হয়ে জ্বলে উঠে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র উল্কাগুলো- যেগুলোর ব্যাসার্দ্ধ ১ মিলিমিটারের ২০ভাগের ১ভাগ, - অনেক সময়ে ধ্বংস না হয়ে উল্কার ভূপতিত ক্ষুদ্র টুকরারূপে পৃথিবী পড়ে। এর মধ্যে অনেকগুলোকে পরে খুঁজে বের করা হয়েছে। দেখা গেছে, এই উল্কাগুলোর কোনো কোনোটির মধ্যে লৌহ-নিকেল যৌগ রয়েছে। এমনকি এর কোনো কোনোটিতে ৬০% এরও বেশী নিকেল রয়েছে।

বিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে আরো বলা যায়, উল্কা বৃষ্টির সময়ে অনেক উল্কাকে একই সময়ে দেখা যায়। যদিও তা প্রমাণিত হয়নি, তবু এই কথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, পুরানো ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষ থেকে এই উল্কাবৃষ্টি হয়। যখন পৃথিবী এই ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে সেই সময়ে উল্কাগুলো সমান্তরাল পথে ধাবিত হয়। এমনকি দৃশতঃ, দিগন্ত রেখার ওপরে একটি বিন্দু থেকে উল্কাগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। বৃটিশ মিউজিয়ামের উল্কা বিভাগের তত্ত্বাবধানকারী রবার্ট হাচিনসনের মত অনুসারে, "বিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ডগুলো পানি যেমন বরফ, হিমায়িত এমোনিয়া, মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে তৈরি।"[৭]

ইউসুফ আলী, পিকথল ও হামিদুল্লাহ তাঁদের মন্তব্যে সবাই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ওপরের আয়াতগুলোতে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ উল্কা।

খ. পতিত উল্কাপিণ্ড

এগুলো হচ্ছে কঠিন ধাতব পিণ্ড যা বায়ূমন্ডলে প্রবেশ করা সত্ত্বেও টিকে থেকে মাটিতে আঘাত করে। বায়ূমন্ডলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে বাইরের আবরণীটা বাষ্প হয়ে গলে যায়। সে'জন্য, এদেরকে আলোর উজ্জল গোলাকার বস্তু রূপে দেখা যায়। এগুলোকে বড় উল্কা বলা হয়।

---

[৭] *The Search for Our Beginnings*, Hutchison, Oxford U. Press, 1983.

সম্ভবতঃ কোরআনে ওপরে উল্লেখিত সূরা আল-তারিক (নৈশ আগন্তুক) ৮৬ নং সূরায় একেই "রাত্রিতে আবির্ভূত" উজ্জল নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে।

তিন ধরনের পতিত উল্কাপিণ্ড রয়েছে। (১) লৌহ- যেগুলো নিকেল- লোহা যৌগ দিয়ে তৈরি। (২) পাথর যেগুলো সিলিকেট দিয়ে তৈরি (৩) পাথর- লৌহ যৌগ যা পাথর ও লোহার মিশ্রনে তৈরি। পতিত উল্কা পিণ্ডের নমুনা থেকে প্রতিফলিত আলো গ্রহানুপুঞ্জ থেকে প্রতিফলিত আলোর অনুরূপ। এটি এবং তিনটি উল্কাপিণ্ডের কক্ষসমূহ যা পতনের সময়ে যে ছবি তোলা হয়েছে, তাতে এই মতবাদ সমর্থন করে যে, বেশীরভাগ পতিত উল্কাপিণ্ড গ্রহানুপুঞ্জ বলয় থেকে আসে।

এখানে যে সমস্যাটি রয়েছে, তা অবশ্যই বিজ্ঞানের সমস্যা - উল্কা বা পতিত উল্কাপিণ্ড কী দিয়ে তৈরি এর মধ্যে বিরোধের বিষয় নয়। সমস্যাটি হচ্ছে কোরআন যা বলেছে, তা আমরা কেমন করে বুঝবো? "রাজিম" শব্দটির সাধারণতঃ অনুবাদ করা হয় "অভিশপ্ত"। আধুনিক অনুবাদে ক্রিয়াপদ অনুসারে এর অর্থ হচ্ছে -পাথর ছোড়া এবং হামিদুল্লাহ ৬৭ নং সূরার এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন যা আগে আমরা উল্লেখ করেছি। এখানে আবার তা দেওয়া হলো,

> "এবং আমরা ওগুলোকে সাজিয়েছি প্রদীপমালা দিয়ে, শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য"
> (লেখক নিজেই ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন)

আমরা কী বুঝতে পারি যখন এটি বলে যে, কার্বন ডাই অক্সাইড বা লোহা-নিকেল যৌগ দিয়ে তৈরি পতিত উল্কাপিণ্ড আল্লাহ্ এগুলোকে দেহবিহীন শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করেন, যখন সে চুরি করে আকাশের খবর জানতে চায়? আর আমরা পতিত উল্কা বৃষ্টিকেই কী বলবো, যখন ওগুলো সমান্তরাল পথে ধাবিত হয়? আমরা কি এই বুঝবো যে, শয়তান এই সময়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে? আসলে এগুলো সহজ প্রশ্ন নয়।

৪. সময়ের ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই

ক) কোরআনে বর্ণিত সৃষ্টির দিন

এই বইয়ের ১ম অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে "ধোঁয়া" শব্দটির অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অংশে আমরা একটি বিশদভাবে দিনের সংজ্ঞা এবং তাদের বিন্যাস সম্পর্কে দেখতে চাই। ছয় দিনে আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এই কথা কোরআনে বিভিন্ন সূরার ৯:৫৪; ১০:৩; ১১:৭; ২৫:৫৯; ৩২:৪, ৫০:৩৮ এবং ৫৭:৪ এই ৭টি আয়াতে বলা হয়েছে। শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা ইউনুস ১০:৩ আয়াতের উল্লেখ করাই

এখানে যথেষ্ট হবে। কারণ, যে-তথ্যগুলো অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে, এই আয়াতের মধ্যেই সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে। এখানে বলা হয়েছে,

"তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী **৬ দিনে** সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং, তাঁহার ইবাদত কর।

এখানে সরাসরি, স্পষ্ট ভাষায় সৃষ্টিকাজের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ মক্কী যুগের সূরা হামিম আল-সেজদা (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ ও সেজদা) ৪১:৯-১২ আয়াতে বলা হয়েছে,

"বলো, তোমরা কি তাঁহাকে Aস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন **দুই দিনে** এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক! তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্টে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যান এবং **চারদিনের** মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূর্মপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন,' তোমরা উভয়ে আস' ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।'

উহারা বলিল.'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া'।

অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে **দুই দিনে** সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা।"

এই আয়াতগুলো পড়ে দিনগুলো যোগ করার জন্য কোনো অংক জানা পন্ডিতের প্রয়োজন নেই, একজন সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারেন যে, এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ২দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তী ৪দিনে প্রত্যেকের জন্য সমভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। যার মোট অর্থ হচ্ছে ৬ দিন। এছাড়াও পর্বতমালা সৃষ্টির পর, প্রতিটি প্রাণীর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করার পর তারপর তিনি ২দিনে সপ্তাকাশ তৈরি করলেন। **তাহলে** দেখা যায় যে, এখানে সব মিলিয়ে ৮দিনের কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং, এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো তথ্যের মধ্যে কোনো মিল নেই!?

কোরআনে ৭ বার বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এখানে ৮ দিনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং, একজন সাধারণ লোক কোন কথটি বিশ্বাস করবেন? এরিষ্টটল যে-কথা বলেছিলেন তা আমরা তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সেই নিয়ম অনুসারে এখানে সন্দেহের সুবিধা লেখককে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সুবিধা আমাদের নিজেদের জন্য নয়।

সুতরাং, এখানে প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন তৈরি করা মনে হয় যুক্তিযুক্ত হবে, যে হজরত মোহাম্মদের ধারণা অনুযায়ী কয়েকটি দিন একত্রে ছিল। তাই এই দিনগুলো একই সাথে হিসেব করতে হবে। এভাবে ৬দিনে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, এই কথা বলা যায়। কিন্তু এই কথা

ধরে নিলেও সমস্যা রয়ে যায়। আকাশ মন্ডলী সৃষ্টির আগেই পৃথিবী তৈরি হওয়া, শীতল হওয়া, খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই বিষয়টি বুঝা কঠিন। একই ঘটনার পর্যায়ক্রম আমরা সূরা আল-বাকারা (গাভী) ২:২৯ আয়াতেও দেখতে পাই। এখানে বলা হয়েছে,

> "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন— ।"

কোরআনের এই বক্তব্য কোনো মতেই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে এক নয় বলে এই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আমি অন্য খানে দেখবো।

খ. ইউনুস নবীর বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের দিনের উল্লেখ

পাঠক সম্ভবতঃ আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন এই সামান্য বিষয় নিয়ে কেন আমরা এতো বিশদ আলোচনা করছি? এর কারণ হচ্ছে, ডঃ বুকাইলি একই ধরনের সময়-সমস্যা নিয়ে পুরো পৃষ্ঠা ৯জুড়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "মথি লিখিত সুসমাচারেই **সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অসম্ভব ঘটনার বিবরণ** লেখা রয়েছে। ঈসা মসীহের মুখ দিয়ে লেখক যা **বলেছেন, তার যৌক্তিকতাও মেনে নেয়া কঠিন**। হজরত ইউনুসের নিদর্শন বলতে গিয়ে (১২:৩৮-৪০) বলা হচ্ছে, ঈসা মসীহ্ যখন জনকয়েক অধাপক ও ফরিশিদের মধ্যে ছিলেন তখন তাঁরা তাঁকে বললেন,
>
> "হুজুর! আমরা আপনার কাছ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাই।"
>
> ঈসা মসীহ্ তাদের বললেন, "এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে কিন্তু ইউনুস নবীর চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্ন তোমাদের দেওয়া হবে না। ইউনুস যেমন সেই মাছের **পেটে তিন দিন দিন রাত** ছিলেন, তেমনি ইবনুল ইনসানও **তিন দিন তিন রাত** মাটির নিচে থাকবেন।"

এরপর ডঃ বুকাইলি দেখাতে চেয়েছেন. একই লেখক হযরত মথির বথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন ঈসা মসীহকে শুক্রবারে ক্রুশে দেওয়া হয়। শুক্রবারের রাত, শনিবার, শনিবার রাত কবরে ছিলেন। এবং রবিবার খুব ভোরে জীবিত হয়ে উঠেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, **তিন দিন কিন্তু দুই রাত তিনি কবরে ছিলেন।**

ঈসা মসীহ্ ভবিষৎদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি মারা যাবেন এবং মাটির গভীরে তিনি **তিন দিন তিন রাত** থাকবেন। ইহুদীদের ঈদুল ফেসাখের আগে -২৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতের শেষে বা বসন্ত কালের শুরুতে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ছয়মাস পরে তিনি আরেকবার তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন, এই সময় তিনি বিশদভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এখানে বলা হয়েছে,

“সেই সময় থেকে ঈসা মসীহ্ তাঁর উম্মতদের জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে জেরুসালেমে যেতে হবে এবং বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান ঈমামদের ও আলেমদের হাতে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে এবং **তৃতীয় দিবসে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।**” (মথি ১৬:২১)

এর এক সপ্তাহ বা ১০ দিন পরে তিনি আবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন (মথি ১৭:২২-২৩) এবং সবশেষে ৩০ খ্রীষ্টাব্দের ঈদুল ফেসাখের ১০ দিন আগে তিনি “ইবনে আদম” এই উপাধি ব্যবহার করে ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের বলেছেন,

“আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি। সেখানে ইবনে আদমকে প্রধান ঈমামদের ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তারা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে স্থির করবেন। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার জন্য এবং চাবুক মারবার ও ক্রুশের ওপরে হত্যা করার জন্য অ-ইহুদীদের হাতে দেবেন; পরে **তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।**” (মথি ২০:১৮-১৯)

“তৃতীয় দিন” তিন দিন ও তিন রাতের সমান হতে পারে এই বিষয়টি ডঃ বুকাইলি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং, তাঁর মতে এটি বড় ধরনের অসঙ্গতি !?! কিছু মনে করবেন না, **এখানে** ঈসা মসীহের **মৃত্যু ও পুনরুত্থান হচ্ছে আসল বিষয়।** ঈসা মসীহ্ ভুল গণনা করেছেন, এটাই কি তাঁর কাছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হয়েছে?

কিন্তু আমরা কি এতোটাই নিশ্চিত করে বলতে পারি হজরত মথি গুণতে ভুল করেছিলেন? আমরা সন্দেহের সুবিধা কি লেখককে দিতে পারি না? আর প্রশ্ন করতে পারি না যে, হজরত মথি এবং ঈসা মসীহ্ আর প্রথম শতাব্দীর অন্যান্য ইহুদীরা “তিনদিন এবং তিনরাত” বলতে কী বুঝতেন?

এ টি রবার্টসন[৮] এর মত অনুসারে “ইহুদীদের সুপরিচিত প্রথা হচ্ছে, কোনো দিনের একটি আংশিক সময় বলতে তারা সম্পূর্ণ দিন বুঝাতো— তাহলে শুক্রবারের আংশিক দিনের অংশকে তাঁরা ১ দিন গণনা করেন। শনিবার ১ দিন আর রবিবারের আংশিক সময়কে ১দিন গণনা করেন।

একই প্রথা উত্তর আফ্রিকায়ও পালিত হয়। যদি আমি কোনো রুগীকে- যিনি শনিবার দিন ব্যথা পেয়েছেন এবং সোমবার সকালে আমার কাছে এসেছেন- জিজ্ঞেস করি, “আপনি কতদিন ধরে ব্যথা পাচ্ছেন? “তিনি সব সময়ে বলবেন. “**তিন দিন** ধরে ব্যথা হচ্ছে।” যদিও তিনি ৪৮ ঘন্টারও কম সময় ধরে ব্যখা পাচ্ছেন। ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে ঈসা মসীহ্ নিজে এই কথাটিই বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি ডঃ বুকাইলি মনোযোগ দিয়ে মথি লিখিত ইঞ্জিল পড়তেন, তিনি একটি তৃতীয় বাকাংশ খুঁজে পেতেন, যা থেকে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেন। মথি ২৭:৬২-৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

“পরের দিন, অর্থাৎ আয়োজনের পরের দিন প্রধান ঈমামেরা এবং ফরিশীরা পীলাতের কাছে জমায়েত হয়ে বললেন, ”হুজুর, আমাদের মনে পড়েছে, সেই ঠগটা বেঁচে থাকতে বলেছিল,’

---

[৮] *A Harmony of the Gospels for Students of the Life of Christ,* Harper and Row, New York, 1922, p 290.

> আমি তিন পরে বেঁচে উঠবো।’ সে’জন্য হুকুম দিন যেন **তিন দিন পর্যন্ত** কবরটা পাহাড়া দেওয়া হয়— ।”

ঈসা মসীহের কথা উদ্ধৃত করে এখানে বলা হয়েছে, “আমি **তিন দিন পরে** বেঁচে উঠবো”, এর অর্থ কি এরকম শুনায়, **“২৪ ঘন্টা হিসেবে তিন দিন পরে”** বা **তিনদিন তিন রাত** বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু সুখবর সিপারার লেখক হজরত মথি একই অর্থে বুঝিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন, “**তিনদিন পর্যন্ত** কবরটা পাহারা দেওয়া হয়।”

সুতরাং, ভাষাবিদ্যা অনুসারে এই তিনটি বাকাংশ মনে হচ্ছে একই কথা বুঝাচ্ছে। আর এই সময়ে লেখক এরিষ্টোটলের কথা অনুসারে লেখককে সন্দেহের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

সবশেষে, একটি রূহানি তথ্য বা যুক্তির কথা বলবো যা অনেক খ্রীষ্টানকে প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে। ঈসা মসীহের কাজের শুরুতে ২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ২৭ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে তিনি কান্না নগরে এক বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন। ঈসা মসীহের মা হজরত মরিয়ম ঈসা মসীহকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি বাড়ির কর্তাকে সাহায্য করেন। কারণ, বিয়ে বাড়িতে আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে গিয়েছিল। ঈসা মসীহ্ মোজেজা করে পানিকে আঙ্গুর-রসে পরিণত করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন, “আমার সময় এখনও হয়নি?” (ইউহোন্না ২:৪)

৩ বছরেরও বেশী সময় পরে ঈসা মসীহের গ্রেফতার হওয়ার অল্প সময় আগে বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলায় তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন,

> “**—সময় হয়েছে**। দেখ, ইবনে আদমকে এখন গোনাহগারদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।” (মার্ক ১৪:৪১)

কোন সময়ের কথা ঈসা মসীহ্ বলেছিলেন? খ্রীষ্টানরা বুঝে “সময়” বলতে তিনি তাঁর কষ্টভোগ এবং আমাদের পাপের জন্য তাঁর মৃত্যুর সময়কে বুঝিয়েছেন। ঈসা মসীহকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে তাঁর এই কষ্টভোগ বৃহস্পতিবার সন্ধে বেলায় শুরু হয়েছিল। এর পরেই তিনি বলেছিলেন, ”সময় হয়েছে” এবং এই সময় তাঁকে চাবুক মারা থেকে শুরু করে, নির্যাতন, ক্রুশে মৃত্যুবরণ করা থেকে পুনরুত্থানের আগের মুহূর্তকে বুঝায়।

যে সময়ে-বৃহস্পতিবার রাতে তিনি বলেছিলেন, “আমার সময় হয়েছে” মৃতদের মধ্য থেকে মহাশান্তিতে রবিবারের ভোরে জীবিত হওয়ার সময়টুকু হচ্ছে, “তিন দিন তিন রাত।”

পাঠক, এই শেষ যুক্তি গ্রহণ করুন আর নাই করুন বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত। যদি **প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন** কোরআনের জন্য তৈরি করা যেতে পারে, যাতে “আট দিন” ছয় দিনের সমান হতে পারে, তাহলে অবশ্যই ভাষাবিদ্যার ব্যবহার ও রূহানি অর্থে “প্রাথমিক অনুমান বা বেসিক এসাম্পসন” ।

অবশ্যই ইঞ্জিল শরীফের জন্যও অবশ্যই প্রয়োগ করা যাবে যাতে “তিন দিন তিন রাত” এবং “তিনদিন পরে “আর “তৃতীয় দিনে” একই কথা বলে ধরে যেতে পারে।

খ) এনাটমি, ভ্রূণ বিদ্যা ও বংশগতিবিদ্যা

৫. বীর্য তৈরির স্থান

৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা নিসার (নারী) ৪:২৩ আয়াত উদ্ধৃত করে আমার একজন মুসলমান বন্ধু একটি মন্তব্য করেছিলেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমাদের জন্য (বিবাহ করা) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে—তোমার **কটিদেশ** (ছুল্‌ব **اَلصُّلْبِ**) থেকে জন্ম নেয়া তোমাদের (ঔরষজাত) পুত্রের স্ত্রী।" (পোষ্য পুত্রের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ নেই)

তিনি দাবী করেছিলেন যে, এখানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, ভ্রূণ বিকাশের সময়ে কিডনী অঞ্চলে পুরুষ অন্ডকোষের উদ্ভব হয়।

যুক্তির দিক দিয়ে একজন বলতে পারেন যে, এটি একবারেই অসম্ভব নয়। কিন্তু একজন ডাক্তার হিসেবে এটা বুঝা কঠিন যে কেন আল্লাহ্‌ এমন একটি অস্পষ্ট তথ্যকে এমন একটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন যেটি এমনকি শল্যবিদ্যা বা এনাটমিতেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে আলোচনা করা হয় না।

অবশ্যই এটি বাক্যালঙ্কার বা উপমা দিয়ে বলা হয়েছে। "—তোমার **কটিদেশ** (ছুল্‌ব) থেকে জন্ম নেয়া তোমাদের পুত্র" বলতে মূল-শব্দের পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করে প্রজনন ক্ষমতার স্থান বুঝিয়েছে। এ শব্দের মূল অর্থ উল্লেখ করার পাশাপাশি ওয়েহার,[১] কাজি মিরস্কি[২] ও আব্দেল নূর[৩] সবাই পৃষ্টদেশ, কটিদেশ বা কোমর" এ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারপর "ইবনে ছুল্‌বিহি **إِبْنُ صُلْبِهِ** " তার নিজের পুত্র একটি রূপক বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এমনকি দ্বিতীয় আরেকটি আরবী শব্দকে একইভাবে সন্তান জন্মের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৭২ আয়াতে বলা হয়েছে,

---

[১] Wehr, ওপরে উল্লেখিত বই

[২] *Dictionnaire Arabe-Français,* A De Biberstein Kasimirski, Maisonneuve, Paris, 1960.

[৩] *Dictionnaire Abdel-Nour al-Mufassal,* Dar el-Ilm lil-Malayin, Beirut, 1983.

“স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্টদেশ (যুহূর اَلظُّهُور) হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন— ।”

আরবী ভাষায় ‘যুহূর’ শব্দটি পৃষ্টদেশ বুঝাতে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। আবারও আমরা দেখি সন্তান উৎপাদনের শক্তি যোগানোর স্থান বা বলিষ্ঠতার স্থান হিসেবে এটি ব্যবহার করা হতো। আসলে ভাষাতত্ত্ববিদদের মত অনুসারে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সংস্কৃতিতে এই শব্দের ব্যপক ব্যবহার ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই ধারণা মেনে নেয়ার জন্য একটি একটি বাধা হচ্ছে, কোরআন “বিজ্ঞানের মোজেজা” হিসেবে একে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে দেখাচ্ছে। আবার একই ধারণা তওরাতেও পাওয়া যেতে পারে। হিব্রু শব্দ “চালাটস” একই অর্থে আরবী শব্দ “সালব”-এর মতো ব্যবহার করা হয়েছে।

যখন ইশাইয়া নবী বলেন, **“তোমার কোমরে (চালাট্‌স) চট জড়াও”** (৩২:১১)’ অথবা নবী হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) লেখেন, “প্রত্যেক **পুরুষকে কোমরে হাত রাখতে** দেখতে পাচ্ছি” (৩০:৬) একথার অর্থ হচ্ছে **“চালাট্‌স”** মানে পৃষ্টদেশ বা কোমর।

হজরত ইয়াকুবের সাথে কথা কলার সময়ে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন,

“তোমার কটিদেশ (চালাটস) থেকে অনেক বাদশাহর জন্ম হবে।” (তৌরাত, পয়দায়েশ ৩৫:১১)

আর ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হজরত দাউদকে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন,

“তবে ঘরটি তুমি তৈরি করবে না, **তোমার কটিদেশ থেকে উৎপন্ন তোমার ছেলে** আমার জন্য সেই ঘর নির্মাণ করবে।” (১ বাদশাহনামা ৮:১৯)

এখানে চালাটস রূপকভাবে “সন্তান উৎপাদনের শক্তি যোগানোর স্থান বা বলিষ্ঠতার স্থান হিসেবে এটি ব্যবহার করা” বুঝিয়েছে।

ইঞ্জিল শরীফের- নুতন নিয়মের- গ্রীক শব্দ “ওসফুস” একই অর্থে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেরিত সিপারায় বলা হয়েছে, হজরত পিতর যখন লোকদের সামনে ওয়াজ করছিলেন, তখন তিনি বাদশাহ হজরত দাউদের কাছে দেওয়া আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

“—তাঁর সিংহাসনে তাঁর কটিদেশের ফল (ওসফাস) বসবে”। (প্রেরিত ২:৩০)

তৃতীয়তঃ ও সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কিতাবুল মোকাদ্দসের মতোই কোরআনেও একটি আয়াতে “কটিদেশ” বুঝাতে “সালব” শব্দটি ব্যবহার করেছে এখানে মূল-শব্দের পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার স্বীকার করা হয়নি।

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-তারিক (নৈশ আগন্তুক) ৮৬:৫-৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

“সুতরাং, মানুষ প্রনিধাণ করুক, কি হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে! তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে, ইহা নির্গত হয় কটিদেশ (ছুল্‌ব اَلصُّلْبِ) ও পঞ্জরাস্থির (তারা'য়িব اَلتَّرَائِبِ) মধ্য হইতে।”

এখানে আমরা দেখি যে, মানুষ তৈরি হয়, তার প্রাপ্তবয়স্ক পিতা থেকে “সবেগে স্খলিত পানি হইতে” “সুতরাং” বলতে যৌন- ক্রিয়ার সময় বুঝানো হয়েছে। “সবেগে স্খলিত পানি” একটি শারীরিক জায়গা “কটিদেশ (সালব) ও পঞ্জরাস্থির (তারায়িব) মধ্য হইতে বের হয়। (কোনো কোনো অনুবাদে মেরুদন্ড ব্যবহার করা হয়েছে)

যেহেতু আয়াতটিতে যৌনক্রিয়ার সময় বলা হয়েছে, তাই এটি ভ্রূণের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারে না। এছাড়াও যেহেতু “সালব” শব্দটি “সবেগে স্খলিত পানি”র সাথে যুক্ত তা কেবলমাত্র শারীরিক বিষয় হতে পারে। আর “তারায়িব” হচ্ছে আরেকটি শারীরিক শব্দ যা বুক, বা পাঁজরের হাড় বা পঞ্জরাস্থি বুঝানো হয়। এখানে সত্যিকার শব্দের পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে না। সুতরাং, আমরা মূল সমস্যার মধ্যে রয়েই যাচ্ছি যে, কারণ, কোরআনের শিক্ষা অনুসারে পৃষ্টদেশ বা মেরুদন্ড কিংবা কিডনি এলাকা থেকে বীর্য বের হয়ে আসে আর তা অন্ডকোষ থেকে বের হয়ে আসে না।

ডঃ বুকাইলি একজন চিকিৎসক হিসেবে এই সমস্যার কথা ভালোভাবেই জানেন। তিনি কথার মারপ্যাচে কথা ঘুরিয়েছেন (তাই তিনি খ্রীষ্টান তফসীরকারীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন। আর সবশেষে তিনি আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, “এটি যতটা না অনুবাদ তার চেয়ে বেশী ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়, তাছাড়া এই অনুবাদের মর্ম কিছুটা অস্পষ্টও বটে।[৪] এখানে দ্বিতীয়বারের মতো স্বীকার করলেন যে, যেখানে সমস্যা রয়েছে, সেখানে কোরআনের আয়াত **অস্পষ্ট ও বুঝা কঠিন।**

তাই আমি যে-কথা বলতে চাচ্ছি, সেই কথা দেখানোর জন্য আমি এখন অন্যান্য মুসলমান অনুবাদকদের কোরআনের অনুবাদ তুলে ধরছিঃ

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত বইয়ের সাথে ১৯৩৮ সালের ভূমিকা রয়েছে।

“তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, একটি পানিবিন্দু হতে-যা মেরুদন্ড ও পাঁজরের হাড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে।”

মুহাম্মদ মারমাডুক পিকথল, ইংরেজ, ১৯৭৭ (সম্ভবত ১৯৪০ সালে অনুবাদ করা হয়েছিল) বলেছেন,

“তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, “সবেগে স্খলিত এক তরল পদার্থের দ্বারা-যাহা বাহির হয় কটিদেশ ও পাঁজরের অস্থিসমূহের মধ্য হইতে।”

মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, পাকিস্তানি, ১৯৭১ বলেছেন,

---

[৪] বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-২৮১

“তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্গত তরল থেকে, যা বের হয়ে আসে কটিদেশ ও বক্ষের অস্থিসমূহের মধ্য থেকে।”[৫]

মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, ফরাসী, ১৯৮১ (দশম সংস্করণ, সম্পুর্ণ সংশোধিত) বলেছেন,

“Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre lombes et côtes. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, “সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা বের হয়ে আসে কটিদেশ ও পাঁজরের হাড়ের মধ্য থেকে।

১৯৬৭ সালে আরেকজন অমুসলিম অনুবাদক ড. মেসন, ফরাসী, লিখেছেন,

“Il a été créé d'une goutte d'eau répandue sortie d'entre les lombes et les côtes. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এক বিন্দু ছিটানো তরল থেকে, যা বের হয়ে আসে কটিদেশ ও পাজরের হাড়ের মধ্য থেকে।”

এই পাঁচটি অনুবাদ একই কথা বলেছে, আর প্রতিটি পাঠকই মূল আরবী বা ফরাসী ভাষা না জানলেও তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন।

ডঃ বুকাইলির অনুবাদ

ডঃ বুকাইলি কী বলতে চাচ্ছেন? তিনি লিখেছেন, “কোরআনের দুটি আয়াতে মানব জীবনের যৌন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনা এমন ভাষায় করা হয়েছে — এই দুটি আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য পর্যালোচনা করতে গেলে যে- কারো পক্ষেই বিশ্ময়ে হতবাক না হয়ে উপায় থাকে না যে, মাত্র দুটি আয়াতের মাধ্যমে কত কিছুই না বলা হয়েছে। এই দুটি আয়াতের সঠিক অনুবাদ খুঁজতে গিয়ে আমি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। (সোজা বাংলায় এর অর্থ হচ্ছে, “এখানে অবাস্তবতা বা বৈপরিত্ব সমস্যা রয়েছে)[৬]। এ-ব্যাপারে আমি বৈরুতের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সাবেক অধ্যাপক ড.এ, কে, জিরড এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তাঁর অনুবাদটি এই,

“‘মানুষ পরিগঠিত হইয়াছে সজোরে নিক্ষিপ্ত এক তরল পদার্থ হইতে, উহা বাহির হয় পুরষের যৌন এলাকা ও নারীর যৌন এলাকার সম্মিলনে (পরিণতিতে)। “কোরআনের আয়াতে পুরষের ‘যৌন এলাকা’ বলতে ব্যবহৃত হয়েছে আরবী শব্দ “সালব’ (একবচন); পক্ষান্তরে, নারীর যৌন এলাকা উল্লেখের বেলায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ তারায়িব’ (বহুবচন)। ওপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের এই অনুবাদই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে।”[৭]

---

[৫] *The Qur'an,* Curzon Press, 1981, (1st Ed. 1971). মিঃ খান, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। তিনি হ্যাগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস্তএর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

[৬] খ্রীস্টানদের সম্পর্কে বুকাইলির মন্তব্য, পৃষ্ঠা-ix

[৭] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২৮১

যখন ওপরের ৫টি আয়াতের সাথে তুলনা করা হয়, তখন এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ডঃ বুকাইলির প্রস্তাব কোরআনের অনুবাদ নয়, এমনকি এটি আক্ষরিক অনুবাদও নয়। এটি হচ্ছে "ব্যাখ্যা, " এবং "অনুবাদ" যা নিম্নে উল্লেখিত "প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption এর ওপর নির্ভরশীলঃ

ক. **'সালব' শব্দটি কেবল পুরুষের যৌন এলাকা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।** যদিও প্রথম শতাব্দীর ইসলামে এই শব্দটির এমন কোনো ব্যবহারের আর কোনো নজির উল্লেখ করা হয়নি।

খ. **"এই সম্মিলনের (পরিণতিতে)" এই শব্দগুচ্ছের মধ্যে দুটো আরবী শব্দ রয়েছে, "মিন বাইন" এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, "মধ্য থেকে"**

গ. **'তারায়িব' শব্দটির অর্থ হতে পারে "নারীর যৌন এলাকা"**

এই শেষের শব্দটি কেবল কোরআনে একবারই ব্যবহার করা হয়েছে। আর আপনি একবার ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে কোনো অর্থ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। ওয়েহির, আব্দেল নূর, এবং কাজি মিরস্কির অভিধানে লেখা হয়েছে, (ক) বুক (খ) বুকের ওপরের অংশ, বুক ও কটিদেশের মাঝের অংশ। (গ) পাঁজরের হাড় আর আব্দেল নূর আরো বলেছেন, (ঘ) মূল-শব্দের পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করে বক্ষস্থলের বৃদ্ধি বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, গলা থেকে চিকুক পর্যন্ত এলাকা আর কাব্যিক ভাষায় বলা যায়, যেখানে মেয়েদের গলার হার থাকে এমন এলাকাকে বুঝায়।

কোনো অভিধানেই 'তারায়িব' বলতে নারীর যৌন এলাকা বুঝানো হয়নি। আর ডঃ বুকাইলি তাঁর নিজের ধারণার সমর্থনে সাহিত্য থেকে কোনো উদাহরণ দিতে পারেননি। মনে হয় কেবল তিনি অন্যদের বিপক্ষে অভিযোগ করেছেন। তিনি তাঁর সমস্যাকে "কথার মারপ্যাচে" আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। ☺☺☺।"[৮]

৬. ভ্রূণ সষ্টির সময়ে ''আলাক্বা" (জমাট রক্তপিণ্ড?!?) এবং অন্যান্য ধাপ

বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন ধাপে ভ্রূণ পরিণত হয়, এটি একটি আধুনিক ধারণা অর্থাৎ কোরআনে আগেই এই আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে পূর্বাভাষ (ভবিষৎদ্বাণী) দিয়েছে যে, ভ্রূণ বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। *হাইলাইটস অব হিউম্যান এমব্রায়োলজী ইন দি কোরআন এন্ড দি হাদিস* নামক পুস্তিকায় কেইথ এল মুর এম ডি,[৯] ডঃ মুর জোর দিয়ে বলেছেন, "কোরআনের বাইরে ১৫ শতাব্দীর আগে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ বিভিন্ন ধাপে বৃদ্ধি পায়, এই কথাটি লোকেরা বুঝতে পারেননি বা

[৮] যাঁরা একটি দুবোর্ধ্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে চান বা গড়মিল দূর করতে চান, সে'সব খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ডঃ বুকাইলির আরেকটি কড়া সমালোচনা। পৃষ্ঠা ১৯

[৯] এনাটমি-র সাবেক অধ্যাপক, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসন, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, টরেন্টো, অন্টেরিও, কানাডা।

ব্যাখ্যাও করা হয়নি।”[১০] এরই সাথে তিনি আরো দাবী করেছেন যে, কোরআনে ভ্রূণ বৃদ্ধির যে বিভিন্ন ধাপের কথা বলা হয়েছে, তার সাথে আমাদের আধুনিক জ্ঞানের মিল রয়েছে।

আমরা প্রথমে কোরআনে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তারপরে কোরআনের সময়ে যে-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ছিল তা পরীক্ষা করে এ-দাবীগুলো সঠিক কি-না তা নির্ণয় করবো।

আসুন, আমরা **’আলাক্বা** শব্দ নিয়ে যে-আয়াতগুলো আছে তা পরীক্ষা করে দেখার মধ্য দিয়ে আমাদের এই কাজ শুরু করি।

’আলাক্বা

আরবী শব্দ “’আলাক্বা **عَلَقَة**” এক বচনে এবং বহুবচনে “'আলাক্ব **عَلَق**” ব্যবহৃত হয়েছে। ভ্রূণের সৃষ্টির ধাপ সম্পর্কে কোরআনে ৫টি ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আমি যে-অনুদিত কোরআনগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি সেগুলোতে একে “জমাট রক্তপিণ্ড” নামে প্রায় প্রতিটি অনুদিত কোরআনে ব্যবহার করা হয়েছে,।

প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-কিয়ামা (পুনরুত্থান) ৭৫:৩৭-৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে “**’আলাক্বা”য়** পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল নর-নারী।”

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল- মুমিন (বিশ্বাসী) ৪০:৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর “**’আলাক্বা”** (জোঁকের মতো রক্তপিণ্ড) হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশু রূপে — যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।”

শেষ মক্কী যুগে না হয় প্রাথমিক মাদানী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা) ২২:৫ আয়াতে আরো কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে,

> “হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর-আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তারপর শুক্র হইতে, তারপর “**’আলাক্বা”** (রক্তপিণ্ড) হইতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে—

---

10 এরাবাইজেসন এন্ড মেডিক্যাল এডুকেশন,পৃষ্ঠা ৫১, ইসলামিক ইনফরমেশন এন্ড দাওয়া সেন্টার ইন্টারনেশনাল, 957 Dovercourt Road, Toronto, M6H 2X6 কর্তৃক ১৯৯৫ সালে পুনঃমুদ্রিত।

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-মুমিনুন (বিশ্বাসীগণ) ২৩:১২-১৪ আয়াতে বিশদভাবে বলা হয়েছে,

> "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে, অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি **"আলাকে"** (রক্তপিণ্ড) অতঃপর **"'আলাক্বা"** (রক্তপিণ্ড)কে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিনত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থিঃ-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশত দ্বারা অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে।"

আমরা নিম্নরূপে সংক্ষিপ্তকারে এই ধাপগুলোকে উল্লেখ করতে পারিঃ

ধাপ ১. নুতফা-বীর্য
ধাপ ২. 'আলাক্বা- রক্তপিণ্ড
ধাপ ৩. মুদাঘা- একখন্ড বা গোশতপিণ্ড
ধাপ ৪. আদাম- হাড়
ধাপ ৫. হাড়কে গোশত দিয়ে ঢেকে দেওয়া

বিগত ১০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই **"'আলাক্বা عَلَقَة"**শব্দটি এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে,

- ফরাসী ভাষায়, un grumeau de sang (এক টুকরা রক্তপিণ্ড)— কাজি মিরস্কি, ১৯৪৮[১১] (লেখকের জীবিত থাকার সময়েই ১৮৮৭ সালে সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।
- a leech-like clot (জোঁকের মতো রক্তপিণ্ড)—ইউসুফ আলী, (১৯৩৮ সালে অনুবাদ করেছেন) ১০৪৬[১২]
- a clot (জমাট রক্তপিণ্ড)— পিকথল (সম্ভবত ১৯৪০ সালে অনুবাদ করা হয়েছিল) ১৯৭৭[১৩]
- a clot (জমাট রক্তপিণ্ড)— মৌলানা মুহাম্মদ আলী, ১৯৫১[১৪]
- a clot (জমাট রক্তপিণ্ড)— মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, ১৯৭১[১৫]
- ফরাসী ভাষায় de caillot de sang (জমাট রক্তপিণ্ড))— হামিদুল্লাহ ১৯৮১[১৬]

---

[১১] Biberstein Kasimirski, *Le Koran,* Bibliotheque Charpentier, Paris, 1948.
[১২] Abdullah, Yusuf Ali, *The Holy Qur'an,* American International Printing Co., Washington, 1946.
[১৩] Muhammad Marmaduke Pickthall, *The Glorious Qur'an,* Muslim World League, New York, 1977.
[১৪] *The Holy Qur'an,* Ahmadiyyah Anjuman Ishaat Islam, Lahore, 1951.
[১৫] *The Qur'an,* Curzon Press, 1981.
[১৬] Muhammad Hamidullah, *Le Coran,* Le Club Francais du livre, 1981.

- a clot of blood (একটি রক্তপিণ্ড)—এস জে দাযুদ, ১৯৮০,[১৭] লেবাননের সুপ্রীম সুন্নী ও শিয়া কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত
- ইন্দোনেসিয়ান ভাষায় segumpal darah (রক্তপিণ্ড বা জমাট রক্তপিণ্ড)
- ফারসী ভাষায় "খুন বাস্তে" (জমাট রক্তপিণ্ড)
- চীনা ভাষায়, "জুই কুয়াই" (রক্তপিণ্ড)
- মালয় ভাষায়, darah beku (রক্তপিণ্ড)
- বাংলা ভাষায় " রক্তপিণ্ড"

মানুষের প্রজনন সম্পর্কে যে সব পাঠক পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন **যে, "মানুষের ভ্রূণ তৈরির সময়ে 'আলাক্বা নামের কোনো ধাপ নেই। আর তাই এটি হচ্ছে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একটি বড় দুর্বোধ্য বিষয়।**

ওয়েহের ও আব্দেল নূর তাঁদের অভিধানে "'আলাক্বা" শব্দের অর্থ লিখেছেন, স্ত্রী লিংগ, একবচন, 'রক্তপিণ্ড' বা 'জোঁক'। আর উত্তর আফ্রিকায় এই শব্দটি এই অর্থে আজো ব্যবহৃত হয়। অনেক রোগী তাদের গলার মধ্য থেকে জোঁক দূর করার জন্য আমার কাছে আসে আর অনেক মহিলা বিশ্বাস করেন যে, রক্তপিণ্ড নামে ধাপের মধ্য দিয়ে ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে। তাঁরা আমার ডিসপেনসারীতে এসে বলেন যে, "আমার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আমাকে তাই ওষুধ দিন।" কিন্তু যখন আমি বলি যে, "আমি তা করতে পারি না, কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, ভ্রূণ একটি মানুষ।" তখন তাঁরা বলেন. "কিন্তু এখনও তা কেবল রক্তপিণ্ড অবস্থায় রয়েছে।"

সবশেষে, আমরা অবশ্যই মক্কায় হজরত মোহাম্মদের কাছে নাজিল হওয়া প্রথম সূরাটি লক্ষ্য করবো। কোরআনের ৯৬ নং সূরার নাম **'আলাক্ব (রক্তপিণ্ড?)** এই সূরাতে আমরা যে শব্দ নিয়ে আলোচনা করছি, সেই একই শব্দ 'আলাক্ব রয়েছে। ৯৬:১-২ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "পাঠ করো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে "'আলাক্ব عَلَق" হইতে।"

এখানেই কেবল "'আলাক্ব" শব্দটির সমষ্টিবাচক বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো এই শব্দটির অন্য অর্থ থাকতে পারে। "**আলিকা عَلِقَ**" ক্রিয়াপদ থেকেই ক্রিয়া-বিশেষ্য "'আলাক্ব عَلَق" শব্দ বের হয়ে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে, "ঝুলে থাকা", "লটকে থাকা", আটকে থাকা, আঁকড়ে থাকা, দৃড়ভাবে এটে থাকা, দৃড়ভাবে লেগে থাকা, সংযুক্ত থাকা। বাংলায় ক্রিয়া-বিশেষ্য ইংরেজী ভাষায় জিরান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন বলা যায়, "সাঁতরানোর মধ্যে এক ধরনের মজা রয়েছে।" তাই আমরা আশা করতে পারি যে, এর অর্থ হচ্ছে, "ঝুলানো", আটকে থাকা, দৃড়ভাবে

---

[১৭] N.J. Dawood, checked and revised by Mahmud Y. Zayid, *The Quran,* Dar Al-Choura, Beirut, 1980.

লেগে থাকা ইত্যাদি। ক্রিয়া-বিশেষ্য ছাড়াও শব্দটির **ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে** এর অর্থ নির্ধারণ করা হয়।

কিন্তু ওপরে উল্লেখিত ১২জন অনুবাদকই এই শব্দটাকে ক্রিয়া-বিশেষ্যের পরিবর্তে সমষ্টিবাচক বহুবচন হিসেবে উল্লেখ করে এই আয়াতেরও অনুবাদ করেছেন, "রক্তপিণ্ড" বা "জমাট রক্তপিণ্ড"। ফজলুর রহমান ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর সুপরিচিত "ইসলাম" গ্রন্থে এই শব্দটির অনুবাদ করেছেন "জমাটবাধা ঘন রক্ত।"।[১৮]

মৌলানা মুহাম্মদ আলী কেন এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, এই আয়াতের টিকায় তার ব্যখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "**'আলাক্ব** "শব্দের অর্থ রক্তপিণ্ড এবং পাশাপাশি এর অর্থ হচ্ছে, "সংযুক্ত থাকা" এবং "জোড়"। আগের অর্থটির গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, এই অর্থটি সবাই গ্রহণ করেছেন, কারণ, মানুষের ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়ে কোরআন শরীফের অন্যান্য আয়াতে **'আলাক্বা** ব্যবহার করা হয়েছে, আর এর অর্থ হচ্ছে মানুষ মৌলিকভাবে গুরুত্বহীন।"[১৯]

> অন্য কথায় বলতে হয়, একবচন এখানে বহুবচনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এমনকি যদিও ক্রিয়া-বিশেষ্যর অর্থ বুঝা ও ব্যবহার করা হতো তবে তা বৈজ্ঞানিক দুর্বোধ্যতা এড়িয়ে যাওয়া যেত।

এই সব অনুবাদকের সংখ্যা অনেব বেশী হলেও ও তাঁদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, যাঁরা জমাট রক্তপিণ্ড ব্যবহার করবেন, ডঃ বুকাইলি তাঁদের তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করছেন। তিনি লিখেছেন,

> "অনুসন্ধিৎসু পাঠককে কোরআনে বর্ণিত মানব প্রজনন বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ও অনুবাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়।"

> "আসলে কোরআনের এমন সব অনুবাদ ও তফসীর এখন পর্যন্ত বাজারে চালু আছে, যেগুলো পাঠ করে কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই মানব-প্রজনন সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত সঠিক-ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। Dউদাহরণস্বরূপ, বেশীরভাগ অনুবাদে দেখা যায়, বিশেষ একটি আয়াতের অনুবাদ করা হচ্ছে এই বলে যে, ”মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, 'জমাট বাঁধা রক্ত' বা 'জোড়' থেকে। অথচ কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে মানব-প্রজনন-সংক্রান্ত্র এ ধরনের কোনো বক্তব্য মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আর সেই বিজ্ঞানী যদি মানব-প্রজনন বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই।- ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, কোরআনে বর্ণিত 'মানব-প্রজজন সংক্রান্ত্র বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে আলোচককে শুধুমাত্র আরবী ভাষাতত্ত্ববিদহলেই চলবে না, তাঁকে একই সংগে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞানেরও অধিকারী হতে হবে।"[২০]

---

[১৮] *Islam,* Second Edition, University of Chicago Press, Chicago, 1979, p 13.

[১৯] মোহাম্মদ আলী, ওপরে উল্লেখিত বই

[২০] দি বাইবেল. দি কোরআন এন্ড সাইন্স, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশনস, ইন্ডিয়াপলিস,১৯৭৯, পৃষ্ঠা ২০০

অন্য কথায় বলা যায় যে, ডঃ বুকাইলি ছাড়া আর কেউ সঠিকভাবে কোরআন অনুবাদ করতে পারেন না। কীভাবে ডঃ বুকাইলি ভাবলেন যে, এভাবেই অনুবাদ করা উচিত? তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, "জমাট বাঁধা রক্ত" এর বদলে "'**আলাক্ব**' শব্দের অর্থ হওয়া উচিত "এমন কিছু যা দৃঢ়ভাবে আটকানো"। এটি বুঝাচ্ছে যে, অমরা বা গর্ভের ফুলের মধ্য দিয়ে জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকা কোনো জিনিস।[২১] এই অর্থ "জমাট বাঁধা রক্তের" চেয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আরো কাছাকাছি।

আমরা এইডাক্তারের অনুবাদ ব্যবহার করে এই "**'আলাক্বা' শব্দের** সমাধানের চেষ্টা করবো:

> "শুক্র বিন্দু থেকে আমরা এমন বস্তু সৃষ্টি করি (গঠন করি) যা দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। আর এই দৃঢ়ভাবে আটকানো বস্তু থেকে আমরা সৃষ্টি করি (গঠন করি) চিবানো মাংস, আর এই চিবানো গোশ্‌ত থেকে আমরা সৃষ্টি করি (গঠন করি) হাড় আর এই হাড়কে আমরা ঢেকে দেই মাংস দ্বারা।

এখন বিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুসারে লোকেরা প্রশ্ন করবে, কিন্তু ডিম্বানু কোথায়? "যা দৃঢ়ভাবে আটকানো বস্তু" তা তো শুক্রানু থেকে সৃষ্টি হয় না। এটি শুক্রানুর ও ডিম্বানুর নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে তৈরি হয়। অবশ্যই যা নির্গত হয়, এটি একেবারে ভুলও নয়।

দ্বিতীয়তঃ "দৃঢ়ভাবে আটকানো বস্তু" তো আটকে থেকেই "চিবানো গোশতে" পরিণত হয়। ৮/১২ মাস পর্যন্ত সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত এটি দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

এমনকি অনেক বিজ্ঞানী যদিও এই শব্দটির অনুবাদ নিয়ে একমত হতে পারেননি। ড. বেখির টর্কি এই সমস্যাটি উপলব্ধি করে ৯৬ নং সূরা 'আলাক্ব এভাবে অনুবাদ করেছেন,

> "পাঠ করো, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে **সংযোগ** (ডি এটাচেস) থেকে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ করো, তোমার প্রতিপালক দয়ালু, তিনি তোমাকে কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।"

ফরাসী শব্দটির আমি অনুবাদ করেছি "সংযোগ", এর আরো অর্থ হতে পারে, বন্ধন, গ্রনি' আর সংযুক্ত থাকা। এই অর্থগুলো ডাঃ বুকাইলি যা লিখেছেন তার মতো হুবুহু এক বলেই মনে হয়। কিন' ড. টর্কি আসলে এটি ভিন্ন অর্থে প্রকাশ করেছেন, তিনি লিখেছেন,

> "তিনি (আল্লাহ) মানুষকে সংযোগসমূহ (বন্ধন) থেকে সৃষ্টি করেছেন, সংযোগ থেকে নয়। বরং সংযোগসমূহ এখানে আরো তথ্য প্রকাশ করে। যেভাবে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যা সংযুক্ত বা ভাষমান অবস্থায় কোষের সকল জীনের মধ্যে আছে। বিশেষভাবে একদিকে পুরুষের শুক্রানু যা জীন বহন করে অন্যদিকে নারীরাও তা বহন করে। প্রথম শব্দ 'পাঠ করো' (সূরার মধ্যে) এখানে প্রথম কোষ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হচ্ছে, যে কোষ থেকে মানব দেহ গঠিত হয়। দ্বিতীয় শব্দ 'পাঠ ' করো বলতে কোরআন শরীফকে বুঝিয়েছে যা আল্লাহ্ মানুষকে কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।"

[২১] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২০৪

রেখাচিত্র-৯, ধাপ ৭-১৭

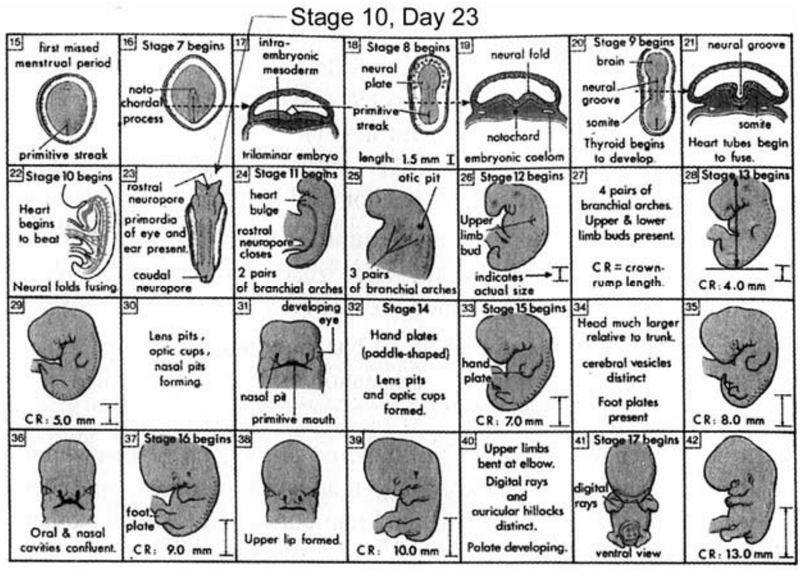

W. B. Saunders থেকে অনুমতিক্রমে ছাপানো হল

ছবি ৫-৯

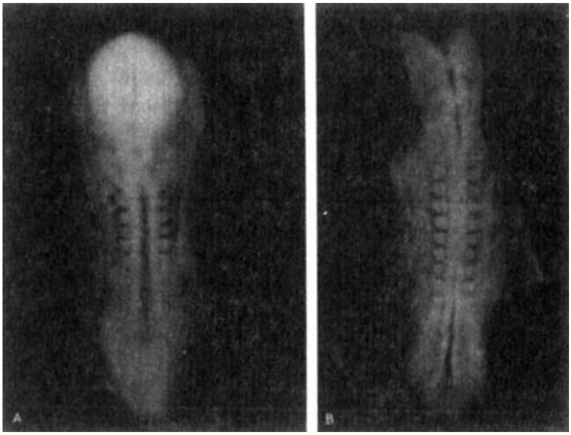

ছবি ৫-৯তে ২২ ও ২৩ দিসের ভ্রূণের এক্স-রে ছবিতে বর্ধিত করে দেখানো হয়েছে। ২২ দিনের ভ্রূণের পৃষ্টদেশের এই এক্স- রে ছবিতে মেরুদন্ডের নিউরাল গ্রুভকে এখনও খো্লা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। [২২]

W. B. Saunders থেকে অনুমতিক্রমে ছাপানো হল

---

[২২] *The Developing Human,* Moore, 4th ed., 1988, পৃষ্ঠা ৭৫

রেখাচিত্র- ১০

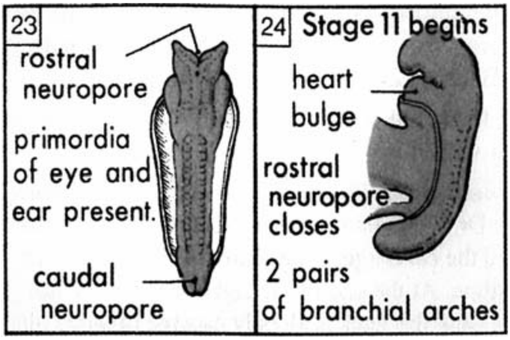

রেখাচিত্র ১০[২৩]-এ ২৩ দিনের ভ্রূণের এক্স- রে ছবিতে রোষ্টাল এবং কডাল নিউরোপোর এখনও খোলা আছে এবং কুসুমথলির (ইয়ক সেক) পার্শ্বদেশ দেখা যাচ্ছে।

W. B. Saunders থেকে অনুমতিক্রমে ছাপানো হল

ছবি ৪-১০

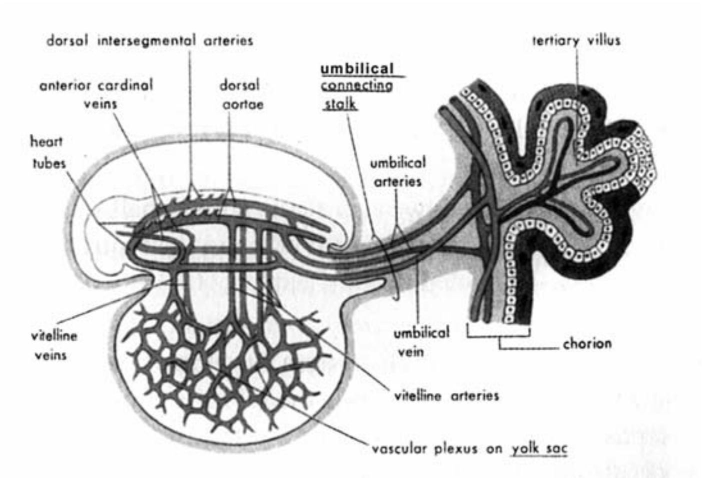

ছবি ৪-১০[২৪] দেখাচ্ছে যে, ভ্রূণের মধ্যে বৃহৎ ভেন্ট্রাল ইয়ক সেক ও আম্বিলিকাল কানেকটিং স্টক বা নাভিরজ্জু রয়েছে। একটি জোঁকের এই ধরণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

W. B. Saunders থেকে অনুমতিক্রমে ছাপানো হল

---

[২৩] Moore, ওপরে উল্লেখিত বই, সামনের মলাটের ভিতরে

[২৪] Moore, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৬১

এটি খুবই দক্ষতার সাথে উদ্ভাবিত ধারণা, যদিও ব্যক্তিগতভাবে এটি বিশ্বাস করা আমার জন্য কঠিন যে, আল্লাহ্ হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে প্রথমে বলেছেন যে "তুমি জিনকোড পড়, " আর এই বিষয়টি বাদ দিলেও আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। যেখানে একবচনে '**'আলাক্বা** 'শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ড. টকি সে সম্পর্কে কী বলবেন? আধুনিক জ্ঞানে শিক্ষিত লোকেরা কী বুঝবে, যদি তাদের এই কথা বলা হয়, "এক বিন্দু শ্রুক্র থেকে আমরা একটি জিন কোড তৈরি করি, জিন কোড থেকে আমরা মাংস পিণ্ড তৈরি করি"? **জিন কোড শুক্রানুর মধ্যে** রয়েছে, এটি **থেকে** শুক্রানু তৈরি হয় না।

কয়েকজন অনুবাদক "**'আলাক্বা**' শব্দের ভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত রেজিস ব্লেকায়ার ২৩:১৪ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন.

> "আমরা নির্গত পদার্থকে একটি জোড়ে পরিণত করি। আমরা জোরকে একটি কোমল মাংসের কাঠামো তৈরি করি আর এই অসি'পঞ্জরের কাঠামোকে মাংস দিয়ে ঢেকে দেই।[২৫] (কিন' আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সূরা কিয়ামাহ (প্রলয় ঘটনা) ৭৫:৩৮ আয়াতের তিনি অনুবাদ করেছেন, 'জমাট বাধা রক্ত বিন্দু'।)

১৯৬৪ সালে মুহাম্মদ আসাদ, ১৯৮০ সালে প্রকাশিত কোরআনের তফসীরে বলেছেন,

> "আর তারপর আমি নির্গত শুক্র বিন্দু থেকে একটি জার্ম সেল বা জনন কোষ তৈরি করি, তারপর জার্ম সেল বা জনন কোষ থেকে একটি ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ড তৈরি করি আর পরে এই ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ড থেকে আমি হাড় তৈরি করি আর তারপর আমি হাড়কে মাংস দিয়ে ঢেকে দেই।"[২৩]

মুহাম্মদ আসাদ সূরা 'আলাক্ব (ঘনিভূত শোণিত) ৯৬:২ আয়াতের একটি টিকায় লিখেছেন যে, "জার্ম কোষ-"**'আলাক্বা"** হচ্ছে নিষিক্ত ডিম্বানু।

তবে, আমি মনে করি এটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট যে, আগের সমালোচনাগুলো আমরা এই ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারিঃ

ক. শুক্রানু কখনো 'জোড়ে' বা অনিষিক্ত ডিম্বানু ছাড়া নিষিক্ত ডিম্বানুতে পরিণত হতে পারে না।

খ. "**'আলাক্বা"-র** অর্থ জনন কোষ বা নিষিক্ত ডিম্বানু ধরে নেয়ার অর্থ হচ্ছে এখানে প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption তৈরি করা হয়েছে।

গ. এটি একটি জোড় যা সমস্ত গর্ভকালের সময়েই এটি দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

ঘ. "মুদাঘা ('মাংসপিণ্ড)' শব্দের বিংশ শতাব্দীর বিশেষণ অনুসারে 'ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ড' অনুবাদ করা আর 'ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ড "থেকে "হাড় তৈরি হয়, এই কথা না বলে 'ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ডের' "মধ্যে" হাড় তৈরি হওয়ার কথা বলা এই উভয় বিষয়টি হচ্ছে **প্রাথমিক অনুমিত বিষয় (basic assumption)।**

---

[২৫] *Le Coran, Librairie Orientale et Americaine,* Paris, 1957. (translation mine)

[২৩] *The Message of the Qur'an,* Dar Al-Andalus Limited, Gibraltar, 1980.

সবশেষে, এই অংশে আমরা অবশ্যই 'আলাক্বা শব্দের অর্থ নির্ণয় করার জন্য ডঃ কেইথ মুরের পরামর্শটি বিবেচনা করবো। এনাটমি-র সাবেক অধ্যাপক এবং ভ্রূণতত্ত্বের ওপর পাঠ্যবই রচয়িতা, বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করেছেন, "মানুষের ভ্রূণের এই বিকাশের ধাপে এই জোঁকের মতো দেখতে ও চিবানো গোশতের মতো ধাপ থাকার এই বিষয়টি কোরআনের আরেকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।"[২৬]

> এই সংজ্ঞা থেকে ডাঃ মূর তাঁর ধারণাকে আরো বিকশিত করে বলেছেন যে, ২৩ দিসের ভ্রূণ, ৩ মিমি লম্বা বা ১ ইঞ্চির ১/৮ অংশ লম্বা। একে জোঁকের মতো মনে হয়। এই কার্নেগী ধাপ ১০, যার ছবি আমরা ডাঃ মূরের বইয়ের সামনের মলাটের ভেতরের দিক থেকে নেয়া হয়েছে, আর এই বইয়ের রেখাচিত্র- ৯- এ দেখানো হয়েছে।[২৫]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, এই ২৩ দিনে ৩ মিলিমিটার (১/৮ ইঞ্চি) ভ্রূণে রাষ্টাল এবং কডাল নিউরোপোর এখনও খোলা আছে এবং এর সাথে ভ্রূণের মধ্যে বৃহৎ ভেন্ট্রাল ইয়ক সেক ও আম্বিলিকাল কানেকটিং স্টক বা নাভিরজ্জু দেখা যাচ্ছে। এটা কখনই জোঁকের মতো নয়। এছাড়া আরও বলা যায় যে, কোন অভিধানেই **'আলাক্বা** শব্দের অর্থ বলতে "জোঁকের মতো দেখা যায়", এমন কথা বলা হয়নি। আর কেউই বলেননি যে, কোরআন বলেছে যে, মানুষ স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে গঠিত যা পরে জোঁকে পরিনত হয়। ডঃ মূর আরবী ভাষা জানেন না, আর ব্যক্তিগত আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, **"যদি ''আলাক্বা' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'রক্তপিণ্ড' হয়, তবে ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে এমন কোনো ধাপের অস্তিত্ব নেই।**

'আদাম - পেশীর আগে হাড় তৈরি

তৃতীয়তঃ কোরআনের এই আয়াতগুলো বলে যে, 'চিবানো গোশত' হাড়ে পরিণত হয় আর হাড় মাংস দিয়ে ঢাকা হয়। এই একই ধারণা ২ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা (গাভী) ২:২৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "— অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কীভাবে সেইগুলিকে সংযোজিত করি এর গোশত দ্বারা ঢাকিয়া দেই — ।"

এই আয়াতগুলো আমাদের মনে এই ধারণা দেয় যে, প্রথমে হাড় দিয়ে কংকাল তৈরি হয়, তারপর তা মাংস দিয়ে ঢাকা হয়। ডঃ বুকাইলি ভালোভাবেই জানেন যে, এই কথাটি সত্য নয়।

পেশী ও তরুনাস্থি যা হাড়ে পরিণত হয় তাও একই সাথে সোমাইট থেকে সৃষ্টি হয়। আট সপ্তাহের শেষে কেবলমাত্র কয়েকটি "হাড় তৈরির কেন্দ্র" শুরু হয় কিন্তু ইতোমধ্যেই ভ্রূণ তাঁর পেশী নড়াচড়া করতে পারে।]

---

[২৬] Moore, *Arabization*, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৫৬

[২৫] *The Developing Human,* Moore, 4th ed., 1988.

চেপেল হিল, এন সি, ২৭৫১৪, নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদবিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক ও *লেঙ্গসম্যানস মেডিক্যাল ইমব্রাওলজী* বইয়ের লেখক টি, ডব্লু; সেডলার, ৮/১/৮৭ তারিখে লেখা তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন,

> "ভ্রূণ নিষেকের পরে অষ্টম সপ্তাহে পাঁজরের তরুনাস্থি তৈরি হয়, আর এই সময়ে পেশী দেখা যায়। আর এই সময়ে পাঁজরের হাড়ের কোণে হাড় পরিণত হওয়াও শুরু হয়। আর কাঠামো ঘিরে তা ছড়িয়ে পরে যে পর্যন্ত ৪র্থ মাসে কোষ্টাল তরুনাস্থি পর্যন্ত না পৌঁছে। ৮ম সপ্তাহে পেশী কিছুটা নড়াচড়া করতে পারে। ১০-১২ সপ্তাহের মধ্যে এই ক্ষমতা আরো ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়।"

এটা সব সময়ে ভালো যে, দুইজন সাক্ষী থাকা দরকার। তাই আমরা দেখবো যে, হাড় ও পেশীর বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁর লেখা "দি ডেভেলপিং হিউম্যান"- বইয়ে ডঃ কেইথ এল মূর কী বলেছেন? ১৫-১৭ অধ্যায়ের সার- সংক্ষেপ করে আমরা নিম্নলিখিত তথ্য দেখতে পাই:

> মেসোডার্ম থেকে হাড়ের কাঠামো ও পেশীতন্ত্র বৃদ্ধি পায়। এর কোনো কোন অংশ *মেসেনকাইমাল* কোষ তৈরি করে। এই মেসেনকাইমাল কোষ পেশী তৈরি করে, এবং এগুলো আলাদাভাবে — ওস্টিওব্লাস্ট তৈরি করতে সক্ষম, যেখান থেকে হাড় তৈরি হয়। প্রথমে হাড় তরুনাস্থির কাঠামো তৈরি করে, যা ৬ সপ্তাহের শেষে তরুনাস্থি থেকে বোনি কেলসিয়াম ছাড়া গোটা অস্থি কংকালের কাঠামো তৈরি হয়, যা ছবি ১৫-১৩-ত দেখানো হয়েছে।[২৭]

হাড়ের কাঠামো যখন তৈরি হতে থাকে, তখন মায়োব্লাষ্ট প্রতিটি লিম্ব বাডের মধ্যে পেশীর বিরাট পিণ্ডের সৃষ্টি করে। তা এক্সটেনসর ও ফ্লেক্সর পেশীর উপাদানগুলোকে আলাদা করে। **অন্য কথায় বলা যায় যে, বিকাশমান হাড়ের চারদিকে অংগের পেশী একইসাথে মেসেনকাইম থেকে বৃদ্ধি পায়।** তাই দেখা যাচ্ছে, ডঃ মূর, ডঃ সেডলারের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছেন।

এছাড়াও বলা যায় যে, ডঃ মূরের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারীতায় আমি তাঁকে ডঃ সেডলারের বক্তব্যটি দেখিয়েছিলাম। আর তিনি একমত যে, ডঃ সেডলার একেবারেই খাঁটি কথা বলেছেন।

উপসংহারঃ হাড়ের বৃদ্ধির ব্যাপারে ডঃ সেডলার ও ডাঃমূর একমত পোষণ করেছেন। এমন কোনো সময় নেই, যে সময়ে ক্যালসিফাইড হাড় তৈরি হওয়ার পরে তার চারদিকে পেশী দিয়ে ঢাকা হয়। ক্যালসিফাইড হাড় তৈরির কয়েক সপ্তাহ আগেই পেশী সেখানে থাকে। তাই পেশীর আগে তৈরি হাড়ের চারদিকে পরে পেশী দিয়ে ঢেকে দেওয়ার বিষয়ে কোরআন বলেছে। **কোরআনে বর্ণিত এ তথ্যটি একেবারেই ভুল।**

---

[২৭] Keith L. Moore, *The Developing Human,* 4th ed., 1988, পৃষ্ঠা ৩৪৬

ছবি ১৫-১৩

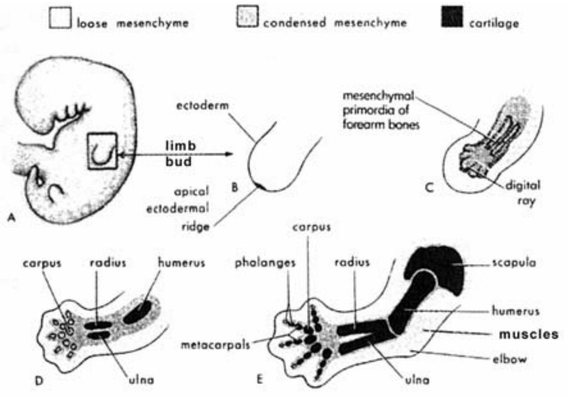

W. B. Saunders থেকে অনুমতিক্রমে ছাপানো হল

সমস্যা

'মুগাধা' ও **''আলাক্বা'** শব্দের এসব নতুন সংজ্ঞা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার বড় সমস্যা হচ্ছে, হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত আরবী ভাষা থেকে আর কোনো উদাহরণ আমাদের দেওয়া হয়নি।

ডঃ বুকাইলি বলতে চেয়েছেন যে, এই সব অনুবাদকরা কোরআন শরীফের ভুল অনুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কোরআনকে সঠিকভাবে অনুবাদ করতে হলে, একজন অনুবাদকের ভালো বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু কতটুকু ভালো বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তাঁর থাকতে হবে তা তিনি বলেননি।

ডঃ বুকাইলি কি বুঝতে পারেননি? এসব অনুবাদকরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ছিলেন। আর তাঁরা কোনো ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সত্য খুঁজে পাননি, যা দিয়ে তাঁরা এই আয়াতের শব্দগুলোর অর্থের বদলে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁরা খুবই বিশ্বস-অনুবাদক ছিলেন, তাঁরা বিজ্ঞানের বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না।

ডঃ বুকাইলি বলেছেন যে, "তাঁদের অনুবাদ অস্পষ্ট।" আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি তাঁর এই কথার সাথে একমত হতে পারলাম না। **তাঁদের অনুবাদ খুবই স্পষ্ট ও সঠিক, তাঁরা কেবল মূল আরবী ভাষায় যে সমস্যা রয়েছে, এর ওপর আলোকপাত করেছেন।**

একটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করার একমাত্র পথ হচ্ছে, ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। যদি হজরত মোহাম্মদের কাছাকাছি সময়ে, মক্কা ও মদিনার লোকেরা তাদের সাহিত্যে এই শব্দগুলোর এই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন; তবেই কেবল একটি উপায়ে স্ত্রীলিংগ বাচক শব্দ একবচন **''আলাক্বা'র** অর্থ হতে পারে,'যা দৃঢ়ভাবে আটকে থাকা বস্তু', বিশেষভাবে কুরাইশদের ভাষায় যদি তা থাকে, কারণ, কোরআন "স্পষ্ট আরবী" ভাষায়-বিশেষভাবে কুরাইশদের কথ্য ভাষায় রচিত।

এটি কোনো সহজ কাজ নয়, কারণ, কুরাইশদের এই “স্পষ্ট আরবী ভাষার” ওপর প্রচুর কাজ করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরা সহজাতভাবেই কোরআনের সঠিক অর্থ বুঝার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন। আর এই কারণে তারা তাঁদের ভাষা ও কবিতার ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেছেন,

> “এই কথা জানা দরকার যে, কোরআন আরবী ভাষায় নাজিল হয়েছে এবং তাদের রচনারীতির সাথে সামঞ্জস্য অনুসারে বলা হয়েছে, তাঁরা সবাই এটি বুঝতে পারতেন আর আয়াতের বিভিন্ন অংশের সাথে জড়িত শব্দের বিভিন্ন অর্থও তাঁরা জানতেন।”[২৮]

তিনি বলেছেন যে, আরবের সবাই কোরআন বুঝতে পারতেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, যে-কেউ বলতে পারেন, এখানে অত্যুৎসাহী লোক অতিরঞ্জিতভাবে এই কথা বলেছেন। ডঃ বুকাইলি বলেছেন যে, আজ পর্যন্ত কেউই কোরআনের সঠিক অর্থ বুঝে না এই কথা বলার চেয়ে বরং ইবনে খালদুনের কথাই সত্যের কাছাকাছি দেখা যায়। ১৯৮৫ সালে ৬ মে, মন্টপেলিয়ারে অনুষ্ঠিত “কলূকুই সুর লি ডিও ইউনিক” সভায় পেপিরসের জামে মসজিদের সাবেক রেকটর হামজা বুবাকিউর এখানে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের কাছে উত্তরের আশা না করেই প্রশ্ন করেছেন,

> “হজরত মোহাম্মদের সময়ে যেভাবে লোকেরা কোরআন বুঝতো তা কি আজও অপরিবর্তনীয়ভাবে একইভাবে পাঠকেরা বুঝতে পারেন? ”

পরে তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন,

> “প্রাচীন কবিতা আজও শব্দতাত্বিক অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়।”

আমরা কেবল এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, যদি আয়াতগুলো মুসলমানদের রূহানিক সান্ত্বনা ও আশা দিয়ে থাকে, তা আজো অপরিবর্তনীয় রয়েছে, তারপর বৈজ্ঞানিক বক্তব্য যা এসব আয়াতে রয়েছে, নতুন প্রমাণ আমাদের সামনে না আসা পর্যন্ত তাও অপরিবর্তনীয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কোনো কোনো আয়াত বলে যে, এসব তথ্যকে **নিশানা** বলা হয়েছে। সূরা আল- মুমিন (বিশ্বাসী) ৪০:৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর **“’আলাক্বা” (জোঁকের মতো রক্তপিণ্ড) হইতে, — যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।”**

সূরা আল-হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা) ২২:৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্ধিগ্ধ হও তবে **অবধান কর** -আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তারপর শুক্র হইতে, তারপর **“’আলাক্বা”** (রক্তপিণ্ড) হইতে, তারপর পূর্ণাকৃতি আ অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে— ইত্যাদি, ইত্যাদি।

---

[২৮] ইবনে খালদুন, ভলুউম ২, পৃষ্ঠা ৩৯১

সুতরাং, অবশ্যই এখানে আবারও এই প্রশ্ন করা যায়, “যদি যদি এটি মক্কা ও মদিনার লোকদের জন্য স্পষ্ট **নিদর্শন** হিসেবে যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তারা এই **’আলাক্বা** শব্দ থেকে পুনরুত্থান সম্পর্কে কী বুঝেছিল?

উত্তর

আমরা এখন হযরত মোহাম্মদের সমকালীন ঐতিহাসিক পরিবেশ পরীক্ষা করে দেখবো যে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর উম্মতেরা ভ্রূণ সম্পর্কে কী বিশ্বাস করতেন? এই উত্তর খোঁজার জন্য আমরা প্রথমে গ্রীক ও ভারতীয় চিকিৎসকদের ধারণা সম্পর্কে জানবো।

হিপোক্রেটিস

আমরা হিপোপক্রেটিসকে নিয়েই এই আলোচনা শুরু করবো। সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ অনুসারে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে কোস নামক এক গ্রীক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছি, সে সম্পর্কে তাঁর মতানুসারে ধাপ হচ্ছে,

বীর্য

প্রতিটি পিতামাতার গোটা দেহ থেকেই শুক্রানু আসে। দুর্বল দেহ থেকে দুর্বল শুক্রানু আর সবল দেহ থেকে সবল শুক্রানু বের হয়ে আসে। অংশ ৮, ৩২১ পৃষ্ঠা।

মায়রে রক্তরে সাথ জমা হওয়া

বীজ (ভ্রূণ) তখন, একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। এছাড়াও এটি মায়ের রক্তের কারণে বৃদ্ধি পায়। এই রক্ত জরায়ুতে নেমে আসে। তাই সন্তান গর্ভে এলে মায়ের মাসিক বন্ধ হয়ে যায়- অংশ ১৪, ৩২৬ পৃষ্ঠা।

মাংস

এই ধাপে মায়ের রক্ত নেমে আসা রক্তের সাথে মিলিত হয়ে. আম্বিলিকাস বা ভ্রূণের নাভীর সংগে মায়ের ফুলের সংযোজক নালী সহ মাংস তৈরি হয়। অংশ ১৪, ৩২৬ পৃষ্ঠা।

হাড়

মাংস বৃদ্ধি পেলে এটি আলাদা অংশ তৈরি করে--- হাড় শক্ত হয়- আরো বলা যায় যে, তারা গাছের মতো শাখা তৈরি করে। অংশ ১৭, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

নিচে আমরা এই ধাপগুলোকে সারকথায় প্রকাশ করতে পারি।

হিপোক্রেটিস-এর মতানুসারে প্রসব পূববর্তী ভ্রূণের বিকাশ

ধাপ ১. শুক্রানু

ধাপ ২. পর্দার চারদিকে মায়ের রক্ত নেমে আসে
ধাপ ৩. মাংস, আমিলিকাসের মধ্য দিয়ে পুষ্টি পায়
ধাপ ৪. হাড়

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, কোরআনের ধারণার ১০০০ বছর আগেও ভ্রূণ যে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায়, এ ধারণা ছিল।

এরিষ্টটল

এখন আমরা এরিস্টটলের ধারণা দেখবো। প্রায় ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে লেখা *অন দি জেনাবেশন অব এনিমেল্‌স*[২৯] বইয়ে এরিষ্টটল ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ উল্লেখ করেছেন। (বইয়ের কোন অংশ থেকে নেয়া হয়েছে, সেই সংখ্যা লেখার মধ্যেই দেওয়া হলো।

বীর্য ও মাসিক রক্ত

অংশ ৭২৮ ক - তে, এরিষ্টটল বলেছেন, পুরুষ শুক্রানু হচ্ছে খাঁটি— "পরে নারী থেকে যে উপাদান বের হয়ে আসে, শুক্রানু তার ওপরে কাজ করে।" অন্যকথায় বলা যায় যে, বীর্য মাসিক রক্তের সাথে মিশে ঘনীভূত পিণ্ড তৈরি করে।

পরে তিনি আরো বলেছেন, "সবচেয়ে খাঁটি উপাদান থেকে প্রকৃতি **মাংস** তৈরি করে, — অবশিষ্ট অংশ থেকে হাড়, পেশিতন্তু চুল আর নখও তৈরি হয়—"। আর সবশেষে, "**হাড়ের চারদিকে,** তার সাথে যুক্ত হয়ে পাতলা তন্তু দিয়ে তৈরি বন্ধনী তৈরি করে, মাংসল অংশ বৃদ্ধি পায় —। (অংশ ৬৫৪ খ)।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কোরআন এই ধারণাকে হুবুহু অনুসরণ করছে, শুক্রাণু মাসিক রক্তের সাথে মিশ্রিত ঘনীভূত পিণ্ড থেকে মাংস তৈরি করে। পরে হাড় তৈরি হয় আর সবশেষে, "হাড়ের চারদিকে— মাংসল অংশ তৈরি হয়, যা আমরা নিম্নের ধাপগুলোতে লক্ষ্য করি।

এরিষ্টটলের মতানুসারে প্রসব পূববর্তী ভ্রূণের বিকাশ

ধাপ ১. শুক্রানু
ধাপ ২. কেটামেনিয়া - মাসিক রক্ত
ধাপ ৩. মাংস
ধাপ ৪. হাড়
ধাপ ৫.হাড়ের চারদিকে মাংসল অংশ **বৃদ্ধি পায়**

এখন আমরা ভারতীয় চিকিৎসাবীদদের কথা বিবেচনা করবোঃ

---

[২৯] Aristotle, *On the Generation of Animals,* Translated by Arthur Platt, Vol. 9 of Great Books of the Western World, Encyclopedia Brittanica, Inc., 1952.

চরক (খ্রীষ্টপূর্ব১২৩ অব্দ) ও শশ্রুতের মত অনুসারে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বীজ রয়েছে। পুরুষ থেকে যে পদার্থ বের হয়ে আসে, তাকে বলা হয় শুক্র (বীর্য)—

নারী থেকে যে পদার্থ নিসৃত হয়, তাকে বলা হয়, আর্তাবা বা শোনিত (রক্ত) আর এটি খাদ্য থেকে "রক্ত আকারে তৈরি হয়— " । [৩০]

এখানে আমরা দেখি যে, ভারতীয় চিকিৎসাবীদদের মধ্যেও এই ধারণাও ছিল যে, পুরুষের শুক্রানু ও নারীর মাসিক রক্ত থেকেই শিশুর জন্ম হয়।

এখন আমরা গেলেনের মত লক্ষ্য করবো

১৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পার্গামুম শহরে (তুরস্কের আধুনিক বারগামা শহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বই, *ডি সেমেনি* হতে আমরা যে জ্ঞান পাই, তা গেলেনের বেঁচে থাকার সময়ের প্রায় ৭০০ বছর পরে, ৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বইটার যে অনুবাদ হয়েছিল, সেই অনুবাদের ১৫ ও ১৬ শতাব্দীর দুটো গ্রীক পাণ্ডুলিপি আর ১২ ও ১৩ শতাব্দীর দুটো আরবী পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তী করে গড়ে উঠেছে। গেলেন-এর এই বইটি এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেও এর অনুলিপি তৈরি হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ যদিও গেলেন মারা যাওয়ার ৭০০ বছর পরে তাঁর বইয়ের আরবী অনুবাদ হয়েছিল, তবু এই বইয়ের অনুবাদের যথার্থতা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলেনি।

আমি একথা বলছি, এর কারণ হচ্ছে, ঈসা মসীহ্‌র বেহেস্তে আরোহণের মাত্র ১৫০ বছর পরে পেপিরাসের উপর লেখা গ্রীক-ইঞ্জিল শরীফের পাণ্ডুলিপির ৭৫% আমাদের খ্রীষ্টানদের কাছে অক্ষত রয়েছে। আর ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে দুটো সম্পূর্ণ গ্রীক অনুলিপি রয়েছে। সুতরাং, সুখবর- ইঞ্জিল শরীফেরও যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। এর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

বীর্য সম্পর্কে গেলেন-এর মন্তব্য

গেলেন বলেছেন, "যে পদার্থ থেকে ভ্রূণ তৈরি হয়, তা কেবল মাত্র মাসিকের রক্ত নয়, যে-কথা এরিষ্টটল বলেছেন, **বরং মাসিকের রক্ত ও দু'ধরণের বীর্য থেকে ভ্রূণ তৈরি হয়।"** (৫০ পৃষ্ঠা)

কোরআন গেলেন-এর সাথে একমত, সূরা দাহর (কাল) ৭৬:২ আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি, মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে।"

---

[৩০] Dr. P. Kutumbiah, M.D., F.R.C.P., *Ancient Indian Medicine,* Orient Longmans, Madras, 1969, p 2-4.

ভ্রূণের বিকাশ

ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে গেলেন আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভ্রূণ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায়। তিনি লিখেছেন, "প্রথম ধাপে বীর্য জয়লাভ করে। হিপোক্রেটিসও চমকপ্রদভাবে একে বীর্য *(জেনিচার)* বলেছেন।"

পরবর্তী ধাপ হচ্ছে, যখন **এটি রক্ত দিয়ে পূর্ণ হয়,** আর হৃদপিণ্ড, মগজ এবং কলিজা (তখনও) গ্রন্থি দ্বারা যুক্ত হয় না ও এর কোনো আকৃতি থাকে না — এ অবস্থাকে — হিপোক্রেটিস (বলেছেন) *ভ্রূণ।"*

এই ধারণাকে তুলে ধরে কোরআনের সূরা হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা) ২২:৫ আয়াতে বলা হয়েছে, "—তাহার পর পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে —)

তারপর, গর্ভাধারণের তৃতীয় ধাপ আসে, "এভাবে এটি (নেচার) **মাংস** তৈরি করে, **হাড়ের** চারদিকে বৃদ্ধি পায়।

আমরা ওপরে দেখেছিলাম যে, কোরআন এই ধারণার সাথে একমত। সূরা মোমেনুন (বিশ্বাসীগণ) ২৩:১৪ আয়াতে বলা হয়েছে, "অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশত দ্বারা।"

চতুর্থ ও সর্বশেষ ধাপে (পুয়ের বা শিশু—আয়াত ৯) তখন অংগের বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করা যায়।[৩১]

প্রসব পুর্ববর্তী অবস্থায় গেলেন-এর উল্লেখিত ধাপ

ধাপ ১. দু'ধরণের বীর্য

ধাপ ১খ. মাসিকের রক্ত সহ

ধাপ ২. আকারবিহীন মাংস

ধাপ ৩. হাড়

ধাপ ৩খ. মাংস তৈরি হয় ও হাড়ের চারদিকে বৃদ্ধি পায়

এভাবে আমরা দেখি যে, গেলেন নিজেও বিভিন্ন ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করেছেন, কিন্তু কাজের অনুক্রম একই।

গেলেন লিখিত ২৬টি বই চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের ভিত্তি

চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে গেলেন লিখিত বইগুলো এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, হিজরতের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও মিসরের খ্যাতনামা ৪ জন চিকিৎসক গেলেন লিখিত ১৬টি বইকে পাঠ্যপুস্তক

[৩১] গেলেন, ওপরে উল্লেখিত বই, ১৯, আয়াত ১-৯, পৃষ্ঠা ৯২-৯৫

হিসেবে গ্রহণ করে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ১৩ শতাব্দী পর্যন্ত ও পরবর্তী শতাব্দী জুড়েই বইগুলো লিখিত চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।[৩২]

এরিষ্টটল ও গেলেন-এর মধ্যবর্তী সময়ে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে আরব চিন্তাধারা

আমরা এখন অবশ্যই নিজেদেরকে প্রশ্ন করবো, হজরত মোহাম্মদের সমকালীন সময়ে আররের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চিকিৎসা সর্ম্পকীয় পরিবেশ কেমন ছিল?

ইয়েমেনের হাদ্রামাউত থেকে মসলার বানিজ্য বহর মক্কা ও মদিনা শহরের মধ্য দিয়ে উত্তরের দিকে এগিয়ে শেষে ইউরোপে চলে যেত। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঘোসানীয়রা উত্তর আরব দখল করে, আর ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইয়াসরিব (মদিনা) এর বাইরে সিরিয়ার মরুভূমিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের ভাষা ছিল সিরিয়াক (এক ধরণের অরামীয় ভাষা)।

৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইহুদীরা তৌরাত ও পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষা থেকে সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ করে (বৃটিশ মিউজিয়ামে এর একটি অনুলিপি রয়েছে)। এটি খ্রীষ্টান ঘোসানীয়দের কাছে ও আরবীয় ইহুদী সমপ্রদায়ের মধ্যে যারা হিব্রু ভাষা জানতো না, তাদের কাছে পাওয়া যেত।

এই সময়ে, গ্রীক থেকে সিরীয়াক ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে একজন পুরানো ও সবচেয়ে ভালো অনুবাদক সার্জিয়াস আল- রাস আইনি (৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কে ইন্তেকাল করেন) চিকিৎসাবিদ্যার ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, এর মধ্যে গেলেন লিখিত ২৬টি বই তিনি সিরিয়াক ভাষায় অনুবাদ করেন। এগুলো সম্রাট প্রথম খসরুর সাম্রাজ্যে ও ঘোসান গোত্রের মধ্যে পাওয়া যেত, যাদের প্রভাব মদিনা শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রথম খসরু (আরবীকে কিসরা), ৫৩১-৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পারস্যের সম্রাট ছিলেন, তিনি মহান খসরু নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী বহু এলাকা দখল করে। এমনকি তিনি সুদূর ইয়েমেন পর্যন্ত দখল করেন। তিনি জ্ঞ্যানার্জন করা পছন্দ করতেন। আর এই কারণে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন।

> প্রথম খসরুর দীর্ঘ ৪৮ বছরের শাসনামলে জুনদি-শাহপুর বিদ্যালয়টি সেই সময়ে সবচেয়ে বিখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর চার দেয়ালের মধ্যে গ্রীক, ইহুদী, নাস-রীয়, পারসীক এবং হিন্দু চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা অবাধে বিনিময় করা হতো।

গ্রীক থেকে সিরিয়াক ভাষায় অনুদিত বইয়ের মাধ্যমেই বেশীরভাগ শিক্ষা সেখানে দেওয়া হতো।[৩৩] এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর শাসনামলে জুনদি-শাহপুর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর, এরিষ্টটল, হিপোক্রেটিস আর গেলেন- এর লেখা বইগুলো তাদের হাতের কাছেই সহজলভ্য ছিল।

---

[৩২] *The Role of the Nestorians and Muslims in the History of Medicine,* Allen O. Whipple, 1967, Princeton Univ. Press, p 16.

[৩৩] The Role of the Nestorians and Muslims in the History of Medicine, Allen O. Whipple, 1967, Princeton Univ. Press, p 16.

পরবর্তী সময়ে, আরবীয় বিজয়ী শক্তি গ্রীক ভাষা থেকে সিরিয়াক ভাষায় অনুদিত বইগুলোকে আবার আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে নাস্তরীয়দের বাধ্য করেছিল। সিরিয়াক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা সহজ; কারণ, এই দুটো ভাষা ব্যাকরণের একই নিয়ম মেনে চলে।

হজরত মোহাম্মদের সময়ে চিকিৎসা বিদ্যার পরিবেশ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই সময়ে আরবে চিকিৎসকরা ছিলেন।

হারিস ইবনে কালাদা সবচেয়ে সুশিক্ষিত চিকিৎসক ছিলেন, তিনি রোগ থেকে সুস্থ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

> ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি তায়েফের বানু সাকিফ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়েমেনের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে শেষে পারস্যে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত জুনদি-শাহপুর বিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। আর এভাবে তিনি এরিষ্টটল, হিপোক্রেটিস আর গেলেন-এর চিকিৎসা সর্ম্পকীয় জ্ঞানের সাথে পরিচিত হন।
>
> তিনি পড়াশোনা শেষ করে পারস্যে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। এই সময়ে সম্রাট প্রথম খসরু তাঁকে রাজদরবারে ডেকে পাঠান, তাঁর সাথে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেন। পরে তিনি ইসলামের শুরুতে আরবে ফিরে গিয়ে তায়েফে বসবাস করতে থাকেন। এসময়ে ইযেমেনের বাদশাহ আবুল খায়ের তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময়ে বাদশাহ একটি বিশেষ রোগে ভুগছিলেন। বাদশাহ রোগ থেকে ভালো হওয়ার পর তাঁকে অনেক টাকা ও একজন ক্রীতদাসী দান করেছিলেন।
>
> যদিও হারিস বিন কালাদা চিকিৎসা বিদ্যার ওপর কোনো বই লেখেননি, সম্রাট খসরুর সাথে আলোচনার সময়ে বিভিন্ন রোগের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভংগী সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। চোখ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, চোখের সাদা অংশ চর্বি দিয়ে তৈরি, কালো অংশ পানি দিয়ে তৈরি. আর বাতাস দিয়ে চোখের দৃষ্টিশক্তি গঠিত।

এসব কিছু — দেখায় যে, হারিস গ্রীক চিকিৎসকদের জ্ঞানের সাথে পরিচিত ছিলেন।[৩৪] ২য় খলিফা হজরত ওমরের শাসনামলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এই পরিস্থিতি সংক্ষিপ্তাকারে ডঃ লুসিয়ান লি কার্ল্ক - *হিষ্টরী ডি লা মেডিসিন আরাবী* বইয়ে লিখেছেন,

> হারিস বিন কালাদা জুনদি-শাহপুর বিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। আর হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞানের জন্য কিছুটা হলেও হারিস-এর কাছে ঋণী। এভাবে, আমরা বিভিন্ন দিক আলোচনা করে আমরা সহজেই গ্রীক (চিকিৎসা শাস্ত্র) চিন্তাধারার এই পথটি চিনতে পারি।[৩৫]

---

[৩৪] Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, *Studies in Arabic and Persian Medical Literature,* Calcutta University, 1959, p 6-7.

[৩৫] LeClerc, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-১২৩

কখনো কখনো হজরত মুহাম্মদ (দঃ) রোগীদের চিকিৎসাও করেছেন। কিন্তু জটিল রোগীদের তিনি হারিসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।[৩৬]

হজরত মোহাম্মদের আশেপাশের লোকদের মাঝে নজর বিন হারিস নামে একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন কুরাইশ বংশীয় ও হজরত মোহাম্মদের চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি সম্রাট খসরুর রাজ দরবারে গিয়েছিলেন। তিনি ফারসী ভাষা ও সঙ্গীত শিখে এসে আর সেইগুলো কুরাইশদের মাঝে পরিচিত করেছিলেন।

তবে হজরত মোহাম্মদের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। তিনি কোরআনের কতগুলো কাহিনী নিয়ে তামাশা করেছিলেন। "এই জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কখনো তাঁকে ক্ষমা করেননি। বদরের যুদ্ধের পর তাঁকে বন্দি করে, তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।"[৩৭]

আমাদের আলোচনার সারমর্ম হিসেবে আমরা দেখি যে,

১. ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মক্কা, মদিনার লোকদের অন্যান্য জাতি বিশেষ করে ইথিওপিয়া, ইয়েমেন, পারস্য ও বাইজেনটাইন অর্থাৎ তুর্কীর লোকদের সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

২. হজরত মোহাম্মদের একজন চাচাতো ভাই চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করার পাশাপাশি ভালোভাবেই ফারসী ভাষা জানতেন।

৩. ঘোসান গোত্র -যারা সিরিয়ার মরুভূমি থেকে শুরু করে, মদিনার সদর দরজা পর্যন্ত শাসন করতেন-তাঁরা সিরিয়াক ভাষা ব্যবহার করতেন। সিরিয়াক ভাষা চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য অন্যতম একটি প্রধান ভাষা ছিল, এছাড়াও এটি ছিল তাদের সরকারী ভাষা।

৪. সেই সময়ে পৃথিবীর বিখ্যাত সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা বিদ্যার বিদ্যালয়- জুনদি-শাহপুর- থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসক- হারিস বিন কালাদা-এর কাছে ইয়েমেনের অসুস্থ বাদশাহ তায়েফে এসে দেখা করেছিলেন। আর হারিসের কাছে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেও মাঝে মাঝে রোগীদের পাঠাতেন।

৫. হজরত মোহাম্মদের বেঁচে থাকার সময়ে গেলেন লিখিত ২৬টি বইকে পাঠ্যসূচি হিসেবে ব্যবহার করে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য আরও একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

ওপরের তথ্যগুলোই দেখায় যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর আশেপাশে থাকা লোকদের যখন তাঁরা তাদের অসুস' রোগীদের ভালো করার জন্য হারিস বিন কালাদা ও অন্যান্য স'ানীয় চিকিৎসকদের কাছে যেতেন, তখন ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে এরিষ্টটল, হিপোক্রেটিস ও গেলেনের তত্ত্ব সম্পর্কে জানার সমূহ-সুযোগ ছিল।

---

[৩৬] LeClerc, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৩৩

[৩৭] Edward G. Brown, M.B., F.R.C.P., *Arabian Medicine,* Cambridge, 1921, p 11.

সূরা আল-মুমিন (বিশ্বাসী) ৪০:৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর ’আলাক্বা হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন— **যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার**।”

আর সূরা আল-হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা) ২২:৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর-আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তারপর শুক্র হইতে, তারপর “’আলাক্বা” (রক্তপিণ্ড) হইতে, তারপর পূর্ণাকৃতি আ অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হইতে।”

আমরা যদি আবারও আমাদেরকে এই প্রশ্ন করি, তবে তা করা আমাদের জন্য সঠিক হবে তাঁরা কী অবধান করেছিল বা বুঝতে পেরেছিল?

তাদের ধারণা কী ছিল?

যদি আমরা কোরআনের ধাপগুলো লক্ষ্য করি, তবে আমরা এর স্পষ্ট উত্তর পাবো।

কোরআনের বর্ণিত প্রসব পূববর্তী অবস্থায় ভ্রূণের বিকাশের ধাপ

ধাপ ১. নুতফা -শুক্রানু

ধাপ ২. ’আলাক্বা- রক্তপিণ্ড

ধাপ ৩. মুদাঘা- টুকরা বা গোশতপিণ্ড

ধাপ ৪. আদামা- হাড়

ধাপ ৫. হাড়কে মাংস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

তারা সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যেই ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে গ্রীক চিকিৎসকদের শিক্ষা বুঝতে ও ধারণা করতে পেরেছিল।

আমি একথা বলতে চাচ্ছি না যে, হজরত মোহাম্মদের শ্রোতারা সবাই গ্রীক চিকিৎসকদের নাম জানতেন, বরং তাঁরা ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে গ্রীক চিকিৎসকদের শিক্ষা বুঝতে ও ধারণা করতে পেরেছিলেন।

১. তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পুরুষের শুক্রানু

২. স্ত্রীর বীর্য ও মাসিকের রক্তের সাথে মিশে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, পরে এটাই শিশুতে পরিণত হয়।

৩. তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এমন এক সময় আছে, ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ড যখন "আকারবিহীনভাবে তৈরি" হয়।

৪. তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ভ্রূণীয় মাংসপিণ্ড হাড়ে পরিণত হয়।

৫. পরে সেগুলো পেশী দিয়ে ঢাকা হয়।

কোরআনে আল্লাহ্ সেই সাধারণ জ্ঞানকেই চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যেন শ্রোতারা ও পাঠকেরা তাঁর দিকে ফিরে আসে। সমস্যা হচ্ছে এই সাধারণ জ্ঞান সঠিক ছিল না।

হজরত মোহাম্মদের পরবর্তীকালে আরবীয় চিকিৎসক

আমরা এখন অবশ্যই একটি হাদিস দেখবো ও হজরত মোহাম্মদের পরবর্তীকালে দুইজন সুপরিচিত চিকিৎসকের মন্তব্য লক্ষ্য করবো। স্পষ্টতঃই তাঁদের কোনো প্রভাব কোরআনের ওপর নেই, কিন্তু তাঁরা ভ্রূণীয় বিকাশ সম্পর্কে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব বিশ্বে প্রচলিত এরিষ্টটল, হিপোক্রেটিস এবং গেলেন- এর সেই চিন্তাধারাই তাঁরা বিশ্বাস করেছেন।

এই **হাদিসটি** আন-নাওবী সম্পাদিত ৪০টি হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে,

> "এই হাদিস আবি আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেছেন; রাসুলুল্লাহ - যিনি বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী তিনি আমাদেরকে বলেছেন, "মায়ের গর্ভে তোমাদের যে কোনো লোককে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করা হয়। ৪০ দিন এটি শুক্ররূপে হিসেবে থাকে; তারপর একই সময় ধরে জমাট-রক্তপিণ্ড ('আলাক্বা) আকারে থাকে; তারপর একই সময় ধরে 'চিবানো গোশতের' মতো থাকে; তারপর একজন ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠানো হয় তিনি তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেন, তারপর, তাকে লিখিতভাবে ৪টি কথা (ভবিষৎ সম্পর্কে) লিখে দেওয়া হয়, ; তার কাজ, হায়াত, জীবিকা আর সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা তাও লিখে দেওয়া হয়।
>
> "যিনি ব্যতিত আর কোনো মাবুদ নেই, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ বেহেশতবাসীর মতো কাজ করতে থাকবে এমনকি যখন তার ও বেহেস্তের মধ্যে একহাত দূরত্ব থাকবে, তখন তকদির তার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং সে দোযখবাসীদের কাজ করে দোযখে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে, কেউ-কেউ দোযখবাসীদের মতো কাজ করতে থাকবে এমনকি যখন তার ও দোযখের মধ্যে একহাত দূরত্ব থাকবে, তখন তকদির তার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে এবং সে বেহেশতবাসীদের কাজ করে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। (লেখক অনুবাদ করেছেন) এই হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম হাদিস শরীফে রয়েছে।[৩৮]

এখানে উল্লেখিত হাদিসটি হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজে বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আলেম ঈমাম বোখারী ও ঈমাম মুসলিম হাদিস সংকলনে এই হাদিসটিকে সহি-হাদিসরূপে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই হাদিসটির মধ্যে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এক বিরাট ভুল রয়েছে। এই হাদিসে বলা হয়েছে, নির্গত শুক্রানু একটি শুক্রবিন্দু হিসেবে ৪০ দিন থাকে; তারপর

---

[৩৮] আল-নাওবী, ওপরে উল্লেখিত বই,পৃষ্ঠা-২৮-২৯

’আলাক্বা হিসেবে ৪০ দিন, মোট ৮০ দিন; তারপর, ‘চিবানো গোশ্‌ত’ হিসেবে ৪০ দিন, তাহলে সর্বমোট **১**২০ দিন। আধুনিক স্ত্রীরোগবিদ্যা গবেষণায় দেখা যায় যে, স্ত্রী-জনন অঙ্গের মধ্যে শুক্রানু **১** সপ্তাহের কম জীবিত অবস্থায় থাকে। ৭০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় আর মগজ ও হাড় ছাড়া অন্যান্য অঙ্গগুলো অনেক পরিপক্ক হয়।

হাদিস অনুসারে প্রসব পূববর্তী ভ্রূণের বিকাশ

ধাপ ১. শুক্রানু- ৪০ দিন

ধাপ ২. ’আলাক্বা -৪০ দিন

ধাপ ৩. মুদাঘা- মাংস ৪০ দিন

এসব দিনগুলো মিলে ১২০ দিন বা ৩ মাস গত হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো হাড় তৈরি হয়নি।

আসলে সত্যি কথা হচ্ছে, ২ মাসের মধ্যেই অঙ্গগুলো তৈরি হয়, হাড় শক্ত হতে শুরু করে আর পেশীর নড়াচড়া করতে পারে।

এই হাদিসটি বলছে ৮০ দিনের আগে ‘চিবানো গোশতের ‘রূপ হয় না। এটি স্পষ্টতই ভুল কথা। ডঃ বুকাইলি নিজেও এই হাদিসটি উল্লেখ করে, শেষে বলেছেন যে,

> “ভ্রূণের বিবর্তনের এই ধারণা আধুনিক তথ্যের সাথে একমত হতে পারেনি।”[৩৯]

অবশ্য, এ হাদিসটি আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায় যে, হজরত মোহাম্মদের ইন্তেকালের মাত্র ২০০ বছর পরেও লোকেরা কী বিশ্বাস করতেন, তা জানা যায়। এই **হাদিস** অনেক বড়-বড় ধর্মতত্ত্বীয় সমস্যা তুলে ধরেছে।

ধর্মতত্ত্বীয় সমস্যা

এই হাদিসে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে ভুল রয়েছে তা কি হজরত মোহাম্মদের ধর্মতত্ত্বীয় বক্তব্যকে সন্দেহজনক বা দুর্বল করে তুলে?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল হলে যদি তা প্রমাণ করে যে, এই সহি-হাদিসটি জাল বা “দুর্বল” বা যইফ হাদিস, তাহলে অন্যান্য সহি-হাদিসের সঠিকত্ব সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানবো, যেগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভুল নেই, সেগুলো জাল বা “যইফ” হাদিস বলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

---

[৩৯] দি বাইবেল, দি কোরআন ও বিজ্ঞান,বুকাইলি, পৃষ্ঠা-২৪৫

আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন হয়েছে, কীভাবে আমরা জানবো যে, এগুলো সঠিকভাবে প্রচারিত হয়নি? কীভাবে আমরা জানবো যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এই হাদিসগুলো বলেননি বা বিজ্ঞানের সত্যকেই বা আমরা কীভাবে বুঝতে পারবো???

এছাড়াও বলা যায় যে, যদি 'আলাক্বা শব্দের সঠিক অনুবাদ হয়, "জোঁকের মতো পদার্থ" হয়, যেভাবে আধুনিক মুসলমান যেমন শাবির আলি দাবী করেছেন, তা কোরআন পরবর্তীকালীন এই চিকিৎসকরা উল্লেখ করেননি। আসলে, তাঁরা একেবারে উল্টো কথাই বলেছেন। এসব গ্রীক চিকিৎসকদের কোরআন ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, আর গ্রীক চিকিৎসকদের অর্থকে আলোকিত করার জন্য কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

ইবনে সিনা ৯৮০-১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ লিখেছেন,

> ৬৭৯.দুটো জিনিস থেকে মানবদেহ গঠিত হয়- (১) **পুরুষ শুক্রানু**, যা মূল "ভূমিকা" পালন করে; (২) **নারীর শুক্রানু [মাসিকের রক্তের প্রথম অংশ]** যা একটি পদার্থের যোগান দেয়— এগুলো **মিশ্রিত** হয়ে ঘনীভূত অংশে পরিণত হয় (তিনি মানুষকে 'আলাক্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন- কোরআন ৯৬:২) একটা নির্দিষ্ট কাঠিন্য ও শক্ত অবস্থায় পরিণত হয় ।[৪০]

এভাবে আমরা দেখি যে, ইবনে সিনা নারীর শুক্রানুর যে-ভূমিকা বলেছেন, একেবারে হুবুহুভাবে এরিষ্টটল মাসিক রক্তের সেই ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন—-। আধুনিক ইউরোপীয় লোকদের পক্ষে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইবনে সিনার ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন। [৪১]

ইবনে কাইয়ুম আল-জাওজিয়া (১২৯১- ১৩৫১)

ইবনে কাইয়ুম কোরআন ও গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যে মিলের পুরো সুযোগটি তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

এখানে ইবনে কাইয়ুমের চিকিৎসা বিদ্যা সর্ম্পকীয় একটি লেখা তুলে ধরা হলো, যার মধ্যে রয়েছে,

হিপোক্রেটিস (বাঁকা অক্ষর)

কোরআন (গাড় অক্ষর)

হাদিস (লেখার নিচে দাগ)

তফসীর (লেখার নিচে দুটো দাগ)

আর তাঁর নিজের কথাকে একই অনুচ্ছেদের মধ্যে উপরে উল্লেখিত চিহ্ন ছাড়াই সাদামাটাভাবে লেখা হয়েছে।

---

[৪০] Gruner, ওপরে উল্লেখিত বই,পৃষ্ঠা-৩৫৯

[৪১] Musallam, Basim F., *Sex and Society in Islam,* Birth Control before the 19th century, Cambridge University Press, 1983, p 47-48.

কিতার আল-আজিন্না নামক বইয়ে হিপোক্রেটিস তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, *"— শুক্রাণু একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, আর মায়ের রক্তের কারণে তা বৃদ্ধি পায়, এই রক্ত জরায়ুতে নেমে আসে*[৪২] *— কোনো কোনো পর্দা শুরুতে গঠিত হয়, আর কতগুলো ২ মাস পরে আবার কতগুলো ৩মাস পরে গঠিত হয় —।"* ***এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন, "তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (কোরআন ৩৯:৬)।*** *যেহেতু এসব পর্দার প্রতিটির তাদের নিজস্ব অন্ধকার রয়েছে, আল্লাহ্ যখন সৃষ্টির ধাপ ও এক ধাপ থেকে আরেক ধাপের রূপান-র সম্পর্কে বলেন, তিনি পর্দার অন্ধকারের কথাও উল্লেখ করেন। অধিকাংশ তফসীরকারক ব্যাখ্যা করেছেনঃ "এটি হচ্ছে, পেটের অন্ধকার, জরায়ুর অন্ধকার আর অমরার অন্ধকার-।"*

দ্বিতীয় উদাহরণে আমরা পড়ি,

হিপোক্রেটিস বলেছেন, "মুখ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোলে, আর নাক ও কান মাংস থেকে গঠিত হয়। কান খোলা হয়, আর চোখ যা পরিষ্কার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে।" ***নবী প্রায়ই বলতেন, "আমি তাঁর এবাদত করি, যিনি আমার মুখমন্ডলের*** **আকার দিয়েছেন, তৈরি করেছেন আর আমার শ্রবণশক্তি খুলে দিয়েছেন আর দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন।"** ইত্যাদি [৪৩]

তিনি একথা বলতে পারেন কারণ, আমরা দেখেছি যে, হজরত মোহাম্মদের সময়ে শিক্ষিত লোকেরা গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে পরিচিত ছিলেন।

তবে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাদের এখানে বুঝতে হবে যে, কোরআন গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোন সংশোধন করেনি। ইবনে কাইয়ুমের কোনো সুযোগ ছিল না যে, তিনি চিৎকার করে বলেন, "এই যে তোমরা সবাই শোন, তোমরা যা শুনেছ তার সবই ভুল। 'আলাক্বা শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে, "যা আকড়ে ধরে থাকে:" অথবা "জোঁকের মতো পদার্থ"। তা না করে ইবনে কাইয়ুম কোরআন ও গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে মিল তুলে ধরেছেন। আর এই মিলের মধ্যেই ভুল রয়েছে।

সর্বশেষ সাক্ষী হিসেবে আমরা ইবনে নাসির উদ্দিন বায়জাবীর তফসীর উল্লেখ করতে চাই। তিনি ১২৮২ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি সূরা হজ্ব (মক্কায় তীর্থযাত্রা) ২২:৫ আয়াত (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন) উল্লেখ করেন। তারপর তিনি কী বুঝেছেন তা বলেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, "'আলাক্বা হচ্ছে এক টুকরো ঘন রক্ত", আর মুদাঘা হচ্ছে, একটুকরো মাংস, যতটুকু পরিমাণে একসাথে চিবানো যায়।"

---

[৪২] আমরা এই অংশের শুরুতে হিপোক্রেটিস্তএর এই উদ্ধৃতিটি "--- শুক্রাণু একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, আর মায়ের রক্তের কারণে তা বৃদ্ধি পায়, এই রক্ত জরায়ুতে নেমে আসে, ফলে একজন নারী গর্ভবতী হলে তার মাসিকের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়---।" উল্লেখ করেছিলাম। সেকশন ১৪, পৃষ্ঠা ৩২৬

[৪৩] ইবনে কাইয়ুম ,তোহফাত, পৃষ্ঠা ২৪৮-৫২

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ
عَظِيمٞ ١ يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ
أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ
سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ
٢ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ ٣ كُتِبَ عَلَيۡهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ
وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٤ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي
رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ
مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ
وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ
طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ
وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ
بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا
ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ٥

বৃদ্ধির ধাপ- একটি আধুনিক ধারণা?!?

এই পাঠের শুরুতে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, বলা হয়ে থাকে যে, ভ্রূণের বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ হচ্ছে একটি আধুনিক ধারণা। আর কোরআন এই বিভিন্ন ধাপের কথা বর্ণনা করে আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে ভবিষৎদ্বাণী করেছে। যদিও আমরা দেখেছি যে, এরিষ্টটল, হিপোক্রেটিস, ভারতীয়রা ও গেলেন সবাই কোরআন আসার ১০০০ বছর আগেই ভ্রূণের বিকাশের এই বিভিন্ন ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন।

আর কোরআন আসার পরে, কোরআনে যে-বিভিন্ন ধাপের কথা বলা হয়েছে, তা হাদিস ও ইবনে সিনা এবং ইবনে কাইয়ুম গ্রহণ করেছেন। আর এই ধারণা গেলেন ও তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই মূলগতভাবে একই ধারণা ছিল।

হাড় সৃষ্টির ধাপ সম্পর্কে বলা যায়, ডঃ মূর তাঁর লেখা পাঠ্য বইয়ে দক্ষতার সাথে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পেশী সোমাইট থেকে তৈরি হওয়ার একই সময়ে হাড়ের তরুনাস্থির কাঠামো তৈরি হয়। হাড় তৈরির জন্য আলাদা কোনো ধাপ নেই যে সময়ে বিকাশমান ভ্রূণের কেবল হাড় থাকে আর পরবর্তী সময়ে এর চারদিকে মাংশ দিয়ে ঢাকা হয়।

এটিও সমভাবে স্পষ্ট যে, কোরআনে বর্ণিত ‘’আলাক্বা’ শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্তপিণ্ড আর যে- সব কুরাইশ হজরত মোহাম্মদের কথা শুনেছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, শিশুর বিকাশে মায়ের অবদান হিসেবে এখানে মাসিক রক্তের কথাই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বুঝিয়েছেন।

সুতরাং, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বছরের পর বছর ধরে ভ্রূণতত্ত্বের উপর কোরআনের আয়াতগুলো বলছে যে, “মানুষ একবিন্দু শুক্রানু থেকে তৈরি, যা পরবর্তীকালে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়” এ-ধারণাটি কোরআনের সমকালীন প্রথম শতাব্দীর “বিজ্ঞান”-এর ধারণা অনুসারে সঠিক।

কিন্তু যখন আমাদের বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে তুলনা করি, তখন দেখি যে,

হিপোক্রেটিসের তত্ত্বে ভুল রয়েছে,

এরিষ্টটলের তত্ত্বে ভুল রয়েছে,

গেলেনের তত্ত্বে ভুল রয়েছে,

কোরআনের তত্ত্বে ভুল রয়েছে,

আর এসব তত্ত্বগুলোতে মারাত্মক ভুল রয়েছে।

৭. গর্ভধারণের সময়কাল

কোরআনের যে সব আয়াতে শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো সম্পর্কে তথ্য ও হুকুম দেওয়া হয়েছে, সেগুলো নিচে দেওয়া হলো:

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা লূকমান ৩১:১৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং **তাহার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে**। সুতরাং, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও— ।

২ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানী সূরা বাকারা (গাভী) ২:২৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "যে স্তন্যপান-কাল পূর্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে— ।"

শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-আহকাফ (স্থান বিশেষের নাম) ৪৬:১৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, **তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহাকে স্তন্য ছাড়াইতে সময় লাগে ত্রিশ মাস—** ।"

এখানে অবশ্যই এই কথা বলা যায় যে. যদি সম্ভব হয়, তবে ২৪ মাস ধরে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোতে কোনো সমস্যা নেই। বহু বছর ধরে বোতলে দুধ খাওয়ানোর কথা প্রচার পরে ডাক্তাররা এখন বলছেন, উন্নয়নশীল দেশে, এমনকি উন্নত দেশেও শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো বোতলের দুধ খাওয়ানোর চেয়ে ভালো, যাতে শিশুরা যত দিন সম্ভব প্রোটিনের একটি পরিষ্কার উৎস পায়, এখন এটি হচ্ছে শিশুর জন্য বাঁচা-মরার বিষয়।

অবশ্য, তৃতীয় আয়াত অনুসারে হিসেব করলে দেখা যায় যে, গর্ভধারণকাল ও বুকের দুধ খাওয়ানোতে ৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন। ৩০ মাস থেকে ২৪ মাস বিয়োগ করলে **গর্ভধারণের সময়মীমা হচ্ছে মাত্র ৬ মাস।** কিন্তু স্বাভাবিক গর্ভধারণ সময়কাল হচ্ছে ৯ মাস। ইউসুফ আলী বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখানে সমস্যা আছে, তাই তিনি এই আয়াতের টিকায় লিখেছেন, এখানে গর্ভধারণের *নুন্যতম* সময়সীমা ৬ মাস বলা হয়েছে, এরপর শিশুটি বেঁচে থাকতে পারে। এটি সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে।[৪৪] (বাঁকা অক্ষরের লেখাগুলো তাঁর নিজের)

---

[৪৪] ইউসুফ আলী, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৩৭০, টীকা ৪৭৯০

তিনি যখন এটি লিখেছিলেন, সেই সময়ে ইউসুফ আলীর তৈরি এই প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption দেখে পাঠকরা খুশি হতে পারেন, (যদিও বর্তমানে এটি আর সত্য নয়)।[৪৫] কিন্তু ১৯৩৮ সালে লোকেরা এসব কথা সহজে বুঝতে পারতো না। এই আয়াতে পরে বলা হয়েছে,

> "—ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হইবার পর বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি— আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আত্মসমর্পণ করিলাম।"

এই বক্তব্যে ৪০ বছর বয়সকে প্রতিটি স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। বিশেষ কোনো পরিস্থিতির কথা এখানে বলা হয়নি। যদি ২৪ মাস দুধ খাওয়ানো স্বাভাবিক সময় হয়; আর মানুষের ৪০ বছর বয়সে পৌঁছানো স্বাভাবিক ব্যাপার হয়, তবে আমরা আশা করতে পারি যে, গর্ভধারণ সম্পর্কে প্রথম শব্দগুচ্ছে যে বলা হয়েছে, তা স্বাভাবিক গর্ভধারণ সময়কাল (৯ মাস) বুঝিয়েছে; আর অস্বাভাবিক গর্ভধারণ সময়কাল ৬ মাস বুঝায়নি; কারণ, তা আসলে স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এটি আসলে রোগ।

৮. উত্তরাধিকার ও অর্জিত বৈশিষ্ট্য

ক. বংশগতি বিদ্যা ও দুধ-মা

বিগত কয়েকশো শতাব্দী ধরে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, গর্ভবতী অবস্থায় মায়েরা যা করে বা দেখে গর্ভের সন্তানের ওপর তার প্রভাব পড়ে। ১০০ বছর আগে আমেরিকার সংস্কৃতিতে, লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কোনো মহিলা একটি খরঘোষ দেখে তবে মনে করা হতো যে, তাঁর সন্তান খরঘোষের মতো ওপরের ঠোঁট-কাটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে ওপরের ঠোঁট কাটা লোকদের খরঘোষ-ঠোঁটো বা হেয়ার লিপ বলা হতো। এই "হেয়ার লিপ" শব্দটি এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইয়ে আজো রয়েছে। (বাংলাদেশেও মনে করা হয়, চন্দ্র গ্রহণের সময়ে কোনো গর্ভবতী মহিলা বেগুন কাটলে তাঁর সন্তান ঠোঁট- কাটা নিয়ে জন্ম নেবে।

মনে হয়, এমন একটি প্রাচীন ধারণা কোরআনেও রয়েছে। ৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা নিসা (নারী) ৪:২৩ আয়াতে যেসব মেয়েদের বিয়ে করা যাবে না, তাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে বলা হয়েছে,

> "— দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী—তোমাদের কটিদেশ হইতে উৎপন্ন তোমার ঔরশজাত পুত্রের স্ত্রী—" (পোষ্য ছেলের বউকে বিয়ে করার অনুমতি সূরা আহ্যাব (দলসমূহ) ৩৩:৩৭ আয়াতে দেওয়া হয়েছে)

[৪৫] এখন ৬০০ গ্রাম ওজনের সাড়ে পাঁচ মাসের শিশুও বেঁচে থাকতে পারে, যা আমি নিজে ১৯৮৯ সালে

এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, ডঃ বুকাইলি যাকে বলেছেন, অনুবাদকের "অবশ্যই" আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকতে হবে। সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বলতে পারি, আমাদের বাবা এবং মার কাছ থেকে প্রাপ্ত জিনের দ্বারা উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়; এছাড়া আর কোনো পদ্ধতি নেই। দুধ-মার দুধ পান করে কোনো বংশগতির স্বভাব অর্জন করা যায় না। দুধ-মার দুধপানকারী কোনো ভাই ও তার দুধ- বোনের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। সুতরাং, বলা যায় যে, এই ধরনের বিয়ে নিষিদ্ধ করারও কোনো কারণ নেই।

আমরা বলতে পারি যে, এই নিষেধের মধ্য দিয়ে দুধ-মাকে সম্মান জানানো হয়। কিন্তু এটি মূল বিষয় হতে পারে না। বরং এটি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, দুধ খেলে দুধ-মার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ওপরে উল্লেখিত সূরা নিসা (নারী) ৪:২৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেম ঈমাম বোখারী লিখেছেন, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) একদিন বিবি আয়েশাকে বলেছিলেন, "দুধ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে তেমনি বিয়ে সংক্রান্ত নিষিদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়, যেমনিভাবে শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে বিয়ে সংক্রান্ত নিষিদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়।"[৪৬] এর অর্থ হচ্ছে, দুধ-বোনকে বিয়ে করা যাবে না কিন্তু রক্তের ভাইদের মতোই দুধ-বোনরা ঘোমটা ছাড়াই দুধ-ভাইকে দেখতে পারে। আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছামতো যা খুশী তাই হুকুম দিতে পারেন, কিন্তু এখানে এটি অবশ্যই আধুনিক বংশগতিবিদ্যার সাথে একমত নয়।

খ. বংশগতিবিদ্যা ও তৌরাত-পুরাতন নিয়মের ফোটা-ফোটা রংঙের ছাগল।

তওরাতে, পয়দায়েশ কিতাবের ৩০:৩২-৩১:১৩ আয়াতে আমরা একটি কাহিনী দেখতে পাই। এখানে হযরত ইব্রাহিমের নাতি হযরত ইয়াকুব অবৈজ্ঞানিক তথ্যে বিশ্বাস করতেন যে, গর্ভবতী ভেড়ীরা যা দেখে, তার প্রভাবে তাদের গর্ভের বাচ্চার রং পরিবর্তন হয়।

হজরত ইয়াকুবের শ্বশুর লাবন চেয়েছিলেন হজরত ইয়াকুব যেন তাঁর ভেড়ার পাল দেখাশোনা করেন, এর বিনিময়ে তিনি হজরত ইয়াকুবকে বেতন দিতে চাইলেন। হজরত ইয়াকুব প্রস্তাব দিলেন যেন লাবন ফোটা-ফোটা রংয়ের ছাগল ও ভেড়াগুলো যেন পাল থেকে আলাদা করে নেন। তবেই হজরত ইয়াকুব আবার পশুপাল চরাবেন। তারপর হজরত ইয়াকুব কালো রংয়েরগুলো চরাতে লাগলেন। আর ফোটা-ফোটা রংয়ের ভেড়া ও তাদের বাচ্চাগুলো তাঁর বেতন হিসেবে ঠিক করা হলো। লাবন তাঁর প্রস্তাবে একমত হয়ে ডোরাকাটা ও ফোটা-ফোটা রংয়ের ও কালো রংয়ের ভেড়াগুলো সরিয়ে রাখলেন। হজরত ইয়াকুব কালো রংয়ের ছাগল ও ভেড়াগুলো চরাতে লাগলেন।

কিন্তু হজরত ইয়াকুবের মনে-মনে একটি ধারণা ছিল যে, কীভাবে সে নবজাত পশুদের বাচ্চার রং পরিবর্তন করতে পারেন। তওরাতের কাহিনীতে বলা হয়েছে,

> "ইয়াকুব—লিবনী, লূস ও আর্মোণ গাছের কাঁচা ডাল নিয়ে তার ওপর থেকে রেখার মতো করে ছাল ছাড়িয়ে নিলেন। তাতে মধ্যে মধ্যে তার নিচের সাদা কাঠ দেখা যেতে লাগলো। পশুর

[৪৬] বোখারী, বিয়ে সম্পর্কে, ৬৭ অধ্যায়, সংখ্যা ২১

পাল যখন পানি খেতে আসতো, তখন তিনি সেই ডালগুলো নিয়ে তাদের সামনে পানির গামলার সামনে রাখতেন।”

হজরত ইয়াকুব বিশ্বাস করতেন যে, পশুদের মিলিত হওয়ার সময়ে, রেখা আছে এমন ডালপালা তাদের সামনে রাখলে তাদের সন্তানদের ওপর এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু আমরা বংশগতিবিদ্যার আধুনিক পরীক্ষার সাহায্যে জানি যে, এমন কোনো কিছু নেই যার প্রভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত স্বভাব লাভ করা যায়। (এর অর্থ হচ্ছে যে, আপনি খরঘোষ- ঠোঁটো বা ফাটা তালু নিয়ে জন্মাবেন না, যদিও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় আপনার মা তা দেখেছিলেন।) তাই হজরত ইয়াকুবের ধারণা ভুল ছিল!

তবে, হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসহাকের (আঃ) আল্লাহ্ চাননি যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর এই ভুল ধারণা নিয়ে কাজ করুক, কারণ এই কাজ কেবল স্রষ্টার সাফল্য চুরি করার মতো। তিনি হযরত ইয়াকুব (আঃ)কে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আসল কারণ বলে দিলেন। এই বিষয়টি হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর স্ত্রীদের এভাবে বলেছিলেন,

“একবার পশুগুলোর মিলিত হবার সময়ে আমি এক স্বপ্ন দেখলাম। চারদিকে তাকিয়ে আমি যেন দেখলাম, ছাগীদের ওপর যে সব ছাগলগুলো উঠছে তা ডোরা-কাটা এবং বড়-বড় ও ছোট ছোট ছাপের। স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন, “ইয়াকুব”।

আমি বললাম, ”এই যে আমি।” তিনি বললেন, তুমি চোখ তুলে দেখো, **ছাগীদের ওপর যে সব ছাগলগুলো উঠছে, সেগুলো ডোরা-কাটা এবং বড়-বড় ও ছোট ছোট ছাপের**। লাবন তোমার প্রতি যা করেছে তার সবই আমি দেখেছি। আমি সেই বেথেলের আল্লাহ, যেখানে তুমি থামের ওপর তেল ঢেলে দিয়ে আমার কাছে কসম করেছিলে। এখন এই দেশ ছেড়ে তোমার জন্মভূমিতে ফিরে যাও।”

এই মোজেজা আল্লাহ্ কীভাবে করেছিলেন, তা জানার জন্য আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি, নীল চোখ যেমন মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিন, তেমনি ফোটা-ফোটা রং ছাগলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিন। এর মানে হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মিলনের ফলে, ২৫% ছাগল হবে হোমোজাইগাস (একই ধরনের দুটো জিন) হবে প্রকট কালো রংঙের, ২৫% হবে হোমোজাইগাস ফোটা-ফোটা রংয়ের, অন্যদিকে ৫০% হবে হেটোরোজাইগাস এদের মধ্যে একটি জিন হবে কালো ও অন্য জিনটি হবে ফোটা-ফোটা। এই ৫০% ও হবে কালো রংয়ের, কারণ, কালো রংয়ের জিন প্রকট বৈশিষ্ট্য ও এটি রঙকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে ফোটা-ফোটা রং হবে প্রচ্ছন্ন জিন, আর তা লূকানো থাকবে। একটি স্বাভাবিক পশুর (২৫%-৫০%-২৫%) সাথে যদি মিলনেন সুযেগ পায় তবে মিলনের ফলে মিশ্রিত স্বভাবের পুরুষ ও মাদী ভেড়া জন্ম নেবে। এখানে দেখা যাবে যে, ২৫% ফোটা-ফোটা রংয়ের বাচ্চা রয়েছে।

লাবন যখন ২৫% ফোটা-ফোটা রংয়ের ২৫% প্রাণী সরিয়ে নিল, ফলে নেই পালের মধ্যে ৩৩% বিশুদ্ধ কালো রংয়ের ছাগল ও৬৭% মিশ্রিত বা হেটোরোজাইগাস ছাগল ছিল। ফলে এটি হজরত ইয়াকুবের পরিকল্পনার বিপক্ষে কাজ করছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ্ এই পরিকল্পনার মধ্যে কাজ

করলেন, তিনি সকল ফোটা-ফোটা রংয়ের ভেড়াদের (হোমোজাইগাস- প্রচ্ছন্ন) মধ্যে মিলন করাতে বললেন।

প্রথম বছরের ফলাফল হলো, ৬৭% হেটারোজাইগাস মাদি পশুর ৫০% বাচ্চা হবে ফোটা-ফোটা রংয়ের, ফলে দেখা গেল যে, সমস্ত ভেড়ার বাচ্চার মধ্যে ফোটা-ফোটা রংয়ের ৩৩% বাচ্চা হলো, আর এই বাচ্চাগুলোর মালিক হলেন হজরত ইয়াকুব।

দীর্ঘদিন ধরে এইরূপ মিলনের ফলে দেখা যাবে যে, সব কালো রংয়ের বাচ্চাগুলো হেটারোজাইগাস হয়েছে, এদের মধ্যে ফোটা-ফোটা রংয়ের প্রচ্ছন্ন জিন থাকবে। তারা পিতার কাছ থেকে এই প্রচ্ছন্ন জিন পেয়েছে। এর ফলে পরবর্তী বছরে হেটারোজাইগাস মাদী ভেড়ার শতকরা হার ৭৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। আর সবশেষে দেখা যাবে যে, প্রায় অর্ধেক বাচ্চা ফোটা-ফোটা রংঙের হয়েছে, তার মানে হচ্ছে হজরত ইয়াকুব তাঁর পাওনা মুজুরীর দ্বিগুণ পাবেন।

এভাবে ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কিতাবুল মোকাদ্দসের কাহিনীতে হজরত ইয়াকুবের ভুল-ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি এখানে আধুনিক বংশগতিবিদ্যার জ্ঞানও তুলে ধরা হয়েছে।

৯. অন্যান্য সমস্যা

ক. দুধ— শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-নাহল (মৌমাছি) ১৬:৬৬ আয়াতের কথা বলতে পারি। এখানে বলা হয়েছে,

> "অবশ্যই "আনআমের" মধ্যে তোমাদিগের জন্য শিক্ষা আছে। উহাদিগের উদরস্থিত (বুতুন بُطُون) গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদ|ó

এর সম্ভাব্য অর্থ কি এই হতে পারে যে, দুধ গোবর ও রক্ত থেকে বের হয়ে আসে?

দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থিসমূহ যা থেকে দুধ বেরিয়ে আসে, তা চামড়ার অংশ ও চামড়ার নীচে থাকে। গোবর তলপেটে অন্ত্রের মধ্যে থাকে, শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে বিবেচনা করলে এগুলো দেহের বাইরের অংশ। গোবরের মধ্যে কোনো রক্তনালী নেই, আর তা দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থির সাথে জড়িতও নয়।

খ. মধু— অথবা একই সূরার আল-নাহল (মৌমাছি) ১৬:৬৯ আয়াতের কথা বলতে পারি, যেখানে বলা হয়েছে,

> "—উহার উদর (বুতুন بُطُون) হইতে নির্গত হয়, বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু); যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য।"

এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, মৌমাছির উদর থেকে মধু বের হয়ে আসে? আর মধু কী কী রোগ ভালো করতে পারে?

গ. তোমাদের মতো একটি উম্মত— শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-আনআম (গবাদি পশু) ৬:৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি উড়ে না যাহা তোমাদিগের মতো একটি উম্মত (সমাজ) নয়— ।"

এখানে "তোমাদিগের মতো একটি উম্মত (সমাজ) নয় ‘‘বলতে কী বুঝানো হয়েছে? ডঃ বুকাইলি উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ মৌমাছি। [৪৭]

প্রত্যেকেই একমত হবেন যে, মৌমাছিরা দলভুক্ত হয়ে বাস করে। কিন্তু মাকড়সা সম্পর্কে কি এই কথা বলা যাবে? যৌন মিলনের পরে তো এদের অনেক প্রজাতির স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে। এই রকম উম্মতের সম্প্রদায় কি আমার মতো? আপনার মতো?

সিংহদের সম্পর্কে কী বলা যায়? যুবা-সিংহ কোনো গোত্রের মধ্য থেকে বুড়ো সিংহকে তাড়িয়ে দিয়ে, আগের সিংহের বাচ্চা-সিংহদের মেরে ফেলে। এখন আমার বয়স ৭০ বছর, তবে আমার ও আমার ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে কী আছে?

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে, আসুন আমরা আবারও মৌমাছিদের কথা চিন্তা করি। মৌচাকে কেবল একটি রানী মৌমাছি আছে। সমস্ত শ্রমিক মৌমাছি হচ্ছে, ক্লীব। তাহলে পুরুষ দের‌্ন সম্পর্কে কী বলা যায়? একটি পুরুষ মৌমাছি রানী মৌমাছির সাথে মিলিত হওয়ার পরে সব পুরুষ মৌমাছিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরকম সম্প্রদায় কি আমাদের মতো? আমি তা মনে করি না।

ঘ. সূর্য— আসুন আমরা প্রাথমিক যুগে নাজিল হওযা মক্কী সূরা আল-ফুরকান (কোরআন) ২৫:৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কীভাবে তিনি ছায়া সমপ্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক।"

সূর্য কি ঘুরে ঘুড়ে ছায়াকে নিয়ন্ত্রণ করে? আমাদের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে, পৃথিবী পূর্ব দিকে ঘুরার কারণেই পূর্বদিকে ছায়া লম্বা হয়। আর পৃথিবী ঘুরার সাথে সূর্য ঘুরে না, দেখা যায় যে, পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে, ছায়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সূর্য ঘুরে না। কোরআন সঠিক তথ্য তুলে ধরেনি।

সূর্য সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতটি আমরা সূরা আল-কাহাফ (গুহা) ১৮:৮৬ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে,

---

[৪৭] বুকাইলি , বাইবেল, কোরআন, ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১৯২

"— চলিতে চলিতে সে (জুল-কারনায়ন) যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিল তখন সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল— ।"

সবার আগে আমি বলতে চাই যে, ওপরের আলোচনা অনুসারে দেখে দেখা যায় যে, সূর্য কখনও ডুবে না। পৃথিবী ঘুরার ফলেই রাত নেমে আসে। এমনকি অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিকও কথা বলার সময়ে সূর্য ডুবেছে এই কথা বলেন। কিন্তু পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্য ডুবলে. তবে বাষ্পে পৃথিবী ভরে যেতো। এটা একটা বড় ভুল।

ডঃ বুকাইলি এই সব আয়াত নিয়ে আলোচনা করেছেন তা আমাদের প্রমাণের সাহায্যে বিশ্বাস করতে কোনো সাহায্য করে না।

১০. মেরু অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমান ও মুসলমান নভোচারীর নামাজ আদায়

সর্বশেষ সমস্যা যা এখন বলা হচ্ছে, তা কোরআনে আলোচিত হয়নি। এটি গর্বের সাথে বলা একটি কথা বলেই আমাদের কাছে মনে হয়। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো।

ক. কোরআনে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন হচ্ছে সমস্ত জগতের আলো ও পথপ্রদর্শক। তবুও এই কথা বলতে হয় যে, মেরু অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরাও মুসলমান হতে পারবে না!

''এটি সঠিক কথা নয়," আপনি বলবেন। "যে-কেউ মুসলমান হতে পারেন। তাঁকে কেবল ঈমান আনতে হবে আর মুখে কলেমা শাহাদাত পাঠ করতে হবে।"

তাহলে আমি বলবো, "আপনি ভুল বলছেন। মুসলমান হলে তাঁকে রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে, আর রোজা রাখলে মেরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তিনি ক্ষুধায় মারা যাবেন; কারণ, ইফতার করার জন্য সেখানে সূর্য ডুবে না। কয়েক সপ্তাহ ধরে যখন সূর্য ডুবার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে রোজা রেখেই যেতে হবে।"

"ঠিক আছে, তবে" আপনি উত্তরে বলবেন, "তিনি স্টকহোম বা মক্কার সময় অনুসারে রোজা রাখবেন।"

হ্যাঁ, যদিও এই সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু অনেক মুসলমানরা একমত হবেন না যে, এই ধরনের "মৌলিক চিন্তা" করা সঠিক। প্রতি বছর মরক্কোতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় যে, চান্দ্রমাসের ২৯ না ৩০ তারিখে ঈদের নতুন চাঁদ দেখা যাবে। এর সাথে জড়িত রয়েছে যে, একজন লোক কি অতিরিক্ত একদিন রোজা রাখবে কি রাখবে না? এর ফলে দেখা যায় যে, লোকেরা কোথাও যাবার জন্য রেলের টিকিট সংরক্ষণ করতে পারে না, কারণ, তারা জানেনা যে, কখন তাদের ঈদের ছুটি শুরু হবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সব অসুবিধা বছরের পরে বছর ধরে দেখে আমি আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, “কিন্তু এখন বিংশ শতাব্দী, আমরা নতুন চাঁদ উঠার সময় গণনা করেই বের করতে পারি। কেন লোকেরা তা গণনা করে না, তা করলে তো আর এই অনিশ্চয়তা থাকতে পারে না?”

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “কারণ, কোরআনে বলা হয়েছে, “যখন তোমরা কেউ (ব্যক্তিগতভাবে) নতুন চাঁদ দেখবে।”এই কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি এই গুরুত্ব তুলে ধরলেন যে, মানুষের অবশ্যই নতুন চাঁদ দেখতে হবে।[৪৮]

তিউনিশিয়ার লোকেরা চান্দ্র-পঞ্জিকা অনুসারে রোজা রাখতে পারে। যদি কোনো ল্যাপল্যান্ডবাসী মুসলমান হন, এ বিষয়ে তাঁর জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কখন ও কীভাবে তিনি রোজা রাখবেন?

খ. এই ধরনের **দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা** হচ্ছে, সমপ্রতি একজন নভোচারী- সৌদি যুবরাজ- তিনি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছেন। ২০০ কিমি (১২৫ মাইল) উচ্চতায়, প্রতি ঘন্টায় ২৯০০০ কিমি বেগে (১৮০০০ মাইল) গৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরতে ৯০ মিনিট সময় লেগেছে। তাহলে বিংশ শতাব্দীর প্রশ্ন এখানে করা যেতে পারে।

১৮ দিন ধরে পৃথিবীর চারদিকে ভ্রমণের সময়ে প্রতিদিন সূর্য উঠেছে, ডুবেছে, তাহলে কীভাবে তিনি সূর্যাস্তের সময়ে নামাজ পড়েছেন? কারণ পৃথিবীর আকাশে লাল রংয়ের চিহ্ন যত সময় থাকে এরই মধ্যে মাগরিবের নামাজ আদায় করতে হয়। আর কীভাবে বা সেই নভোচারী মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন, যদি না সেই শহরের দিকে গতিপথ নির্ধারিত না হয়, নভোযানের গতিপথের কোণও অনবরত ঘুরবে, এমনকি ৪ রাকাত নামাজ আদায়ের মধ্যেও এটি বেশ কয়েকবার ঘুরবে?

সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, নভোচারী নভোযানের সাথে পা আটকে রেখে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দিনে ৩ বার নামাজ পড়বেন। এটি অবশ্যই একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ-সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি।

আমি এতো সব কথা বলছি, কারণ, ডঃ বুকাইলি দীর্ঘ ২ পৃষ্ঠা জুড়ে এই রিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, সূরা আল-রাহমান (আল্লাহ্‌র নাম বিশেষ) ৫৫:৩৩ আয়াতে “যদি” শব্দের ব্যবহারের দ্বারা ভবিষ্যতে মহাকাশ বিজয়ের **সম্ভাবনার** কথা কোরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।[৪৯] কিন্তু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি না আমরা এর সমাধান না করতে পারি যে, কীভাবে নভোচারীরা নভোযান ঘুরার সময়ে মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বেন অথবা ল্যাপলেন্ডের লোকেরা সময় গণনা করে রোজা রাখবেন বা নামাজ পরবেন? যদি কেউ আমাদের এই সব ধর্মতত্ত্বীয় প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতে দিতে পারেন, তবেই কেবল তিনি বলতে পারেন যে, কোরআনে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে আমরা এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীর বিশদ বর্ণনা পাই, আর আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্য করবো।

---

[৪৮] ২ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা ২:১৮৫

[৪৯] বাইবেল, কোরআন, ও বিজ্ঞান, বুকাইলি, পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৯

কোনো ভুল নেই

গ) উপকথা, রূপক বর্ণনা ও ইতিহাস

১১. উপকথা - একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে কি নৈতিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, না-কি কাল্পনিক রূপকাহিনী বা উপকথা বলা হয়?

বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করার সময়ে "উপকথা" নিয়ে আলোচনা করাটা মনে হতে পারে ঠিক হয়নি। কিন্তু এই অংশে এটি আলোচনা করার কারণ হচ্ছে, **কিতাবুল মোকাদ্দস** বা **কোরআনে** বর্ণিত "সঠিক ইতিহাসকে" আমরা বৃহত্তর অর্থে বিজ্ঞান বলতে পারি।

ডঃ বুকাইলি স্বীকার করেছেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে বিশেষভাবে তৌরাত-পুরাতন নিয়ম কোনো সঠিক ইতিহাস নয়। কিন্তু এগুলো আসলে উপকথা আর মানুষের কল্পনার ফসল। 'কিতাবুল মোকাদ্দসের আদি উৎস' এই শিরোনামে তিনি ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

> "পুস্তাকাকারে সংকলনের পর্বে কিতাবুল মোকাদ্দস ছিল ঐতিহ্যবাহী জনকথা, অর্থাৎ মানুষের স্মৃতি নির্ভর কাহিনী মাত্র। আদিতে এই ধরনের স্মৃতিচারণই ছিল ভাবাদর্শ প্রচারের একমাত্র উপায়।—
>
> "ই. জ্যাকোবের মতে, এসব বাণী ও কাহিনী (শরিয়াত ও রেকর্ড) পরিবার নিয়ে বংশ-পরম্পরায় অথবা এবাদতখানার মাধ্যমে স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত মানুষের কথা ইতিহাসের কাহিনী বা গাথা হিসেবে চালু ছিল।
>
> **"ইতিহাসের এসব কাহিনী সময়ে লোকমুখে গল্পকথায় পরিণত হয়েছে**। যেমন যোথমের গল্পকথা (কাজীগণ ৯:৭-২১) যেখানে বলা হয়েছে, "একদা গাছেরা নিজেদের ওপর অভিষেক করার জন্য রাজার খোঁজে গেল- তাহারা জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর এবং কাঁটা-ঝোপকে বলল— ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে ই. জ্যাকোবের অভিমত হলো, **"কাহিনীকে সুন্দর করে তোলার বাসনায় এসব বর্ণনা টেনে আনা হয়েছে,** এভাবে জানা-অজানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বটে কিন্তু বর্ণনার গতি কোথাও ব্যহত হয়নি।"[১]

কাজীগণ কিতাব আল্লাহ্‌র কিতাব নয় বরং এটি একটি কাহিনীকে সুন্দর করে বলার জন্য এসব বর্ণনা টেনে আনা হয়েছে, এই কথা বলা ভুল। খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র ওহী অনুসারে

[১] বাইবেল, কোরআন, ও বিজ্ঞান, বুকাইলি, পৃষ্ঠা-৪

এটি লেখা হয়েছে। কাজীগণ কিতাবে এই উপকথাটি রয়েছে। এটি ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরেছে, যে-ঘটনাগুলো মিসর থেকে হিজরতের পরে কনান দেশ দখলের পরে ঘটেছিল।

ই. জ্যাকোবের মত অনুসারে এটি এমন একটি সময়, যে সময়ে কোনো লেখা ছিল না আর **"ইতিহাসের এসব কাহিনী সময়ে লোকমুখে গল্পকথায় পরিণত হয়েছে।"** তবে, পাঠকেরা স্মরণ করতে পারেন যে, আমরা এই প্রশ্ন নিয়ে তৃতীয় অংশে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কমপক্ষে ২৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই এই অঞ্চলে লেখার প্রচলন ছিল। আর ১৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, কাজীগণ কিতাব লেখার ১০০ বছর আগেই কনান দেশে ভিন্ন ধরনের লেখা ছিল। স্পষ্টতঃ বিশেষজ্ঞ ই. জ্যাকোব এই বিষয়ে ভুল বলেছেন।

এখন, আমরা আমরা তথাকথিত "উপকথা" বিষয়ে সকল প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচনা করবো, যাতে প্রতিটি পাঠক তাঁদের নিজস্ব মূল্যায়ন তৈরি করতে পারেন।

কাজীগণ কিতাবের ৬ অধ্যায় অনুসারে, আল্লাহ্ যোয়াশের ছেলে গিদিয়োনকে তাঁর পিতার তৈরি বাল দেবতার কোরবানগাহটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। পরে তিনি অনন্তকালীন আল্লাহ্ ইয়াওয়েহ এলোহিমের নামে কোরবানগাহ তৈরি করেছিলেন। গিদিয়োন আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে তাই করলেন। পরের দিন গ্রামের লোকেরা এসে গিদিয়োনের বাবাকে বললো,

> "তোমার ছেলেকে বের করে নিয়ে এসো। তাকে মরতে হবে, কারণ, সে বাল দেবতার কোরবানগাহ ভেংগে ফেলেছে আর তার পাশের আশেরা খুঁটিটাও কেটে ফেলেছে।'

> "সেই দিন তিনি গিদিয়োনের নাম দিলেন.'যিরুব্বাল' অর্থাৎ বাল দেবতা ওকালতি করুক।' (কাজীগণ ৩০-৩২)

৭ ও ৮ অধ্যায়ে, কীভাবে আল্লাহ্ মাত্র ৩০০ লোক সহ মাদিয়ানীয় ১০০, ০০০ সৈন্যদের ওপর এমন ভয় সৃষ্টি করলেন যে, তারা মাঝ রাতে পালিয়ে গেল আর শুধু তাই না তারা একজন আরেকজনকে হত্যা করতে লাগলো।

এই বিরাট জয়ের পর গিদিয়োন তাঁর নিজের গ্রাম অফ্রায় ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি আরোও ৪০ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর অনেকগুলো স্ত্রীর ৭০ জন ছেলে ছিল। আর তাঁর একজন উপস্ত্রীর একজন ছেলে ছিল। এই ছেলের নাম ছিল আবিমালেক। তিনি পাশ্ববর্তি শহর শিখিমে বাস করতেন।

কাজী গিদিয়োনের মৃত্যুর পর, ৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আবিমালেক শিখিমের লোকদের বললেন,

> "কোনটা তাদের পক্ষে ভালো? যিরুব্বালের সত্তরজন ছেলে তাদের শাসনকর্তা হবে, নাকি একজন লোক হবে? ভুলে যাবেন না যে, আমি আপনাদেরই রক্ত ও মাংস।" (কাজীগণ ৯:২)

যখন শিখিমের লোকেরা এই কথা শুনলো, তারা আবিমালেককে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাঁর পেছনে এই সমর্থন পেয়ে,

“অফ্রাতে তিনি তাঁর বাপের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সত্তরজন ভাইদের প্রত্যেককে, অর্থাৎ যিরুব্বালের ছেলেদের প্রত্যেককে একই পাথরের ওপর হত্যা করলেন। কিন্তু যিরুব্বালের সবচেয়ে ছোট ছেলে যোথম লুকিয়ে থেকে বেঁচে গেল। তারপর শিখিম ও বৈৎ-মিল্লোর সমস্ত লোক একত্র হয়ে শিখিমের থামের কাছে এলোন গাছটার পাশে গিয়ে আবিমালেককে বাদশাহ করল।” (কাজীগণ ৮:৯:৫-৬)

এরপর যোথম তাঁর উপকথাটি বললেন,

“যোথমকে যখন এই কথা জানানো হলো, সে তখন গরিষীম পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে লোকদের বললো, ”শিখিমের লোকেরা, আমার কথা শুনুন, তাতে আল্লাহও আপনাদের কথা শুনবেন।

“গাছেরা সবাই একদিন নিজেদের জন্য একটি বাদশাহকে অভিষেক করার উদ্দেশ্যে বের হলো। তারা জলপাই গাছকে বললো,’ তুমি আমাদের বাদশাহ হও।’ কিন্তু জলপাই গাছ বললো,’আমার যে তেলে আল্লাহ্ ও মানুষ সম্মানিত হোন তা বাদ দিয়ে কি আমি সমস্ত গাছের ওপরে দুলতে যাব।’ এরপর গাছগুলো ডুমুর গাছকে বললো, ‘তুমি আমাদের বাদশাহ হও।’ কিন্তু ডুমুর গাছ জবাবে বললো,’ আমি আমার এই ভালো ও মিষ্টি ফল দেওয়া বাদ দিয়ে কি সমস্ত গাছের ওপর দুলতে যাবো। এরপর গাছগুলো আঙ্গুর লতাকে বললো, ‘তুমি আমাদের বাদশাহ হও।’ কিন্তু জবাবে আঙ্গুর লতা বললো, “আমার ফলের রসে যে আল্লাহ্ ও মানুষ আনন্দ পান তা বাদ দিয়ে কি সমস্ত গাছের ওপর দুলতে যাবো?” শেষে, সব গাছগুলো কাঁটাঝোপকে বললো,’তুমি আমাদের বাদশাহ হও।’ তখন কাঁটাঝোপ তাদের বললো,’ যদি সত্যিই তোমরা আমাকে তোমাদের বাদশাহ হিসেবে অভিষেক করতে চাও, তবে তোমরা এসে আমার গাছের ছায়ায় আশ্রয় নাও। তা যদি না করো, তবে যেন কাঁটাঝোপ থেকে আগুন বেড়িয়ে এসে লেবাননের এরস গাছগুলো পুড়িয়ে দেয়।”

“তবে শুনুন, আবিমেলককে বাদশাহ করে আপনারা কি বিশ্বস্ততা ও সততার কাজ করেছেন? আপনারা কি যিরুব্বাল ও তার পরিবারের প্রতি ভালো ও উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন? আমার পিতা তো তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের জন্য যুদ্ধ করে মাদিয়ানীয়দের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করেছেন।— কিন্তু আজ যদি যিরুব্বাল ও তাঁর পরিবারের প্রতি আপনারা বিশ্বস্তা ও সততার কাজ করে থাকেন, তবে আবিমালেক যেনো আপনাদের আনন্দের কারণ হয়, আর আপনারাও যেনো তাঁর আনন্দের কারণ হোন। কিন্তু তা যদি আপনারা না করে থাকেন তবে আবিমালেকের মধ্য থেকে যেনো আগুন বের হয়ে এসে আপনাদের অর্থাৎ শিখিমের ও বৈৎ-মিল্লোর লোকদের পুড়িয়ে দেয়, আর আপনাদের, অর্থাৎ শিখিমের ও বৈৎ-মিল্লোর লোকদের মধ্য থেকেও আগুন রেব হয়ে এসে আবিমালেককে পুড়িয়ে দেয়।” (কাজীগণ ৯:৭-২১)

৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এর তিন বছর পরে আবিমালেক শিখিমের লোকদের হত্যা করেন, আর “তারপর শহরটা ধ্বংস করে তার ওপর লবণ ছিটিয়ে দিলেন” কয়েকদিন পরে আবিমালেকও

নিজেই নিহত হয়েছিলেন। একজন মহিলা একটি যাঁতার ওপরের পাথরটা আবিমালেকের মাথার ওপরে ফেলে দিলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরে মারা যান (কাজীগণ ৯:৪৫-৫৭)।

এখন এই উপকথাটিকে কি **ইতিহাসের এসব কাহিনী সময়ে লোকমুখে গল্পকথায় পরিণত হয়েছে"** এই কথা কি বলা যায়?

লারওজীর অভিধানে উপকথার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, উপকথা হচ্ছে,

ক. ভূমিকা, রূপক বর্ণনা, সাধারণত আয়াতগুলোতে দেখা যায়। এখানে কাহিনীর আড়ালে নীতি লুকিয়ে থাকে।
খ. একটি মিথ্যে বর্ণনা, কাল্পনিক।[২]

স্পষ্টতই যোথম যে দৃষ্টান্তটি বলেছেন তাতে অবশ্যই নীতিশিক্ষা রয়েছে। সুতরাং, আমাদের প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে এটি একটি উপকথা। কিন্তু **ইতিহাসের এসব কাহিনী সময়ে লোকমুখে গল্পকথায় পরিণত হয়েছে"** এই কথা বলা যায় না। ইতিহাসের মধ্যে উপকথা থাকতে পারে, তবে তা অবশ্যই ইতিহাস থেকে আলাদা।

তবে, যখন ডঃ বুকাইলি ই, জ্যাকোবের উদ্ধৃতি দিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেন, আর তৌরাত-পুরাতন নিয়মকে রোনাল্ডের গান বলেছেন, তখন তিনি উপকথার দ্বিতীয় অর্থটি ব্যবহার করেছেন। তিনি দাবী করেছেন, এসব বর্ণনার আসলে কোনো ঐতিহাসিক সত্য নেই। তিনি তা বলতে পারেন, কারণ, তাঁর কথা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ইউরোপে খুব কম পাঠকের কাছেই কিতাবুল মোকাদ্দস রয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনে কাহিনীটা থাকায় এটি স্পষ্ট যে, গিদিয়োনের ছোট ছেলে যোথম একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাঁদের বুঝাতে চেয়েছেন, যারা তাঁর ভাইদেরকে খুন করেছেন, তারা সবাই একজন আরেকজনের হাতে মরবে। এই উপকথাটিকে রূপকথা বলা হচ্ছে একটি বড় ভুল।

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্য পুরাতত্ত্বীয় আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। মিসীগানের বেরিয়েন সিপ্রংস-এর এন্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের একজন অধ্যাপক ড. সিগফ্রাইড এইচ হর্ণ ১৯৬৮ সালে লিখেছেন,

> "শিখিমের পুরাত্বীয় আবিষ্কার সম্পর্কে একটি আমি আমার ব্যক্তিগত মন্তব্যে বলতে চাই, কারণ, আমি সেই খননকাজে অংশ নিয়েছিলাম। শিখিমে ১৯৬০ সালে আমাদের খনন কাজের ফলে শহরটি এবং ১২ শতাব্দীতে ধ্বংস হওয়া বাল দেবতার মন্দির আবিষ্কার করা হয়। এটি একেবারেই সেই সময়ের ঘটনা যে সময়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখিত গিদিয়োনের ছেলে আবিমালেকের শহরটি ধ্বংস করার সময়টির সাথে মিলে যায়।"

পুরাতত্ত্বীয় প্রমাণ হিসেবে প্রায় ১১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের তৈজসপত্রের ভাংগা টুকরা পাওয়া গিয়েছিল। এই দুটো সময়কাল যা আমরা একটি কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে পেয়েছি। আর আমরা দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে আমরা পুরাতত্ত্বীয় প্রমাণ থেকে তথ্য পেয়েছি।[৩]

---

[২] আমি ফরাসী ভাষায় সঙ্গা দিয়েছি, কারণ, ডঃ কুকাইলির জন্য এই ফরাসী ভাষায় অর্থ দেয়া হলো বুঝেন।

কোরআনের ঐতিহাসিক বিবরণী? উপকথা? বাদশা সুলায়মান ও সাবা দেশের রানীর কাহিনীঃ

মধ্য মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-নমল (পিপিলিকা) ২৭:১৫-৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু মুমিন বান্দাদের ওপর শ্রেষ্টত্ব দিয়াছেন।' সুলায়মান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল,'হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।' সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাঁহার বাহিনীকে-জিন্ন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন বুহ্যে। যখন উহারা পিপিলীকা অধুষ্যিত উপত্যকায় পৌছিল, তখন পিপীলিকা বলিল,' হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ করো, যেন সুলায়মান এবং তাঁহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।'

সুলায়মান উহার উক্তিতে মৃদুহাস্য করিল এবং বলিল, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎ কার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদিগের শ্রেণীভুক্ত কর।'

সুলায়মান বিহংগকুলের সন্ধান লইল এবং বলিল,'ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখিতেছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? 'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাহ করিব।' অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল,' আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা' হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।

'আমি এক নারীকে দেখিলাম উহাদিগের ওপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সকল কিছু হইতে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। 'আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না; 'নিবৃত্ত করিয়াছে এইজন্য যে, উহারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যাহা তোমরা গোপন করো ও যাহা তোমরা ব্যক্ত করো। 'আল্লাহ্‌ তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নাই. তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

সুলায়মান বলিল,'আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী?'

---

[৩] Recent Illumination of the Old Testament, *Christianity Today,* June 21, 1968, p 15.

সেই নারী বলিল,'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে; 'ইহা সুলায়মাসের নিকট হইতে এবং ইহা এইঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে. 'অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।'

সেই নারী বলিল,' হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই করি।' উহারা বলিল,'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন।' সে বলিল,'রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপদগ্রস্থ করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে; ইহারাও এইরূপই করিবে; আমি তাহাদিগের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি, দূতেরা কী লইয়া ফিরিয়া আসে?'

দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল. 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্‌ আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদিগের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ।

'উহাদিগের নিকট ফিরিয়া যাও, আমি অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবেলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।'

সুলায়মান আরো বলিল,' হে আমার পারিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে?' এক শক্তিশালী জিন্ন বলিল, 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'

কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল, সে বলিল,'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব।' সুলায়মান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল তখন সে বলিল,'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন. আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তাহা করে নিজের কল্যানের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।'

সুলায়মান বলিল,'তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে - না সে বিভ্রান্তদিগের শামিল হয়?' সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল.'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই?' সে বলিল,' ইহা তো যেন উহাই।' আমাদিগকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করিয়াছি। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, সে ছিল কাফির সমপ্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। তাহাকে বলা হইল,'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।' যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার উভয় 'স্যাক' অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, 'ইহা তো সূক্ষ্ম স্ফটিক মন্ডিত প্রাসাদ।' সেই নারী বলিল,' হে আমার প্রতিপালক! আমি তো

নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।

এই বিবরণীতে যখন কথা বলা পাখি, কথা বলা পিপীলিকা, এক শক্তিশালী জিন্ন, "চোখের পলকে সিংহাসন নিয়ে আসা" সম্পর্কে আমরা কী বলবো?

হামিদুল্লাহ এই আয়াতগুলোতে বর্ণিত "ইফরিত" সম্পর্কে টিকায় লিখেছেন, "এ হচ্ছে এক ধরনের মন্দ শয়তান যা অনেক **গল্প কাহিনী**তে দেখা যায়।" (বিশেষ্যের মতো নয়, ফরাসী বিশেষণ "fabuleux" যা আমি "উপকথা" বলে অনুবাদ করেছি। এই শব্দের একমাত্র অর্থ হচ্ছে, **ভান করা, কাল্পনিক, রূপকথা, অস্বাভাবিক**)

হজরত সুলায়মান ও অন্যান্য প্রাণী ও পাখি সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দসে কী বলা হয়েছে,

> "তিনি লেবাননের এরস গাছ থেকে শুরু করে দেওয়ালের গায়ে জন্মানো হিস্যোপ গাছ পর্যন্ত সমস্ত গাছের বর্ণনা করেছেন। **তিনি জীব-জন্তু, পাখি, বুকে-হাঁটা প্রাণী ও মাছেরও বর্ণনা করেছেন**। দুনিয়ার যে সব বাদশাহরা সুলায়মানের জ্ঞানের বিষয় শুনেছিলেন তাঁরা তাঁর জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনবার জন্য লোকদের পাঠিয়ে দিতেন। (১ বাদশাহনামা ৪:৩৩-৩৪ক)

তবুও *L'Homme, D'Ou Vient-il* বইয়ে ডঃ বুকাইলি উল্লেখ করেছেন,

> "এর সাথে আরও বলা যায় যে, মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানোর সময় থেকে আমি কোরআনের কোনো আয়াতে কোনো উপকথা, কুসংস্কারের পরোক্ষ উল্লেখও দেখিনি, যেভাবে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসে দেখেছি, সেখানে লেখকদের কলম তাদের ইতিহাসের ঘটনাবহুল সময়ের ভাষায় বর্ণনা করেছে।[8]

মুসলমান পাঠকেরা এই বিবরণীকে ক শ্রেণীতে রাখতে পারেন, অর্থৎ একটি উপকথার মধ্যে একটি নীতি-শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এটি কোরআনে আছে বলে মনে হয় না। এটি সত্য যে, সেখানে কিছু নীতিকথা আছে। কিন্তু আলোচনা ও তথ্য যা-কাহিনীতে আছে, আর কোরআনের কাহিনীর আগে ও পেছনে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো এখানে ইতিহাসের সত্য ঘটনা তুলে ধরেছে।

হজরত সুলায়মান ও সাবা দেশের রানীর কাহিনীর আগে এই সূরায় "জলন্ত ঝোঁপের" কাছে হজরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বলা হয়েছে। কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও এই সত্য কাহিনী বলা হয়েছে। আর সামুদে যাওয়ার বিষয়ে নবী হজরত সালিহের আর হজরত লূত তাঁর লোকদের সাথে কথা বলার বিষয়টি, হজরত সুলায়মান ও সাবা দেশের রানীর কাহিনী বলার পর পরই বলা হয়েছে। এটি এখানে ও কোরআনের অন্যান্য জায়গায় সত্য ইতিহাস হিসেবে বলা হয়েছে।

আরো বলা যায় যে, ৫৯-৬৬ আয়াতে আল্লাহ্‌ যে মহান তার প্রমাণ, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় এই কথা অনেকবার বলা হয়েছে। একইসাথে দুটো পানির মধ্যে "অন্তরাল" থাকার কথাও

---

[8] Bucaille, *L'Homme,* p 161.

উল্লেখ করা যায়। ডঃ বুকাইলি ও ড. টর্কি উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এই বিষয়টিকে কোরআনে আধুনিক বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

আমরা ওপরে যোথমের কাহিনী পড়েছি, সেখানে সত্তরজন ভাইয়ের হত্যা ও পরে গাছের দৃষ্টান্ত কাহিনীর মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি ও তাঁর শ্রোতারা জানতেন যে, তিনি একটি দৃষ্টান্ত কাহিনী বলছেন, যার মধ্যে একটি নীতি-কথা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের দুটো বিবরণীর মাঝখানে কোনো বিভাগ সৃষ্টি না করেই কোরআনে বাদশাহ সুলায়মানের কাহিনীর স্থান দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও আরো বলা যায় যে, যেহেতু ডঃ বুকাইলি বিকাবুল মোকাদ্দসের উৎস খুঁজে বের করার জন্য এতো মনোযোগী ছিলেন, অবশ্যই তাঁকে প্রশ্ন করা যায়, কেন তিনি কোরআনের উৎস খুঁজার জন্য এতো আগ্রহী ছিলেন না? তিনি এ সম্পর্কে অনেক দরকারী বই খুঁজে পেতেন, যেমন, ডব্লু . এসটি, ক্লেয়ার-টিসডেল এর লেখা *দি সোর্সেস অব* ***ইসলাম।*** এই বইয়ে যিনি দেখিয়েছেন বাদশাহ সুলায়মানের এই কাহিনীটা ইহুদীরা জানতেন আর এই কাহিনীটি এষ্টেরের দ্বিতীয় তার্গম বইয়ে রয়েছে। তার্গমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের চুলের মতো রানীর পা ছিল। আর এই তথ্যটি, কোরআনে পাওয়া যায় না, তবে *আরায়িশ আল-মাজালিস* নামক মুসলিম হাদিসে রয়েছে।[৫]

বাদশাহ সুলায়মানের মৃত্যু

বাদশাহ সুলায়মানের মৃত্যু সম্পর্কে এখানে কোরআনের আরেকটি অংশ আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা সাবা (দেশ বিশেষ) ৩৪:১২-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে,

> “আমি সুলায়মানের জন্য— গলিত তাম্রের এক প্রস্রবন প্রবাহিত করিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে জিন্নদিগের কতক তাহার সম্মুখে (বায়না ইয়াদায়্হি بَيْنَ يَدَيْهِ) কাজ করিত। উহাদিগের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব— উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিত— যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা সুলায়মানের লাঠি খাইতেছিল।” যখন সুলায়মান পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে (কাজে) আবদ্ধ থাকিত না।

এখানে আমরা মহান বাদশাহ্ সুলায়মান সম্পর্কে জানতে পারি যে, তিনি তাঁর লাঠির ওপর ঝুঁকে থেকে জ্বীনদের কাজ দেখাশোনা করছিলেন। কাজের পদির্শক বা ওভারশিয়ার যেমন রাস্তা মেরামতরত একদল শ্রমিকের কাজ দেখাশোনা করেন, তিনিও তেমনি জিন্নদের কাজ দেখাশোনা করছিলেন। তিনি লাঠির ওপর ঝুঁকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন। যে-চাকর তাঁকে খাবার দিতো সে

---

[৫] ওপরে উল্লেখিত আয়াত দেখুন, T. & T. Clark, 38 George St. Edinburgh, reprinted Birmingham Bible Instit. Press, Birmingham, p. 24-29.

জানতে পারলো না, যে সেনাপতি হুকুম নেবার জন্য তাঁর কাছে আসেন, তিনিও জানতে পারলেন না। তাঁর পারিষদেরও কেউ না, এমনকি হুদ্‌হুদ্‌ পাখিও তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলো না, কেবল একটি মাটির পোকাই যখন লাঠিটি খেয়ে শেষ করলো, তখনই তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন!?!?

যদি এই গল্পটি কিতাবুল মোকাদ্দসে থাকত তবে ডঃ বুকাইলি কী বলতেন? তিনি এই আয়াতকে বলতেন এক **"phantasmagoria"**,[৬] যে পাঠকের হাতের কাছে অভিধান নেই, তাদের জন্য বলছি, এর অর্থ হচ্ছে, "এক ধরনের নিরন্তর মায়া অথবা মনে হতে পারে প্রতারণা, যেভাবে স্বপ্ন বা কল্পনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়।"[৭]

আবারও আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করবো, "এই ঘটনা সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দসে কী বলা হয়েছে? ১ বাদশাহনামা ৫:১৫-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "সুলায়মানের অধীনে ছিল সত্তর হাজার ভারবহনকারী লোক ও পাহাড়ে পাথর কাটবার জন্য আশি হাজার লোক। তাদের কাজের দেখাশোনা করার জন্য তিন হাজার তিনশো কর্মচারী ছিল।"

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, যদিও বলতে, এখানে আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমান, আসমান ও দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ কি জ্বীনদের বোকা বানিয়ে কাজ করাবেন?

এটি হচ্ছে সেই সব প্রশ্নের মধ্যে একটি, যা ঈসা মসীহের ক্রুশের মৃত্যুবরণ সম্পর্কে আমাদের মনে আসে। একজন মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ-যিনি সত্য- তিনি এমনকি কাজ করবেন, যাতে তাদের কাছে মনে হয়েছিল, ঈসা মসীহকে ক্রুশে দেওয়া হয়নি। আসলেই কি তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়নি?

২ বা ৩ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আলি ইমরান (ইমরানের পরিবার) ৩:৫২-৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহের হাওয়ারীরা **তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলেন**। তারপর ৫৪ আয়াতে আরো বলা হয়েছে,

> "এবং তাহারা চক্রান্ত (মাকারূ مَكَرُوا) করিয়াছিল, আল্লাহ্‌ও কৌশল (মাকারাمَكَرَ) করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌ কৌশুলীদের শ্রেষ্ঠ (খাইর আল-মাকিরীন خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)।"

এই কৌশুলি (মাকিরاَلْمَاكِرُ) খুবই শক্তিশালী শব্দ। এই শব্দটি ওয়েহের ও আব্দেল নূর বলেছেন, "প্রতারক, ধূর্ত, কূটকৌশুলী।[৮] আরবী-আরবী মনজিদ অভিধানে একে বলা হয়েছে, "খুদা'আ اَلْخُدَعَةُ " যার অর্থ আগে যে অর্থ বলা হয়েছে, সেই অর্থগুলোর মতোই হুবুহু এক।

---

[৬] বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, ডঃ বুকাইলি, ফরাসী সংস্করণ- পৃষ্ঠা-২৩৯

[৭] *The American College Dictionary,* Random House, New York, 1951.

[৮] Wehr, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৯১৭

ইঞ্জিল শরীফ অনুসারে ইহুদী নেতারা ঈসা মসীহকে গোপনে ধরার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে কোনো বিদ্রোহ না হয়। কিন্তু আল্লাহ্ কেন তাদেরকে এই ধরণের চিন্তা করতে দিলেন যেন তারা সফল হতে পারে এবং ঈসা মসীহকে গোপনে ধরতে পারে। আর এভাবে আল্লাহ্ নিজেকে সর্বাপেক্ষা কৌশুলি বলে পরিচয় দিলেন? এর ফলে ঈসা মসীহের ঘনিষ্ট হাওয়ারীরা প্রতারিত হলেন- এসব হওযারীদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে, তাঁরা ঈসা মসীহের ওপর ঈমান এনেছিলেন। এটি কি আসলেই সত্য হতে পারে যে, আল্লাহ্র পক্ষে এমন ধরণের প্রতারণা করা সম্ভব?

হজরত মথির "অবিশ্বাস্য" বর্ণনা

ডঃ বুকাইলি তাঁর বইয়ের ৯ ৮৯ পৃষ্ঠায় চার ইঞ্জিল, উৎস ও ইতিহাস' অধ্যায়ে লিখেছেন,[৯]

"মথি-লিখিত সুসমাচারেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও **অসম্ভব ঘটনার** বিবরণ লেখা হয়েছে।"

আসুন ,আমরা দেখি তিনি যেসব আয়াতকে" অসম্ভব ঘটনা "বলেছেন ,তার মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে দেখি। মথি লিখিত ইঞ্জিল ২৭:৫০-৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে ,

> "ঈসা আবার জোরে চিৎকার করার পরে প্রাণত্যাগ করলেন। তখন বায়তুল মোকাদ্দসের পর্দাটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ হয়ে গেল; আর ভূমিকম্প হলো ও বড়-বড় পাথর ফেটে গেল। কতগুলো কবর খুলে গেল এবং আল্লাহ্র যে বান্দারা ইন্তেকাল করেছিলেন, তাঁদের অনেকের দেহ জীবিত হয়ে উঠলো। তাঁরা কবর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং ঈসা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পর পবিত্র শহরের মধ্যে গেলেন। তাঁরা সেখানে অনেককে দেখা দিলেন।"

এ সম্পর্কে ডঃ বুকাইলির অভিযোগ কী? সবার আগে, তাঁর কথা হলো, "এই বর্ণনা অন্য কোনো সুখবর কিতাবে নেই"। অর্থাৎ এটি কেবল একবারই পাওয়া যায়। তাহলে এটি অবশ্যই কোরআনের জন্যও সত্য হরে যে, কোরআনে কেবল একটি সূরাতেই বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ্ মারা যাননি।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন, "এটি বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে, "*ঈসা মসীহের মৃত্যুর সময়ে* পবিত্র লোকদের মৃতদেহ কীভাবে জীবিত হয়েছিল (সুখবর সিপারার বর্ণনা অনুসারে ঈসা মসীহের মৃত্যু ঘটেছিল শুক্রবারে (সাব্বাত বা বিশ্রামবারের প্রাক্কালে) এবং কীভাবেই বা সেই জীবিত দেহগুলো *ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের পর* (রবিবারে) কবর থেকে বেরিয়ে এলো।"

আমরা আর কী বলবো? আমি বলি যে, যদি এই আয়াতগুলো আমাদের মনে প্রভাব ফেলে আমরা অবশ্যই এর লেখককে সন্দেহের সুবিধা দেব। আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে, তিনি

[৯] বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, ডঃ বুকাইলি, ফরাসী সংস্করণ- পৃষ্ঠা-৬১-৬২

আমাদের এই কথা বুঝাবার জন্য লেখেননি যে, যাঁরা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন, তাঁরা শুক্রবার থেকে রবিবারের ভোর পর্যন্ত ঠান্ডা কবরে বসে কাঁপছিলেন।

আমি নিশ্চিত যে, তিনি পাঠকদের এই কথা বুঝাবার জন্য লিখেছেন যে, শুক্রবার দিন কবর খুলে গিয়েছিল। আর রবিবার ভোরে একই সময়ে একই সাথে মসীহের পুনরুত্থানের অংশ হিসেবে অন্যান্য পবিত্র লোকেরা জীবিত হয়েছিলেন।

তবে, বাদশাহ সুলায়মানের কথা-বলা-পাখি ও জিন্নদের ইফরিতের সাথে, অথবা লাঠির ওপরে ঝুঁকে থাকা বাদশা সুলায়মানের মৃতদেহের সাথে তুলনা করলে, কিতাবুল মোকাদ্দসের এই বর্ণনা বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে একটি মুক্তার মতো মনে হবে, আর এটি উল্লেখ না করাটা ডঃ বুকাইলির জন্য অমর্যাদাকর হয়েছে।

সত্য কথা হলো এই যে, তৌরাত-পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল-নতুন নিয়মে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী লেখকদের ও শ্রোতাদের সংস্কৃতি অনুসারে করা হয়েছিল এবং পাক-রূহ্ পুরাতন নিয়মের নবীদের ও ঈসা মসীহের সাহাবীদের অদ্ভুত হাস্যকর রূপকথার ধারণা, গ্রীক, রোমীয় ও বেবিলিনীয়দেব বহু আল্লাহ্ মতবাদ বা শিরকের বিষয় ইঞ্জিল শরীফে লিখতে বাধা দিয়েছেন।

উপসংহার

আমরা এই অধ্যায়ে দেখেছি যে, ডঃ বুকাইলি অন্যান্য লেখকরা কোরআনের বিভিন্ন অসংগতি মিল করার জন্য নিজস্ব "প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption তৈরি করেছেন। ডঃ বুকাইলির মতো আমরা যারা তৌরাত-পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল-নতুন নিয়ম ভালোবাসি আমাদেরকেও অবশ্যই এই ধরনের "প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption তৈরি করার স্বাধীনতা দিতে হবে।

খ্রীষ্টানরা যখন বলে যে, হযরত মথি লিখিত সুখবরে দেওয়া ঈসা মসীহের বংশতালিকা হযরত ইউসুফের বংশ অনুসারে আর হযরত লূক লিখিত সুখবরে হযরত ঈসা মসীহের বংশতালিকা তাঁর মা বিবি মরিয়মের বংশতালিকা অনুসারে লেখা হয়েছে. তখন প্রতিটি পাঠক বলতে পারেন যে, আমি এই প্রমাণ বিশ্বাস করি না। কিন্তু ডঃ বুকাইলির জন্য এটি সঠিক নয় যে, খ্রীষ্টানরা এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য একই ধরনের প্রাথমিক অনুমিত বিষয় (basic assumption) তৈরি করেছেন, যখন তিনি খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা একগুয়ে রকমের অন্ধভাবে গড়মিল দূর করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। অথচ **তিনি তাঁর গোটা বই জুড়েই এরকম অনেক প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption নিজেই তৈরি করেছেন।**

এছাড়াও তিনি খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করেছেন যে, তাঁরা যে সমস্যায় আছেন, এই কথাটি তাঁরা স্বীকার করতে চান না। ঐতিহাসিকভাবেই তাঁর এই অভিযোগ সত্য নয়। ঈসা মসীহের বেহেস্তে আরোহনের ৩০০ বছরের মধ্যেই আলেম ইউসুবিয়াস-একজন খ্রীষ্টান বিশপ যিনি প্যালেষ্টাইনে বাস করতেন- প্রাথমিক জামাতের ইতিহাস রচনা করেছেন, তিনি কিন্তু এই সমস্যাটি উল্লেখ করে ওপরে বর্ণিত উপায়ে সমাধানের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

আর যখন ডঃ বুকাইলি একটি বড় সত্য তথ্য তুলে ধরে বলেছেন যে, তিনি মূল ভাষায় কোরআনকে পড়ে সঠিকভাবে বুঝার জন্য আরবী শিখেছেন, তবে তিনি অবশ্যই সূরা আল-আনকাবুত (মাকড়শা) ২৯:১৪ আয়াত পড়েছেন, এখানে বলা হয়েছে,

> "আমি তো নূহকে তাহার সমপ্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল **পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর**-- ।"

তাহলে কিসের ভিত্তিতে তিনি লিখছেন যে,

> "যে-কেউ জানে যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের বংশতালিকা হযরত ইব্রাহিম থেকে ধরা হয়। হযরত আদম পর্যন্ত ধরলে হযরত ইব্রাহিমের ১৯তম পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত মুতাওশালেহ। তিনি **অবিশ্বাস্য** রকম হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি ৯৬৯ বছর বেঁচেছিলেন— ।"[১০]

অবশ্যই, যদি কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণিত "৯৬৯" বছর **অবিশ্বাস্য** হয়, তবে, কোরআনের জন্যও "৯৫০ বছর" **অবিশ্বাস্য**, যদি কোরআনের জন্য "৯৫০ বছর" **বিশ্বাসযোগ্য** মনে হয়, তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের জন্য "৯৬৯" বছরও **বিশ্বাসযোগ্য** হবে। আমাদের একই পাল্লায় দুটো কিতাবকেই ওজন করতে হবে।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে,

> What is good for the goose is also good for the gander. ("রাজহংসীদের জন্য যা ভালো, তা রাজহাঁসের জন্যও ভালো")

তবু হযরত আদম থেকে শুরু করা বংশতালিকার মধ্যে সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। এটি এমন এক সমস্যা যার কোনো সন্তোষজনক সমাধানের কোনো প্রস্তাব করা হয়নি। "*রেভিলিসন ডাস অরিজিন*" বইয়ে হেনরী ব্লকার এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য তিন পৃষ্ঠা জুড়ে চারটি সম্ভাব্য উত্তর দিয়েছেন। শেষে তিনি লিখেছেন, "এদের সবগুলোর মধ্যে অসুবিধা রয়েছে, সুতরাং, সমস্যাটি রয়েই গেল।"[১১]

তৌরাত ও ইঞ্জিলের ইতিহাসের সমর্থনের জন্য সমস্ত পুরাতত্ত্বীয় প্রমাণগুলো, আর ঈসা মসীহের অনেক মোজেজা, আর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা- সুখবর যে সত্য এগুলো নিঃসন্দেহে তার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ। আমাদের আরো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আর ভবিষ্যতের আরো অনেক গবেষণা ও আবিষ্কার লক্ষ্য করতে হবে। ১৯৪৭ সনে কেউই ভাবতে পারেনি যে, ১৯৪৮ সনে আমরা লেবীয় কিতাবের অনুলিপির অংশবিশেষ আবিষ্কার করতে পারবো, যে অনুলিপিগুলো ঈসা মসীহ্ যখন এই পৃথিবীতে চলাফেরা করেছেন, তারও ২০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল। ঠিক আমাদের হাতে যে-তৌরাত আছে, তার সাথে এই অনুলিপির অংশবিশেষের হুবুহু মিল রয়েছে। **এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, তওরাতের কোনো পরিবর্তন হয়নি।**

---

[১০] Bucaille, L'Homme, p 153.
[১১] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২২৮-২৩০

পঞ্চম খণ্ড

ওহী প্রমাণ করার পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিক্ষমতার প্রমাণ ও কোরআন অনুসারে ওহী যাঁচাই করার পদ্ধতি

আমার মতো অনেকেই যাঁরা তৌরাত, জবুর শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফকে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এটি বুঝা কঠিন যে, ডঃ বুকাইলি কীভাবে দাবী করতে পারেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অথচ আকাশ ও আকাশমন্ডলীর কথা ৭৫ বারেরও বেশী কেবল হজরত দাউদের ওপর নাজিল হওয়া কিতাব যবুর শরীফে রয়েছে।

এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকাজ বর্ণনা করার পাশাপাশি অনেক কাব্যিক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বেহেস্তে রয়েছেন। জবুর শরীফের ৩৬:৫-৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "হে মাবুদ, তোমার অটল ভালোবাসা মহাশূন্যে পৌঁছায়; তোমার বিশ্বস্ততা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। তোমার সততা অটল পাহাড়ের মতো;তোমার ন্যায়বিচার যেন গভীর সাগর।

জবুর শরীফের অন্যান্য গজলেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টিক্ষমতার উল্লেখ করে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, যেমন ১২১ নং গজল ১-২ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আমি সেই পাহাড়ের সারির দিকে চোখ তুলে তাকাবো, কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে? আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা মাবুদের কাছ থেকে সাহায্য আসবে।

অথবা জবুর শরীফের গজল ৯৬:৫ আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে শক্তিহীন দেব-দেবীগুলোর তুলনা করে বলা হয়েছে,

> "মাবুদই মহান ও সবার ওপরে প্রশংসার যোগ্য; সব দেব-দেবীর চাইতে তিনি বেশী ভয় জাগানো। **বিভিন্ন জাতির দেব-দেবী অসার মাত্র; কিন্তু মাবুদ আসমানের সৃষ্টিকর্তা।**

এই সব আয়াতের মধ্যে আরো বেশী আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুসারে আসমান সৃষ্টির কথা জবুর শরীফ ৮:১, ৩-৪ আয়াতে বলা হয়েছে। হজরত দাউদ লিখেছেন,

> "হে মাবুদ, আমাদের মালিক, সারা দুনিয়ায় রয়েছে তোমার মহিমার প্রকাশ, বেহেস্তে তোমার মহিমা তুমি স্থাপন করেছ, —আমি যখন তোমার হাতে গড়া আসমানের দিকে তাকাই, আর সেখানে তোমার স্থাপিত চাঁদ ও তারাগুলো দেখি, তখন ভাবি মানুষ এমন কী যে, তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও?

জবুর শরীফ ১৯:১-৪ আয়াতে পাক-রূহের পরিচালনায় তিনি আরও লিখেছেন,

“আসমান আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করছে, আর আকাশ তুলে ধরছে তাঁর হাতের কাজ। দিনের পর দিন তাদের ভিতর থেকে বাণী বেরিয়ে আসে, আর রাতের পর রাত তারা ঘোষণা করে জ্ঞান, কিন্তু তাতে কোনো শব্দ নেই, কোনো ভাষা নেই, তাদের আওয়াজও কানে শুনা যায় না; তবু তাদের ডাক সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের কথা ছড়িয়ে পড়ছে, পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত।”

হযরত দাউদ এখানে বলছেন যে, আকাশের মহিমা এমন একটি ভাষার মতো, যা সব মানুষের কথা বলে যাতে সে জানে যে, একজন বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা আছে। “তাতে কোনো শব্দ নেই, কোনো ভাষা নেই, (কোনো মানুষ বা এক দল মানুষ নয়) তাদের আওয়াজও কানে (এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকাজের শব্দ বা দর্শন) শুনা যায় না।

এই আয়াতগুলোর ওপর ভিত্তি করে পাক-রূহ্ ইঞ্জিল শরীফ লেখার জন্য হযরত পৌলকে পরিচালনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

“আল্লাহ্‌র যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর **খোদায়ী স্বভাব** সৃষ্টির শুরু থেকে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। **তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা খুব বুঝতে পারে**। এর পরে মানুষের আর কোনো অজুহাত নেই।

“মানুষ তাঁর সম্পর্কে জানার পরেও আল্লাহ্ হিসেবে তাঁর প্রশংসাও করেনি, তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানায়নি।-- আসলে তারা মুর্খই রয়ে গেছে। চিরস্থায়ী মহিমাপুর্ণ আল্লাহ্‌র এবাদত ছেড়ে দিয়ে তারা অস্থায়ী **মানুষ, পাখি, পশু, ও বুকে হাঁটা প্রাণীর মূর্তির পূজা করেছে**। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের পূজা করেছে, কিন্তু সমস্ত প্রশংসা চিরকাল সেই সৃষ্টিকর্তারই। আমিন। (রোমীয় ১:২০-২৩ক, ২৫৫)

যেহেতু আমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিশ্ময়কর জিনিস দেখেছি, - মহাশূন্যে তারাগুলো সব সময়ে তাদের গতিপথে চলছে, বৃষ্টির পরে মরূভূমি সতেজ হয়, প্রাণের সঞ্চার হয়, আমরা জানি যে আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, আর তাঁর কাছেই আমাদের কাজের জন্য আমাদের হিসাব দিতে হবে। এর সাথে আরও বলা যায়, আজকের দিনে অনেক মাইক্রোকেমিক্যাল বিশ্ময়কর জিনিস রয়েছে, যেমন কার্বন-চক্রের বিশ্ময়- এনজাইম পদ্ধতি, যার মাধ্যমে জীবন্ত কোষে চিনি ভেঙ্গে শক্তিতে পরিণত হয়। এর সাথে জেনেটিক কোডের বিশ্ময় - নিয়ে ডঃ বুকাইলি তাঁর লেখা *L'Homme D'Ou Vient-il* বইয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[১] এই সব জিনিস সবই সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির প্রমাণ। আমাদের চোখের সামনে এই সব বিশ্ময়কর প্রমাণ থাকার কারণে **আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস না করার কোনো অজুহাত নেই।**

অবশ্য, তবু একটি সমস্যা রয়ে গেছে, মানুষেরা অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করে, আর অনেক লোক এসব দেবতার নবী হিসেকে নিজেদের দাবী করে। কীভাবে আমরা জানতে পারি যে, মানুষের মাঝে দেব-দেবী নামে পরিচিত এসব দেবতারা কি **সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ?**

---

[১] ওপরে উল্লেখিত বই

‘প্রকৃত সত্য আল্লাহ’ কে?

ইনি কি সেই, হিন্দু দেবী কালি যিনি তাঁর ভক্তদের চুরি করতে আর নরবলী দিতে আদেশ করেন?

ইনি কি সেই, চীনা দেবতা শেং টি যাঁকে কেবল শাসনকর্তারা সরাসরি উপাসনা করেন?

ইনি কি সেই কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ, যিনি বলেছেন যে ঈসা মসীহকে ক্রুশে দেওয়া হয়নি?

ইনি কি সেই তওরাতে বর্ণিত অনন্তকালিন আল্লাহ? ইনি বলেছিলেন ঈসা মসীহ্ মারা যাবেন (ইশাইয়া ৫৩) আর তিনি আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছেন। সমপ্রতি আমি আলজেরিয়ার আমার চিকিৎসা পেশার সহকর্মী ডঃ আহমেদ অরোরা লিখিত *L'Islam et la Science* বইটি আমি পড়েছি। এই বইয়ে সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেছেন,

> “সুতরাং, বিজ্ঞান দাবি করবে যে, কেবল দৃশ্যমান ঘটনার বিষয়, আর কীভাবে দৃশ্যমান ঘটনাগুলোর ওপর কাজ করা হয়, তা ব্যাখ্যা করাই নয়, কিন্তু এই উত্তরও দেবে যে, কীভাবে ও কেন এই জিনিসগুলোর ধীরে ধীরে বিকাশলাভ ঘটে।
>
> “তথাকথিত, বস্তুগত বিজ্ঞান এই ধরনের আধিবিদ্যক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিক থেকে দর্শন হচ্ছে কেবল অনুমান, **কেবল অত্যুকৃষ্ট উৎস থেকেই নিশ্চয়তা আসতে পারে, এই উৎস নিখিল বিশ্বের প্রকৃত্ব সত্তা ও নিয়তির ওপর কর্তৃত্ব করে, আর তা ভবিষ্যদ্বাণীর দৃশ্যমান ঘটনা দ্বারা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়**।”[২]

অথবা, আমরা যে শব্দ ব্যবহার করছি এর আলোকে বলা যায়, এই নিখিল বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা একজন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পরিচয় পাই। কিন্তু এই আল্লাহ্‌র পরিচয় যেন মানুষ পায়, সেইজন্য তিনি অবশ্যই ওহী বা প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন।

ডঃ অরোরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের মধ্য দিয়েই সেই ওহী প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর বইয়ে তিনি কোনো যুক্তি বা প্রমাণ দেখাননি, কেন তিনি এভাবে ইসলামকে বেঁছে নিলেন। তিনি কোনো কারণও দেননি যে, তিনি কীভাবে একজন নবীকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

তাই সমস্যাটি রয়েই যাচ্ছে। কোন খোদা বা দেবতা প্রকৃত সত্য আল্লাহ? কোন নবী হচ্ছেন সত্য নবী। প্রতিটি লোককে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন?

তৌরাত-পুরাতন নিয়মে, প্রথম বাদশাহনামা ১৮ অধ্যায়ে নবী হজরত ইলিয়াস “বাল” দেবতার পুরোহিতদের এক অন্যন্য উপায়ে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, একটি কোরবানগাহের ওপরে তারা একটি ষাড় কোরবানী করবে আর অন্য কোরবানগাহের ওপরে ইয়াওয়েহ এলোহিমের নামে তিনি একটি ষাড় কোরবানী করবেন। কিন্তু

[২] *L'Islam et la Science*, 2nd Edition, Entreprise nationale du Livre, Algiers, 1984, p 8. (অনুবাদ আমার)

কোরবানীর কোনো পশুর ওপরই তারা নিজেরা আগুন দেবেন না। তারপর দু'দল লোকেরা মোনাজাত করবে। বেহেশত থেকে যিনি আগুনের সাহায্যে উত্তর দেন, সেই আল্লাহ্ নিজেই আগুন পাঠিয়ে প্রমাণ করবেন যে, তিনিই প্রকৃত সত্য আল্লাহ।

কয়েক ঘন্টা ধরে 'বাল' দেবতার পুরোহিতরা চেষ্টা করলো, কিন্তু বেহেশত থেকে আগুন আর নেমে এলো না। তারপর, হযরত ইলিয়াস কোরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন, এমনকি তিনি পানি দিয়ে তা ভিজিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মোনাজাত করলেন, আর ইয়াওয়েহ এলোহিম আগুনের সাহায্যে উত্তর দিলেন। আগুন নেমে এসে কোরবানীর পশু সহ পানিও চুষে নিল। এ ঘটনা দেখে সব লোক মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে চিৎকার করে বললো,

"আল্লাহ্ই মাবুদ, আল্লাহ্ই মাবুদ!"

সেখানে উপস্থিত সব লোক নিজের চোখে আল্লাহ্র কুদরত দেখে, সত্য আল্লাহ্ কে তা তারা জেনেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনের জন্য আমরা কী করবো? কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে, প্রকৃত ও সত্য আল্লাহ্ কে?

কোরআনের মতো একটি সূরা (রুকু)

হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে আরেক ধরনের চ্যালেঞ্জ করার জন্য কোরআনে হুকুম দেওয়া হয়েছে। কোরআনের চারটি স্থানে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রতিদ্বন্ধীদের চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, যদি তারা নিশ্চিত হয়ে এই কথা বলে যে, তিনি নিজেই কোরআন রচনা করেছেন, তবে যেন তারা কোরআনের মতো এইরকম বা এর চেয়ে ভালো কোনো সূরা লিখে নিয়ে আসে। শেষ যুগের মক্কী সূরা বনি-ইসরাইল (ইসরাইল সন্তানগণ) ১৭:৮৮ আয়াতে, তিনি তাঁর শ্রোতাদের একটি গোটা কিতাব লিখে আনার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন, পরে শেষ যুগের মক্কী সূরা হুদ (নবীর নাম), ১১:১৩ আয়াতে, চাহিদা কমিয়ে এখানে মাত্র ১০টি আয়াত লিখে আনার কথা বলেছেন। সবশেষে, শেষ যুগের মক্কী সূরা ইউনুস (নবীর নাম), ১০:৩৮ আয়াতে এবং ২ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা (গাভী) ২:২৩ আয়াতে দাবী আরো কমিয়ে মাত্র একটি আয়াত লিখে আনার কথা বলা হয়েছে।

সূরা ইউনুস (নবীর নাম) ১০:৩৮ আয়াতে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানিয়ে বলা হয়েছে,

> "তাহারা কি বলে,'সে ইহা রচনা করিয়াছে? 'বল' তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং **আল্লাহ্ ব্যতিত** অপর যাহাকে পার আহ্বান কর (তোমার সাহায্যের জন্য), যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

তবু আসুন, আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি, তবে আর একটি প্রশ্ন অবশ্যই করা যাবে-এটি এমন একটি প্রশ্ন যার কোনো স্পষ্ট উত্তর হয়তো নেই। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন মক্কাবাসীদের কাছে যে কোরআনের মতো আর একটি সূরা রচনা করার জন্য, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তখন

তিনি কি কোরআনের কাব্যিক সৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন? না কি তিনি এর ধর্মীয় সত্যের কথাই বলেছিলেন?

মুসলমানরা কোরআনের কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন, আর এই কথা ঠিক যে, কোরআনে অনেক সুন্দর সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা রয়েছে। যেমন, ৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-নূর (জ্যোতি) ২৪:৩৫-৩৬ আয়াতে আল্লাহ্‌কে নূরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৩] তবে কি ভাষার মাধুর্যের ওপর ভিত্তি করেই এই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল?

মনে হয় না যে, কোরআনের কোনো আয়াতে এর উত্তর দেওয়া আছে। আমি নিজে মনে করি যে, কাব্যিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে এই চ্যালেঞ্জ করা হলে কোরআনের আবেদন খাটো হবে। এইজন্য ধর্মীয় বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই বিচার করা করা উচিত। যেমন সেক্সপিয়ার সবচেয়ে ভালো ইংরেজী সাহিত্য রচনা করেছেন বলে তাঁকে কেউ নবী বলে না।

আমি যখন এই প্রশ্নটি আমার মুসলমান বন্ধুদের কাছে করি, তাঁরা সব সময়েই প্রায় অনিচ্ছার মনোভাব নিয়ে বলেন যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এখানে ধর্মীয় সত্যের কথাই বলেছেন। অন্যদিকে এই কথাও স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মতত্ত্ববিদরা বলেন যে, কোরআনের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেই কোরআনের মোজেজা রয়েছে।

প্রথম আমি যখন কোরআন পাঠ করি, আমি মনে করেছিলাম, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আহলে কিতাবীদের[৪] চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, আর আমি চিন্তা করেছিলাম যে কিতাবুল মোকাদ্দসের কোনো অধ্যায়টি আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পেশ করবো। এর পরে আমি আমার মন পরিবর্তন করেছি।

আমরা আগে এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়ে বলেছি যে, মক্কা নগরীতে হজরত মোহাম্মদের কাছে থাকা তৌরাত, জবুর শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফ তিনি বিশ্বাস করতেন। এই কিতাবগুলো সম্পূর্ণ সংকলিত অবস্থায় ছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে, মক্কী মধ্য যুগের নাজিল হওয়া সূরা আল-আম্বিয়া (আল্লাহ্‌র সংবাদবাহক গণ) ২১:৫ আয়াতে হযরত দাউদের বাণী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) উল্লেখ করেছেন. "আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে?" এই উদ্ধৃতি জবুর শরীফ ৩৭:২৯ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে। তিনি দাবী করেছেন, তাঁকে যে ওহী দেওয়া হয়েছে, সেই একই ওহী আগের নবীদেরও দেয়া হয়েছে (সূরা ৪:১৬৩)

যদি আগের নবীদের কাছে দেওয়া ওহী আর হজরত মোহাম্মদের কাছে দেওয়া ওহী একই হয়, তবে তাঁদের কিতাবও হজরত মোহাম্মদের কাছে দেওয়া কিতাবের মতোই সত্য। সুতরাং, আমি এখন বিশ্বাস করি যে, তিনি মূর্তিপূজারীদের কাছেই কোরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। তিনি মক্কানগরীতে বসবাসরত "আহলে কিতাবীদের" চ্যালেঞ্জ করেননি।

---

[৩] এই আয়াতগুলো ২ নং ছবিতে দেখা যাবে।

[৪] "আহলে কিতাব" শব্দটি কোরআনে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অবশ্য, যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তবে আমি এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে দুটো সূরা (কিতাবুল মোকাদ্দসের দুটো অধ্যায়) এখানে পেশ করতে চাই, তারপর আমি ঈসা মসীহের বাণীর আরেকটি অংশ ইঞ্জিল শরীফ থেকে পেশ করবো।

প্রথমটি আমি হজরত দাউদের জবুর শরীফ থেকে নিয়েছি, এতে ভিন্নভাবে কাব্যিক মাধুর্য ফুটে উঠেছে। হিব্রু ভাষায় কবিতা ছন্দের মিল থাকে না। এর সৌন্দর্য ফুটে উঠে যখন একই ধারণা অন্য শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আমাদের বলা হতে পারে যে, ছন্দের মিল না থাকলে আমাদের তা আনন্দ দেয় না, কিন্তু এটির আরো একটি বড় সুবিধা আছে। **অনুবাদের সময়ে এর কাব্যিক সৌন্দর্যের ব্যাঘাত ঘটায় না, কারণ, একই সত্য দুবার করে বলায়, এই সত্য যে কোনো ভাষায় বিশ্বস্তভাবে প্রকাশ করা যায়।**

নিম্নে হজরত দাউদের জবুর শরীফের ১০৩ কাওয়ালী তুলে ধরা হলো,

১ হে আমার প্রাণ, মাবুদের প্রশংসা কর;
হে আমার অন্তর, তাঁর পবিত্রতার প্রশংসা কর।
২ হে আমার প্রাণ, মাবুদের প্রশংসা কর;
তাঁর কোন উপকারের কথা ভুলে যেয়ো না।
৩ তোমার সমস্ত গুনাহ্ তিনি মাফ করেন;
তিনি তোমার সমস্ত রোগ ভাল করেন।
৪ তিনি কবর থেকে তোমার জীবন মুক্ত করেন;
তিনি তোমাকে অটল মহব্বত ও মমতায় ঘিরে রাখেন।
৫ যা উপকার আনে তেমন সব জিনিস দিয়ে
তিনি তোমাকে তৃপ্ত করেন;
তিনি ঈগল পাখীর মত তোমাকে নতুন যৌবন দেন।
৬ মাবুদ উচিত কাজ করেন;
তিনি ন্যায়ভাবে অন্যাচারিতদের বিচার করেন।
৭ কি উদ্দেশ্যে কি করেন তা তিনি মূসাকে জানিয়েছেন;
তাঁর কাজ তিনি বনি-ইসরাইলদের দেখতে দিয়েছেন।
৮ মাবুদ মমতায় পূর্ণ ও দয়াময়;
তিনি সহজে রেগে উঠেন না,
তাঁর অটল মহব্বতের সীমা নেই।
৯ তিনি দোষীর বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অভিযোগ করেন না,

চিরকাল রাগ পুষে রাখেন না।
১০ আমাদের গুনাহের শাস্তি যতটা আমাদের পাওনা
ততটা তিনি আমাদের দেন না;
আমাদের অন্যায় অনুসারেও শাস্তি দেন না।
১১ দুনিয়া থেকে আসমানের দূরত্বের যেমন সীমা নেই,
তেমনি তাঁর ভক্তদের উপরে তাঁর অটল মহব্বতেরও
সীমা নেই।
১২ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক যত দূরে,
আমাদের সব গুনাহ্ তিনি তত দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।
১৩ সন্তানদের প্রতি পিতার যেমন মমতা আছে
তেমনি তাঁর ভক্তদের উপর তাঁর মমতা আছে।
১৪ কিভাবে আমরা গড়া তা তো তাঁর অজানা নেই;
আমরা যে ধূলি ছাড়া আর কিছু নই তা তাঁর মনে আছে।

১৫ ঘাসের আয়ুর মতই মানুষের আয়ু,
মাঠের ফুলের মতই সে ফুটে ওঠে।
১৬ ফুলের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে ফুল আর থাকে না;
যে জায়গায় সেই ফুল ফুটেছিল
সেই জায়গায়ও আর তাকে মনে রাখে না।
১৭-১৮ কিন্তু যারা মাবুদের ভক্ত,
যারা তাঁর ব্যবস্থা মেনে চলে
আর তাঁর নিয়ম মত চলার দিকে নজর রাখে,
তাদের উপর তাঁর অটল মহব্বত ও তাঁর বিশ্বস্ততা
চিরকাল থাকবে, বংশের পর বংশ ধরে থাকবে।

১৯ মাবুদ বেহেশতে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন;
সব কিছুর উপরেই তাঁর রাজত্ব।
২০ হে মাবুদের শক্তিশালী ফেরেশতারা, যারা তাঁর কথার বাধ্য থেকে
তাঁর হুকুম পালন করছ,
তোমরা তাঁর প্রশংসা কর।

২১ হে মাবুদের খেদমতকারী শক্তিদলগুলো
যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করছ,
তোমরা তাঁর প্রশংসা কর।
২২ হে মাবুদের রাজ্যের সব স্থানে তাঁর সৃষ্ট সব কিছু,
তোমরা তাঁর প্রশংসা কর;
হে আমার প্রাণ, মাবুদের প্রশংসা কর। [৫]

জবুর শরীফের এই কবিতা ও কোরআনের যে কোনো সূরার সাথে এর কাব্যিক সৌন্দর্য তুলনা করতে হলে অবশ্যই একটি মূল বিষয় থাকতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে যে-ধর্মীয় সত্য রয়েছে সে অনুসারে বিচার করলে তা কোরআনের অনেক সূরার সাথে তুলনা করা যায়।

হজরত দাউদ এখানে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছেন, তিনি বাদশাহদের বাদশাহ। তিনি পাপ ক্ষমা করেন। তাঁর ভালোবাসা ওপরে আকাশ ও নিচের জমিনের মধ্যে ফাঁকের মতোই বিশাল। পিতা যেমন সন্তানদের প্রতি মমতা করেন, তিনিও তেমনি আমাদের ওপর মমতা করেন। তিনি চিরবিরাজমান, অনন্তকালীন আল্লাহ। আর এই তথ্য যে কোনো বিশ্বাসীকে সান্ত্বনা দেয়।

আমি দ্বিতীয় অংশটি তৌরাত-পুরাতন নিয়ম থেকে নিয়েছি। এখানে সৃষ্টির আশ্চর্য বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও রয়েছে। এখানে দেব-দেবীর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। ইয়াওয়েহ এলোহিম অনাদি অনন্তকালীন আল্লাহ্ নিজেই এখানে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

ইশাইয়া কিতাবের ৪০ অধ্যায়ে নবী হযরত ইশাইয়া লিখেছেন,

আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য সান্ত্বনা

১ তোমাদের আল্লাহ্ বলছেন, "আমার বান্দাদের সান্ত্বনা দাও,
সান্ত্বনা দাও।
২ জেরুজালেমের লোকদের সংগে নরমভাবে কথা বল,
আর তাদের কাছে এই কথা ঘোষণা কর যে,
তাদের দুঃখ-কষ্ট শেষ হয়েছে,
তাদের গুনাহের মাফ হয়েছে,
তাদের সব গুনাহের ফল
তারা মাবুদের হাত থেকে পুরোপুরিই পেয়েছে।"

৩ একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে,

---

[৫] এখানে 'মাবুদ' বলতে ইবরানী শব্দ 'ইয়ায়ুয়েহ' বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ 'আমি আছি বা অনন-স্বত্বা'। ফরসী অনুবাদ L'Eternel, একেবারেই সঠিক অনুবাদ। আর একটি ইবরানী শব্দ হচ্ছে, 'আদোনাই' একে বাংলায় 'প্রভু', ইংরেজীতে 'Lord' বলা হয়। এই শব্দটিকে আল্লাহ্ বা মানুষ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

"তোমরা মরুভূমিতে মাবুদের পথ ঠিক কর;
মরুভূমিতে আমাদের আল্লাহ্‌র জন্য
একটা রাস্তা সোজা কর।
৪ প্রত্যেক উপত্যকা ভরা হবে,
পাহাড়-পর্বত সমান করা হবে,
পাহাড়ী জায়গা সমতল করা হবে,
আর অসমান জমি সমান করা হবে।
৫ তখন মাবুদের গৌরব প্রকাশিত হবে,
আর সমস্ত মানুষ তা একসংগে দেখবে;
মাবুদই এই সব কথা বলেছেন।"

৬ একজনের কণ্ঠস্বর বলছে, "ঘোষণা কর।"
আমি বললাম, "আমি কি ঘোষণা করব?"
"সব মানুষই ঘাসের মত,
ঘাসের ফুলের মতই তাদের সব সৌন্দর্য।
৭ ঘাস শুকিয়ে যায় আর ফুলও ঝরে যায়,
কারণ মাবুদের নিঃশ্বাস সেগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যায়।
সত্যিই মানুষ ঘাসের মত।
৮ ঘাস শুকিয়ে যায় আর ফুলও ঝরে যায়,
কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌র কালাম চিরকাল থাকে।"

৯ হে সিয়োন, সুসংবাদ আনছ যে তুমি,
তুমি উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠো।
হে জেরুজালেম, সুসংবাদ আনছ যে তুমি,
তুমি জোরে চিৎকার কর,
চিৎকার কর, ভয় কোরো না;
এহুদার শহরগুলোকে বল,
"এই তো তোমাদের আল্লাহ্‌ !"
১০ দেখ, আল্লাহ্‌ মালিক শক্তির সংগে আসছেন,
তাঁর শক্তিশালী হাত তাঁর হয়ে রাজত্ব করছে।
দেখ, পুরস্কার তাঁর সংগে আছে,
তাঁর পাওনা তাঁর কাছেই আছে।
১১ তিনি রাখালের মত করে তাঁর ভেড়ার পাল চরাবেন,
ভেড়ার বাচ্চাগুলো তিনি হাতে তুলে নেবেন
আর কোলে করে তাদের বয়ে নিয়ে যাবেন;
বাচ্চা আছে এমন ভেড়ীদের তিনি

আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

১২ কে তার হাতের তালুতে দুনিয়ার সব পানি মেপেছে
কিংবা তার বিঘত দিয়ে আসমানের সীমানা মেপেছে?
কে দুনিয়ার ধুলা মাপের ঝুড়িতে ভরেছে
কিংবা দাঁড়িপাল্লায় পাহাড়-পর্বত ওজন করেছে?
১৩ কে মাবুদের রূহ্‌কে মাপতে পেরেছে
কিংবা তাঁর পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁকে উপদেশ দিয়েছে?
১৪ বুদ্ধি পাবার জন্য মাবুদ কার পরামর্শ নিয়েছেন,
আর ঠিক পথ কে তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছে?
কে তাঁকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে
কিংবা বিচারবুদ্ধির পথ দেখিয়েছে?

১৫ দেখ, জাতিগুলো যেন কলসীর মধ্যে পানির একটা ফোঁটা;
দাঁড়িপাল্লায় ধূলিকণার মতই তাদের মনে করা হয়।
দূর দেশের লোকেরা তাঁর কাছে মিহি ধুলার মত ওজনহীন।
১৬ আগুন জ্বালাবার জন্য লেবাননের কাঠ
আর পোড়ানো-কোরবানীর জন্য লেবাননের পশু যথেষ্ট নয়।
১৭ সমস্ত জাতি তাঁর সামনে কিছুই নয়;
সেগুলোকে তিনি কিছু বলে মনে করেন না;
সেগুলো তাঁর কাছে অসার।

১৮ তবে কার সংগে তোমরা আল্লাহ্‌র তুলনা করবে?
তুলনা করবে কিসের সংগে?
১৯ কারিগরেরা ছাঁচে ঢেলে মূর্তি বানায়;
স্বর্ণকার তা সোনা দিয়ে মোড়ে
আর তার জন্য রূপার শিকল তৈরী করে।
২০ গরীব লোক মূর্তি তৈরী করবার জন্য
যে কাঠ পচবে না সেই কাঠই বেছে নেয়।
যা টলবে না এমন মূর্তি তৈরীর জন্য
সে একজন পাকা কারিগরের খোঁজ করে।

২১ তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোন নি?
প্রথম থেকেই কি তোমাদের সে কথা বলা হয় নি?
দুনিয়া স্থাপনের সময় থেকে কি তোমরা বোঝ নি?

২২ দুনিয়ার গোল আসমানের উপরে
তিনিই সিংহাসনে বসে আছেন,
দুনিয়ার লোকেরা ফড়িংয়ের মত।
চাঁদোয়ার মত করে তিনি আসমানকে বিছিয়ে দিয়েছেন,
বাস করবার তাম্বুর মত করে তা খাটিয়ে দিয়েছেন।
২৩ তিনি বাদশাহ্‌দের ক্ষমতাশূন্য করেন
আর এই দুনিয়ার শাসনকর্তাদের অসার জিনিসের মত করেন।
২৪ যেই তাদের লাগানো হয়,
যেই তাদের বোনা হয়,
যেই তারা মাটিতে শিকড় বসায়,
অমনি তিনি তাদের উপর ফুঁ দেন আর তারা শুকিয়ে যায়;
একটা ঘূর্ণিবাতাস নাড়ার মত করে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়।

২৫ **আল্লাহ্‌ পাক বলছেন,**
"তোমরা কার সংগে আমার তুলনা করবে?
কে আমার সমান?"
২৬ তোমরা চোখ তুলে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখ;
কে ঐ সব সৃষ্টি করেছেন?
তিনিই তারাগুলোকে এক এক করে বের করে এনেছেন;
তিনিই তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকেন।
তাঁর মহাক্ষমতা ও মহাশক্তির জন্য
তাদের একটাও হারিয়ে যায় না।
২৭ হে ইয়াকুব, কেন তুমি বলছ,
হে ইসরাইল, কেন তুমি এই নালিশ করছ,
"আমার পথ মাবুদের কাছ থেকে লুকানো রয়েছে,
আমার ন্যায়বিচার পাবার অধিকার
আমার আল্লাহ্‌ অগ্রাজ্য করেছেন"?
২৮ তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোন নি?
মাবুদ, যিনি চিরকাল স্থায়ী আল্লাহ্‌,
যিনি দুনিয়ার শেষ সীমার সৃষ্টিকর্তা,
তিনি দুর্বল হন না, ক্লান্তও হন না;
তাঁর বুদ্ধির গভীরতা কেউ মাপতে পারে না।
২৯ তিনি দুর্বলদের শক্তি দেন
আর শক্তিহীনদের বল বাড়িয়ে দেন।
৩০ অল্পবয়সীরা পর্যন্ত দুর্বল হয় ও ক্লান্ত হয়

আর যুবকেরা উচোট খেয়ে পড়ে যায়,
৩১ কিন্তু যারা মাবুদের উপর আশা রাখে
তারা নতুন শক্তি পাবে।
তারা ঈগল পাখীর মত ডানা মেলে উঁচুতে উড়বে;

হজরত দাউদের জবুর শরীফের মতোই এই আয়াতগুলোতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা রয়েছে. যা বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করে। ইশাইয়া ৪০:৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "ঘোষণা কর" অথবা 'ঘোষণা' করার কথা বলা হয়েছে। একই হুকুম কোরআনের প্রথম নাজিল হওয়া সূরা আল-'আলাক্ব (রক্ত পিণ্ড) ৯৬:১-২ আয়াতে বলা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ ঘাসের মতো শুকিয়ে যায়। এই কথাও কোরআনের একই সূরার ৬-৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"মানুষ তো সীমালংঘণ করিয়া থাকে—তোমার (তোমাদের সবার) প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।"

মানুষের হাতের তৈরি সোনা-রূপার দেব-দেবীর মূর্তির অসারতা নবী ইশাইয়া তুলে ধরেছেন, যা অনেক- অনেক বছর পরে কোরআনে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ অবশ্যই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। পরম পাক আল্লাহ্ নিজেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, "তোমরা কার সাথে আমার তুলনা করবে, কে আমার সমান হবে? আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখো, ওইগুলো কে সৃষ্টি করেছে? ইশাইয়া উত্তর দিয়েছেন, **"অনাদি অনন্ত আল্লাহ, মাবুদ, দুনিয়ার শেষ সীমার সৃষ্টিকর্তা।**

সবশেষে, আমরা দেখি যে, এই নবী যিনি প্রায় ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিখেছিলেন, তিনি ২২ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, **আল্লাহ্ "দুনিয়ার গোলসীমার ওপরে বসিয়া আছেন;"- এই কথা আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে মিল রয়েছে যে, এই পৃথিবী গোলাকার।"**

উপসংহার

যদিও এই অংশে উল্লেখিত অধ্যায় ও আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, তৌরাত-পুরাতন নিয়মে বহুবার বলা হয়েছে, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রমাণ বা নিশানা দেওয়া হয়েছে যে, একজন **সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্** আছেন। এই সর্বশেষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি ডঃ বুকাইলির সাথে একমত পোষণ করছি।

কোরআনের বেলায় এই যুক্তি তিনি যেমন গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, কিতাবুল মোকাদ্দসের বেলায় তেমনিভাবে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেননি। কিন্তু এর একটি সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ কারণও রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, তৌরাত-পুরাতন নিয়মের ইয়াওয়েহ এলোহিম-অনাদি অনন্ত আল্লাহ্ একজন নবী আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছেন কি না তা জানার জন্য আরেকটি ভিন্ন পদ্ধতির কথা বলেছেন। আর এই পদ্ধতিটি পরবর্তী অধ্যায়ে পরীক্ষা করে দেখবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৌরাত অনুসারে ওহী যাঁচাই করার পদ্ধতি

তৌরাত- দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে ১৮:১৭-২০ আয়াতে একটি ওহী যাঁচাই করার প্রথম পদ্ধতি বলা হয়েছে। হজরত মূসা (আঃ)-র মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের বলেছেন যে, আমরা একজন সত্য নবীকে কীভাবে যাঁচাই করবো।[১] তিনি বলেছেন,

> "তখন মাবুদ আমাকে বললেন, "তারা ভালোই বলেছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো একজন নবীকে পয়দা করবো ও তাঁর মুখে আমার কালাম দেব; আর আমি তাঁকে যা যা হুকুম দেব, তা তিনি তাদেরকে বলবেন। **আর আমার নামে তিনি আমার যে সব কালাম বলবেন, তা যদি কেউ না শুনে, তাকে আমি দায়ী করবো।** কিন্তু আমি যে কালাম বলতে হুকুম দেইনি, আমার নামে যে কোনো নবী দুঃসাহস করে তা বলে, কিংবা অন্য দেবতাদের নামে যে-কথা বলে, সেই নবীকে মরতে হবে।"

আল্লাহ্‌র হুকুম ও হুকুম অমান্য করার জন্য শাস্তি এখানে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে। ইয়াওয়েহ- অনাদি অনন্ত **আল্লাহ্** বলেছেন, আমার নামে তিনি আমার যে সব কালাম বলবেন, তা যদি কেউ না শুনে, তাহাকে আমি দায়ী করবো। যে সমস্যা আমাদের মনে আছে. পরে তিনি সেই সমস্যার কথা বলেছেন (২১ ও ২২ আয়াত),

> "তুমি যদি মনে-মনে বলো, **মাবুদ যে কালাম নাজিল করেননি, তা আমরা কীভাবে জানবো?**

কীভাবে আমরা একজন ভণ্ড নবীকে সত্য নবী থেকে আলাদা করবো? একজন লোক আল্লাহ্‌র পক্ষে কথা বলছেন বা বলছেন না তা কীভাবে আমরা জানবো? আর মাবুদ নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

> **"যদি কোনো নবী মাবুদের নামে কথা বললে যদি সেই কালাম পরে সফল না হয় ও তার ফল দেখা না যায়, তবে সেই কালাম মাবুদ নাজিল করেননি;** ঐ নবী দুঃসাহস করে তা বলেছে, তাকে তুমি ভয় করো না।"

অন্য কথায় বলা যায় যে, **যদি কারও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়, তবেই তুমি জানবে যে তিনি সত্য নবী।**

১ বাদশাহনামা ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে একটি স্পষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে হযরত ইলিয়াস বাদশাহ আহাবের কাছে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

---

[১] এই আয়াতগুলো সম্পর্কে আলোচনা দেখার জন্য ২৯-৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন, আর দাবী করা হয় যে,এখানে হজরত মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল

তিনি বলছেন,

"আমি যার খেদমতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের আল্লাহ্ সেই জীবন্ত মাবুদের কসম, এই কয়েক বছর শিশির কি বৃষ্টি পড়বে না; কেবল আমার কথা অনুসারে পড়বে।'

নবীর এই কথা শুনে কী ঘটে তা দেখার জন্য প্রতিটি লোক অপেক্ষা করছিলেন। কয়েকমাস ধরে যখন বৃষ্টি হলো না, তখন লোকেরা মনে করেছিলেন, এটি হয়তো কেবল প্রকৃতির কিছুটা অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যখন তিন বছর ছয় মাস ধরে বৃষ্টি হলো না আর হজরত ইলিয়াস যখন বাদশাহ আহাবকে বললেন, "নেমে যান, পাছে বৃষ্টিতে আপনার যেতে অসুবিধা হয়।" আর তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো, তখন প্রতিটি লোক জেনেছিলেন যে, হজরত ইলিয়াস হলেন আল্লাহ্র তরফ থেকে পাঠানো এমন একজন সত্য নবী, যে আল্লাহ্কে আমাদের ভয় করতে হবে।

তৌরাত অনুসারে ওহী যাঁচাই করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো নবী কি আগের নবীদের কাছে নাজিল হওয়া ওহীর বিপক্ষে কোনো কথা বলছেন কি না তা মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। তওরাতে অনাদি, অনন্ত ইয়াওয়েহ হজরত মূসাকে ওহী যাঁচাই করার এই পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন,

"তোমার মধ্যে কোনো নবী কিংবা স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে এমন কেউ যদি তোমার জন্য কোনো নিশানা কিংবা মোজেজা ঠিক করে এবং সেই নিশানা কিংবা মোজেজা সফল হয়, যার সম্বন্ধে সে তোমার অজানা অন্য দেবতাদের বিষয়ে তোমাদেরকে বলেছিল, 'এসো, আমরা সেই অন্য দেবতাদের অনুগামী হই ও তাদের সেবা করি,' **তবে তুমি সেই নবীর কিংবা সেই স্বপ্ন`k‡Ki কথায় কান দিও না;—**

"তোমরা নিজেদের আল্লাহ্ (ইয়াহুয়ে ইলোহিম) মাবুদেরই অনুগামী হও, তাঁকেই ভয় করো, তাঁরই হুকুম পালন করো, তাঁরই কথা শোন, তাঁরই সেবা করো ও তাঁর ওপরেই ভরসা রাখো।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৪)

কোনো নবীর নবুয়ত প্রমাণের জন্য কেবল মোজেজা করাই যথেষ্ট নয়। যদি কোনো লোক আগের নবীদের দেওয়া শিক্ষার বিপক্ষে বলেন, তবে তাঁকে নবী বলে বিশ্বাসও করা যাবে না, তাঁকে নবী বলে স্বীকারও করা যাবে না। এই দুটো বিষয় খুব ভালোভাবে পরবর্তী উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে, এখানে দুইজন লোকই ইয়াওয়েহ এলোহিমের নবী হিসেবে নিজেদের দাবী করেছেন, কিন্তু তাঁরা দু'জনেই একজন অপরজনের বাণীর বিপক্ষে ও উল্টা কথা বলেছেন।

সত্য ও ভণ্ড নবী

এর যথাযথ উদাহরণ আমরা হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) নবীর জীবনে দেখতে পাই। জেরুসালেমে বাস করার সময়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেহেতু লোকেরা অনাদি, অনন্ত আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে শক্তিহীন, মিথ্যে দেবতাদের উপাসনা করছে, এজন্য বেবিলনের রাজা নবূখদ্নিৎসরকে দিয়ে আল্লাহ্ এই নগর ধ্বংস করতে যাচ্ছেন।

একটি জোয়াল কাঁধে ঝুলিয়ে বাদশাহ সিদিকিয়ের কাছে গিয়ে নবী হজরত ইয়ারমিয়াকে আল্লাহ্ এই কথাগুলো বলতে বললেন,

> “আপনারা নিজ নিজ ঘাড় বেবিলনের রাজার জোয়ালের নিচে পেতে তাঁর ও তাঁর লোকদের গোলাম হোন, তাতে বাঁচবেন। যে জাতি বেবিলনের রাজার গোলাম হবে না, তার বিরুদ্ধে মাবুদ যা বলেছেন, সেই অনুসারে আপনারা অর্থাৎ আপনি ও আপনার প্রজারা তলোয়ারে, দুর্ভিক্ষে ও মড়কে কেন মরবেন?” (ইয়ারমিয়া ২৭:২, ১২-১৪)

কিন্তু সেই সময়ে অন্যান্য নবীরা ছিলেন, যাঁরা হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) নবীর একেবারেই উল্টো কথা বলেছেন। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে নবী হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) তাঁর দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর ২৮ রুকুতে বলেছেন,

> “ঐ বৎসরে, চতুর্থ বৎসরের **পঞ্চম মাসে**, **—** গিবিয়োনবাসী অসূরের ছেলে হনানিয় নবী মাবুদের ঘরে ঈমামদের ও সমস্ত লোকদের খেদমতে আমাকে এই কথা বললো,’ আসমানি ফৌজের মাবুদ ইসরায়েলের আল্লাহ্, এই কথা বলেন, “আমি বেবিলনের রাজার জোয়াল ভেঙ্গে দিয়েছি। বেবিলনের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর এই জায়গা থেকে মাবুদের ঘরের যে পাত্রগুলি বেবিলনে নিয়ে গিয়েছে, সেগুলো আমি দুই বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনবো।” — কারণ, আমি বেবিলনের রাজার জোয়াল ভাঙ্গবো।”’
>
> হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) বললেন,’— আমার ও তোমার আগের জমানার যে নবীরা ছিলেন, তাঁরা অনেক দেশ ও বড় বড় রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারীর বিষয়ে ওহী বলেছিলেন। যে নবী শাস্তির ওহী বলে, সেই নবীর কথা সফল হলেই জানা যায় যে, মাবুদ সত্যই সেই নবীকে পাঠিয়েছেন।’ ***(এখানে হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) ওহী যাঁচাই করার দুটো পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন।*** *তিনি শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আগের নবীদের সাথে একই মিল রেখে কথা বলেছেন। আর ওহী সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে লোকেরা সত্য নবী কে তা জানতে পারবে।)* “তখন হনানিয় নবী ইয়ারমিয়া নবীর কাঁধ থেকে সেই জোয়াল নিয়ে ভেঙ্গে ফেললো।” (ইয়ারমিয়া ২৮:১-৩, ৮-১০)

আসুন, এখন আমরা কল্পনা করি যে, সেই সময়ে আমরা জেরুসালেমে বাস করছিলাম। হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) আমাদের বলছেন যে, আল্লাহ্ এই নগরী ধ্বংস করতে যাচ্ছেন। আর আমরা যদি বেবিলনের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের কাছে আত্মসমর্পন না করি এ’জন্য আমরা দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে আর তলোয়ার দ্বারা আমাদের মেরে ফেলা হবে। তিনি আমাদের দাস হিসেবে বেবিলনে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা সেখানে বেঁচে থাকবো, ৭০ বছর পরে আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ্ আবার এদেশে ফিরিয়ে আনবেন (ইয়ারমিয়া ২৯:১০)। ইসরায়েলের বাদশাহ অবশ্যই নবীর এই কথাকে বিদ্রোহ হিসেবে দেখবেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিপক্ষে গিয়ে কে মরতে চায়?

অন্যদিকে, হনানিয় বলছেন যে, আল্লাহ্ ইসরাইলকে উদ্ধার করতে যাচ্ছেন। যদি তা সত্য হয়, তবে মুক্ত মানুষ হিসেবে আমাদের এখানে থাকাই ভালো। দাস হতে কে চায়? এর সাথে আরও বলা

যায় যে, যদি আমরা শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলাই, আর যদি ইসরাইলের বাদশাহ আমাদের ধরতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই শত্রুর সাথে হাত মিলানোর জন্য আমাদের মেরে ফেলবেন।

এটি ছিল আসলে লোকদের বাঁচা-মরার, স্বাধীনতা আর গোলামীর প্রশ্ন। কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেব? কোন রাজা যুদ্ধে জয়ী হন, তার ওপর ভিত্তি করে শেষে আমরা জানতে পারবো কে আসলে সত্য নবী ছিলেন, যদি হজরত হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-এর ওহী সত্য হয় তবে তাঁর কথা অনুযায়ী কোনো কিছু করার জন্য আর আমাদের হাতে কোনো সময় আর থাকবে না।

এজন্য মাবুদ, অনাদি, অনন্ত আল্লাহ, আমাদেরকে আরো তথ্য জানালেন। ইয়ারমিয়া কিতাবের ২৮ রুকুতে আরো বলা হয়েছে,

> "হনানিয় ইয়ারমিয়া নবীর কাঁধ হইতে জোয়াল নিয়ে ভাঙ্গার পরে ইয়ারমিয়ার ওপর মাবুদের এই কালাম নাজিল হলো, 'তুমি গিয়ে হনানিয়কে ব'লো, মাবুদ এই কথা বলেন, তুমি কাঠের জোয়াল ভাঙ্গলে বটে, কিন্তু ওর বদলে লোহার জোয়াল তৈরি করবে।— এই জাতিগুলো যেন বেবিলনের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের গোলাম হয়, সেই জন্য আমি তাদের কাঁধে লোহার জোয়াল দিলাম;—'"

> "তখন ইয়ারমিয়া নবী হনানিয় নবীকে বললেন, 'হে হনানিয়! শোন; মাবুদ তোমাকে প্রেরণ করেননি, কিন্তু তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছো। এইজন্য, মাবুদ এই কথা বলেন, "দেখো, আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে দূর করে দেব; **তুমি এই বছরেই মরবে**, কেননা তুমি মাবুদের বিরুদ্ধে বিপথগমনের কথা বলেছ।'"

> "পরে সেই বৎসরের **সপ্তম মাসে হনানিয় নবী ইন্তেকাল করলো**।" (ইয়ারমিয়া ২৮:১২-১৭)

সেই সময়ে যাঁরা জেরুসালেমে বাস করছিলেন তাদেরকে কোন নবী সত্য তা জানার জন্য আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ভণ্ড-নবী হনানিয় **পঞ্চম মাসে** এই মিথ্যে ওহী বলেছিল। হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি এই মিথ্যে ওহী বলার জন্য মরবে" এই কথা বলার **সপ্তম মাসেই** সে ইন্তেকাল করে। হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে আল্লাহ্ সফল করেছেন। আর যাঁরা সেই সময়ে আল্লাহ্‌র পরিচালনা পেতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের অবশ্যই বেবিলনের রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে আর বেবিলিনে যেতে হবে।

পাঁচ বছর পরে জেরুসালেমের পতন হওয়ার মধ্য দিয়ে হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-র ওহী যে সঠিক তা প্রমাণিত হয়েছিল। আমরা ইয়ারমিয়া ৩৯:৬-৭ আয়াতে পড়ি, সেখানে বলা হয়েছে,

> "— আর বেবিলনের রাজা সিদিকিয়ের সামনে তাঁর ছেলেদেরকে হত্যা করলেন, বেবিলনের রাজা ইহূদার সমস্ত আমিরকেও হত্যা করলেন। আর তিনি সিদিকিয়ের চোখ তুলে ফেলে তাঁকে বেবিলনে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিতলের দুইটি শিকলে বাঁধলেন।"

তৌরাত-পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত অন্যান্য ওহী যেগুলো পূর্ণ হয়েছিল

তৌরাত-পুরাতন নিয়মে অন্যান্য বহু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো পূর্ণ হয়েছিল। এদের মধ্যে কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী বলা ও পূর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের পার্থক্য খুব কম ছিল। নবী ইলিয়াসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এখানে তিন বছর ছয় মাস সময় লেগেছিল। আবার অন্যদিকে হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-এর ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। এভাবে সেই সময়ে লোকেরা বেঁচে থাকতেই এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখে, কোন নবী সত্য তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আবার এমনও কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যা পূর্ণ হওয়ার জন্য কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। আর এমনও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো আজও পূর্ণ হয়নি। নিচে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

ক. দ্বিতীয় অংশে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দানিয়েল নবীর ওহী উল্লেখ করেছি। এখানে বলা হয়েছে, মিডিয়-পারশিকদের হাতে বেবিলনের পতন হবে, শেষে গ্রীক বাহিনীর হাতে তারাও পরাজিত হবে (যা দু'শো পঞ্চাশ বছর পরে পূর্ণ হয়েছিল), আর মসীহ্ আসবেন, তাঁকে "**তাঁকে মেরে ফেলা হবে, তবে তিনি নিজের জন্য মরবেন না** "; দ্বিতীয়বারের মতো জেরুসালেম ও এবাদতখানা ধ্বংস হবে, এই ঘটনা ৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল (দানিয়েল ৮:২০-২১ এবং ৯:২৫-২৬)।

খ. ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে ইশাইয়া নবীর ওপর মাবুদের কালাম নাজিল হয়েছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, দানিয়েল নবীর ওহী অনুসারে একজন পারশ্য সেনাপতি বেবিলন দখল করবেন। এই সেনাপতির নাম কোরস। ইশাইয়া নবী আরো বলেছেন যে, কোরস ইহুদীদেরকে নিজেদের দেশে ফিরে আসা ও এবাদতখানা নির্মাণ করার জন্য অনুমতি দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে,

"তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ভ থেকে তোমার গঠনকারী মাবুদ এই কথা **বলেন,'আমি মাবুদ** সমস্ত কিছুর-নির্মাতা, আমি একাকী আসমানসমূহ বিছিয়েছি, আমি পৃথিবীকে মেলে দিয়েছি; আমার সঙ্গী কে?'

মাবুদ ভণ্ড-নবীদের নিশানাগুলি ব্যর্থ করেন ও গনকদের বোকা করেন—

তিনি তাঁর বান্দার কথা সফল করেন ও তাঁর দূতদের বলা কথা পূর্ণ করেন;

তিনি জেরুসালেমের বিষয়ে বলেন, 'তাতে বসতি থাকবে—'

তিনি **কোরসের** উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার পালের হেফজাতকারী,

সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে।'

তিনি জেরুসালেমের বিষয়ে বলেন, 'উহা আবার তৈরি হবে

এবং বায়তুল মোকাদ্দসকে বলেন, তোমার ভিত্তি স্থাপিত হবে'।" '

(ইশাইয়া ৪৪:২৪-২৮)

উযায়ের কিতাবে ইশাইয়া নবীর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কথা লেখা আছে। ইশাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী করার ৩০০ বছর পরে-৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইস্রা লিখেছেন.

> **"পারস্যের রাজা কোরসের** রাজত্বের প্রথম বৎসরে —মাবুদ পারস্যের রাজা কোরসের মনে ইচ্ছা জাগাইলেন, — তিনি নিজের রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত ফরমান দ্বারা এই হুকুম প্রচার করিলেন:
>
> পারস্যের রাজা কোরস এই কথা বলেন:
>
> "বেহেস্তের আল্লাহ মাবুদ জমিনের সকল রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর **তিনি ইহূদা দেশের জেরুসালেমে তাঁহার জন্য একটি ঘর তৈরি করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন—"** আর নবূখদ্‌নিৎসর মাবুদের ঘরের যে সমস্ত পাত্র জেরুসালেম হইতে আনিয়া নিজ মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, রাজা কোরস সেইগুলিও বাহির করিয়া দিলেন। (উযায়ের ১:১-২, ৭)

এই ভবিষ্যদ্বাণী আসলেই লক্ষ্য করার যোগ্য। রাজা কোরস, ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারশ্যের (ইরান) সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি বেবিলনকে পরাজিত করেছিলেন। এই বেবিলনেই ইহুদীরা বন্দি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন সব ইহুদীরা নিজেদের দেশে ফিরে যায় ও **এবাদতখানা নির্মাণ করে।** প্রতিটি লোককে হুকুম দেওয়া হলো, যেন তাঁরা তাঁদের আল্লাহ্‌কে "মহান দেবতার" কাছে রাজার জন্য সুপারিশ করতে বলেন। রাজা কোরস "মহান দেবতা" বেল ও নবোর উপাসনা করতেন।

এই নীতিটি "কোরস সিলিন্ডারে" (বৃটিশ মিউজিয়ামে আছে) লেখা আছে। এখানে লেখা আছে,

> "সমস্ত আল্লাহ্ বা দেবতা যাদেরকে আমি তাঁদের নিজেদের পবিত্র নগরে স্থাপন করেছি, তাঁরা যেন বেল ও নবো দেবতার কাছে আমার দীর্ঘ-জীবন ও আমার জন্য (সেই মহান দেবতার কাছে) সুপারিশ করেন।"

সার-কথা হলো এই যে, হজরত ইশাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ বেবিলনের রাজাকে পরাজিত করার জন্য পারশ্যের রাজা কোরসকে ব্যবহার করেন। রাজার এই অতুলনীয় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কারণে এসব বন্দি লোকেরা তাঁদের নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পেরেছিল, যেন তারা সেখানে ফিরে গিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করতে পারে। এসব বন্দি লোকদের মধ্যে ইহুদীরাও ছিল। আল্লাহ্ যে তাদের মধ্যে দুনিয়ার নাজাতদাতা হিসেবে মসীহকে পাঠাবেন, এই গুরুত্ব ছাড়া ইহুদীরা ছিল ক্ষুদ্র, গুরুত্বহীন লোক, যাদের কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা এতো লক্ষ্য করর বিষয় ছিল যে, যে সব লোকেরা "অনুমিত পরিকল্পনা দলিল" (ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিস) মতবাদ তৈরি করেছেন, যে মতবাদের কথা এই বইয়ের তৃতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই মতবাদ স্রষ্টারা বলেছেন যে, "যেহেতু ওহীর মোজেজা ঘটা সম্ভব নয় তাই কোরসের রাজা হওয়ার পরে হজরত ইশাইয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীটি লেখা হয়েছিল।"

গ. ৫৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে হজরত ইহিস্কেল নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বেবিলনের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর, সোর (বর্তমান লেবানন) দখল করবেন আর সেই শহর “জাল মেলে দেওয়ার জায়গা হ’বে;” আর “নির্মিত হ’বে না” (ইহিস্কেল ২৬)। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজা নবূখদ্‌নিৎসর সোর নগরী অবরোধ করেন আর তেরো বছর পরে ৫৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি তা দখল করেন। এভাবে নবী হজরত ইহিস্কেল বেঁচে থাকতেই দেখেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আর যে সব লোকেরা শুনেছিলেন, তারাও বেঁচে থাকতেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছেন।

অবশ্য সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশটিও আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে রয়েছে। কারণ, যদিও এখন আধুনিক সোর নগরী রয়েছে, কিন্তু পুরানো নগর আর নির্মাণ করা হয়নি, আর আজও সেখানে জেলেরা জাল ধুইয়ে তা শুকাতে দেয়।

ঘ. নবী মিখা ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শত শত বছর পরে শমরিয়া নগরী ধ্বংস হবে। “মাবুদ বলেছেন, ‘**আমি শমরিয়াকে খোলা মাঠের ধ্বংসস্তূপ করবো, আঙ্গুরলতার বাগান করবো।’” মিখা ১:৬**

ঈসা মসীহের সময়কালে এবং এর পরেও শমরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত শহরটি ধ্বংস হয়েছিল। শহরের ভিত্তিপাথরগুলো উপত্যকায় পড়ে ছিল। আর আজও তা **আংগুর লতায় ঢেকে আছে।**

ঙ. ঈসা মসীহের জন্মের ১২০০ বছর আগে হজরত মূসা (আঃ) লিখেছেন যে, তওরাতের লেবীয় সিপারার ২৬:৩১-৩৩ক আয়াতে আল্লাহ্ বনি-ইসরায়েলের বারো বংশকে বলেছেন, যদি তারা তাদের সমস্ত **অন্তকরণ** দিয়ে তাঁকে অনুসরণ না করে তবে তিনি তাদেরকে এই শাস্তি দেবেন,

> “আর আমি তোমাদের নগরগুলো উৎসন্ন করবো, তোমাদের এবাদতখানাগুলি ধ্বংস করবো ও তোমাদের ধূপের ঘ্রাণ নেব না। আর আমি দেশ ধ্বংস করবো —- আমি তোমাদেরকে জাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব ও তোমাদের পেছনে তলোয়ার খাপ থেকে বের করবো।” (লেবীয় ২৬:৩১-৩৩ক)

প্রত্যেকেই জানে যে, দুটো প্রধান ঘটনার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমবার হজরত হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) নবীর সময়ে তাদেরকে বেবিলনে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার মসীহকে অগ্রাহ্য করার জন্য ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমীয় সেনাপতি তিত জেরুসালেম নগর ধ্বংস করেন। তখন অনেক ইহুদী বিভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পরেছিল। আর আজ পর্যন্ত তাদের পশু কোরবানীর জন্য কোনো এবাদতখানা তৈরি হয়নি।

এখন, ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার ওপরের এসব উদাহরণ দেখে, আমরা অবশ্যই নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি এই উদাহরণগুলো থেকে কি আমরা কোনো কিছু শিখতে পারি? এর উত্তর হচ্ছে, “**হ্যাঁ**”, অবশ্যই আমরা শিখতে পারি।

দুই বা ততোধিক সাক্ষী অবশ্যই থাকতে হবে

আল্ল্াহ যখন হজরত মূসার মধ্য দিয়ে বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাওকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করা হবে না। তিনি বলেছেন যে, দুইজন সাক্ষীর অবশ্যই প্রয়োজন। হজরত ইলিয়াস নবী যখন বলেছেন যে, বৃষ্টি হবে না, তখন তিনি ছিলেন প্রথম সাক্ষী। নবী হজরত ইলিয়াসের প্রার্থনা অনুসারে তিন বছর ছয় মাস ধরে বৃষ্টিকে আটকে রেখে আল্লাহ্ এখানে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দ্বিতীয় সাক্ষী হয়েছেন।

হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভণ্ড নবী হনানিয় মারা যাবেন, তিনি ছিলেন প্রথম সাক্ষী। কয়েক সপ্তাহ পরে হনানিয়ের মৃত্যু ঘটানোর মধ্য দিয়ে হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-এর কথা সত্য প্রমাণিত করে আল্লাহ্ এখানে দ্বিতীয় সাক্ষী হয়েছেন। তওরাতে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ দুইজন সাক্ষী থাকার এই নীতিকে মানুষের বিচার সংক্রান্ত্র কাজে ব্যবহার করতে বলেছেন। দ্বিতীয় বিবরণ **১৭:৬** আয়াতে বলা হয়েছে,

> "কোন মানুষকে হত্যা করতে হলে **দুই বা তিনজন** সাক্ষীর কথার উপর ভরসা করে তা করতে হবে। মাত্র একজন সাক্ষীর কথার উপর ভরসা করে তা করা চলবে না।"

আর দ্বিতীয় বিবরণ **১৯:১৫** আয়াতে একই নীতি সব ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বলেছেন,

> "কেউ কোনো অপরাধ কি পাপ, যে কোনো পাপ করলে, তার বিরুদ্ধে একজন মাত্র সাক্ষী দাঁড়ালে চলবে না; **দুই বা তিনজন** সাক্ষীর প্রমাণে বিচার ফয়সালা হবে।"

দুইজন সাক্ষী থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা কোরআনেও বলা হয়েছে। ২ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-বাকারা (গাভী) ২:১৮২ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না-পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা রাজী তাদের মধ্যে **দুইজন পরুষ সাক্ষী রাখবে যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা রাখবে।**

উইল বা ওসিয়ত তৈরি বা সাক্ষী দেওয়ার সময়েও একইভাবে দুইজন সাক্ষী থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। ১০ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:১০৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "হে মুমিনগণ ! যখন তোমাদিগের মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন ওসীয়ত করার সময় **তোমাদিগের মধ্যে দুইজন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রাখিবে —** ।"

৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা নূর (জ্যোতি) ২৪:৪ আয়াতে বলা হয়েছে, কারও বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষী থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে,

> "যাহারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং **চারজন সাক্ষী** উপস্থিত করে না, তাহাদিগকে আশিটি কশাঘাত করিবে এবং তখনও তাহাদিগের **সাক্ষী** গ্রহণ করিবে না ইহারাই তো সত্যত্যাগী।"

স্পষ্টতইঃ যদি মানুষের ব্যাপারে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দুই বা চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, **তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা ওহী প্রমাণের জন্য দুই বা ততধিক সাক্ষী উপস্থিত থাকা কত না বেশী প্রয়োজন!**

যদি কেউ ইরান বা মিসরের কোনো শহরে গিয়ে নিজেকে “মাহদী” বলে দাবী করে, তবে কীভাবে একজন লোক সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তাঁর দাবী সত্যি।

যদি কেউ লন্ডন বা নিউইর্য়ক বা জেরুসালেম থেকে কেউ নিজেকে “মসীহ” বলে দাবী করে তবে আমরা তাঁকে গ্রহণ করবো না অগ্রাহ্য করবো এই সিদ্ধান্ত কীভাবে নিতে পারি।

অবশ্যই যাঁচাই করার প্রথম উপায় হচ্ছে, তাঁর শিক্ষা বা মতবাদ অবশ্যই আগের ওহীর উল্টো কিছু বলবে না। যেভাবে এই অধ্যায়ের শুরুতে দেখেছি, কেবল মোজেজা করতে পারাই সত্য নবী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। একজন লোক যদি নিজেকে মসীহ্‌ বলে দাবী করেন যে, তিনি দ্বিতীয়বারের মতো পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন, তবে প্রথমবার মসীহ্‌ হিসেবে তিনি যে-শিক্ষা দিয়েছেন এখন সেই শিক্ষার বিপক্ষে বিরোধীতা করে বিপরীত কথা তিনি বলতে পারেন না।

যাঁচাই করার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি সমর্থনসূচক চিহ্ন-মোজেজা বা আগের ওহীর পূর্ণতা দেখতে চাবো, যা প্রমাণ করবে যে, তিনি আল্লাহ্‌র কথাই আমাদের বলছেন।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন মক্কার লোকদের কাছে বলেছেন যে, তিনি একজন নবী আর মক্কাবাসীরা ও ইহুদীরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি সমর্থনসূচক চিহ্ন-মোজেজা দেখতে চেয়েছেন, এই দেখতে চাওয়াটা কিন্তু কেবল তাদের কঠিন হৃদয়ের অবিশ্বাস বা কুফরীর কারণে ঘটেনি। হয়তো অনেকের জন্যই এই কথা সত্যি, কিন্তু যেহেতু কোরআন নিজেই বলছে যে, ইহুদীদের মধ্যে কিছু শ্রদ্ধেয় লোক ছিলেন, তাঁরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। ইহুদী ও মক্কার লোকেরা বলেছিলেন, “একজন সাক্ষী যথেষ্ট নয়, আমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি সমর্থনসূচক সাক্ষী চাই।” মানুষকে পালন করার জন্য আল্লাহ্‌ যে-হুকুম দিয়েছিলেন, তাঁরা কেবল তাই করছিলেন। কারণ, অনাদি অনন্ত ইয়াওয়েহ আমাদের জন্য নিয়ম করে দিয়েছেন যে, অবশ্যই দুইজন বা তারও বেশী সাক্ষী থাকতে হবে।

ষষ্ঠ খণ্ড

হজরত ঈসা মসীহ্ ও হজরত মুহাম্মদ (দঃ) - পথভ্রষ্ট দুনিয়ার জন্য দুইজন নবী?

প্রথম অধ্যায়

হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত

বিগত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মানুষের জাগতিক যে কোনো আইনের বিষয়ে মিমাংশার জন্য দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। আর তিনি আশা করেন যে, বেহেশতী বিষয়ের প্রমাণের জন্যও যেন কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকে। আমরা দেখেছিলাম যে, যদি কোনো লোক জেরুসালেম বা মক্কায় বা অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে দাবী করেন যে তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কালাম বলছেন, তবে আমরা নিজেদের কাছে বা তার কাছেও জানতে চাইবো যে, "কীভাবে আপনি জানেন যে, আপনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা- বেহেশত ও দুনিয়ার মালিকের কথাই বলছেন?"

এই ধরনের প্রশ্ন করলে, সম্ভবতঃ কোনো কোনো পাঠক অসুখী বা অসন্তুষ্ট হবেন। কারণ, এর ফলে যিনি ওহী বলছেন, তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এতে এই ধারণা প্রকাশ পায় যে, যাঁকে আপনি প্রশ্ন করছেন, তাঁকে বলছেন যে, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।"

এই ধারণার মধ্য দিয়ে হয়তো আপনি সত্য কথাই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একবার কল্পনা করুন, একজন খ্রীষ্টানকে যখন এই প্রশ্ন করা হয়, তখন তার কেমন লাগে? এই কথা আমি শত শতবার শুনেছি, "আপনারা আপনাদের কিতাবুল মোকাদ্দসে রদবদল করেছেন, এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না।"

আমরা যতই মনে করি না কেন, এটি কোনো বিষয় নয়, তবে, এই একই প্রশ্ন মুসলমান ও খ্রীষ্টান উভয় সমপ্রদায়ের লোকদের কাছেই করা যায়। "কী প্রমাণ আছে? "কী ধরনের সাক্ষ্য দিয়ে আপনি প্রমাণ করবেন যে, ঈসা মসীহ্ যে-কথা বলেছেন, তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে? কী ধরনের সাক্ষ্য দিয়ে আপনি প্রমাণ করবেন যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে-কথা বলেছেন, তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে?"

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন মক্কায় বাস করতেন, তখন তিনি একজন কোরআন পাঠককে বলেছেন যে, কেয়ামতের দিনের বিষয়ে আল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন, তাহলে কীভাবে সেই লোক এখন সেই কথা জানতে ও শুনতে পাবেন? কারণ, **হজরত মুহাম্মদ (দঃ)ই হচ্ছেন কেবলমাত্র একজন সাক্ষী- প্রথম সাক্ষী।**

দ্বিতীয় সাক্ষী

আমি যখন প্রশ্ন করি যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ছাড়া আর কেউ জিবরাইল ফেরেশতার কথা শুনেছিলেন? তখন একজন ছাড়া সবাই বলেছেন, "না, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই কেবল তা

শুনেছেন।” সেই লোকটি আমাকে একটি হাদিস দেখিয়েছিলেন। আর এই হাদিসটি হজরত নাওয়াবীর ৪০টি হাদিস কিতাব থেকেই নেয়া হয়েছিল।

এই হাদিসটি ঈমাম মুসলিম এভাবে বর্ণনা করেছেন,

“একবার একজন লোক এসে হজরত মোহাম্মদের কাছে জানতে চাইলেন, একজন শিক্ষকের কণ্ঠস্বর কেমন হবে, উত্তর শুনার পরে তিনি হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বললেন যে, “আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। “সেই লোকটি চলে যাওয়ার পরে, সেখানে উপস্থিত হজরত ওমর ও অন্য লোকদেরকে শুনিয়ে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বললেন, “যে লোকটি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি হলেন ফেরেশতা হজরত জিবরাইল।”

যদি তাই ঘটে থাকে, তবুও কিন্ত আমরা কেবল হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কেই একক সাক্ষী হিসেবে এই হাদিসে দেখতে পাই। জিবরাইল ফেরেশতা কারও কাছে নিজের পরিচয় দেননি। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই দাবী করেছেন যে, তিনি ফেরেশতা জিবরাইল ছিলেন।

আরেকটি দিক দিয়েও এটি যে, একমাত্র সাক্ষী তা প্রমাণিত হয়। তাই এই **হাদিসের** সত্যতা নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে। **যে-হাদিস** কেবলমাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, সেই হাদিসের সত্যতা সন্তোষজনকভাবে আমরা নিরূপন করতে পারি না। স্বাভাবিকভাবেই লোকেরা এই হাদিসের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করতে পারে।

অন্যদিকে, অনেক নবীর ক্ষেত্রেই এই কথা বলা যায় যে, আল্লাহ্ বা তাঁর ফেরেশতার কথা কেবল সেই নবী একাই শুনেছেন। আমরা তৌরাত-পুরাতন নিয়ম থেকে এমন কোনো প্রমাণ দিতে পারি না যে, হজরত ইশাইয়া (আঃ) বা হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ) নবীর কাছে আল্লাহ্ যে-কথা বলেছেন, সেই কথা তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ শুনেছেন। একইভাবে কোরআনেও কোনো প্রমাণ নেই যে, হজরত হুদ (আঃ) বা হজরত সালেহ (আঃ) নবীর সাথে আল্লাহ্ যে-কথা বলেছিলেন, সেই কথা তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ শুনেছেন। কেবলমাত্র ঈসা মসীহ্ ও হজরত মূসা (আঃ)-এর বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সিনাই পাহাড় থেকে আল্লাহ্ হজরত মূসা (আঃ) ও সমস্ত বনি-ইসরাইলদের সাথে কথা বলেছিলেন। বনি- ইসরাইলীরা এতো ভয় পেয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহ্কে অনুরোধ করেছিল যে, তিনি যেন আবার এই কাজ না করেন। লোকেরা মাবুদের কাছে এই অনুরোধ করেছিল, কারণ, মাবুদ বলেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে হজরত মূসা (আঃ)-এর মতোই তাদের ভাইদের মধ্য থেকে আরেকজন নবী পাঠাবেন (তৌরাত-দ্বিতীয় বিবরণ ১৮)। [১]

ঈসা মসীহের জীবনকালেই **দ্বিতীয় সাক্ষী** হিসেবে আল্লাহ্ তিনবার কথা বলেছেন। তরিকাবন্দীদাতা হজরত ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়ার কাছ থেকে ঈসা মসীহের তরিকাবন্দী নেওয়ার সময়ে আল্লাহ্ প্রথমবার বলেছিলেন,

---

[১] পৃষ্ঠা ২৯-৩০তে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে

"যে সমস্ত লোক ইয়াহিয়ার কাছে এসেছিল তারা তরিকাবন্দী গ্রহণ করার সময়ে ঈসাও তরিকাবন্দী গ্রহণ করলেন। তরিকাবন্দীর পরে ঈসা যখন মোনাজাত করছিলেন, তখন আসমান খুলে গেল আর পাক-রূহ কবুতরের মতো হয়ে তাঁর ওপর নেমে এলেন। **আর বেহেশত থেকে এই কথা শুনা গেল, "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট" (লূক ৩:২১-২২)।**

স্পষ্টতই বলা যায়, হজরত ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া ও অন্যান্য যাঁরা তরিকাবন্দী নিচ্ছিলেন, আল্লাহ্‌র সেই কথা তাঁরা সবাই শুনেছিলেন।

দ্বিতীয়বার তিনজন সাহাবী- হজরত পিতর, হজরত ইয়াকুব ও হজরত ইউহোন্না্র উপস্থিতিতে আল্লাহ্‌ কথা বলেছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ তাঁদেরকে একটি উচুঁ পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, ওখানেই ঈসা মসীহের সুরতবদল হয়েছিল। তাঁর কাপড়, বরফের মতো ধবধবে সাদা হয়েছিল। এই ঘটনার ৯০০ বছরেরও বেশী সময় আগে নবী হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত ইলিয়াস (আঃ) মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা এই সময়ে ঈসা মসীহকে দেখা দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এভাবে বলা হয়েছে,

"এই সময়ে একখন্ড মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেললো, আর **সেই মেঘ থেকে এই কথা শুনা গেল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এঁর কথা শুন**। পরে হঠাৎ তাঁরা চারদিকে তাকিয়ে আর কাওকে দেখতে পেলেন না, দেখলেন, কেবল একা ঈসা তাঁদের সঙ্গে আছেন'" (মার্ক ৯:৭-৮)।

তৃতীয়বার অনেক লোকের সামনে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন। ইউহোন্না কিতাবে বলা হয়েছে,

"ঈসা বললেন, 'পিতা, তোমার মহিমা প্রকাশ করো'। **বেহেশত থেকে তখন এই কথা শুনা গেল, "আমি মহিমা প্রকাশ করেছি এবং আবার তা প্রকাশ করবো।"**

যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা তা শুনে বললো, 'ওটা মেঘের ডাক।' কেউ কেউ আবার বললো,' কোনো ফেরেশতা এঁর সাথে কথা বললেন।'

তখন ঈসা মসীহ্‌ বললেন, **'এই কথা আমার জন্য বলা হয়নি। কিন্তু আপনাদের জন্যই বলা হয়েছে'"** (ইউহোন্না ১২:২৮-৩০)।

অবশ্য, এই কথা তো সত্যি যে, আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে লোকদের কাছে সব সময়ে কথা প্রমাণ দেননি যে, নবীরা আল্লাহ্‌র কথাই লোকদেরকে বলেছেন। তাই আল্লাহ্‌ আরেক উপায়ে দ্বিতীয় সাক্ষী দিয়েছেন। অতীতে আল্লাহ্‌ সাধারণতঃ তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

ক. নবীর কথা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্য নবীদের মোজেজা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

খ. আগের নবীরা যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, পরের নবীরা সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন।

গ. নবীরা যে-ভবিষ্যতের ঘটনার কথা বলেছেন, তা সফল হবার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

আমরা এই ধরনের প্রতিটি সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখবো,

ক. মোজেজা হচ্ছে দ্বিতীয় সাক্ষী

তৌরাত ও কোরআন উভয় কিতাবে বলা হয়েছে, অনেক মোজেজার মধ্য দিয়ে হজরত মূসা (আঃ)-এর নবুয়ত যে সত্য আল্লাহ্ তা প্রমাণ করেছেন। তৌরাত- পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্ অনেক মোজেজার মধ্য দিয়ে হজরত ইলিয়াস ও হজরত ইলিশায়ের নবুয়ত যে-সত্য তাও প্রমাণ করেছেন। আর ইঞ্জিল শরীফ ও কোরআন উভয় কিতাব বলে যে. ঈসা মসীহের নবুয়ত যে-সত্য তা অনেক মোজেজার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তাই নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে হজরত মোহাম্মদের কাছে মোজেজা দেখতে চাওয়াটা মক্কার লোকদের একেবারেই স্বাভাবিক ছিল।

কোরআনের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বলা হয়েছিল যেন তিনি লোকদের কাছে বলেন যে, তাঁকে কেবল একজন **সতর্ককারী** হিসেবে পাঠানো হয়েছে। বেহেশত, সূর্য, চাঁদ ও পর্বত থাকার জন্য পৃথিবী আন্দোলিত না হওয়া, নদী, ফলমূল, বাগান, খেজুর গাছকে নিশানা হিসেবে উল্লেখ করার পরে শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-রাদ (বজ্র) ১৩:৪খ, ৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "—অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সমপ্রদাযের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন--।
>
> তাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোনো নিদর্শন অবর্তীর্ণ হয় না কেন?'
>
> **কিন্তু তুমি তো কেবল সতর্ককারী** এবং প্রত্যেক সমপ্রদায়ের জন্য রহিয়াছে পথপ্রদর্শক।

২৭ আয়াতেও তাদের এই দাবীকে আরেকবার তুলে ধরা হয়েছে?"

> "যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোনো নিদর্শন অবর্তীর্ণ হয় না কেন?"

আর ৩১ আয়াতে উত্তর দেওয়া হয়েছে, 'যদি কোরআন এমন হইত, যদ্দারা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত, তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না।'

এর মানে হচ্ছে যে, অনেক কঠিন হৃদয় অবিশ্বাসীরা রয়েছে, তাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত সত্য। এক মিনিটের জন্যও তারা সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। ৫টি রুটি ও ২টি মাছকে বরকতদান করে ভেঙ্গে ঈসা মসীহ্ ৫০০০ এরও বেশী লোককে খাইয়েছিলেন, এই মোজেজার ওপর ভিত্তি করে তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি একমাত্র জীবনরুটি যিনি বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন। তারা বলেছিল, **"তা হলে কী এমন আশ্চর্য কাজ আপনি করবেন, যা দেখে আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে পারি? আপনি কী কাজ করবেন?"** (ইউহোন্না ৬:৩০)

সব সময়েই দেখা যায় যে দুটো দল থাকে। কঠিন-মনা-লোকেরা আল্লাহ্‌র যে-কোনো কাজ দেখেই চোখ বন্ধ করে রাখে। আবার সব সময়ে যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জানতে চায় এমন লোকদেরও দেখা যায়। তারা **দ্বিতীয় সাক্ষীর** জন্য অপেক্ষা করে যেন এর দ্বারা জানতে পারে যে, তারা সঠিক পথই অনুসরণ করছে।

কোরআনে এই প্রয়োজনের উত্তর হিসেবে আল্লাহ্‌র দেওয়া চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওপরে যে-চিহ্নগুলোর কথা বলা হয়েছে, তা সবই প্রাকৃতিক নিশানা। আর এই নিশানাগুলো কেবল একটি বিষয়ই প্রমাণ করতে পারে যে, একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। **এগুলো প্রমাণ করে না যে, যিনি এসব কথা চিহ্নের কথা বলেছেন, তিনি একজন নবী।**

ডঃ বুকাইলি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিশ্ময়কর দিক উল্লেখ করে দুটো বই লিখেছেন। দ্বিতীয় বইয়ে, তিনি এমন কিছু বিশ্ময়কর ঘটনার কথা বলেছেন, যা কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। **কিন্তু এর জন্য ডঃ বুকাইলিকে কি একজন নবী বলা হবে?** অবশ্যই না, আর ডঃ বুকাইলিকেই প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি নবী নন।

আর কি কোনো মোজেজা আছে, যাকে মুসলমানরা সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে বলবেন? কেউ কেউ মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করেন। হিজরতের ১ বছর আগে নাজিল হওয়া সূরা বনি-ইসরাইল (ইসরাইলের সন্তানগণ) ১৭:১ আয়াতে এই ঘটনা বলা হয়েছে,

> “পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাহার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য — ।”

বেশীরভাগ তাফসীরকারী বিশ্বাস করেন যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সশরীরে মেরাজে গিয়েছিলেন, যদিও হামিদুল্লাহ বিশ্বাস করেন, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) দর্শন দেখেছিলেন। হামিদুল্লাহ ছাড়া সকলেই একমত যে, এখানে মসজিদুল আকসা বলতে বায়তুল মোকাদ্দসকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হামিদুল্লাহ মনে করেন যে, এটি বেহেশতকে বুঝিয়েছে। ইউসুফ আলীর মতে জেরুসালেম থেকে বেহেস্তের সর্বোচ্চ স্থানে সিংহাসনের সামনে পর্যন্ত তিনি আরোহন করেছিলেন। হামিদুল্লাহ বলেছেন, সেখান থেকেই হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের বিশ্বাস কেবল হাদিস থেকে জানা যায়। ওপরের আয়াতে এই ধারণার কোনো ইংগিত দেওয়া হয়নি। আবারও আমরা এখানে একটি মাত্র সাক্ষী দেখতে পাচ্ছি। এখানে কেবল হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন আর সেই অভিজ্ঞতা তিনি সবার কাছে বলেছেন।

মক্কার অবিশ্বাসীদের এই দাবী সম্পর্কে মধ্য মক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরা আল-আনকাবুত (মাকড়শা) ২৯:৫০ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “উহারা বলে,’তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন?’

৫০খ-৫১ আয়াতে আরেকটি উত্তর দেওয়া হয়েছে,

> “বলো, নিদর্শন আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।’ ইহা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার কাছে কোরআন অবর্তীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়।’”

এখন আমরা যুক্তিকে চূড়ান্তভাবে সাজিয়ে দেখতে পারি। মোজেজা ও নিশানা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে। হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে এখানে হুকুম দেওয়া হচ্ছে, যেন তিনি লোকদের বলেন যে, তিনি কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র। এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ্‌ হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে কোনো মোজেজা দিতে **চাননি। আর তাহলে একটি প্রশ্ন করা যায় যে, দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে "কোরআন কি যথেষ্ট নয়?"**

কিন্তু এই প্রশ্নটিকে আমরা উত্তর হিসেবে নিতে পারি। আমাদের বলা হয়েছে যেন আমরা নবীর বাণী গ্রহণ করি। আর এই ক্ষেত্রে কোরআন হচ্ছে একমাত্র দ্বিতীয় সাক্ষী। কিন্তু কোরআন এখন উল্টো কথা বলছে যে, নবীর কথাই হচ্ছে দ্বিতীয় সাক্ষী। এটি সম্ভব নয়। নবী ও তাঁর বাণী আলাদা নয়। তাঁরা এক, আর এদুটো মিলিতভাবেই হচ্ছে প্রথম সাক্ষী।

মনে করুন, আমি আপনাকে বললাম যে, "চাঁদ মাখন দিয়ে তৈরি।" আজকের দিনে আপনি তখনি বলবেন যে, "নভোচারীরা এই কথা বলেননি, আপনার কথা আমাকে প্রমাণ করে দেখান।" এর প্রমাণ হিসেবে আমি একটি কাগজ নিয়ে লিখে দিলাম যে, "চাঁদ মাখন দিয়ে তৈরি।" তারপর আমি আপনাকে বললাম, "এখানে, এই কাগজে লেখা তাই বলছে, আপনি তা চেয়ে দেখুন।"

এভাবে দেখলে, এটি স্পষ্ট যে, আমার মুখের কথা আর আমার লেখা একেবারেই এক। এটি কেবল একজন সাক্ষীর কথা বলছে। আর আপনি বলবেন, "না, আপনি যা বলছেন, সেই মুখের কথা ছাড়াও আরেকটি প্রমাণ আমাকে দেখিয়ে দিন।" আপনি কখনই আমার লেখাকে আমার মুখের কথার প্রমাণের দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

সূরা আনকাবুত (মাকড়শা) ২৯ এর ৫২ আয়াতে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বলতে বলা হয়েছে,

> "বলো,' আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তিনি অবগত— ।"

এখানে এই যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যে, "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর"- সৃষ্টি সম্পর্কে বলার মধ্য দিয়ে একজন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পরিচয় আমরা পাই। এটি হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত প্রমাণ করে না। সুতরাং, তওরাতে আমাদের আল্লাহ্‌ যে কোনো নবীর কাছে যে-প্রশ্ন করার অনুমতি আমাদের দিয়েছিলেন, এর কোনো উত্তর আমরা এখানে পাইনি। সেখানে আমাদের প্রশ্ন করতে বলা হয়েছিল, **"আপনার নবুয়তের সত্যতার নিশানা কি- যা দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে প্রমাণ করে যে, আপনি এই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কথা বলছেন?**

খ. আগের কিতাবসমূহে হজরত মোহাম্মদের নবুয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

৯২পৃষ্ঠায় আমরা নিম্নের হাদিসটি কিতাবুল মোকাদ্দসের সঠিকত্ব যাঁচাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। এখন আমরা হজরত মোহাম্মদের নবুয়তের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে কি-না, সেই বিষয়ে এই হাদিসটি আবার যাঁচাই করে দেখবো। এখানে বলা হয়েছে,

> হজরত আতা বিন ইয়াসার বলেছেন, "আমি হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস-এর সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে বলুন, তওরাতে রাসুলুল্লাহ্‌রকী বর্ণনা দেওয়া আছে?' তিনি আমাকে তা জানাতে চাইলেন। আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে তিনি বললেন, 'তওরাতে তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর কিছু অংশ কোরআনে রয়েছে।' কোরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ও সাধারণ লোকদের প্রহরীরূপে।" (আল-আহ্‌যাব ৩৩:৪৫)।
>
> (পরে তৌরাত-পুরাতন নিয়ম থেকে তিনি বলছিলেন) "দেখো, আমার গোলাম, ও আমার রাসূল: আমার বাছাই করা বান্দা, যাঁর ওপর আমি সন্তুষ্ট। সে চিৎকার করবে না বা জোরে কথা বলবে না; সে রাস্তায় রাস্তায় তাঁর গলার স্বর শোনাবে না। সে মন্দের বদলে মন্দ করবে না। কিন্তু সে ক্ষমা করবে এবং দয়া করবে। আল্লাহ্ তাকে তুলে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে দিয়ে বক্র-ধর্মমতকে সরল করবেন। ফলে লোকেরা বলবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।' আর সে অন্ধদের চোখ খুলে দেবে, কালাদের কান খুলে দেবে ও কঠিন হৃদয় খুলে দেবে।"
>
> এই হাদিসটি ঈমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন। হজরত দারিমিও প্রায়ই একই কথা বলেছেন। তিনি হজরত আতার নিকট থেকে সনদ পেয়েছেন, আর হজরত আতার নিকট থেকে হজরত ইবনে সালাম সনদ পেয়েছেন।

তৌরাত- পুরাতন নিয়ম থেকে ওপরের যে-অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা আজো দেখতে পাওয়া যায়। ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে,

"ঐ দেখো, আমার বান্দা, আমি তাঁকে ধারণ করি;
তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাঁতে সন্তুষ্ট;
আমি তাঁর ওপরে আমার রূহকে দিলাম; তিনি জাতিদের কাছে ইনসাফ নিয়ে আসবেন।
তিনি চিৎকার করবেন না, জোরে কথা বলবেন না,
পথে তাঁর রব শুনাবেন না।
তিনি থেতলা নল ভাঙ্গবেন না; সধূম শলিতা নিভাবেন না;
ধার্মিকতার সাথে তিনি ইনসাফ করবেন।
আমি মাবুদ ধার্মিকতাতে তোমাকে আহ্বান করেছি, —
আর আমি তোমার হাত ধরবো, তোমাকে রক্ষা করবো;
এবং তোমাকে লোকদের চুক্তির মতো করবো —
তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দেবে,
তুমি কারাগার থেকে বন্দিদের ও সেখানকার অন্ধকারের গর্তে রাখা লোকদেরকে
বের করে আনবে" (ইশাইয়া ৪২:১-৩, ৬ক, ৭)।

এখানে এই হাদিসটি তাহলে অবশ্যই প্রামাণিক হাদিস বলা যায়, কারণ, এর **দুটো সাক্ষী** রয়েছে। আমরা মুসলমান সমপ্রদায়ের ব্যবহৃত হাদিসটি দেখেছি, আর নবী ইশাইয়ার উদ্ধৃত আয়াতগুলো ইশাইয়া কিতাবে আমাদের কাছে রয়েছে। এই আয়াতগুলোকে ঈসা মসীহের আগমনের বিষয়ে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছে। আর ঈসা আল-মসীহের আগমন সম্পর্কে এই রকম ডজন ডজন ভবিষ্যদ্বাণী পাককিতাবে রয়েছে। এই আয়াতগুলো আসলে ইঞ্জিল শরীফে ব্যবহৃত আয়াতগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেগুলো ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফের মথি সিপারার ১২:৫-১৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "ঈসা — সেখান থেকে চলে গেলেন; এবং অনেক লোক তাঁর পেছনে পেছনে গেল, আর **তিনি সবাইকেই সুস্থ করলেন,** — ঈশাইয় নবীর ওপরে নাজিল হওয়া এই কালাম পুর্ণ হয়, দেখো, আমার বান্দা, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রিয়, আমার প্রাণ তাঁতে সন্তুষ্ট, আমি তাঁর ওপর আমার রূহ্ নাজিল করবো, আর তিনি জাতিদের কাছে ইনসাফের বাণী ঘোষণা করবেন।"

এই অংশটি ২২ আয়াত পর্যন্ত রয়েছে। **সেখানে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ্ একটি বোবা ও অন্ধ লোককে ভালো করলেন।** তখন সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে **বললো, "ইনি কি সেই দাউদের সেই বংশধর?" মসীহ্?**

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) না ঈসা মসীহের আগমনের বিষয়ে নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই বিষয়ে পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নিবেন। কিন্ত এই দুটো সাক্ষী থাকার কারণে আমরা ৯৯% নিশ্চিত যে, ওপরের হাদিসে যে- আলোচনা করা হয়েছে, তা সঠিক ছিল।

কিন্তু কেবল ৯৯% কেন? কারণ, সামান্য সম্ভাবনা আছে যে, কেউ এই হাদিসটিকে কোনো মতবাদ সমর্থনের জন্য মিথ্যে কল্পনা করে বলেছেন। কিন্তু যদি তা সত্যও হয়, তবু **এটি দেখায় যে, মুসলমান সমপ্রদায়ের কোনো লোক আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে ইশাইয়া কিতাব থেকে ওই আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেছেন।**

"পারাক্লিট" কি হজরত মুহাম্মদ (দঃ) (আহমাদ) এর আগমনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী?

কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআন তুলনা করে আলোচনার সময়ে ডঃ বুকাইলি তাঁর "বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান" বইয়ে ১০২-১০৬ পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি ইউহোন্না কিতাব থেকে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ইউহোন্না কিতাবে ১৪-১৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, একজন পারাক্লিট আসবেন। পয়দায়েশ ১ অধ্যায় ও বংশতালিকা ছাড়া কিতাবুল মোকাদ্দসের আর কোনো আয়াতসমূহ নিয়ে এতো বিশদভাবে তিনি আলোচনা করেননি।

এই ৪ পৃষ্ঠা জুড়ে, তিনি দাবী করেছেন যে, পারাক্লিট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব আয়াত তিনি উদ্ধৃত করেছেন। পরে তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের সঠিকত্ব সম্পর্কে ৬টি বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। উদাহরণ হিসবে বলা যায় যে, তিনি দাবী করেছেন যে, কিতাবুল মোকাদ্দস হতে কিছু কিছু বিষয় লূকানো হয়েছে। আর অন্য কথা এখানে যোগ করা হয়েছে, আর এই গ্রীক শব্দগুলো ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আর বেশীরভাগ অনুবাদকরা সম্পূর্ণ ভুল করেছেন।

এগুলো খুবই মারাত্মক আক্রমণ। আর ডঃ বুকাইলি তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতার সাহায্যে এগুলো এমনভাবে তুলে ধরেছেন, তার ফলে পাঠকের মনে ছাপ ফেলে যে, তাঁর এই বক্তব্যের সপক্ষে অনেক পন্ডিতেরাই একমত। তাই আমরা এই ছয়টি বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিটি বিবেচনা করে দেখবো, এর সাথে সপ্তম দাবী যে মিথ্যা সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করবো।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, এই শব্দটি হচ্ছে পারাক্লিট (গ্রীক ভাষায় বলা হয়েছে, παρακλητος পারাক্লিটস) শব্দটি দ্বারা পাক-রূহ্ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর এই পাক-রূহ্ প্রতিটি খ্রীষ্টানের সাথে বাস করেন, পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে সাহায্য করেন।[২]

মুসলমানরা বলেন যে, এখানে হজরত মোহাম্মদের আগমনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। একজন মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, একই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী ৩ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আল-সাফ (শ্রেণী) ৬১:৬ আয়াতে রয়েছে, এখানে বলা হয়েছে,

> "স্মরণ করো, মরিয়ম তনয় 'ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনি- ঈসরাইল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের কাছে যে তৌরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শন সহ উহাদের নিকট আসিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু !'"

আরবী ভাষায় **আহমদ** (প্রশংসাকারী) আর **মুহাম্মদ** (প্রশংসিত) একই মূল অক্ষর[৩] ও এর অর্থের সাথে মিল রয়েছে। তাই মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, এটি কিছুটা প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, এখানে ঈসা মসীহ্ বলেছেন যে, একদিন হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নবী হিসেবে আসবেন।

সুখবর সিপারাগুলোতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলে এই ধরনের কোনো নবীর আগমন সম্পর্কে এখানে স্পষ্ট করে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা বুঝা যায় না। তাই যুগ যুগ ধরে এই বিষয়টি খুঁজে বের করার জন্য বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আর এখন অনেক মুসলমান দাবী করেন যে, ইউহোন্না ১৪ অধ্যায়ে বর্ণিত একজন সহায় বা উকিল বা পারাক্লিট পাঠানোর জন্য ঈসা মসীহ্ যে ওয়াদা করেছেন, সেই ওয়াদাই হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের আগমনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। *মানার আল-ইসলাম* বইয়ে অধ্যাপক কাটকাট এই বিষয়টি একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন[৪] আর ইউসুফ আলীও সূরা সাফ (শ্রেণী) ৬১:৬ আয়াতের ব্যাখ্যা করে টিকায় উল্লেখ করেছেন,

> "আহম্মদ" অথবা "মুহাম্মদ" (প্রশংসিত জন) গ্রীক পেরিক্লিটস শব্দের প্রায় একই অর্থ। বর্তমানে ইউহোন্না সুখবর সিপারায় ১৪:১৬, ১৫:২৬ এবং ১৬:৭ আয়াতগুলোতে সান্তনাদানকারী শব্দটি গ্রীক পারাক্লিটস শব্দের অনুবাদ।—আমাদের ডাক্তার সাহেব মনে করেছেন যে,

[২] সুখবর অনুসারে পাকরূহ হচ্ছে আল্লাহর রূহ,তিনি ফেরেশতা জিবরাইল নন।

[৩] আরবী অভিধানে হা মিম দাল নামে আপনি এই শব্দদুটো দেখতে পারেন।

[৪] কাটকাট, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৫৯, এই বইয়ের ২৩-২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

পারাক্লিটস হচ্ছে পেরিক্লিটস শব্দের বিকৃত পাঠ। আসলে ঈসা মসীহ্ মূল কথায় আমাদের পবিত্র নবী হজরত মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।"[৫]

প্রথম যে জিনিসটি আমাদের বুঝতে হবে তা হচ্ছে আরবী ভাষার মতো গ্রীক ভাষা নয়। গ্রীক ভাষায় স্বরবর্ণ যোগ করে লেখা হয়। তাই পারাক্লিটস থেকে পেরিক্লিটস শব্দে পরিবর্তন করতে হলে কমপক্ষে তিনটি লিখিত অক্ষর পরিবর্তন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের পরিবর্তন যে করা হয়েছে, কোনো মূল পাণ্ডুলিলিতে থেকে এর কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। ২০০ খ্রীষ্টাব্দের ইউহোন্না কিতাবের পুরানো কোনো পাণ্ডুলিপি

[৫] ইউসুফ আলী, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৫৪০

ছবি-৭

২০০ খ্রীষ্টাব্দের পেপিরাস পি ৭৫- এ লেখা ইউহোন্না ১৪:৯-২৬ক আয়াত দেখাচ্ছে যে, ১৬ আয়াতে ও ২৬ আয়াতের শেষে “ΠΑΡΆΚΛΗΤΟΝ” শব্দটি দেখা যাচ্ছে।

বডমার লাইব্রেরীর অনুমতিক্রমে ছবিটি ছাপানো হলো।

থেকে আজ পর্যন্ত কোনো পাণ্ডুলিপিতে পারাক্লিটস এর বদলে পেরিক্লিটস শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোন নজির নেই। ২০০ খ্রীষ্টাব্দের লেখা ইউহোন্না কিতাবের পাণ্ডুলিপি-পেপিরাস P৭৫- ৭ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। এখানে ইউহোন্না কিতাবের ১৪:৯-২৬ ক আয়াত লেখা আছে। এই পৃষ্ঠায় ২৬ আয়াতের শেষের শব্দটি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, এটি হচ্ছে "পারাক্লিটস "(παράκλητος) । ১৬ আয়াত আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। কিন্তু লাইনের মাঝখানে দুটো তীর দিয়ে চিহ্নিত অংশে আজো যে-কেউ পড়তে পারেন, পারাক্লিটন শব্দের "পারাক্লি-ন παράκλητον আছে। (গ্রীক ভাষায় "ον অন" মূখ্য কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। প্রথমটির বেলায় সম্পূর্ণ শব্দটি স্পষ্ট দেখা যায়। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনায় ব্যবহৃত শব্দটির দুই বা তিনটি শব্দ স্পষ্টই দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ. যদিও পেরিক্লিটস, এই শব্দটির অর্থ বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ, এই শব্দটি মহাকবি হোমার খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় রচিত "ইলিয়াড ও ওডিসি" নামক তাঁর অমর মহাকাব্যে ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটি বা এই গ্রুপের অন্য কোনো শব্দ কইনি গ্রীক ভাষায় রচিত ইঞ্জিল শরীফে বা পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্টে একবারের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে, এমন কোনো নজির নেই।

এভাবে দেখা যায় যে, "পেরিক্লিটস" শব্দ ব্যবহারের আর কোনো সাহিত্যিক বা পাককিতাবের মধ্যে ব্যবহারের আর কোনো নজির নেই।

ক. ডঃ বুকাইলির প্রাথমিক মন্তব্য

Contradictions and Improbabilities (স্ববিরোধীতা ও অবাস্তবতা) নামক অধ্যায়ের শেষে পারাক্লিটস্ বা পাক-রূহ্ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ বুকাইলি জোর দিয়েছেন যেন তাঁর পাঠকেরা পড়ার আগেই ধরে নেন যে, এখানে স্ববিরোধীতা ও অবাস্তবতা রয়েছে।

পরে, তিনি দাবী করেছেন যে, কেবলমাত্র একটি ইঞ্জিল সিপারায় একজন মাত্র লেখক পারাক্লিটস্ আসার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, কীভাবে এই মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ৪টি সুখবর সিপারার মধ্যে কেবল একটিমাত্র সিপারায় উল্লেখ করা হয়েছে? পরে তিনি এই বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে দুটো ইঙ্গিতপূর্ণ ও সমালোচনামূলক প্রশ্ন করেছেন।

১. "এটি কি অন্য সুখবরে ছিল যা পরবর্তী সময়ে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে?"

ধামাচাপা দেওয়া বা গোপন করা হয়েছে? ধামাচাপা দেওয়া বা গোপন করা সম্পর্কে কে বলতে পারে? ধামাচাপা দেওয়া বা গোপন করা সম্পর্কে কমপক্ষে একটি প্রমাণও না দিয়ে কেউ কি বলতে পারেন যে, ধামাচাপা দেওয়া বা গোপন করা হয়েছে? তিনি জানতে চেয়েছেন,

২. "কেন ধামাচাপা দেওয়া বা গোপন করা হয়েছিল?"

এভাবে কোনো তথ্য না দিয়েই তিনি একটি বিরোধিতা সৃষ্টি করেছেন, আর বলেছেন যে, খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিল শরীফের অংশবিশেষ ধামাচাপা দিয়েছেন বা গোপন করেছেন।

পরে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন, **"কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তাই রহস্য রয়ে গেছে।"**

এখন আমাদের একটি রহস্য আছে- একটি রহস্য বাজে শব্দ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে, আমি দুর্বল শব্দের কথা বলিনি। এগুলো খুবই শক্তিশালী শব্দ। কিন্তু এগুলো বাজে কারণ, এগুলো কোনো সত্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এগুলো এমন শব্দের মতো, যেগুলো ঈসা মসীহ্ সতর্ক করার জন্য ব্যবহার করেছেন।

> "লোকে যে সমস্ত বাজে কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রত্যেকটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে।" (মথি ১২:৩৬)

প্রথমতঃ যে বিষয়টি বলতে চাই তা হলো, ডঃ বুকাইলি যখন বলেছেন যে, কেবলমাত্র একজন লেখকই এই "মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" লিখেছেন, তখন তিনি ভুল বলেছেন। যদিও **পারাক্লিট** শব্দটি হযরত লূক ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি পাক-রূহ্ সম্পর্কে ঈসা মসীহের ওয়াদা এবং প্রেরিত ১ ও ২ অধ্যায়ে সেই ওয়াদার পূর্ণ হওয়ার কথা তিনি লিখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ডঃ বুকাইলির এই প্রশ্ন করার পেছনে মনে হয় তিনি এই ধারণা করেছিলেন যে, **তিনি একটি ঘটনা সম্পর্কে একজন লেখককে ব্যবহার করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পক্ষে এটি অসম্ভব।**

যদি এই ধারণা সঠিক হয়, তাহলে তা কোরআনের জন্যও প্রযোজ্য হবে। একজন মানুষ- হজরত মোহাম্মদের মাধ্যমেই গোটা কোরআন নাজিল হয়েছে। এর সাথে আরও বলা যায় যে, অনেক ঘটনা, যেমন গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা যুবকদের[৬] সম্পর্কে কেবল কোরআনে কেবল একবারই বলা হয়েছে। এমনকি ঈসা মসীহের মুখে বলা ভবিষ্যতে "আহম্মদ" নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও কোরআনে কেবল একবারই দেখা যায়। আমরা কি তাহলে এক্ষেত্রেও স্ববিরোধিতাও রহস্য বলা হয়েছে বলে ধরে নেব?!? কয়জন পাঠক এই যুক্তি মেনে নেবেন?

আর যদি তাঁর নেতিবাচক ধারণা সঠিক হয় তাহলে আমরা কি উল্টো কথা বলার অনুমতি পাব:ইঞ্জিল সিপারায় যে সব বিষয়গুলো দুই, তিন বা চারবার উল্লেখ করা হয়েছে, **তা কি সত্যি?** যদি তাই হয়, তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পাপের জন্য ঈসা মসীহের মৃত্যু ও মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পরে খালি কবরের **কথা ৪টি সুখবর সিপারার লেখকরা ছাড়াও হজরত পৌল লিখেছেন।**[৭] এটি অত্যন্ত একটি জোড়ালো প্রমাণ।

খ. ডঃ বুকাইলি উদ্ধৃত "পারাক্লিট" সম্পর্কিত আয়াত

আরো কিছু বলার আগে আমাদের "পারাক্লিট" সম্পর্কিত আয়াতগুলো লক্ষ্য করা দরকার. ১০৬ পৃষ্ঠায় ডঃ বুকাইলি এই আয়াতগুলোকে উদ্ধৃত করেছেন,

---

[৬] মক্কী সূরা আল-কাহফ ১৮:৯-২৬

[৭] এমনকি মার্ক লিখিত সুখবর সিপারা শেষ আংশ খোয়া যাবার আগে কবর খালি একথা লেখা আছে বলে দেখা যায়

“তোমরা যদি আমাকে (ঈসা) ভালোবাস, তবে আমার হুকুমগুলো পালন করিও। আর আমি পিতার কাছে চাব এবং তিনি আরেকজন **“পারাক্লিট”** তোমাদেরকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের রূহ” (ইউহোন্না ১৪:১৫-১৬)

“কিন্তু সেই সাহায্যকারী (পারাক্লিট) পাক-রূহ, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদেরকে হেদায়েত করবেন এবং আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, তা স্মরণ করিয়ে দেবেন” (ইউহোন্না ১৪:২৬)

“সেই সাহায্যকারী আসবেন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন” (ইউহোন্না ১৫:২৬)।

“তবু আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। আর তিনি এসে পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতা সম্বন্ধে ও বিচার সম্বন্ধে, **দুনিয়াকে** দোষী করবেন।

এ’ছাড়া, **তিনি, সত্যের রূহ,** যখন আসবেন, তখন হেদায়েত করে তোমাদের পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ **তিনি নিজ থেকে কিছু *বলবেন*** না, কিন্তু যা যা ***শুনেন,*** তাই বলবেন এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। তিনি আমার গৌরব প্রকাশ করবেন; কারণ, যা-কিছু আমার কাছে শুনবেন, তাই তোমাদেরকে জানাবেন (ইউহোন্না ১৬:৭-৮, ১৩-১৪)।

এই আয়াতগুলো উল্লেখ করার পরে ডঃ বুকাইলি তাঁর বিশেষ টিকায় লিখেছেন:

“উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের নতুন নিয়মের ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের ১৪-১৭ অধ্যায়ের অন্যসব অনুচ্ছেদগুলো এখানে আর তুলে ধরা হলো না। কেননা ওইসব অনুচ্ছেদেও ঘুড়েফিরে মোটামুটিভাবে একই ধরনের কথা বলা n‡q‡Q|Ó

গ. অমিল??

তাহলে কি ডঃ বুকাইলির “অমিল” নিয়েই কি সমস্যা ছিল? হ্যাঁ, তাই ছিল। ওপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো ভিত্তি করে তিনি নিম্নের সমালোচনা করেছেন:

3৩. এখানে যে প্রশ্নটা সঙ্গতকারণেই না জেগে পারে না, তা-হলো, উদ্ধৃতাংশের এই বক্তব্য ‘পাক-রূহের’ প্রতি প্রয়োগ করাটা বিশ্ময়কর নয় কি? ‘পাক-রূহ্’ কথা বলার ক্ষমতা রাখেন, যা কিছু শোনেন তাও সাধারণ্যে ঘোষণা করতে পারেন; কারণ, গ্রীক ভাষায় কোনো রূহের ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

৪. যেহেতু রূহের ক্ষেত্রে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয় না, তাই পরবর্তী সময়ে ইউহোন্না ১৪:২৬ আয়াতে এই পাক-রূহ্ শব্দটি পরে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৫. কেন তারা পরবর্তীকালে শব্দটা যোগ করেছে? এই শব্দটি ইচ্ছে করেই যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা মূল বাইবেলের যে-বাণীতে হযরত ঈসার পরে আরেকজন নবী আসার কথা ছিল, যা

জামাতের সংগঠনকালে প্রচারের বিরোধী ছিল বলে তা পরিবর্তন করা হয়েছে।[৮] অন্য কথায় বলা যায় যে, অন্য নবীর আগমন সম্পর্কে মসীহের ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্টানরা পুরোপুরিভাবে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

৬. পারাক্লিটের অনুবাদের সময় সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ করা হয়েছে।

আমরা এখন ওপরে উল্লেখিত প্রতিটি সমালোচনা সঠিক কিনা তা **মূল্যায়ন** করবো।

৪. আয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা

ডঃ বুকাইলি এই পয়েন্টে এই কথা বলে আলোচনা শুরু করেছেন যে, "এই ধরণের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনার বেলায় প্রথমেই পাঠ-ভিন্নতার কথা উঠতে পারে।" অন্য কথায় বলা যায় যে, তিনি এমন একটি প্রমাণ খুঁজে বের করতে চাচ্ছিলেন যে, পাক-রূহ্ শব্দটি পাককিতাবে পরবর্তী সময়ে যোগ করা হয়েছে। আমরা এই প্রশ্নটি কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্ষেত্রে ভিন্ন-পাঠ ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তৃতীয় অংশে, ৩ক অধ্যায়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনুলিপি তুলনা করে দেখা গেছে যে, পাণ্ডুলিপি লিপিকারকদের ভুলের কারণে ভিন্ন পাঠের সৃষ্টি হয়েছিল।

সুতরাং, আমরা ডঃ বুকাইলির অনুসন্ধান সম্পর্কে কী বলতে পারি? ইউহোন্না ১৪:২৬ আয়াতের আর কোনো ভিন্ন-পাঠ আছে? কেবল একটি! ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর সিরিয়াক ভাষায় অনুদিত কিতাবে এই ভুলটি রয়েছে। এখানে রূহের বিশেষণ "পাক" ভুল করে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিশেষ্য "রূহ" শব্দটি রয়ে গেছে। তাহলে আমাদের প্রশ্নাধীন আয়াতটি এভাবে পড়তে হবে, "**সেই সাহায্যকারী (পারাক্লিটস্), অর্থাৎ রূহ্,** যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন— "

অনুবাদের ক্ষেত্রে এই একটি মাত্র ভিন্ন-পাঠের কী মূল্য আমরা দেব? হজরত ইউহোন্না সুখবর সিপারাটি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন? আর আমরা যখন ২০০- ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পেপিরাসের ওপর লেখা গ্রীক পাণ্ডুলিপিগুলো পরীক্ষা করে দেখি, তখন দেখি যে, এদের সবগুলোতেই "পাক-রূহ্"শব্দটি রয়েছে। ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোডেক্স সিনাইটিকাস ও কোডেক্স ভেটিকানাসের আর কোনো ভিন্ন-পাঠ নেই। ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোডেক্স আলেকজান্ড্রিয়াসে "পাক-রূহ" শব্দটি রয়েছে।

এটি একেবারেই ফারসী ভাষায় অনুদিত কোরআনের একটি ভিন্ন পাঠের মতো, যা ৩৪৫ হিজরীতে একটি কমিটি অনুবাদ করেছিলেন। এখনও এর অনুলিপি পাওয়া যায়।[৯] আপনি এই ফারসী ভাষায় অনুদিত কোরআনের কী মূল্য দেবেন?

---

[৮] বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, বুকাইলি, ফরাসী সংস্করণ-পৃষ্ঠা ১০৯, (আমি অনুবাদ করেছি)

[৯] Hamidullah, Le Coran, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-xxxvi

কোরআন ও **কিতাবুল মোকাদ্দসে** এমন একটি মাত্র ভিন্ন পাঠের ওপর ভিত্তি করে একটি মতবাদগত সিদ্ধান্ত নেয়া কতটুকু সঠিক হতে পারে?

অবশ্যই এটি একটি লিপিকারদের ভুল, আর এইজন্য এর উত্তর হচ্ছে, **না!!**

ডঃ বুকাইলি এই ধরনের লিপিকারদের ভুল থাকার সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, "তাহলে কি নকলকারী ভুল করে বাড়তি একটি শব্দ বসিয়েছিলেন?" অবশ্য তিনি ভেবেছেন যে, লিপিকার ইচ্ছা করেই এই ধরনের বাদ দিয়েছেন। তাই তিনি জানতে চেয়েছেন,

> "না-কি তিনি জ্ঞাতসারেই এই দাবি সাবস্ত্য করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যে মূল কিতাবুল মোকাদ্দসের লেখা কপি করছেন, সেখানেই পাক-রূহকে দিয়ে 'কথা শোনানো' ও 'কথা বলানোর' কথা বলা হয়েছে। কথাটা যতই উদ্ভট মনে হোক, তবু বাস্তবে কিতাবুল মোকাদ্দস নকল করতে গিয়ে নকলকারী নতুন একটা শব্দ জুড়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা বর্জন করতে পারেননি।[১০]

কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ শুনেন ও কথা বলেন, সুতরাং আল্লাহ্‌র রূহ্ কথা বলেন, এই কথা বলা কেন অলিক হবে?

৩. রূহানিক সত্তার ক্ষেত্রে কেউ কি "আকুয়ো" (শোনা) এবং "লালিও" (বলা) ব্যবহার করতে পারেন?

গ্রীক শব্দ "আকুয়ো" (শোনা) এবং "লালিও" (বলা) শব্দ ইউহোন্না ১৬:১৩-১৪ আয়াতে ওপরে উদ্ধৃত করার সময়ে আমি গাঢ় করেছি। ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, এগুলো বস্তু বাচক শব্দ হওয়ায় পাক-রূহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। তিনি বলেছেন, "এটা খুবই স্পষ্ট যে, "আকুয়ো" এবং "লালিও" এই দুই গ্রীক ক্রিয়াপদ এমন দুটি বাস্তব কর্মের নির্দেশ দিচ্ছে, যা কেবল একজন জীবন্ত মানুষ তাঁর শ্রবণ ও উচ্চারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমাধা করতে পারেন। সুতরাং, ঐ শব্দ দুটি "হোলি স্পিরিট' পাক-রূহ্ বা পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রয়োগ বাস্তবিকই অসম্ভব।" এই কারণেই এই আয়াতগুলো কেবলমাত্র অন্য একজন মানুষ বা নবীর আগমনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

আমরা যখন একটি প্রাচীন গ্রীক অভিধান দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, তিনি প্রাচীন গ্রীক ভাষা অনুসারে সত্যি কথাই বলেছেন। *The Dictionary of New Testament Theology*, ভলুউম ২, ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পাদক কলিন ব্রাউন বলেছেন,

> "(খ্রীষ্ট পূর্ব ১০ম শতাব্দী মহাকবি হোমারের সময় থেকে) "আকুয়ো" শব্দের অর্থ "শোনা"। এর দ্বারা প্রাথমিকভাবে কান দ্বারা কোনো কিছু শোনাকে বুঝায়।

এই কথা ১০০% ডঃ বুকাইলির সাথে মিলে যায়। কিন্তু সেই অভিধানে আরো বলা হয়েছে,

---

[১০] বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, বুকাইলি, পৃষ্ঠা- ১০৪-১০৫

"তবে 'শোনা' কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, কিন্তু যে-বিষয়টি শোনা হচ্ছে সেই বিষয়টি মন থেকে বুঝা বা বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধী করা বা গ্রহণ করার বিষয়ও বটে। **এই বিষয়টি ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি করে, যা** আমরা মিম্নে হিব্রু "শামা" শব্দ **যা লোকায়ত গ্রীক ভাষায় দেখা যায় তার আলোকে এই পার্থক্য দেখবো।**

কিন্ত "আর এটি হচ্ছে বড় কিন্তু। আমরা ৯৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কোনো সময়ের কথা বলছি না। আমরা কইনি গ্রীক বা সাধারণ লোকদের ব্যবহৃত উপভাষার কথা বলছি, যা লোকেরা রাস্তাঘাটে বা হাটে- বাজারে ১ম শতাব্দীর লোকেরা ব্যবহার করত।

আমরা এই বইয়ের ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম কোনো শব্দের অর্থ তার ব্যবহারের ভিত্তিতে বাক্যের প্রসঙ্গের ভিত্তিতে বা লেখার অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সুতরাং, আমরা **ইঞ্জিল-নতুন নিয়মকে** খ্রীষ্টানদের ব্যবহৃত গ্রীকভাষার উৎস হিসেবে পরীক্ষা করে দেখবো। আমরা প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে একদল ইহুদী কর্তৃক অনুদিত সেপ্টুয়াজিন্ট- তৌরাত -পুরাতন নিয়মের গ্রীক **অনুবাদকে** ইহুদীদের ব্যবহৃত গ্রীকভাষার উৎস হিসেবে পরীক্ষা করে দেখবো। আর মুসলমানদের জন্য কোরআনের ব্যবহৃত শব্দ যা আল্লাহ্‌র 'শোনা' ও 'বলা' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা তাও পরীক্ষা করে দেখবো।

ক. ইঞ্জিল শরীফের অন্যান্য আয়াতগুলো নিম্নে দেওয়া হলো, যেখানে "আকুয়ো" (বা এর যৌগিক শব্দ) এবং "লালিও" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইঞ্জিল বা **ইঞ্জিল শরীফের** আর কোনো আয়াত আছে কি, যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এমন একটি সত্তা যিনি শুনেন, তা বুঝানোর জন্য "আকুয়ো" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক রয়েছে। "আকুয়ো" এবং এর যৌগিক শব্দ ইউহোন্না ৯:৩১, ১১:৪১, ৪২ ২ করিঃ৬:২, লূক ১:১৩ এবং প্রেরিত ১০:৩১ আয়াতে রয়েছে। এখানে তাদের মধ্য থেকে তিনটি আয়াতে বাংলা শব্দে গাঢ় ও বাঁকা অক্ষরে দেখানো হলো:

"আকুয়ো"

১. আমরা জানি, আল্লাহ্ পাপীদের কথা **শুনেন** না, কিন্তু যদি কোনো লোক আল্লাহ-ভক্ত হয়, আর তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তবে তিনি তারই কথা **শুনেন** (ইউহোন্না ৯:৩১)।

২. পরে ঈসা ওপরের দিকে চোখ তুলে বললেন,' পিতা, তোমার শুকরিয়া আদায় করি যে, তুমি আমার কথা **শুনেছ।** আর আমি জানতাম, তুমি সবসময়ে আমার কথা **শুনে** থাক... (ইউহোন্না ১১:৪১, ৪২)।

"এইসাকু"

৩. কিন্তু ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "জাকারিয়া, ভয় করো না; কারণ, তোমার মোনাজাত ***শোনা*** হয়েছে, তোমার স্ত্রী এলিজাবেত তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে ও তুমি তার নাম ইয়াহিয়া রাখবে" (লূক ১:১৩)।

ওপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, ***আকুয়ো*** শব্দটি যে কোনো রূহানিক সত্তা এমনকি আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও, প্রথম দুটো উদাহরণ ইউহোন্না কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে, আর এই কিতাবের লেখক পারাক্লিট শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

লালিও শব্দটি ইউহোন্না ৯:২৯, প্রেরিত ৭:৬, ইবরানী ১:১ এবং ৫:৫, মার্ক ১৩:১১ এবং প্রেরিত ২৮:২৫ আয়াতে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে "লালিও" শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে নিম্নে তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

১. "আমরা জানি, আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা ***বলেছিলেন*** —।" (ইউহোন্না ৯:২৯)

২. "আল্লাহ, পুরানো জমানায় বহুভাগে ও বহুরূপে নবীদের মারফত পূর্বপুরুষদের সাথে কথা **বলে,** —ইবরানী ১:১

৩. পাক-রূহ্‌ ইশাইয়া নবীর দ্বারা আপনাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই কথা ভালোই **বলেছিলেন** — (প্রেরিত ২৮:২৫)

এভাবে **নতুন নিয়ম** পরীক্ষা করলে সহজেই দেখা যায় **যে, *"আকুয়ো"*** ও ***"লালিও"*** আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে কর্তা হিসেবে **ইউহোন্না** সহ **ইঞ্জিল শরীফের--সুখবর** পাঁচজন লেখক ব্যবহার করেছেন।

খ. সেপ্টুয়াজিন্টে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ শুনেন ও কথা বলেন

হিব্রু পুরাতন নিয়মের গ্রীক ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে সেপ্টুয়াজিন্ট (Septuagint)। ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একদল ইহুদী আলেম ইহুদী বিশ্বাসীদের জন্য গ্রীক ভাষায় এই কিতাব অনুবাদ করেছিলেন। আর প্রথম শতাব্দীতেও ইহুদী ও খ্রীষ্টান সমপ্রদায়ের লোকেরা এই কিতাব ব্যবহার করতেন।

আমরা যখন এটি পরীক্ষা করি, তখন আমরা দেখি যে, আল্লাহ্‌কে কর্তা হিসেবে ধরে নিয়ে **"আকুয়ো"** ও **"লালিও"** শব্দ বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। ডজন ডজন উদাহরণের মধ্য থেকে আমরা কেবল তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করবো। এখানে **"আকুয়ো"** হিব্রু শব্দ 'শামা''র বদলে আর **"লালিও"** হিব্রু শব্দ 'ডাবা'র বদলে ব্যবহার করা হয়েছে।

১. হিজরত ৬:২, ৩ "আল্লাহ্‌ মূসার সাথে আলাপ করে আরও **বললেন,** 'আমি ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ [মাবুদ]; (আমি ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌' বলে দেখা দিতাম, —।

২. জবুর শরীফ ১১৫:৪-৬ "ওদের মূর্তিগুলি রূপা ও সোনা, ওগুলো মানুষের হাতের কাজ। মুখ থাকতেও ওরা কথা **বলে** না; —কান থাকতেও **শুনতে** পায় না; নাক থাকতেও ঘ্রাণ পায় না;

৩. জবুর শরীফ ৯৪:৭, ৯ "তারা বলছে, মাবুদ দেখবেন না, ইয়াকুবের আল্লাহ্‌ বিবেচনা করবেন না। যিনি কান তৈরি করেছেন, তিনি কি **শুনবেন** না? যিনি চক্ষু গঠন করেছেন, তিনি কি দেখবেন না?

ওপরের উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, মূর্তির বিরুদ্ধে দোষ দেওয়া হয়েছে, তামাশা করা হয়েছে, কারণ তারা “**আকুয়ো**” পায় না ও “**লালিও**” পারে না **কিন্তু মাবুদ, ইয়াওয়েহ, অনাদি, অনন্তকালীন আল্লাহ, তিনি শুনেন-”আকুয়ো” ও কথা বলেন -”লালিও”** ।

ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, এই শব্দগুলো কেবল মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, কারণ, মানুষের শুনার জন্য কান ও বলার জন্য মুখ আছে। তাঁর জন্য ওপরের উদাহরণে জবুর শরীফ ৯৪:৭, ৯ আয়াতে কী চমৎকার উদাহরণই না দেওয়া হয়েছে:

“যিনি কান তৈরি করেছেন, তিনি কি শুনবেন না?”

গ. কোরআনেও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ শুনতে ও বলতে পারেন

আমরা যখন কোরআনে খোঁজ করি, তখন দেখতে পাই যে, যদিও মুসলমানরা খুবই সতর্কভাবে বলেন যে, আল্লাহ্ সম্পুর্ণ ধরা-ছোঁয়ার উর্দ্ধে, কিন্তু কখনো কখনো বলা হয়েছে যে, তিনি শুনতে ও বলতে পারেন। এখানে ৪টি উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) ৪০:৬০ আয়াতে বলা হয়েছে, “তোমাদের প্রতিপালক ***বলেন,’*** তোমরা আমাকে ডাক, ***আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।”***

২. সূরা বাকারা (গাভী) ২:৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, ”স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের ***বললেন —।”*** লক্ষ্য করুন, এখানে একজন রুহানি সত্তা (আল্লাহ) আরেক দল রুহানি সত্তাদের (ফেরেশতা) সাথে কথা বলেছেন।

৩. মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা তাহা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ২০:৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে, “তিনি (আল্লাহ) ***বলিলেন,’*** তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।’

৪. সূরা আলি ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে, “সেখানেই জাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল,’ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা **শ্রবণকারী।**

৫ম আয়াতটি ইঞ্জিল শরীফেও একইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জাকারিয়া নবী তাঁর ছেলে হজরত ইয়াহিয়ার জন্য মোনাজাত করার কথা এখানে বলা হয়েছে। এখানে লূক লিখিত সুখবরে গ্রীক ক্রিয়াপদ “এইসাকু” শব্দ ব্যবহার করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ শুনেন। এখানে দুটো আয়াত পাশাপাশি দেওয়া হলো।

৫. সূরা আলি ইমরান ৩:৩৮- “সেখানেই জাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট	লূক ১:১৩, ৫৮ খ্রীষ্টাব্দ - “ফেরেশতা তাঁকে বললেন, “জাকারিয়া ভয় করো না, কারণ আল্লাহ্ তোমরা মোনাজাত **শুনেছেন**। তোমার স্ত্রী

হইতে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা **শ্রবনকারী।’”**

এলিজাবেতের একটি ছেলে হ’বে, তুমি তাহার নাম রাখিও ইয়াহিয়া।’”

সুতরাং, এটি সঠিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে, সূরা ৩:৩৮ আয়াতে **“শ্রবণকারী” (سَمِيعٌ)** শব্দটির গ্রীক ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে *এইসাকু।* এই “এইসাকু” শব্দটি কোরআন নাজিল হওয়ার ৬০০ বছর আগে হজরত লূক লিখিত সুখবর সিপারায় বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রীক ভাষায় অনুদিত কোরআনের একটি অনুলিপিতে সমপ্রতি আমি আমার এই ধারণার প্রমাণ পেয়েছি।[১১] আমি যখন ওপরের সূরা আল-ইমরান (ইমরানের পরিবার) ৩:৩৮ আয়াতটি দেখি (গ্রীক অনুবাদে ৩৩ নং আয়াত) সেখানে বলা হয়েছে:

> “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা *শ্রবণকারী* (এইসাকু)।”

অবশ্য, আমি আশা করি যে, পাঠকেরা এখন বুঝতে পারবেন যে, যদিও এখানে জোরালো প্রমাণ রয়েছে যে, আমার যুক্তি সঠিক, কিন্তু এখানে হযরত ইউহোন্না লিখিত সুখবরে বা কোরআনে “*আকুয়ো”* শব্দের যে-অর্থ দেওয়া হয়েছে, সেই অর্থই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে এর কোন কারণ নেই। এর কারণ হচ্ছে, ১৯২৮ সালে এই অনুবাদ করা হয়েছিল। সুতরাং, প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টানরা এবং ৭ম শতাব্দীর মুসলমানরা এই অর্থেই তা ব্যবহার করেছিলেন এর উদাহরণ এটি হতে পারে না যে,

সারসংক্ষেপঃ

১. যেহেতু **“আকুয়ো”** ও **“লালিও” ইঞ্জিল শরীফের** অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ **শুনেন** ও **বলেন** এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে,

২. আর যেহেতু আল্লাহ্‌কে কর্তা হিসেবে দেখিয়ে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্টে **“আকুয়ো”** ও **“লালিও”** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে,

৩. আর যেহেতু **কোরআনের আধুনিক গ্রীক অনুবাদে আল্লাহ্ শুনেন এই কথা বুঝানোর জন্য “এইসাকু” এই ক্রিয়া পদ ব্যবহার করা হয়েছে.**

৪. আর যেহেতু একই ঘটনা কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণনা করার জন্য আধুনিক গ্রীক অনুবাদে আল্লাহ্ শুনেন এই কথা বুঝানোর **জন্য “এইসাকু”** এই ক্রিয়াপদ **“সামিওন”** শব্দের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে.

সুতরাং, এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এই গ্রীক শব্দটি রূহানিক সত্তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে আর ডঃ বুকাইলির দেওয়া যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই।

---

[১১] *তো কোরানিয়ন,* জি আই পেনটাখ কর্তৃক গ্রীক ভাষায় অনুদিত। ১৯২৮ সালে গ্রীসে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. খ্রীষ্টান জামাত কি শিক্ষা দেয় যে, ঈসা মসীহ্ শেষ নবী?

এই কথার সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, "না"! **ইঞ্জিল শরীফ** - নতুন নিয়ম বলা হয়েছে যে, **ঈসা মসীহের পরও নবী আসবেন।** ইফিষীয় কিতাবে আল্লাহ্ হজরত পৌলের কাছে প্রকাশ করেছেন যে,

> "তিনি (পুনরুত্থিত মসীহ) কিছু লোককে **প্রেরিত**, কিছু লোককে **নবী** — হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।" (ইফিষীয় ৪:১১)

আমরা ইঞ্জিল শরীফ- নতুন নিয়ম খুঁজলে দেখতে পাই যে, এখানে অনেক লোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, **যাঁরা ঈসা মসীহের বেহেস্তে আরোহনের পরও আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী লাভ করেছেন।**

৩৫ বছর পরে পুনরুত্থিত প্রভুকে দেখার পরে **প্রেরিত হজরত পিতর** দুটো ওহী পেয়েছিলেন, একটি **সমস্ত লোকের জন্য** ও অন্যটি শেষ দিনের বিষয়ে **ভবিষ্যদ্বাণী** করেছিলেন।[১২]

ঈসা মসীহের এই পৃথিবীতে থাকার ৫০-৬০ বছর পরে আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহীর দ্বারা প্রেরিত ইউহোন্না সকল জাতির লোকদের জন্য সুখবর সিপারা লিখেছেন।[১৩] আরো বলা যায় যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ কিতাবটিও ইউহোন্না লিখেছেন। তিনি আমাদের সতর্ক করেছেন, আর যখন ঈসা মসীহ্ ফিরে আসবেন তখন কী ঘটবে সেই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

নবী **আগাব** সারা রোম সাম্রাজ্যে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ার কথা **ভবিষ্যদ্বাণী** করেছিলেন (প্রেরিত **১১:২৮**) আর "**এহুদা ও সীল** তাঁরাও **নবী** হিসেবে বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছেন (প্রেরিত **১৫**, ৩২)। এই সব নবীরা কিন্তু ঈসা মসীহের পরে এসেছিলেন।

প্রকাশিত কালাম **১১:১-১২** আয়াতে ভবিষ্যতে আসবেন এমন দুইজন নবীর কথা আমাদের বলা হয়েছে,

> "কিন্তু আমি আমার **দুইজন সাক্ষীকে** এমন ক্ষমতা দেব, যার ফলে তারা চট পরে এক হাজার দুইশ' ষাট দিন ধরে **নবী হিসেবে কথা বলবে—এই** লোকেরা **যতদিন নবী হিসেবে কথা বলবে** ততদিন যেন বৃষ্টি না হয় (হজরত ইলিয়াসের মতো), এবং পানিকে রক্ত করার ক্ষমতাও তাদের থাকবে।"

স্পষ্টতঃই আদি খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করতেন যে, ঈসা মসীহের বেহেস্তে আরোহনের পরে অনেক প্রেরিত ও নবীরা এসেছিলেন। ভবিষ্যতে আরো দুইজন নবী আসবেন।

---

[১২] ১ পিতর, ২ পিতর

[১৩] ইউহোন্না সুখবর সিপারা ও প্রকাশিত কালাম

তাহলে, কোন যুক্তিতে এই কথা বলা যায় যে, আদি খ্রীষ্টানরা হজরত মোহাম্মদের আগমনের বিষয়ে বলা ওহিটি গোপন করেছেন?

তিনি ভবিষ্যতে কী বলতে যাচ্ছেন অথবা তাঁর শিক্ষা কী হবে এই কথা তো তাঁরা জানতেন না।

উপসংহারে, এই কথা বলা যায় যে, আমরা ডঃ বুকাইলির তত্ত্বে দেখি যে, জামাত হজরত মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী গোপন করেছে, এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই, এটি একেবারেই অন্তঃসারশূন্য অভিযোগ।

৬. "পারাক্লিট" শব্দের ভুল ব্যাখ্যা

ডঃ বুকাইলি ষষ্ঠ অভিযোগ করেছেন যে, "পারাক্লিট" শব্দটি ভুলভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। ১০৬ পৃষ্ঠায় পাদটিকায় তিনি লিখেছেন,

> "কোনো কোনো অনুবাদক ও ভাষ্যকার, বিশেষতঃ যাঁরা প্রাচীন তাঁরা অবশ্য এই পারাক্লিট শব্দের অর্থ করেছেন 'কনসোলার' বা সান্ত্বনাদাতা। কিন্তু এই অর্থ **মোটেই সঠিক নয়**।"[১৪]

ভুল অনুবাদ করার সম্ভাবনা সব সময়ে রয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ কেবল একজন অনুবাদকের বিপক্ষে করা যায় না, বরং অনেকের বিপক্ষেই করা যায়। আসলে, এটি কেবল এক ভাষার ক্ষেত্রেই যে ঘটে তাও নয়। "পারাক্লিট" শব্দটি আরবীতে "মু'আয্যী مُعَزِّيٌ", ইংরেজীতে comforter (সান্ত্বনাদানকারী) এবং ফরাসী ভাষায় consolateur আর বাংলায় "সহায়" বা "পক্ষসমর্থনকারী উকিল বলা হয়েছে। তাহলে কি আমরা বলবো যে, কেবল ডঃ বুকাইলির অনুবাদ ছাড়া আর সব অনুবাদ ভুল। তিনি যখন এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন, তখন তিনি কোরআন সম্পর্কে বলেছেন,

> "আসলে কোরআনের এমন সব তরজমা ও তফসীর এখন পর্যন্ত বাজারে চালু রয়েছে, যেগুলি পাঠ করে কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই — কোরআনে বর্ণিত সঠিক-ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।
>
> — আমরা দেখতে পাব, কীভাবে বহু সুখ্যাতিসমপন্ন আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ পন্ডিত শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের অভাবে কোরআন -অনুবাদের বেলায় মারাত্মক ভুল করে গেছেন।"[১৫]

যে-লোক এই কথা বলতে পারে যে, কিতাবুল মোকাদ্দস ও কোরআনের সব অনুবাদক ও তাফসীরকারক ভুল করেছেন; এই কথা শুনে যে কোনো লোক বিশ্ময়ে সেই লোকের সামনে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।

---

[১৪] ডঃ বুকাইলি, বাইবেল,কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১০৬

[১৫] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২৭৬

তাহলে ডঃ বুকাইলি কীভাবে “পারাক্লিট”-এর সঠিক অনুবাদ করবেন? তিনি তা করতে পারেন না! তিনি এমন একটি অনুবাদ ব্যবহার করেছেন যেখানে গ্রীক শব্দ “পারাক্লিট” এর কোনো অনুবাদ করা হয়নি!?!

অবশ্যই এতে সমস্যা এড়ানো গেছে, কিন্তু এতে কি আপনার কোনো উপকার হয়েছে? সম্ভবতঃ হয়নি? কারণ, বেশীরভাগ লোকেরাই এই গ্রীক শব্দের অর্থ জানে না।

একজন “পারাক্লিট” হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে সাহায্যের জন্য ডাকা হয়। তাই আপনার কী ধরনের সাহায্য প্রয়োজন তার ওপর এর অর্থ নির্ভর করে। হতে পারে একজন উকিল হিসেবে পক্ষ সমর্থন করা বা সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে কাউকে দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দেওয়া। একটি অভিধানে “পারাক্লিট” শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে, (১) মধ্যস্থতাকারী, (২) উকিল (৩) কনসুলর বা সান্ত্বনাদানকারী এবং (৪) উৎসাহদাতা। এমন কোনো একক ইংরেজী, বাংলা বা আরবী শব্দ নেই যার দ্বারা এই সব কয়টি অর্থকে এক শব্দে দেখাতে পারি। সুতরাং, আমাদের এই “পারাক্লিট” শব্দের অর্থ খুঁজে বের করার জন্য আমাদের প্রসংগে ফিরে যেতে হবে!

সঠিক অনুবাদ করতে হলে অবশ্যই **প্রসংগ অনুসারে** শব্দটির অনুবাদ করতে হবে। বেশীরভাগ পুরানো অনুবাদে “সান্ত্বনাদানকারী” অনুবাদ করা হয়েছে। কারণ, প্রসংগের মধ্যে একটি শব্দ হচ্ছে ‘এতিম’ (ইউহোন্না ১৪:১৮)। একজন এতিমের কোনো বাবা বা মা নেই বলে সে একা এজন্য তার সান্ত্বনার দরকার। *NIV* বাইবেলের অনুবাদে “পারাক্লিট” এর অনুবাদ করা হয়েছে “পরামর্শদাতা” । এটি আসলেই একটি সুন্দর অনুবাদ, কারণ, এর মধ্যে ৪টি অর্থের মধ্যে ২টি অর্থ -উৎসাহদাতা ও সান্ত্বনাদাতা রয়েছে।

১ ইউহোন্না ২ আয়াতে বলা হয়েছে, “যদি কেউ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের একজন “পারাক্লিট” আছেন, তিনি ধার্মিক ঈসা মসীহ।” এখানে প্রসংগ অনুযায়ী এটি স্পষ্ট যে, আমাদের কোনো সান্ত্বনাদানকারীর দরকার নেই, আমাদের একজন মধ্যস্থতাকারী বা একজন উকিল প্রয়োজন, তাই ইংরেজী অনুবাদে “এডভোকেট বা ফরাসী ভাষায় এভোকেট আর মধ্যস্থতাকারী বা আরবী ভাষায় শাফী' (اَلْشَّفِيع) ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও নতুন নিয়মে “পারাক্লিট” শব্দটি ৫ বার ব্যবহার করা হয়েছে, এই সম্পর্কিত বিশেষ্য “পারাক্লিসিস” যার অর্থ হতে পারে, “সান্ত্বনা, ”দুঃখ-উপশম, উৎসাহদাতা এবং অনুনয়কারী এই শব্দগুলো ২৯ বার বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর **সান্ত্বনা** শব্দটি ২০ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রিয়া পদ “পারাকালেও” যার অর্থ কাওকে সাহায্যের জন্য ডাকা, সান্ত্বনা, আকাঙ্খা, উৎসাহদাতা এবং অনুনয়কারী ১০৭ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে সান্ত্বনা দেওয়া অর্থে ২৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

২ করিন্থীয় ১:৩-৪ আয়াতের সাহায্যে একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে এই শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা দেখবো।

“ধন্য আমাদের প্রভু ঈসা মসীহের আল্লাহ ও পিতা; তিনিই দয়াময় পিতা এবং সমস্ত **সান্ত্বনার (পারাক্লিসিস)** আল্লাহ; তিনি আমাদের সমস্ত কষ্টের মধ্যে আমাদিগকে **সান্ত্বনা (পারাকালেও)** দান করেন, যেন আমরা আল্লাহ্‌র দেওয়া **সান্ত্বনা (পারাকালেও)** অন্যদের কষ্টের সময়ে আমরা তাদেরকে **সান্ত্বনা (পারাক্লিসিস)** দিতে পারি। ”

এই দুটো আয়াতে দুটো শব্দ ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিবার প্রসংগ অনুযায়ী এর অর্থ “সান্ত্বনা” বা “সান্ত্বনাদানকারী”। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, “পারাক্লিট” শব্দটির অনুবাদ “সান্ত্বনাদানকারী” **সম্পূর্ণ ভুল,** ডঃ বুকাইলির এই দাবীটি অন্তসারশূন্য।

৭. ডঃ বুকাইলি কি “পারাক্লিট” সম্পর্কিত সমস্ত আয়াত প্রসংগ সহ উল্লেখ করেছেন?

এই অধ্যায়ের শুরুতে “পারাক্লিট” সম্পর্কিত আয়াত হযরত ইউহোন্না লিখিত সুখবর থেকে যেভাবে ডঃ বুকাইলি উদ্ধৃত করেছিলেন, সেভাবে দেওয়া হয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম যে, একটি বিশেষ টিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন,

“উল্লেখ করা প্রযোজন যে, কিতাবুল মোকাদ্দসের ইঞ্জিল শরীফের ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৭ অধ্যায়ের অন্য সব অনুচ্ছেদ এখানে আর তুলে ধরা হলো না। *কেননা ওই আয়াতগুলো কোনোভাবেই এই সব আয়াতের সাধারণ অর্থের কোনো পরিবর্তন করে না।*”[১৬]

অনেকের বাড়িতে **নতুন নিয়ম-ইঞ্জিল শরীফ** নেই। এই কিতাব সহজে পাওয়াও অনেক দেশে সম্ভব হয় না। সুতরাং, ডঃ বুকাইলি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন, তা আমরা বাম কলামে দিলাম। ডান দিকে আমরা ওই আয়াতটি সহ “পারাক্লিট” সম্পর্কিত আরো ৮টি আয়াত তুলে দিলাম। এগুলো কি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাকে সীমিত করেছে বা পরিবর্তন করেছে, এখন পাঠক নিজেরাই তা বিচার করে দেখতে পারবেন।

ইউহোন্না ১৪:১৫-১৬— (১৫) তোমরা যদি আমাকে ভালোবাস, তবে আমার হুকুমগুলি পালন করিও। (১৬) আর আমি পিতার কাছে চাইব এবং তিনি আরেকজন **“পারাক্লিট”** তোমাদেরকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের রূহ।	ইউহোন্না ১৪:১৫-১৮— (১৫) তোমরা যদি আমাকে ভালোবাস, তবে আমার হুকুমগুলি পালন করিও। (১৬)আর আমি পিতার কাছে চাইব এবং তিনি আরেকজন “পারাক্লিট” তোমাদেরকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; (১৭) **তিনি সত্যের রূহ; দুনিয়া** তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না; কারণ **সে তাঁকে দেখে না,**

[১৬] ডঃ বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান, ফরাসী সংস্করণ-পৃষ্ঠা ১০৯, (আমি অনুবাদ করেছি)

ইউহোন্না ১৪:২৬— কিন্তু সেই "**পারাক্লিট**", **পাক রূহ,** যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদেরকে হেদায়েত করবেন এবং আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

ইউহোন্না১৫:২৬— তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।

(লক্ষ্য করুন, ডঃ বুকাইলি এখানে "পারাক্লিট শব্দটি বাদ দিয়েছেন)

ইউহোন্না ১৬:৭-৮— (৭) তবু আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে **দেব**। (৮) আর তিনি এসে পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতা সম্বন্ধে ও বিচার সম্বন্ধে, **দুনিয়াকে** দোষী করবেন। ইউহোন্না ১৬:১৩-১৪

তাঁকে জানেও না; তোমরা তাঁকে জানো; কারণ, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে বাস করবেন। আমি তোমাদের **এতিম** রেখে যাব না, আমি তোমাদের কাছে আসছি।

ইউহোন্না ১৪:২৬— কিন্তু সেই "**পারাক্লিট**", **পাক রূহ,** যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদেরকে হেদায়েত করবেন এবং **আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।**

ইউহোন্না ১৫:২৬-২৭— যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, **সত্যের সেই রূহ,** যিনি পিতার কাছ থেকে বের হয়ে আসেন, যখন সেই "**পারাক্লিট**" আসবেন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য **দেবেন। (২৭) আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।**

ইউহোন্না ১৬:৭-১২— (৭) তবু আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই "**পারাক্লিট**" তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে **দেব। (৮) আর তিনি এসে পাপ সম্বন্ধে, ধার্মিকতা সম্বন্ধে ও বিচার সম্বন্ধে, দুনিয়াকে দোষী করবেন। (৯) পাপ সম্বন্ধে, কারণ তারা আমার ওপর ঈমান আনে না; (১০) ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ না;** (১১) বিচার সম্বন্ধে, কারণ এই দুনিয়ার অধিপতির বিচার হয়েছে। (১২) তোমাদেরকে বলার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পারবে না। ইউহোন্না ১৬:১৩-১৫

(১৩) এ ছাড়া, তিনি, **সত্যের রূহ, যখন আসবেন, তখন** তিনি হেদায়েত করে তোমাদের পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি নিজ থেকে কিছু ***বলবেন*** না, কিন্তু যাহা যাহা ***শুনেন,*** তাই ***বলবেন*** এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। (১৪) তিনি আমার গৌরব প্রকাশ করবেন—।	**(১৩) এছাড়া, তিনি, সত্যের রূহ, যখন আসবেন, তখন তিনি হেদায়েত করে তোমাদের পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন;** কারণ তিনি নিজ থেকে কিছু **বলবেন** না, কিন্তু যা যা **শুনেন,** তাই **বলবেন** এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাও তোমাদেরকে জানাবেন। (১৪) তিনি আমার গৌরব প্রকাশ করবেন; কারণ যাহা কিছু আমার কাছে শুনবেন, তাই তোমাদেরকে জানাবেন। (১৫) পিতার যা যা আছে, সবই আমার; এ'জন্য বললাম, যা আমার কাছ থেকে শুনবেন, তিনি তাই তোমাদেরকে জানাবেন।

ডঃ বুকাইলি দাবী করেছেন যে, তিনি সব গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো তুলে ধরেছেন। "পরে ''তিনি দাবী করেছেন যে, "ওই আয়াতগুলো কোনোভারেই এই সব আয়াতের সাধারণ অর্থের কোনো পরিবর্তন করে না।"

হ্যাঁ, প্রতিটি পাঠকের কাছে এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, এই **আটটি** আয়াতসমূহের অংশ বাদ দেওয়ায় "আয়াতগুলোর সাধারণ অর্থের পরিবর্তন" করা হয়েছে।

ডঃ বুকাইলি একটি সত্য তথ্য তুলে ধরে বলেছেন যে, মূল পাণ্ডুলিপির ৩০০ বছর পরে একটি অনুলিপিতে "পাক" শব্দটি না থাকলেও পরবর্তীকালে "পাক-রূহ্" শব্দটি যোগ করা হয়েছিল। এই সমস্যা উল্লেখ করে ৮০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন,

> "আমরা দেখতে পাব—ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারে পারাক্লীট সংক্রান্ত্র অনুচ্ছেদে একাধিক শব্দ জুড়ে দিয়ে গোটা অনুচ্ছেদের অর্থেরই শুধু পরিবর্তন সাধন করা হয়নি-বরং ধর্মতত্ত্বের বিচারে তার তাৎপর্যকেও আমূল বদলে দিয়েছে।"[১৭]

কিন্তু যখন আমরা ওপরে ডঃ বুকাইলির বাদ দেওয়া আয়াতগুলো পড়ি, আমরা দেখতে পাই যে, এই কথা সত্য নয়। ইউহোন্না ১৪:১৬ আয়াতের ওপরে সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে না। "পারাক্লিট"কে অন্য তিনটি আয়াতে রূহ—সত্যের রূহ্- বলা হয়েছে। ডঃ বুকাইলির বাদ দেওয়া আয়াত ১৪:১৭;১৫:২৬ এবং ১৬:১৩ ডঃ বুকাইলি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এর মানে ৪ বার "পারাক্লিট" শব্দের অর্থ রূহ্ বলা হয়েছে।

ডঃ বুকাইলি ইউহোন্না ১৪:১৬ আয়াত এভাবে উদ্ধৃত করেছেন,

> "আমি পিতার কাছে চাইব এবং তিনি আরেকজন **"পারাক্লিট"** তোমাদেরকে দেবেন।"

[১৭] ডঃ বুকাইলি, বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান পৃষ্ঠা-১১২

কিন্তু তিনি আয়াতের মাঝখানেই থেমে আয়াতের বাকী অংশ আর উল্লেখ করেননি। সম্পূর্ণ আয়াত হচ্ছে,

> “তোমরা যদি আমাকে ভালোবাস, তবে আমার হুকুমগুলি পালন করিও। আর আমি পিতার কাছে চাইব এবং তিনি আরেকজন **“পারাক্লিট”** তোমাদেরকে দেবেন, যেন **“পারাক্লিট”** চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।”

ডঃ বুকাইলির বাদদেয়া আয়াত ১৪:১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, **“দুনিয়া তাঁকে (“পারাক্লিট”) গ্রহণ করতে পারে না, কারণ, দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না, এবং তাঁকে জানেও না।”** একই আয়াতে ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের **বলেছেন, তিনি (“পারাক্লিট”) তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করবেন**।

ঈসা মসীহ্ বলছেন যে, হজরত পিতর, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউহোন্না, হজরত মথি এবং অন্যদের **সংগে সংগে** “পারাক্লিট” **থাকেন** ও হজরত পিতর, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউহোন্না, হজরত মথি এবং অন্য বিশ্বাসীদের সাথে **চিরকাল** বাস করবেন।

ডঃ বুকাইলির বাদদেয়া **১৫:২৭** আয়াতে ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবী- উম্মতদের বলেছেন, তাঁরা অবশ্যই **পারাক্লিটের** সাথে **তাঁর বিষয়ে সাক্ষী দেবেন। যিনি (“পারাক্লিট”) অবশ্যই তাঁর বিষয়ে সাক্ষী দিবেন।** ডঃ বুকাইলির বাদদেয়া আয়াত **১৬:৯ আয়াতে ঈসা মসীহ্ বলেছেন, “তিনি (“পারাক্লিট”) এসে** পাপের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন। কারণ, **লোকেরা আমার ওপর ঈমান আনে না।”**

এর সাথে আরো বলা যায় যে, এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার জন্য ডঃ বুকাইলির পাক-রূহ্ সম্পর্কে ইউহোন্না সুখবরে বর্ণিত নিম্নে উল্লেখিত আয়াতগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত ছিল। ইউহোন্না ১:৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ্ পাকরূহে তরিকাবন্দী দিবেন। ইউহোন্না ৭:৩৯ আয়াতে পাক-রূহ্ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা তাঁর (ঈসা মসীহ) ওপর ঈমান আনবে, তারা পাক-রূহকে পাবে।

ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের যা বলেছেন, এ-সম্পর্কে হজরত লূক যে-তথ্য দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা তাঁর উচিত ছিল।

> “তোমরা জেরুসালেম ছেড়ে যেও না, বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ, তাঁর জন্য অপেক্ষা করো।— ইয়াহিয়া পানিতে তরিকাবন্দী দিতেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে পাকরূহে তোমাদের তরিকাবন্দী হবে।” (প্রেরিত ১:৪-৫)

এই আয়াতগুলো দেখায় যে, “পারাক্লিট”, পাক-রূহ্, সত্যের রূহ্ যা সবাই -এই **১১**জন সাহাবী -একসাথে লাভ করবে। তাঁরা জেরুসালেমে অপেক্ষা করবে আর তারা বেঁচে থাকতেই পাক-রূহ্ লাভ করবেন। হজরত থোমা ভারতে বা হজরত পিতর রোমে যেখানেই প্রচার করবেন, সেখানে যাঁরা প্রেরিতদের প্রচার শুনবেন সেই সব নারী পুরুষের মনে এই “পারাক্লিট” পাপের সম্পর্কে চেতনা দেবেন।

“পারাক্লিট” কেবল রূহানিক সত্তা হতে পারেন।

একসাথে **১১** জন সাহাবীরা যাঁকে লাভ করতে পারেন, একসাথে সব জীবিত খ্রীষ্টানরা যাঁকে লাভ করতে পারেন, তা কেবল পাক-রূহ্ হতে পারেন। ঈসা মসীহের এই প্রতিজ্ঞা করার আগের নবী হজরত মূসা (আঃ) তিনি হতে পারেন না। যিনি এই প্রতিজ্ঞা শুনেছিলেন, সেই হজরত পিতরও হতে পারেন না। আর তিনি যে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এই কথাও সত্য হতে পারে না।

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কি হজরত পিতর এবং অন্যদের সাথে জেরুসালেমে ছিলেন? তিনি কি হজরত পিতর ও অন্যদেরকে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা কি বলতে পারি যে, যিনি এই দুনিয়ার একজন মানুষ “তাঁকে দেখা যাবে না”। অথবা একজন মানুষ হিসেবে তিনি কি তাঁদের সাথে চিরদিন বাস করবেন, যা “পারাক্লিট” সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এর স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই “না।”

এর মানে আমরা একজন সতর্ককারী হিসেবে হজরত মোহাম্মদের মর্যাদাকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখাচ্ছি না। কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ডঃ বুকাইলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রসংগ বাদ দিয়ে **“পারাক্লিট”** এর ব্যাখ্যা করেছেন। আর তাঁর মতবাদ সমর্থনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্ধৃত আয়াতগুলো বিকৃত করেছেন।

তিনি ৬টি অভিযোগ করেছেন কেন এই কিতাবুল মোকাদ্দসের এই আয়াতগুলো সঠিক নয়, সাথে সাথে একটি মিথ্যা মন্তব্য করে দাবী করেছেন যে, তিনি এই প্রসঙ্গে সকল আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। আমরা এর প্রতিটি আয়াত পরীক্ষা করে দেখেছি, তাঁর অভিযোগ ভিত্তিহীন। এইজন্য **একজন এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, তিনি এই কাজে মনোযোগী ছিলেন না। আর তিনি পন্ডিতের মতো গবেষণা করেননি। আর এই আয়াতগুলো কোনোভাবেই হজরত মোহাম্মদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেনি।**

গ. হজরত মোহাম্মদের বলা ভবিষ্যদ্বাণী

আমরা ওপরে দেখেছি যে, হজরত ইলিয়াস (আঃ) ও হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-র নবীর ওহী সফল করে তাঁরা যে নবী ছিলেন, এ বিষয়টি আল্লাহ্ প্রমাণ করেছেন। নবী হজরত ইলিয়াসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, হজরত ইলিয়াস (আঃ)-এর মোনাজাতের উত্তর আল্লাহ্ আগুন দ্বারা দিয়েছিলেন। আমরা এখন দেখবো যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন আর তাঁর নবুয়তের নিশানা হিসেবে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করেছেন।

১. কোনো কোনো তাফসীরকারী ইংগিত দিয়েছেন যে, প্রাথমিক মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা আল-কামার (চাঁদ) ৫৪:৪৫ আয়াতে বদরের যুদ্ধে জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখানে বলা হয়েছে,

> “এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করিবে।”

অথচ, যখন আমরা ৪৩-৪৮ আয়াতে এর প্রসঙ্গ পড়ি, আমরা দেখি যে, এখানে কেয়ামত বা শেষ বিচার দিনের বিষয়ে বলা হয়েছে,

> “তোমাদিগের মধ্যে কাফিরগণ কি উহাদিগের (মিসরীয়-যারা ধ্বংস হয়েছিল) অপেক্ষা শ্রেষ্ট? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোনো সম্পদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে? অথবা ইহারা কি বলে, ‘আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?
>
> **এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ট প্রদর্শণ করিবে**, অধিকন্তু কিয়ামত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর; অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্থ, যেদিন উহাগিকে ওবুড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের দিকে; সেই দিন বলা হইবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো।’

জনাব হামিদুল্লাহ বা ইউসুফ আলী কেউই এই আয়াতগুলোকে ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করেননি। অবশ্যই যদিও তা হওয়া সম্ভব ছিল, কারণ, একটি আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে।

২. ২ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আনফাল (যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী) ৮:৪৩ আয়াতে আরেকটি স্বপ্নের কথা এখানে বলা হয়েছে. আয়াতে আছে,

> “স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাকে (মুহাম্মদ) স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে তাহারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা (মুসলমানরা) সাহস হারাইতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এবং অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।”

এই আয়াতটি বদরের যুদ্ধের পরে নাজিল হয়েছিল, এখানে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের যুদ্ধের আগে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) দেখেছিলেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের বদলে এটা আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখানে দাবী করা হয়েছে যে, এই স্বপ্ন একটি বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দেখিয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ৩০০ মুসলমান সৈনিককে দেখাচ্ছেন যে, তাদের বিপক্ষে ১০০০সৈন্যের বদলে মাত্র কয়েকজন শত্রুসৈনিক রয়েছে। **এভাবে এটি দেখায় যে, আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসী সমপ্রদায়ের সাথে ছলনা করেছেন।**

ব্যক্তিগতভাবে এটি আসলেই আমার জন্য এক দুর্বোধ্য বিষয়। আমি বুঝতে পারি না, বেহেশত ও দুনিয়ার প্রতিপালক. শক্তিশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যার নাম সত্য ও পবিত্র, তিনি কি এভাবে কাজ করতে পারেন?

আমরা আল্লাহ্র এই ধরনের কাজ কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও দেখি। সূরা মরিয়ম (এক ধার্মিকা মহিলার নাম) ১৯:২৬ আয়াতে আল্লাহ্ বিবি মরিয়মকে বলেছেন যেন তিনি বলেন যে, আমি রোজা রেখেছি, আসলে সেই সময়ে তিনি খেজুর ও পানি খেয়েছেন। (ইউসুফ আলী সাধারণতঃ একজন ভালো অনুবাদক কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তিনি কথার দ্বারা রোজা রেখেছেন?!? ☺☺ সূরা সাবা (দেশ বিশেষ) ৩৪:১২-১৪ আয়াতে আল্লাহ্ জীন্নদের বোকা বানিয়ে কাজ করিয়েছেন, জীন্নরা মনে করেছে যে বাদশাহ সুলায়মান বেঁচে

আছেন, আসলে তিনি অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন, যা তারা বুঝতে পারেনি। সূরা নিসা (নারী) ৪:১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ্ মারা যাননি, তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়নি, ববং তাদের কাছে তাই মনে হয়েছিল।

এই কথাগুলো কি ঈমানদারদের মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে না? কীভাবে আপনি আপনার মনকে বুঝাবেন যে, কোরআনে আল্লাহ্‌র চরিত্রের ওপরে এই যে গুণাবলী আরোপিত হয়েছে এগুলো কি মিথ্যাচার নয়?

৩. ষষ্ঠ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আল-ফাতহ (বিজয়) ৪৮:২৭ আয়াতে আমরা আরেকটি দর্শনের কথা দেখতে পাই,

> “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় (ইন শা আল্লাহ) তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে- কেহ কেহ মস্তক মুন্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদিগের কোনো ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা জানো না— ।”

মুসলমানদের মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার আগেই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর লোকদের বলেছেন যে, তিনি একটি দর্শন দেখেছেন যে, তিনি মক্কায় হজ পালন করতে যাবেন। হুদায়বিয়া প্রান্তরে মক্কাবাসীরা তাঁকে বাঁধা দেয় আর সে বছর তারা তাঁদেরকে হজ্ব পালন করতে দেয়নি। কিন্তু এই সময়ে মুসলমান ও তাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়েছিল, এই সন্ধিপত্র অনুসারে ভবিষ্যতে মুসলমানরা হজ্ব পালন করতে পারবেন, এই কথা বলা হয়। **হাদিস** অনুসারে জানা যায় যে, এই স্বপ্নটি পূরণ না হওয়ায় এই সময়ে অনেক মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই জন্য এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে তাদের আশা পূর্ণ হবে।

এই আয়াত সম্পর্কে প্রতিটি পাঠক নিজেরা মূল্যায়ন করবেন। কারণ, আমাদের কাছে এই স্বপ্ন সম্পর্কে বিশদ বিবরণী নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে, **“যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়”** এই শব্দগুচ্ছ এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রয়েছে, যে-কথাটি আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন?

যদি “আল্লাহ্ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করিয়াছেন” আর বলেন, “তুমি প্রবেশ করবে, ” তাহলে কীভাবে “যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়” এই কথা তিনি তাঁর নবীকে বলতে পারেন? যিনি আল্লাহ, তিনি অবশ্যই তাঁর ইচ্ছার কথা জানেন। এটি হচ্ছে মূল বিষয়, যাকে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে। **আমাদের অবশ্যই এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীকে উপেক্ষা করতে হবে।**

৪. সবশেষে, আমরা এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখবো, যা পূর্ণ হয়েছিল। এটি মধ্য যুগে অবতীর্ণ মক্কী সূরা আল-রূম (রোম সাম্রাজ্য) ৩০:১-৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"—রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, নিকটবর্তি অঞ্চলে।কিন্তু উহারা উহাদিগের এই পরাজয়ের পর শ্রীঘ্রই বিজয়ী হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেইদিন বুদ্ধিমান (বিশ্বাসীরা) হর্ষোৎফুল্ল হইবে।"[১৮]

তফসীরকারকদের মতে এই আয়াত ৬১৫ বা ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে নাজিল হয়েছিল। এই সময়ে পারস্য সৈন্যরা কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ৮ বছর পরে ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই স্রোত উল্টো দিকে ঘুড়ে যায়, আর রোমীয় সৈন্যরা পারস্যে প্রবেশ করে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে এবং শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেছে, এমন নজির একেবারেই বিরল নয়। সুতরাং, এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার সম্ভাবনা ৪টির মধ্যে ১টি বা ৫টির মধ্যে ১টি। কিন্তু এটি সবার চোখের সামনেই ঘটেছিল।

হাদিসে ও মৌখিক বিবরণীতে সারা মুসলিম দুনিয়ায় অনেক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সেগুলোই পরীক্ষা করেছি, যেগুলো আমাদের কোরআনের বিভিন্ন শব্দ ও শব্দগুচ্ছ **বুঝতে** সাহায্য করে। আমরা এখন এরকম একটি সামপ্রতিক প্রচেষ্টার কথা বলবো, যেখানে কোরআনের বিভিন্ন শব্দ ও অক্ষর নিয়ে একটি গাণিতিক গবেষণার মাধ্যমে মোজেজার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

৫. কোরআনে ১৯ সংখ্যার মোজেজা?

দ্বিতীয় সাক্ষী খুঁজে বের করার এই আধুনিক **প্রচেষ্টা** হিসেবে ড. রাশেদ খলিফা পিএইচ ডি, *কম্পিউটার মেনিফেস্টেড ই্‌ন দি হোলি কোরআন* নামে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি **দুইজন সাক্ষীর** প্রয়োজনীয়তার কথা একেবারে খোলাখুলিভাবে সরাসরি স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"যুগ যুগ ধরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ অনেক নবী পাঠিয়েছেন, যাঁরা মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছেন, তাঁদেরকে কিতাব দেওয়া **হয়েছিল। এই নবীদের বিভিন্ন মোজেজার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের কাছে নিয়ত সমর্থন করা হয়েছে যে, তাঁরা নবী হিসেবে আল্লাহ্‌র কালাম প্রচার করেছেন।** এভাবে হজরত মূসা (আঃ) কে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে তাঁকে মোজেজা করার শক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর লাঠিটি সাপ হয়ে যাবে। ঈসা মসীহকে এই ধরনের মোজেজা করার শক্তি দেওয়া হয়েছিল যেন, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন, জন্মান্ধকে ভালো করতে পারবেন।"[১৯]

---

[১৮] যদি "বিশ্বাসীরা" বলতে যদি এখানে কনষ্টান্টিনোপলে খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে, তবে এটি কোরআনের বক্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, হজরত মোহাম্মদের জীবনকালে খাঁটি খ্রীষ্টানদের আস্তিত্ব ছিলো, আর এসব 'বিশ্বাসীরা' তাঁদের পাক-কিতাব পরিবর্তন করেননি।

[১৯] Monograph Page 1, পৃষ্ঠা-১, *The Computer Speaks God's Message to the World* বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। Renaissance Productions International, Tucson.

ড. খলিফা এই বিষয়ে আরো বলেছেন, এসব মোজেজা সময় ও স্থানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, সেখানে যারা উপস্থিত ছিল কেবল তারাই তা দেখেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি কোরআনের সত্যতা সমর্থনের জন্য এক ভিন্ন ধরনের মোজেজা খুঁজে পেয়েছেন। এটি আজো সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে যা আমাদের সময়ে কম্পিউটার দিয়ে দেখানো যায়। তিনি লিখেছেন,

> "হজরত মোহাম্মদের চিরস্থায়ী মোজেজার চাবিকাঠি কোরআনের একেবারে শুরুতে প্রথম আয়াতে পাওয়া যায়। পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি— বিস্‌মিল্লাহি রাহ্‌মানি রাহীম— **بسم الله الرحمن الرحيم**।
>
> যখন আমরা কোরআনের প্রথম আয়াতের বড় হাতের অক্ষরগুলো গণনা করি, তখন দেখি যে, এখানে কোরআনের এই আয়াতে ১৯টি অক্ষর আছে।[২০] এটি অবশ্যই একটি বাহ্যিকভাবে তা দেখা যায়। কিন্তু, এ'বিষয়টি আবিষ্কার করা হয়েছে যে, এই আয়াতের প্রতিটি শব্দ কোরআনে কতবার ব্যবহার করা হয়েছে, তা ১৯ দিয়ে গুণ করলে বের করা যায়। প্রথম শব্দ "ইসম" (**اسم**) পাওয়া যায় ১৯ বার, দ্বিতীয় শব্দ আল্লাহ্‌ (**الله**) ২৬৯৮ বার ব্যবহার করা হয়েছে, এটিকে ১৯ এর গুণন বলা যায় (১৯ X ১৪২); তৃতীয় শব্দ আল-রআহমআন (**الرحمن**) কোরআনে ৫৭ বার ব্যবহার করা হয়েছে (১৯ X ৩);আর সবশেষ শব্দটি আল-রআহিম (**الرحيم**) mgM কোরআনে ১১৪ (৬ X ১৯) বার ব্যবহার করা হয়েছে।[২১]

পরে ড. খলিফা দাবী করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বাণীর এই কম্পিউটার গবেষণা খুবই স্বাভাবিক তথ্যে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এতে কোনো অনুমানের, মানুষের ব্যাখ্যা অথবা অনুমান বা ধারণা ছিল না।" অন্য কথায় বলা যায় যে, আর এই গবেষণার সাথে **কোনো "প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption জড়িত ছিল না**। তিনি তাঁর লেখায় আরো অনেক সংখ্যাতাত্ত্বিক উদাহরণ দিয়েছেন।; কিন্তু সময়ের স্বল্পতায় আমরা এই একটি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করে দেখবো।

ড. খলিফা দাবী করেছেন যে, মানুষের কোনো অনুমান বা ধারণা এর সাথে জড়িত ছিল না, তাঁর এই দাবী সত্ত্বেও তাঁর কথামতো কোরআনের এই শব্দগুচ্ছের মধ্যে ১৯টি অক্ষর রয়েছে, এই কথার মধ্যেই **প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption** হয়েছে। যদি আমরা আরবী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করি তবে এভাবে লেখা হয়, "বসম আললহ আল-রহমন আল-রহইম" (বইসম **আল্লআহ, আল-রআহমান** আল-রআহিম, এর মধ্যে দেখি যে, এখানে ১৯টি অক্ষর রয়েছে। তবে, আরবী ব্যাকরণে শাদ্দা নামে একটি চিহ্ন রয়েছে। এর অর্থ যে অক্ষরের নিচে সেটি থাকবে সেখানে দ্বিত অক্ষর রয়েছে বলে ধরা হবে। "আ-ল-ল-হ" এই শব্দের দ্বিতীয় "ল" এর উপর শাদ্দা রয়েছে।

---

[২০] আরবী ভাষায় বহু স্বরবর্ণ লেখা হয় না (দেখুন পৃষ্ঠা ১২৪)। যাঁরা আরবী ভাষা জানেন না, তাদেরকাছে বিষয়টি বুঝানোর জন্য আমি লিভিত বর্ণগুলোকে ইংরেজী বড় হাতের অক্ষরে (বাংলায় যড় অক্ষরে লেখা হয়েছে) আর স্বরবর্ণ লেখা হয়েছে, ছোট অক্ষরে। সম লেখার জন্য আমরা ই লিখিত বর্ণ বিধায়,এর সাথে পদান্বয়ী অব্যয় 'বা' যোগ করার ফলে এর রূপ দাঁড়িয়েছে, এখানে লিখিত ই অদৃশ্য হয়েছে আর তা এভাবে পড়তে হবে, "বসম'।

[২১] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৩

আর এভাবে লেখা যেতে পারে (উচিত) “আ-ল-ল-ল-হ” যার অর্থ হচ্ছে এখানে ২০টি অক্ষর রয়েছে।

ড.খলিফা তাঁর লেখায় ব্যাখ্যা করেননি যে, কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই অক্ষরের দ্বিত বাদ দিয়েছেন? অথবা তিনি কীভাবে অলিখিত স্বরচিহ্ন বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

পরবর্তী সমস্যা “বি-স-ম” শব্দ নিয়ে দেখা যায়। এই শব্দটিতে আসলে দুটো শব্দ একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে।- পদান্বুযী অব্যয় “বি” (بِ) যা এই ক্ষেত্রে অনুবাদ করা হয়েছে “-এ” "এসম" (اسم) বা নাম শব্দের সাথে “নামে” ।

যখন আমরা *আরবী কনকরডেন্স* বইয়ে "এসম" (اسم) শব্দ দেখি, আব্দুল বাকি[২২] লিখিত, “*ইনডেক্স টু দি ওয়ার্ড অব দি গ্লোরিয়াস কোরআন*” এই বইটি ড. খলিফা অনুমোদন করেছেন, তখন আমরা নিম্নলিখিত তথ্য পড়ে একেবারেই অবাক হই,

“ব-স-ম” (بِسم) যে শব্দটি কোরআনের প্রথম আয়াতে রয়েছে, যা আমরা গবেষণা করবো বলে স্থির করেছি, তা ১:১, ১১:৪১ ও ২৭:৩০ আয়াতে **মাত্র তিনবার রয়েছে।**

“ই-স-ম” (اسم) সম্পর্ক বিহিন বিশেষ্য হিসেবে ১৯ বার রয়েছে।

কিন্তু আর একটি তৃতীয় তালিকা রয়েছে। “ই-স-মু-হু” (اسمه) শব্দের অর্থ হচ্ছে “তাঁর নাম”, আরবী ভাষায় **একটি শব্দ হিসেবে ৫ বার রয়েছে।**[২৩]

স্পষ্টতঃই ৩+১৯+৫=২৭, আর এটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

এখন আমাদের সামনে আর একটি **প্রাথমিক অনুমান বা basic assumption** রয়েছে, যার কোনো কারণ ড.খলিফা উল্লেখ করেননি। “বিসম” শব্দটি যে ৩বার রয়েছে, কীসের ভিত্তিতে এ বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেলেন। কারণ এই শব্দটি নিয়েই তো তিনি লিখছেন। কীসের ভিত্তিতে আলাদা করে “ইসম” (اسم) শব্দটি তিনি গণনা করলেন, তাও তিনি বলেননি? আর “ই-স-মু-হু” (اسمه) শব্দের বিশেষ্যকে এর সাথে যুক্ত সর্বনাম থেকে আলাদা করে গণনা করার কারণও তিনি বলেননি?

শব্দের অর্থের মধ্যে কি এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে? সম্ভবতঃ ড. খলিফা সেই আয়াতগুলো গণনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নিচের আয়াত দুটো পরীক্ষা করে দেখি, তবে আমরা দেখতে পাব যে, আসল কারণ সেটি ছিল না।

---

[২২] প্রকাশ করছেন, ডার এহিয়া আল-তওরাত আল-আরাবি,বৈরুত, লেবানন, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২

[২৩] আরবী ভাষায় সম্বন্ধ কারকের সর্বনামকে এভাবে সাধারনতঃ লেখা হয়। যদিও ইংরেজী ভাষায় “তারনাম” বা “তোমারনাম” এক শব্দ হিসেবে লেখার চল রয়েছে।

সূরা আল-মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:৫ আয়াতে আমরা পড়ি,

"—ইহাতে আল্লাহ্‌র নাম (ইস্‌মে আল্লাহ্) (اسم الله) লইবে—।

আর সূরা বাকারা (গাভী) ২:১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"যে কেহ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম "ই-স-মু-হু" (اسمه) স্মরণ করিতে বাঁধা প্রদান করে এবং উহাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে?"

আরবীর মতোই বাংলা অনুবাদে এই শব্দগুলোর মধ্যে "আল্লাহ্‌র নামে" এখানে মূখ্য কর্ম আর "তাঁহার নাম" বলতে এখানে তাঁকে কর্তা হিসেবে দেখানো ছাড়া মূলতঃ আর কোনো পার্থক্য নেই। এই বিষয়-সূচীর রচয়িতা নিজের খেয়ালমতো শব্দগুলোর লিখিত রূপের ভিত্তিতে এদেরকে আলাদা তালিকায় রেখেছেন।

এছাড়াও বলা যায় যে, কীসের ভিত্তিতে বিশেষ্যের বহুবচনের ১২টি রূপ বাদ দেওয়া হয়েছে?- বিশেষভাবে নিম্নের সূরাতে তা দেখা যায়, সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৮০ আয়াতে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ্‌র জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম—।"

এই বাদ দেওয়ার কারণ আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, যদি সব একবচন ও বহুবচনে ব্যবহার গণনা করা হয়, তবে শব্দের সংখ্যা হবে, ৩৯ আর তা ১৯দিয়ে বিভাজ্য নয়।

এইভাবে আল্লাহ্ শব্দ পরীক্ষা করলেও আবার বৈপরিত্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে। পদান্বুযী অব্যয় "লি" (ل) যার অর্থ 'র' তা এই শব্দে "আল্লাহ্‌র" বুঝানো হয়েছে। এটি পরবর্তী বিশেষ্যের সাথে সংক্ষিপ্ত শব্দরূপে একসাথে শাহাদা যুক্ত হয়ে "লি-লা-হ্" বা "লি-ল্-লা-হ্" (لله) শব্দ হয়। (উদাহরণ হিসেবে দেখুন সূরা বাকারা (গাভী) ২:২২) ব্যাকরণগতভাবে, এটি "বি-স-ম" এর মতো যা ওপরে আমরা আলোচনা করেছি। অবশ্য, এবার সংক্ষিপ্ত শব্দরূপের নমুনা "লি-লা-হ্" ২৬৯৮ বার ব্যবহার করা হয়েছে, যা ১৯দিয়ে বিভাজ্য। এই পদ্ধতিতে তা একেবারে যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয়েছে।

এখানে অসংগত বিষয় হচ্ছে, "বি-স-ম" এবং "লিলাহ্" শব্দ একইভাবে গণনা হয়নি। যদি "লি-লা-হ" শব্দটি গূণা হয়, তবে তা ১৯দিয়ে বিভাজ্য হয়। তারপর "বি-স-ম" শব্দটি গূণা হবে আর তা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আ-ল-র-হ্-মা-ন (الرحمن) শব্দের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা নেই। এটি ৫৭ (১৯ X ৩) বার যা লেখক ওপরে উল্লেখ করেছেন।

সবশেষে, আমরা আ-ল-রা-হি-ই-ম (الرحيم) শব্দটি দেখবো। ড. খলিফা বলেছেন যে, এটি ১১৪ বার (৬ X ১৯) বার আছে। কিন্তু আব্দুল বাকীর শব্দাবলির বর্ণনাক্রমিক সূচী অনুসারে একবোরে সঠিক নমুনায় সুনির্দিষ্ট নিদের্শক পদ সহ ৩৪ বার আছে। এটি আরো ৮১ বার সুনির্দিষ্ট নিদের্শক পদ ছাড়া মোট **১১৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে, এছাড়াও আরো একবার বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে সর্বমোট সংখ্যা দাড়াচ্ছে, ১১৬।** অবশ্যই এই কথা সত্য যে, ১১৫ বা ১১৬ কোনোটাই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

ড. খলিফার এই গবেষণা অনেক লোক তাঁদের লেখায় উদ্ধৃত করেছেন। ড. বেখির টর্কি তাঁর বইয়ে পুরো চার পৃষ্ঠারও বেশী অংশ জুড়ে এই গবেষণার সারমর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৪] যদিও কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই নিম্নলিখিত চারটি প্রাথমিক অনুমিত বিষয় বা basic assumption তৈরি করেছেন।

ড. খলিফা একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহ্ একটি ল এবং অলিখিত স্বরচিহ্ন বাদ দিয়েছেন। তিনি "বি-স-ম" থেকে তাঁর গবেষণা শব্দ "ইসম" থেকে বাদ দিয়েছেন, যদিও "আল্লাহ্" শব্দের সাথে গুণার সময়ে **"লিলাহ্"** শব্দটি যোগ করেছেন।

তিনি আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েই "ই-স-মু-হু" শব্দটি গুণেননি, যদিও ব্যাকরণের দিক থেকে তা একেবারেই "ইসম" এর মতোই সমানভাবে তুলনা করা যায়।

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে "ইসম" ও "আল-রাহিম"-এর বহুবচনের ব্যবহার বাদ দিয়েছেন।

এর সাথে বলা যায় যে, "আল-রাহিম" শব্দে অক্ষর গুণায় মনে হয় ভুল রয়েছে।

যদি তাঁর এই অনুসন্ধান, কোরআনের মোজেজা প্রমাণের পক্ষে দ্বিতীয় সাক্ষী হয়, তবে ড. খলিফার যুক্তি সবার কাছে স্পষ্ট হতে হবে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে তিনি কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা আমাদের জানাবেন। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমরা মনে করবো, ড.খলিফার এই গবেষণা তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারেনি।

সিদ্ধান্ত

মোজেজা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কোরআনে যেসব প্রমাণ রয়েছে, আমরা তা সবই পরীক্ষা করে দেখেছি। এখন প্রতিটি পাঠক তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন করবেন, আর সিদ্ধান্ত নিবেন যে, এখানে **দ্বিতীয় সাক্ষী** রয়েছে কি-না আর আপনি সেই প্রমাণে সন্তুষ্ট হয়েছেন কি-না?

পরবর্তী অধ্যায়ে তৌরাত-পুরাতন নিয়মে ঈসা আল-মসীহ্ সম্পর্কে এমন কিছু কিছু ভবিষৎদ্বাণী পরীক্ষা করে যেগুলো মসীহের কাজের স্বপক্ষে আল্লাহ্ **দ্বিতীয় সাক্ষী** হিসেবে সেগুলো পূর্ণ করেছেন কি-না তা আমরা দেখবো।

[২৪] টর্কি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা,৯২-৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈসা মসীহের নবুয়ত ও মসীহ্ হিসেবে তাঁর কাজ

এখন আমাদের অবশ্যই নাসরতীয় ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে নিজেদেরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা দরকার যে, কীভাবে প্যালেষ্টাইনের প্রথম শতাব্দীর লোকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি একজন নবী? আল্লাহ্ কি দ্বিতীয় সাক্ষী হয়েছিলেন? তিনি কি ঈসা মসীহের মাধ্যমে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছিলেন? অথবা তিনি কি মোজেজা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন? অথবা ঈসা মসীহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করার পরে তিনি তা পূর্ণ করেছিলেন?

পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া

যেহেতু অনেক লোক ড. খলিফার গাণিতিক গবেষণাকে অনুমোদন করে, তাই আমরা পুরাতন নিয়ম থেকে "মসীহ" সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এমন কিছু কিছু আয়াত আমরা গাণিতীকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবো।

প্রথমে আমরা কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা পরীক্ষা করে দেখবো। পরে, কেবল একজন লোকের মধ্য দিয়ে এতগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আমরা হিসাব করবো।

এই ধরণের হিসাবের নমুনা হিসেবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আপনার প্রতিটি আলাদা রংয়ের ১০টি শার্ট আছে- আর এই রংগুলো আমি জানি, আর আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে বললাম যে, "আগামী কাল তিনি লাল রংয়ের সার্টটি পড়বেন।"

যেখানে আমরা সব সময়ে মিলিত হই, সেই রেষ্টুরেন্টে আপনি পরদিন যখন এলেন,, দেখা গেল যে, আপনি লাল সার্টটাই পড়ে এসেছেন। তাই আমি সবাইকে বললাম, "দেখো! আমি একজন নবী!"

কিন্তু আপনি এই কথা বলতে পারেন, "আহ! কিন্তু এটি কেবল আপনি সৌভাগ্যক্রমে বলেছেন। ১০টির মধ্যে একটি সঠিক রং সৌভাগ্যক্রমে বলতে পেরেছেন।

এখন ধরুন আপনার ৫টি টুপি রয়েছে। প্রতিটি দেখতে একেবারেই আলাদা। আর তিন জোড়া জুতা আছে; একজোড়া সাদা, একজোড়া কালো আরেক জোড়া চটি জুতো রয়েছে। সুতরাং, আমার দশটি সার্টের মধ্যে ১টি সঠিক সার্টের কথা বলার সম্ভাবনা দশভাগের এক ভাগ। আপনার টুপির মধ্য থেকে ১টি সঠিক টুপির কথা বলার সম্ভাবনা পাঁচভাগের এক ভাগ, আর জুতোর জন্য সঠিকভাবে বলার সম্ভাবনা তিনভাগের একভাগ। আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে তিনটি জিনিস

সঠিকভাবে বলার সম্ভাবনা ১/১০ X ১/৫ X ১/৩। এর সর্বমোট যোগফল হচ্ছে ১/১৫০ অর্থাৎ ১৫০বারের মধ্যে ১বার সঠিকভাবে বলা সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন আমরা নিম্নে দেওয়া ১২টি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ১০টি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ওপর এই গাণিতীক সূত্র কীভাবে কাজ করে তা আমরা দেখবো। আমরা প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি -অলৌকিক জন্মের কথা এখানে ধরিনি, কারণ এটি একেবারেই অনন্য, একক উদাহরণ, এর সাথে আর কোনোটির মিল নেই। আর আমরা শেষেরটিও বাদ দিয়েছি। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে মৃত্যু থেকে ঈসা মসীহের জীবিত হওয়ার বিষয়টি রয়েছে। কারণ, আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অন্যান্য প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা হিসাব করেছি, তারপর নবীদের বলা ভবিষ্যদ্বাণী দৈবক্রমে ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু তাও বের করেছি, অন্য কথায় বলা যায় নাসরতীয় ঈসা ইবনে মরিয়মের একা সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার সম্ভাবনা কতটুকু ছিল তা নির্ণয় করেছি। এর কারণ হচ্ছে, যদি আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ক্ষেত্রে দৈবক্রমে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা গণনা করি, তবে এই চিহ্ন বা নিশানাগুলো আমাদের কাছে প্রমাণ করে ও সাক্ষ্য দেয় যে, **আমাদের হাতে এখন যে ইঞ্জিল শরীফ আছে তা সত্য;** আর অনাদি অনন্ত আল্লাহ, ইয়াওয়েহ এলোহিম আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য ঈসা মসীহকে নাজাতদাতা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা

১. **ওহী.** একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হয়ে এমন একজন বিশেষ পুত্র প্রসব করবে, তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকা হবে। ইম্মানুয়েল শব্দের অর্থ হচ্ছে, “আমাদের সাথে আল্লাহ।”

> “এ’জন্য, প্রভু নিজেই তোমাদেরকে একটি নিশানা দেবেন; দেখো, এক কুমারী গর্ভবতী হয়ে পুত্র **প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে**।” (ইশাইয়া ৭:১৪ — *এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করা হয়েছিল)*

২. **ওহি.** মসীহ্ অবশ্যই বাদশাহ হজরত দাউদের বংশধর হবেন।

> “মাবুদ বলেন, দেখো, এমন সময় **আসছে, যে সময়ে আমি দাউদের বংশে একটি ধার্মিক** শাখা **উৎপন্ন করবো**; তিনি বাদশাহ্ হয়ে বাদশাহী করবেন, বুদ্ধিপূর্বক চলবেন এবং দেশে ইনসাফ করবেন, বুদ্ধিপূর্বক নেক কাজ করবেন। তাঁর সময়ে ইহুদা নাজাত পাবে ও ইসরাইল নির্ভয়ে বাস করবে,
>
> আর **তিনি এই নামে পরিচিত হবেন, মাবুদ আমাদের ধার্মিকতা।**” (ইয়ারমিয়া ২৩:৫-৬— *এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করা হয়েছিল)*

ওহি ১ ও ২ এর পূর্ণতা

“পরে ষষ্ঠ মাসে আল্লাহ গালীল দেশের নাসরত শহরে এক কুমারীর কাছে জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠালেন, দাউদের বংশের ইউসূফ নামে একজন লোকের সাথে তাঁর কাবিন হয়েছিল; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম।

ফেরেশতা ঘরের ভিতরে তাঁর কাছে এসে বললেন, ‘মরিয়ম, ভয় করো না, —- তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ঈসা রাখবে। সে মহান হবে, আর তাঁকে সর্বশক্তিমানের পুত্র বলা যাবে; আর মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন; —তাঁর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না।’ তখন মরিয়ম ফেরেশতাকে বললেন,’ তা কেমন করে হবে? আমার তো পুরুষের সাথে সম্পর্ক হয়নি।” ফেরেশতা তাঁকে বললেন, “পাক-রূহ্ তোমার ওপরে আসবেন এবং সর্বশক্তিমানের কুদরত তোমার ওপরে ছায়া করবে; এ’জন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মিবে, ‘তাঁকে ইবনুল্লাহ বলা যাবে।’ — তখন মরিয়ম বললেন, ‘দেখুন, আমি প্রভুর বাঁদী; আপনার কথামতোই আমার ওপর সমস্ত কিছু হোক।’ পরে ফেরেশতা তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন। (লূক ১:২৬-২৭, ৩০-৩৫, ৩৮)

আমরা অবশ্যই এখানে এই প্রশ্ন করবোঃ শতকরা কয়জন ইহুদী বাদশাহ হজরত দাউদের বংশধর ছিলেন? আসলে বাদশাহ দাউদের বংশধর ইহুদা গোত্রের ১০০ পরিবারের মধ্যে ১ পরিবার ছিল। কিন্তু অবশ্যই যখন তাঁর পরিবার রাজকীয় পরিবারে পরিণত হয়, রাজপুত্র ও রাজকন্যারা রাজনৈতিক কারণে অন্যান্য ১১টি গোত্রের ছেলেমেয়েদের বিয়ে করে। আর প্রতিটি লোকই মনে করত যে, রাজার সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং, আমরা ধরে নিতে পারি যে, ২০০ পরিবারের মধ্যে ১টি বা ২০ X ১০২ পরিবার বাদশাহ হজরত দাউদের পরিবারের সাথে আত্মীয় ছিল।

৩. ওহি, বেথেলহামে একজন চিরস্থায়ী বাদশাহ জন্ম নিবেন।

“আর তুমি, হে **বেথেলেহেম-ইফ্রাথা!** তুমি ইহূদার হাজার হাজার গ্রামগুলির মধ্যে ছোট বলে হিসেবের বাইরে, তবু তোমার মধ্য থেকে ইসরায়েলের শাসনকর্তা হবার জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক লোক পয়দা হবে; তার শুরু পূর্ববর্তীকাল থেকে, অনাদিকাল থেকে। (মিকাহ্ ৫:২— *এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করা হয়েছিল)*

পূর্ণতা

যদিও হজরত ইউসুফ ও বিবি মরিয়ম প্যালেষ্টাইনের উত্তরে নাসরত গ্রামে বাস করতেন, কিন্তু সম্রাট অগাষ্টাসের হুকুম অনুসারে আদম-শুমারীর জন্য নাম লেখাতে হজরত ইউসুফকে তাঁর নিজের শহর বেথেলহামে ফিরে যেতে হয়েছিল।

সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন। ... নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল।

ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্ দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে। তাই ইউসুফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে ইউসুফের

বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে গেল। সেখানে তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম হল, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ হোটেলে তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না। (লূক ২:১,৩-৭)

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে, মসীহ্ বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করবেন। সুতরাং, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়া জুড়ে কতজন লোকের মধ্যে একজনের ছেলে বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেছিল?

সবচেয়ে ভালো উত্তর হচ্ছে, এই ধারণা করা যে, মিখা নবীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীর গড় জনসংখ্যা ২০০ কোটি আর বেথেলহামের জনসংখ্যার গড় হচ্ছে ৭০০০। সুতরাং, ২, ০০০, ০০০, ০০০ /৭০০০= ২৮০, ০০০ হাজার বা ২ X ১০ ^{৫} লোকের মধ্যে বেথেলহামে ১ জন লোকের জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা ছিল।

৪.ওহী. একজন দূত মসীহের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করবে?

“দেখো, আমি আমার নবীকে পাঠাবো, সে আমার আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করবে; এবং তোমরা যে প্রভুকে খুঁজছো, তিনি হঠাৎ তাঁর বায়তুল মোকাদ্দসে আসবেন; চুক্তির সেই দূত, যাঁকে তোমরা চাচ্ছ, দেখো, তিনি আসছেন, একথা আসমানী ফৌজের মাবুদ বলেন। (মালাখী ৩:১— *৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)*

“একজনের কণ্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, ‘তোমরা মরুভূমিতে মাবুদের রাস্তা প্রস্তুত করো, মরুভূমিতে আমাদের আল্লাহ্‌র জন্য রাজপথ সোজা করো।’” (ইশাইয়া ৪০:৩— *এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করা হয়েছিল)*

পূর্ণতা

“আর ইয়াহিয়ার (ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া) সাক্ষ্য এই, যখন ইহুদীরা কয়েকজন ঈমাম ও লেবীয়কে জেরুসালেম থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন, ”আপনি কে?”

তখন তিনি স্বীকার করলেন—’ আমি সেই মসীহ্ নই।

“তখন তাঁরা বললো, ‘আপনি কে?’

তিনি বললেন, আমি মরূভূমিতে একজনের আওয়াজ, যে ঘোষণা করছে, তোমরা মাবুদের রাস্তা সোজা করো, যেমন ইশাইয়া নবীর কিতাবে লেখা আছে,

“পরদিন ইহাহিয়া ঈসাকে নিজের কাছে আসতে দেখলেন, আর বললেন, ‘ওই দেখো, আল্লাহ্‌র মেষ, যিনি দুনিয়ার পাপের বোঝা নিয়ে যান!’ উনি সেই লোক, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ‘আমার পরে এমন একজন লোক আসছেন, যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগেই ছিলেন।’” (ইউহোন্না ১:১৯-২০, ২২-২৩, ২৯-৩০)

এই কথাটি কোরআনেও বলা হয়েছে। ২-৩ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আলি ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৩৯, ৪৫ আয়াতে হজরত ইয়াহিয়া নবীর আসার কারণ বলা হয়েছে,

"সে হইবে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক (مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اَللَّهِ) "তার নাম মসীহ-মরিয়ম তনয় ঈসা।"

এভাবে কোরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, হজরত ইয়াহিয়া নবী এসে ঈসা মসীহের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করবেন আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উভয় দিকই তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, বেথেলহামে জন্ম নেয়া লোকদের মধ্যে কতজন লোকের জন্ম নেয়ার আগে এই রকম একজন দূত এসে তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করেছেন? কিন্তু যেহেতু এখানে বেথেলহামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তাই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সারা দুনিয়ার লোকের জন্য করা যেতে পারে। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী কতজন লোকের মধ্যে একজনের জন্য দূত এসে তাঁর পথ প্রস্তুত করেছিল?

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাহাই ধর্মাবলম্বীরা বলেন যে, বাব নামে একজন লোক এসে বাহাউল্লাহর জন্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মনে হতে পারে এই সংখ্যা খুবই কম, তবু ধারণা করা যায় যে, ১০০০ জন নেতার মধ্যে ১ জনের নেতার এরকম অগ্রদূত ছিল। সুতরাং, আমরা ১ x ১০৩ লোকের মধ্যে ১জন লোক ধরবো।

৫.ওহী . মসীহ্‌ অনেক চিহ্ন ও মোজেজা করবেন।

"চপলমনাদের বলো, 'সাহস করো, ভয় করো না; দেখো, তোমাদের আল্লাহ প্রতিশোধসহ, আল্লাহ্‌র প্রতীকারসহ আসছেন, তিনিই এসে তোমাদেরকে নাজাত দেবেন।' সেই সময়ে **অন্ধদের চোখ খুলে যাবে**, আর কালাদের কান মুক্ত হবে। সেই সময়ে **খোঁড়া হরিণের মতো লাফ দেবে** ও বোবাদের মুখ আনন্দধ্বনি করবে; — (ইশাইয়া ৩৫:৪-৬ক) কারণ মরুভূমিতে পানি বাহির হবে ও মরুভূমির নানা স্থানে স্রোত বইবে।" (ইশাইয়া ৩৫:৪-৬ক— *৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)*

পূর্ণতা

ইঞ্জিল শরীফ বলে যে, (কোরআনেও বলা হয়েছে) ঈসা মসীহ্‌ অনেক মোজেজা করেছেন। কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র ৪জন নবী, হজরত মূসা, হজরত ইলিয়াস, হজরত ইলিশায় ও ঈসা মসীহ্‌ বেশী মোজেজা করেছেন। অন্য নবীরা সবাই মিলে যতগুলো মোজেজা করেছেন, ঈসা মসীহ্‌ একাই তার চেয়েও বেশী মোজেজা করেছেন। আর তিনি নবীদের ভবিষৎদ্বাণী অনুসারে ৪ ধরনের মোজেজাই কেবল তিনি করেননি। পরিশিষ্ট ক তে **আপনি ৩৭টি মোজেজার তালিকা দেখতে পাবেন। এগুলো ৪টি সুখবর কিতাবে বিশদভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।** এর সাথে আরো বলা যায় যে, তিনি কখনও কখনও "যারা তাঁর কাছে এসেছে, তাদের সবাইকে সুস্থ করেছেন।" যদি সবগুলো মোজেজা ধরা হয়, তবে দেখা যায় যে, তিনি ১০০০ এরও বেশী মোজেজা করেছেন।

সুতরাং, একজন বলতে পারেন সকল মানুষের মধ্যে ঈসা মসীহই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করেছেন। তবে, যেহেতু অনেক মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, ১২৪০০০ নবী

রয়েছেন, আমরা এই সংখ্যাকে ব্যবহার করে বলতে পারি যে, ১২৪০০০ বা $১.২৪ X ১০^{৫}$ লোকের মধ্যে ঈসা মসীহ্ই হচ্ছেন সেই একমাত্র লোক।

৬. ওহী. এই সব চিহ্নকাজ করা সত্ত্বেও তাঁর ভাইয়েরা তাঁর বিপক্ষ হবে

> **"আমি হয়েছি আমার ভাইদের কাছে বিদেশী, আমার সহোদরদের কাছে অন্য জাতির লোক"** (জবুর শরীফ ৬৯:৮ — *এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করা হয়েছিল)*

পূর্ণতা

> "এইজন্য ঈসার ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, "এই জায়গা ছেড়ে এহুদিয়াতে চলে যাও...তুমি যখন এই সব কাজ করছ তখন লোকদের সামনে নিজেকে দেখাও।" **আসলে ঈসার ভাইয়েরাও তাঁর উপর ঈমান আনেন নি।**" (ইউহোন্না ৭:৩ক, ৪-৫)

আমাদের প্রশ্ন এখানে এভাবে করা যেতে পারেঃ কতজন লোকের মধ্যে একজন শাসক দেখেন যে, তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁর বিপক্ষতা করছে?

অবশ্যই, দু-ভাবে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে? অতীতে অনেক রাজারা তাঁদের ভাই ও আত্মীয়-পরিজনদের ক্ষমতার ভাগী করেছেন। অন্য দিকটি হচ্ছে, অনেক রাজা তাঁদের নিকট-আত্মীয়দের ক্ষমতার বলয় থেকে সরিয়েও দিয়েছেন। সুতরাং, আমরা এই সংখ্যাকে এভাবে তুলে ধরছি, ৫জনের মধ্যে ১জন বা $২ X ১০^{১}$

৭.ওহী . সেই মসীহ্-রাজা গাধার পিঠে চড়ে আসবেন

> "হে সিয়োন-কন্যা ! খুব আনন্দ করো; হে জেরুসালেম-কন্যা, জয়ধ্বনি করো। দেখো, **তোমার বাদশাহ্ তোমার কাছে আসছেন**; তিনি ন্যায়বান ও তাঁর কাছে নাজাত আছে, তিনি নম্র ও **গাধার ওপরে বসা**, গর্দভীর বাচ্চায় বসা।" (জাকারিয়া ৯:৯ — *এই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রায় ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করা হয়েছিল)*

পূর্ণতা

> পরদিন ঈদে আগত অনেক লোক, ঈসা জেরুসালেমে আসছেন শুনে, খেজুর-পাতা নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে বের হলো; আর জোরে জোরে বলতে লাগলো, হোশান্না; তিনি ধন্য, যিনি মাবুদের নামে আসছেন!
>
> **যিনি ইসরায়েলের বাদশাহ্!"**
>
> **তখন ঈসা একটি গাধার শাবক পেয়ে ওর ওপরে বসলেন— ।"**
>
> **টিকাঃ** স্পষ্টতঃই এখানে দেখা যায় যে, ঈসা মসীহ্ নিজেই এখানে গাধার পিঠে চড়েছেন। কিন্তু জনতা যখন তাঁকে রাজা হিসেবে উল্লেখ করে ও তাঁর প্রশংসা করে ওই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করেছিল।

আমাদের প্রশ্ন এখানে এভাবে করা যেতে পারে, কয়জন লোকের মধ্যে একজন লোক রাজা হিসেবে গাধার পিঠে জেরুসালেমে চড়ে প্রবেশ করেছেন?

আমরা কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে জানি যে, বাদশাহ দাউদের ইন্তেকালের আগে সোলায়মানকে একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে জেরুসালেমে এসেছিলেন (১ বাদশাহনামা ১:৩৩) কিন্তু এর পরে সব রাজারা মনে হয় ঘোড়া বা রথে চড়ে প্রবেশ করেছেন। আজকের দিনে এটি সম্ভব যে, একজন রাজা মাসির্ডিস গাড়ী চড়ে আসবেন। আমরা এই হিসাব করতে পারি যে, গাধার পিঠে চড়ে একজন রাজা আসার সম্ভাবনা ১০০ জন বা ১ X ১০^{২}।

৮. ওহী, রাজা ও শাসনকর্তারা একসাথে মসীহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন।

> "জাতিরা কেন কলহ করে? লোকেরা কেন বাজে বিষয় চিন্তা করে? দুনিয়ার **রাজারা দাঁড়ায়, শাসনকর্তারা** একসঙ্গে পরামর্শ করে, **মাবুদের বিরুদ্ধে এবং তাঁর মনোনীত লোকের বিরুদ্ধে**।" (জবুর শরীফ ২:১-২)

পূর্ণতা

> **রাজা**— "পরে যখন তিনি জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের এলাকার লোক, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, — **আর হেরোদ ও তাঁর সেনারা তাঁকে তুচ্ছ করলেন ও ঠাট্টা-তামাশা করলেন** এবং —তাঁকে **পিলাতের (সিজারের গভর্নর)** কাছে ফেরত পাঠালেন" (লূক ২৩:৭ক, ১১)।

> **শাসনকর্তা**— "এজন্য, **প্রধান ঈমামেরা ও ফরিশীরা** সভা ডেকে বলতে লাগলো, আমরা এখন কী করি? এই লোকটা তো অনেক নিশানা কাজ করছে। —এজন্য, সেদিন থেকে তারা **তাঁকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলো**" (ইউহোন্না ১১:৪৭, ৫৩)

এই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে প্রশ্ন করতে পারিঃ মৃত্যু থেকে কাউকে জীবিত করার পরে কয়জন মোজেজাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল? খুবই সীমিত লোকদের জন্য এই ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে (কিতাবুল মোকাদ্দসে মাত্র তিনবার এই ঘটনার কথা উল্লেখ আছে)। সুতরাং, আমরা প্রশ্নটি এভাবে ঘুড়িয়ে বলতে পারি যে, "ভালো কাজ করার পরে কয়জন লোকের বিরুদ্ধে গোটা সরকার বিপক্ষতা করেছে?"

এটি প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। যেহেতু, একজন লোকের কাছে যা ভালো, তা অন্য লোকের কাছে খারাপ মনে হতে পারে। সুতরাং, আমরা ৫জন লোকের জন্য এই সম্ভাবনা ১ জন ধরে অর্থাৎ ২ X ১০^{১} হিসাব করবো।

৯. ওহী. মসীহকে ক্রুশে দেওয়া হবে।

> "—মন্দলোকেরা আমাকে ঘেরাও করেছে; **তারা আমার হাত পা বিদ্ধ করেছে**। *(১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে* জবুর শরীফের ২২:১৬ *আয়াতটি হজরত দাউদ লিখেছিলেন)*

পূর্ণতা

> "পরে মাথার খুলি নামক জায়গায় গিয়ে তারা সেখানে **ঈসাকে** এবং সেই দুইজন ডাকাতকে **সলিবে দিল,** একজনকে তাঁর ডান পাশে ও আরেকজনকে বাম পাশে দিল" (লূক ২৩:৩৩)।

ইহুদীরা আজও মসীহের আগমনের অপেক্ষায় আছে। তিনি আজ অথবা ভবিষ্যতে যে কোনো সময়ে আসতে পারেন বলে তারা বিশ্বাস করে। সুতরাং, আমাদের প্রশ্ন হচ্ছেঃ হজরত দাউদের পর থেকে কতজন লোকের মধ্যে একজন লোককে ক্রুশে হত্যা করা হয়েছিল?

যুগ যুগ ধরে কতভাবেই না লোকদের প্রাণদন্ড কার্যকরী করা হয়েছে।- তলোয়ার দিয়ে, গিলোটিনের সাহায্যে, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে ইত্যাদি। কিন্তু ইহুদীরা পাথর ছুঁড়ে লোকদের হত্যা করতো। **তারা কাউকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করতো না।** সুতরাং, হজরত দাউদের লেখা এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দ্বারা আরও সুনির্দিষ্টভাবে একজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এটি কম করে হিসেব করা হলেও শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে ক্রুশে মারা হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা হবে ১০০০০ জনের মধ্যে একজন বা ১ 1X ১০⁴।

১০. ওহী, লোকেরা তাঁর পোষাক ভাগ করবে ও সেলাই বিহিন লম্বা ঢিলা পোষাকের জন্য লটারি করবে।

> "তারা নিজেদের মধ্যে আমার পোষাক বিভাগ করে, আমার পোষাকের জন্য ভাগ্য পরীক্ষা করে।" (জবুর শরীফ ২২:১৮)

পূর্ণতা

> "ঈসাকে সলিবে দেওয়ার পরে সৈন্যরা **তাঁর পোষাকগুলো নিয়ে চার ভাগ করে প্রত্যেক সৈন্যকে এক ভাগ দিল** এবং কুর্তাটিও নিলো; ঐ কুর্তায় সেলাই ছিল না, ওপর থেকে সমস্তই বোনা ছিল। তখন তারা একজন অন্যজনকে বললো, 'এটা ছিঁড়ব না, এসো, আমরা ভাগ্য-পরীক্ষা করে দেখি, এটা কার হবে?'" (ইউহোন্না ১৯:২৩-২৪)

সম্ভবতঃ ওই যুগের নিয়ম ছিল, যাকে ক্রুশে দেওয়া হতো, সৈন্যরা তার পোষাক নিজেরাই ভাগ করে নিত। কিন্তু ক্রুশেবিদ্ধ লোকের সেলাইবিহীন কাপড় থাকবে আর তারা সেই পোষাকের জন্য লটারি করবে এই সম্ভাবনা একেবারেই কম ছিল। আমরা এই সম্ভাবনা ধরতে পারি ১০০ জনের মধ্যে ১ জন বা ১ X ১০²

১১. ওহী. যদিও তিনি পাপ করেননি, তাঁকে পাপীদের সাথে গণনা করা হবে, আর মৃত্যুতে তিনি ধনীর সংগী হবেন।

> **"আর লোকে দুষ্টদের সাথে তাঁর কবর ঠিক করলো এবং মৃত্যুতে তিনি ধনীর সঙ্গী হ'লেন,** যদিও তিনি জুলুম করেননি, আর তাঁর মুখে ছলনার কথা ছিল না। — তিনি পাপীদের সাথে গণ্য হলেন; (ইশাইয়া ৫৩:৯-১২খ)

পূর্ণতা

> "আর তারা তাঁর সাথে দুইজন ডাকাতকে সলিবে দিল।" (মার্ক ১৫:২৭)

> "পরে ঈসা আবার জোরে চিৎকার করে নিজ রূহকে সমর্পণ করলেন। (মথি ২৭:৫০)

"পরে সন্ধ্যা হলে অরিমাথিয়ার একজন ধনী লোক এলেন, তাঁর নাম ইউসুফ, তিনি নিজেও ঈসার উম্মত হয়েছিলেন। তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে ঈসার লাশ চাইলেন। —তাতে ইউসুফ লাশটি নিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে জড়ালেন এবং নিজের নতুন কবরে রাখলেন—।" (মথি ২৭:৫৭-৬০)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুটো অংশ রয়েছে। তাই আমরা প্রথম প্রশ্ন করতে পারিঃ কয়জন নির্দোষ লোকের মধ্যে ১ জনকে বিনাদোষে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়? আশা করি যে, এর উত্তর হচ্ছে, খুব কম লোকেরই এরকম প্রাণদণ্ড দেওয়ার নজির রয়েছে। হতে পারে ১০ জনের লোকের মধ্যে ১ জন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কয়জন ধনী লোকের মধ্যে একজন ধনী লোককে এভাবে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। অথবা, "মৃত্যুতে তিনি ধনীর সঙ্গী হয়েছিলেন"? যেহেতু ধনীদের চুরি করা বা বিদ্রোহে প্ররোচিত করার কারণ একেবারেই কম বলা যায়, আর তাদের বন্ধুরা এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে পারে আর উকিলদের টাকা-পয়সা দিতে পারে আমরা এই সংখ্যাকে ১০০ জনের মধ্যে ১ জন ধরতে পারি। ১০ জনের একজনকে ১০০ জনের মধ্যে ১জন দিয়ে গুণ করে আমরা ১০০০ জনের মধ্যে ১জন বা ১ X ১০৩ পাই।

১২.ওহী, মৃত্যুর পরে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।

"তিনি জুলুম ও বিচার দ্বারা অপমানীত হলেন;— তাঁর প্রাণ যখন অপরাধের কোরবানী হাসিল করবে, **তখন তিনি তাঁর বংশ দেখবেন, দীর্ঘায়ু হবেন—** ।" (ইশাইয়া ৫৩:৮খ, ১০)

পূর্ণতা (ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা যাবার পরে রবিবার দিন তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেন)

"—তখন ঈসা নিজে তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ও তাঁহাদেরকে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার হাত ও আমার পা দেখো, এ আমি, আমাকে ছুঁয়ে দেখো, আর দেখো, কারণ আমাকে যেমন দেখছো, আত্মার এইরূপ হাড়-মাংস নেই। — তখন তাঁরা তাঁকে একটি ভাজামাছ দিলেন। তিনি ওটা নিয়ে তাঁদের সামনে খেলেন।" (লূক ২৪:৩৬, ৩৯, ৪২-৪৩)

(আমি ওপরে বলেছি যে, ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া- এই ভবিষ্যদ্বাণীর হিসাব এখানে আমরা ধরবো না; কারণ, আমরা এই বিষয়টি প্রমাণ করবো।)

গণনা

যদি ওপরের হিসাব নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা হয়, তবে একটি প্রশ্ন এখানে করা যেতে পারেঃ সারা দুনিয়া জুড়ে কয়জন লোকের মধ্যে একজন লোক এই দশটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে পারেন? আমাদের সমস্ত হিসেব গুণ করে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ২ X ১০^{২} ; X

২.৮ X $১০^{৫}$; X $১০^{৩}$; X ১.২৪ X $১০^{৫}$; X ২ X $১০^{১}$; $১০^{২}$; ২ X $১০^{১}$; X $১০^{৪}$; X $১০^{১}$; X $১০^{৩}$ জন লোকের মধ্যে ১ জন। এর অর্থ ২.৭৮ X $১০^{২৮}$ এখানে ২৮ অর্থ এই যে, আমাদের ২.৭৮ এর পরে ২৮টি শূন্য রয়েছে। আমরা একে সংক্ষিপ্তাকারে বলতে পারি ১ X $১০^{২৮}$। আমরা এই সংখ্যাকে লিখিতভাবে বলতে পারি, প্রতি ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ জনের মধ্যে একজন এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করতে পারেন।

এই সংখ্যাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর যে, কয়জন লোকের মধ্যে একজন লোক কেবল সৌভাগ্যক্রমে এই দশটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে পারেন? আমরা আসলেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছি। এই ভবিষ্যদ্বাণী বলার পর থেকে আজ পর্যন্ত কয়জন লোক এই দশটি ভবিষ্যদ্বাণী সৌভাগ্যক্রমে পূর্ণ করেছেন?

এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পর থেকে আজ পর্যন্ত কয়জন লোক বেঁচে আছেন, সেই সংখ্যা দিয়ে $১০^{২৮}$ কে ভাগ করে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। সবচেয়ে ভালো তথ্য অনুসারে আমরা এই সংখ্যাকে ধরে নিতে পারি ৮৮০০ কোটি বা ৮.৮ X $১০^{১০}$।

যাকে সহজে ৮.৮ X ১০১০ বা সহজ করে ১ X $১০^{১১}$ বলা যায়। এই দুটো সংখ্যাকে ভাগ করে, আমরা দেখি যে, আজ পর্যন্ত যতজন লোক বেঁচে আছে, তাদের সবার মধ্যে-$১০^{১৭}$ মধ্যে একজন লোকের এই ৮টি ওহী সৌভাগ্যক্রমে পূর্ণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখন আমরা এই সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা হিসাব করে দেখবো। ধরুন, আমরা $১০^{১৭}$ টি ফরাসী ৫ ফ্রাংকের খুচরা পয়সা নিয়ে ফ্রান্স, হলান্ড, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যান্ড মিলে ৭০২, ০০০ বর্গ কিলোমিটার (২৭১০০০ বর্গমাইল) জুড়ে বিছিয়ে দিন। এটি এই গোটা এলাকা জুড়ে ১ মিটার উঁচু হয়ে বিছানো থাকবে। এখন একটি ৫ ফ্রাংক মুদ্রাকে তেজস্ক্রিয় চিহ্ন দিলাম। তারপর গোটা এলাকা জুড়ে তা ছড়িয়ে দিলাম। তারপর আমরা একজন লোককে বললাম, "আপনার ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে গিয়ে সেই ৫ ফ্রাংক মুদ্রাটি খুঁজে বের করে বলুন, এটি সেই নির্দিষ্ট মুদ্রা।

সেই মুদ্রাটি কোথায় পাওয়া যাবে?

এই সমস্যাটির কথা ভাবুন! কোথা থেকে তিনি এই মুদ্রাটি খুঁজা শুরু করবেন? হতে পারে ফ্রান্সের দক্ষিণের এলাকা মার্সিলি থেকে তিনি খুঁজা শুরু করবেন। হতে পারে ডেনমার্কের উত্তর উপদ্বীপ থেকে শুরু করবেন অথবা মণ্ট ব্লেংক-এর চূড়া থেকে শুরু করবেন। এই সঠিক মুদ্রাটি সৌভাগ্যক্রমে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু রয়েছে? একইভাবে বলা যায় যে, যদি নবীরা তাঁদের জ্ঞান থেকেও এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো লিখে থাকেন, তবু নবীরা এই দশটি ভবিষ্যদ্বাণী লেখার পর থেকে একজন লোকের পক্ষে সৌভাগ্যক্রমে তা পূর্ণ করার সম্ভাবনা ততটুকুই রয়েছে।

সিদ্ধান্ত

এর অর্থ এই যে, কেবল একজন লোকের মধ্য দিয়ে এই দশটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় নবীরা যে ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছিলেন তা ১ X ১০১৭ লোকের মধ্যে মাত্র একজন লোকের সৌভাগ্যক্রমে তা পূর্ণ করার সম্ভাবনা ছিল। এছাড়াও বলা যায় যে, এখানে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়নি। কুমারী মেয়ের গর্ভে ঈসা মসীহের জন্মলাভের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমরা এখানে বলিনি। এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পরে ৮৮০০ কোটি লোকের মধ্যে কেবল একজন লোকের মধ্যেই সেই ভবিষ্যদ্বাণী সৌভাগ্যক্রমে পূর্ণ করার কথা ছিল। আমরা এর সাথে আরও বলতে পারি যে, আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো দেখার সময় এখন আমাদের নেই। পরিশিষ্ট খ- তে দেখানো হয়েছে যে, কেবল ঈসা মসীহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ১৬টি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। আমরা এদের ৪টি আমাদের ১০টি ভবিষ্যদ্বাণীর তালিকায় গণনা করেছি।

যদি কুমারী গর্ভে ঈসা মসীহের জন্মলাভের সম্ভাবনা লাভের বিষয়টি, তৌরাত-পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী -যা পঞ্চম অংশের ২ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, তার সাথে গণনা করি, আর আমাদের বর্তমান সংখ্যার সাথে যোগ করি, আমাদের অবস্থা এমন হবে যে, আপনি ইলেকট্রন দিয়ে সারা দুনিয়া ভরে ফেলতে পারবেন আর তার মধ্য থেকে একটি চিহ্নিত ইলেকট্রন একবারে খুঁজে বের করার মতো ব্যাপার হবে।[১]

এটি হচ্ছে তৌরাত-পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফ- নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে বাস্তবতার মাপকাঠি। **মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, ইয়াওয়েহ এলোহিম, নবীদের পরিচালনা দিয়েছেন আর পাক-রূহের মধ্য দিয়ে সেই কথা তাঁদের লিখতে বলেছেন। তারপর, তিনি তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন। যাতে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের পাপের জন্য** ঈসা মসীহের **মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়টি সত্য।**

অনেক ভুল বক্তব্য যেগুলো ডঃ বুকাইলি কিতাবুল মোকাদ্দসের সমালোচনার জন্য ব্যবহার করেছেন, এদের মধ্যে এমন কিছু সমস্যা আছে, যেগুলির মধ্যে কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও অনেক মোজেজা যা ঈসা মসীহ্ করেছেন এর মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র কালাম বলেছেন। আমরা খ্রীষ্টানরা আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে আছি, যে ভবিষ্যতে আমরা আরোও অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাব। প্রতিটি নতুন পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার, পাককিতাবের প্রাচীন অনুলিপির নতুন নতুন আবিষ্কার, আমাদের কাছে যে, ইঞ্জিল শরীফ আছে, তা যে সঠিক এটি প্রমাণ করে। আর এর ওপর যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়, তা মিথ্যে।

আর ঈসা মসীহের মোজেজা ও তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার ওপর ভিত্তি করে যদিও আমরা ঈসা মসীহের কথাগুলো বুঝতে পারি না তবু ঈসা মসীহের এই দাবীগুলো স্বীকার করি, তিনি বলেছেন, “তিনি পিতার মধ্যে আর পিতা তাঁর মধ্যে আছেন” অথবা পিতা তাঁকে ভালোবাসেন, কারণ, “তিনি তাঁর মেষদের জন্য জীবন দিয়েছেন।”

---

[১] এই গবেষণার তথ্য, Peter W. Stoner, *Science Speaks,* (Moddy Press, Chicago, 3rd Edition, 1969) নামক বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা এই শিক্ষাকে কোনো রংচং করে মিথ্যে গল্প বানাননি। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা, প্রকৃত ইহুদী ছিলেন, তাঁরা বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ্ এক। তাই তাঁদের পক্ষে এটি মেনে নেয়া কঠিন ছিল যে, ঈসা মসীহের পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে, আর আল্লাহ্‌কে "তাঁর পিতা" বলার অধিকার রয়েছে। এটি মেনে নেয়ার কারণ হচ্ছে, ঈসা মসীহের মোজেজা ও ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে ও সবশেষে ঈসা মসীহের মুত্যু থেকে জীবিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নিজেই এবিষয়ে দ্বিতীয় সাক্ষী হয়েছেন। তারপর ইহুদীরা বিশ্বাস করেছিল ও ঈসা মসীহের দাবী মেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈসা মসীহের নবুয়ত ও মসীহ্ হিসেবে তাঁর কাজ
(আরো তথ্য)

বিগত অধ্যায়ে আমরা গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলাম, কীভাবে প্রথম শতাব্দীর প্যালেষ্টাইনের লোকেরা জানতে পেরেছিলেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম একজন নবী ও মসীহ্ উভয়ই ছিলেন। আর আমরা দেখেছি যে, ঈসা মসীহ্ ও অন্যান্য নবীদের আগমনের মধ্যে একটি পার্থক্য ছিল। ইহুদীরা ইতোমধ্যেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, আল্লাহ্ একজন মনোনীত লোক- "মসীহ"- পাঠাবেন। আমরা তৌরাত-পুরাতন নিয়ম থেকে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে বলা হয়েছে, এই "মসীহ" বাদশাহ দাউদের বংশধর হবেন, তিনি বেথেলহামে জন্ম নিবেন, মোজেজা করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে আর তাঁকে ব্যতিক্রমীভাবে ধার্মিক ও পবিত্র বলে ডাকা হবে।

নবী ইশাইয়ার কাছে আরো তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই বিশেষ শিশুটি হজরত দাউদের বংশে জন্ম নেবেন। তিনি বলেছেন,

> "কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, — তাঁর নাম হবে-অপূর্ব [অবাক] পরামর্শদাতা, বিক্রমশালী আল্লাহ, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্। দাউদের সিংহাসন ও তাঁর বাদশাহীর ওপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকবে না, — যেন তা, ইনসাফে ও ধার্মিকতার সাথে, এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়।" (ইশাইয়া ৯:৬-৭)

আর, আমরা বিগত অধ্যায়ে দেখেছি যে, ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হজরত ইয়ারমিয়া (আঃ)-এর লেখা ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করেছেন যে, এই বিশেষ "মসীহ" এতো নিখুঁতভাবে ন্যায়বিচার করবেন যে, এই ধামির্কতা স্বর্গীয় হবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন,

> "মাবুদ বলেন, দেখো, এমন সময় আসছে, **যে সময়ে আমি দাউদের বংশে একটি ধার্মিক শাখা উৎপন্ন করবো**; তিনি বাদশাহ্ হয়ে বাদশাহী করবেন, বুদ্ধিপূর্বক চলবেন এবং দেশে ইনসাফ করবেন, বুদ্ধিপূর্বক নেক কাজ করবেন। তাঁর সময়ে ইহূদা নাজাত পাবে ও ইসরাইল নির্ভয়ে বাস করবে,
>
> আর **তিনি এই নামে পরিচিত হবেন, মাবুদ আমাদের ধার্মিকতা**।" (ইয়ারমিয়া ২৩:৫-৬)

এখন আমরা- পাঠক আপনি ও আমি এবং আমাদের প্রতিবেশী জনাব ইলিয়াস- কল্পনা করবো যে, আমরা সবাই প্রথম শতাব্দীর খাঁটি ইহুদী, আমরা রোমীয় শাসনাধীনে প্যালেষ্টাইনে বাস করছি। আমরা আসলে এই রোমীয় মূর্তিপূজারীদের মূর্তি আনা নেয়া দেখে আর তাদের একাধিক দেবতার

উপাসনা করা দেখে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হই। আমরা মসীহের আগমনের অপেক্ষায় আশা করে আছি, আমরা আশা ও প্রত্যাশা করি যে, একদিন মসীহ্ এসে তাঁর মহৎ ও শক্তিশালী ক্ষমতা দ্বারা তিনি খতনাবিহীন অ-ইহূদীদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবেন।

কিন্তু আমাদের সমস্যা আছে। যখন একজন লোক আসে আর দাবী করেন যে, তিনি মসীহ, কীভাবে আমরা জানতে পারবো যে, তিনিই প্রকৃত মসীহ? কীভাবে আমরা জানি যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করা মসীহ?

বিগত ১০০ বছর ধরে বেশ কয়েকজন লোক এসে প্রত্যেকেই দাবী করেছেন যে, তিনি “মসীহ”। তারা সবাই চেষ্টা করেছেন, নিজেদের শক্তিতে তাঁরা ইসরাইল রাজ্য উদ্ধার করতে চেয়েছেন। তাঁরা সবাই ব্যর্থ হয়েছেন আর তাঁদেরকে সংগী সহ মেরে ফেলা হয়েছে।[১] সুতরাং, আমরা একেবারে নিশ্চিত হতে চাই যে, যদি কেউ নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত মসীহ্ হিসেবে দাবী করেন, তবে তাঁকে প্রকৃত মসীহ্ হতে হবে, তবেই আমরা তাঁকে অনুসরণ করবো। নিচের কাহিনীটি আমাদের দেখায় যে, কীভাবে আমাদের বন্ধু ইলিয়াস এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে ঈসা মসীহের শিক্ষা ও মোজেজা

ঈসা মসীহের সেবা কাজের শুরু

আমার নাম ইলিয়াস আর আমি ও আমার স্ত্রী নায়িন গ্রামে বাস করি। নাসরত গ্রাম থেকে আমাদের নায়িন গ্রামটি ৮-৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৩ বা ৪ বছর আগে থেকে আমরা শুনছিলাম যে, একজন রাব্বি এসে কফুরনাহুম শহরে মোজেজা করছেন। আমাদের প্রতিবেশী-একজন গরীব বিধবার একটি মাত্র ছেলে ছিল, সেই বিধবার এক চাচাতো ভাই কফুরনাহুম শহরে বাস করতেন, আর এই কাহিনীটি সেই বিধবাই আমাদেরকে বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, “আমার চাচাতো ভাইয়ের নাম ওবদীয়। তিনি কফুরনাহুমে বাস করেন। এক শনিবারে জামাতখানায় নাসরত থেকে একজন রাব্বি এসেছিলেন। অন্যান্য রাব্বিদের চেয়ে তিনি একেবারেই আলাদা ছিলেন। প্রথমেই সবাই তাঁর শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হয়েছিল;< কারণ, যাঁর অধিকার আছে এমন লোকের মতো তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন>[২]। কারণ, তিনি আল্লাহ্‌কে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর উপদেশ দেয়ার পরে সাথে সাথে < তাঁদের জামাতখানার ভূতে-পাওয়া একজন লোক চিৎকার করে বললো,

> “ওহে নাসরতের ঈসা, আমাদের সংগে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে?-আপনিই তো আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র লোক!”>

---

[১] কিতাবুল মোকাদ্দস উল্লেখ করে যে, (প্রেরিত ৫:৩৪-৩৮) এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যেমন জোসেফাস উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা মসীহের জন্মের আগেই অনেক লোক নিজেদেরকে মসীহ বলে দাবী করেছেন।

[২] < > এই চিহ্নের মধ্যে উল্লেখিত সমস্ত কথাই সরাসরি ইঞ্জিল শরিফ থেকে নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি লোক ঘুড়ে তখন দেখতে লাগলো যে কি ঘটছে? আর তখনি ঈসা নামের সেই রাব্বি দাঁড়িয়ে উঠে সেই ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন,

“< চুপ করো, ওর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!”

সেই ভূতটি তখন সেই লোকটিকে মুচড়ে ধরলো এবং জোরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল।>

আমার চাচাতো ভাই বলেছিলেন, জামাতখানাটি একটি পাগলখানায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে ২০০ লোকের বেশী উপস্থিত ছিল। আর তখন প্রত্যেকেই কথা বলছিল। কয়েকজন আনন্দে কাঁদছিল আর অনেকেই সুস্থ হওয়া লোকের সাথে আনন্দের সাথে কোলাকুলি করছিল। আবার কয়েকজন লোকের মন খুব খারাপ হয়েছিল, কারণ, সেই ভূতটি সেই রাব্বিকে বলেছিল, ”আপনিতো আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র জন”, কিন্তু বেশীরভাগ লোকেরা এমন আশ্চর্য হয়েছিল যে, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল, <“এসব কী ব্যাপার? ! এই অধিকার ভরা নতুন শিক্ষাই বা কী? এমনকি ভূতদেরও তিনি হুকুম দেন আর তারা তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হয়!”> (মার্ক ১:২২-২৭)

আমার চাচাতো ভাই ওবদীয় আরো অনেক কথা বলেছিলেন। তাঁর একজন ভালো বন্ধু জেলে ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হজরত শিমোন পিতর। একদিন হজরত শিমোন ও তাঁর ভাই হজরত আন্দ্রীয় সারা রাত পরিশ্রম করে একটি মাছও ধরতে পারেননি। তখন সেই রাব্বি-ঈসা- ১০০ জনের মতো লোক সাথে নিয়ে তাঁদের কাছে এসে হজরত শিমোনের নৌকায় উঠে লোকদের শিক্ষা দিলেন। < কথা শেষ হলে তিনি হজরত শিমোনকে বললেন,

“গভীর পানিতে গিয়ে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলো।”>

ওবদীয় বললেন, এই কথা শুনে শিমোনের মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গেল। কারণ, তিনি ছিলেন, গালীল সাগরের একজন নামকরা জেলে। আর তিনি সারা রাত পবিশ্রম করে কিছুই ধরতে পারেননি; আর এই রাব্বি কি না আবার তাঁকে সাগরে গিয়ে জাল ফেলতে বলছেন, এই কথা শুনতে তাঁর খুব ভালো লাগছিল না। কিন্তু তিনি একজন ধর্মীয় আলেমের মনেও ব্যথা দিতে চাইলেন না। তাই তিনি বললেন,

“<তবু আপনার কথা মতো আমি জাল ফেলবো।>

তাঁরা যখন তাঁর কথামতো জাল ফেললেন, তাতে এত মাছ ধরা পড়লো যে, তাঁদের জাল ছিড়ে যেতে চাইলো।> তখন তাঁরা হাত ইশারা দিয়ে নৌকার সঙ্গীদের ডাকলেন। তাঁরা এসে দুটো নৌকায় এত মাছ বোঝাই করলেন যে, সেগুলো ডুবে যাবার মতো হলো। (লূক ৫:৩-৬)

এত মাছ দেখে আমার চাচাতো ভাই, হজরত শিমোন পিতর ও হজরত আন্দ্রিয়কে মাছগুলো বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করতে চাইলেন। বাড়িতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন < শিমোনের শ্বাশুড়ীর জ্বর হয়েছে বলে তিনি শুয়েছিলেন। > তিনি সেই রাব্বিকে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। তাঁরা বাড়িতে যাওয়ার পর < তাঁর কথা ঈসাকে বলা হলো। তখন ঈসা কাছে

গিয়ে তাঁকে হাত ধরে তুললেন। তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল।> আর < তিনি তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন। > (মার্ক ১:৩০-৩১) ন, এই দুটো মোজেজা আমার চাচাতো ভাই জামাতখানায় ও এখানে একদিনেই দেখেছিলেন। কিন্তু তুমি এখনও পর্যন্ত অনেক কথাই শুননি।

< সেইদিন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সন্ধ্যেবেলায় লোকেরা সেই এলাকার সমস্ত রোগী ও ভূতে পাওয়া লোকদের ঈসার কাছে আনলো। শহরের সমস্ত লোক তখন সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে জড়ো হলো। অনেক রকমের রোগীকে ঈসা সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন। তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ, তারা জানতো তিনি কে? > (মার্ক ১:৩২-৩৪)

আমি কখনও কফুরনাহুমে যাইনি। কিন্তু ওবদীয় ভাই আমাকে বলেছেন যে, এই গ্রামটিও নায়িন গ্রামের মতোই বড়। প্রায় ৪০০০ লোক সেই গ্রামে বাস করেন। তিনি বলেছেন যে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, প্রায় ৫০০ লোক সেই দরজার কাছে এসে জড় হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে নানা রকমের রোগীকে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল আর তিনি সেই রাতে কম করে হলেও ৫০জন রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, কফুরনাহুম শহরের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে **বলেছিল, <"ইসরাইল দেশে আর কখনও এমন দেখা যায়নি।"** > (মথি ৯:৩৩)

মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া

আমাদের প্রতিবেশী বিধবা মহিলা এমনিতে খুব ভালো; কিন্তু তিনি খুবই কম কথা বলেন। তাই আমি ও আমার স্ত্রী তাঁর প্রতিটি কথাকে খুবই দামী বলে মনে করি। আর তাই আমরা গালীলের অন্যান্য জায়গার লোকদের মতোই এই কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। তারপর, একদিন আমরা একটি দু;খের খবর শুনে মনে খুবই আঘাত পেলাম। আমরা শুনলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী বিধবা মহিলার ছেলেটি মারা গেছে। কয়েক বছর ধরেই তার কাশি ছিল। কিন্তু সেই রাতে তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। প্রতিবেশী বিধবা মহিলা তাঁর ছেলেকে ওষুধ খাওয়ালেও সে মরে গেল। তিনি ছেলের শোকে একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। কারণ, সেই ছেলেটি তার মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল।

সেই বিধবা মহিলার জন্য আমরা খুবই দুঃখ পেলাম। কিন্তু ছেলেটিকে দাফন করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। তাই মৃত ছেলেটিকে খাটে তুলে আমরা দাফন করার জন্য কবরস্থানের দিকে রওনা হলাম। তিনি গরিব বিধবা ছিলেন বলে, বেশী লোক তাঁর ছেলের জানাজায় শরীক হননি, কেবল ৫০ জনের মতো লোক আমরা যাচ্ছিলাম। যদিও আগের মতো এখন আর আমার তেমন শক্তি নেই, তাই আমি পালাক্রমে সেই কফিন বহন করছিলাম।

আমরা যখন গ্রামের সদর দরজার কাছে পৌছলাম, তখন দেখতে পেলাম, অনেক লোক রাস্তা দিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকেরা যখন কাউকে দাফন করার জন্য নিয়ে যায়, তখন সাধারণতঃ অন্য লোকেরা একপাশে সরে গিয়ে তাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়। তারা যখন রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে যাচ্ছিল, তখন আমরা দেখতে পেলাম একজন লোক রাস্তার ওপর

দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সরাসরি আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। কাছাকাছি এসে তিনি খাট না ছুঁয়া পর্যন্ত আমি তাঁর দিকে ভালো করে দেখতে পাইনি। < তারপর, তিনি খাট ছুঁলেন> পরে, তিনি আমাদের দিকে তাকালেন, আমরা থেমে গেলাম এবং < দাঁড়িয়ে থাকলাম, (আর) তিনি বললেন,

<“যুবক, আমি তোমাকে বলছি, উঠো!”>

তখন যা ঘটলো, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু, < সেই মৃত ছেলেটি উঠে বসল, আর কথা বলতে লাগলো!> আমাদের সবার অন্তর ভয়ে ও ভক্তিতে পূর্ণ হলো। লোকেরা ফিসফিস করে বলাবলি করছিল যে, “ইনি নাসরত গ্রামের ঈসা” । আমরা যুবককে খাট সহ মাটিতে নামালাম। আর তার কাফনের কাপড় খুলে ফেললাম।”< আর ঈসা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।> (লূক ৭:১৪-১৫)

প্রাথমিক নীরবতা কাটিয়ে উঠার পর লোকেরা আনন্দে চিৎকার করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করতে লাগলো। আপনি আগে কখনও এরকম দেখেননি। আমি নিজেও চিৎকার করে হাত তুলে লাফিয়ে আমার আনন্দ প্রকাশ করছিলাম। আমি ছেলেটিকে ৫বার আর বিধবা মাকে ৩বার অভিনন্দন জানালাম। আমি রাব্বি ঈসাকে কিছু বলতে চাইলাম, এমনকি আমি তাঁর পিঠ চাপড়ে প্রশংসাও করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সাহস হয়নি, কীভাবে একজন রাব্বিকে পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করা যায়? আর তখনই তিনি তাঁর সাহাবীদের কিছু বললেন আর তাঁরা পাশের একটি রাস্তা ধরে অন্যদিকে চলে গেলেন।

কয়েক মাস পর

কিছু দিন পর আমি আর আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা গিয়ে এই বিষয়টি ভালো করে দেখবো। এর দুটো কারণ ছিল, প্রথম কারণ হলো, তার মা বাতের ব্যথায় পঙ্গু ছিল। এই ব্যথা এত বেশী ছিল যে, তিনি কেবল কয়েক পা হাঁটতে পারতেন। আমরা চিন্তা করলাম যে, ঈসা মসীহের রোগ ভালো করার ক্ষমতা তার মার ওপরও কাজ করে কি-না?

কিন্তু আমার কাছে যাওয়ার আসল কারণ ছিল, ঈসা মসীহ্‌ আসলে কী বলছেন তা আমি নিজ কানে শুনতে চেয়েছিলাম। কিছু লোক বলছিল যে, তিনি ইসরায়েলের বাদশাহ হবেন। অন্যরা বলতো যে, তিনি “আল্লাহ্‌র রাজ্যের” বিষয়ে শিক্ষা দেন; এর সাথে তিনি এই কথাও বলেন যে, এই রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, আসলেই তিনি মসীহ্‌ কি না তা আমি জানতে চাই।

তারপর যখন আবহাওয়া ভালো হয়ে গরমকাল শুরু হলো, তখন আমি আমার ভাইকে ডেকে আমার দুধের গাভী আর ছাগলগুলো দেখাশোনার ভার তার হাতে দিলাম। আর একটি গরুর-গাড়ী

ভাড়া করে এনে তাঁর ওপর আমার শ্বাশুড়ীকে শুইয়ে রওনা দিলাম। প্রথম রাতে আমরা কফুরনাহুম শহরে সেই বিধবার চাচাতো ভাই ওবদিয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকলাম। তিনি ঈসা মসীহের সাহাবী-হজরত শিমোন পিতর ও হজরত আন্দ্রীয়কে চিনতেন।

আরেকদিন আমরা গালীল সাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে বৈৎসৈদা গ্রামে গিয়ে রাত কাটালাম। আমার অসুস্থ শ্বাশুড়ীর জন্য এরকম যাত্রা কঠিন ছিল বলে, যেন তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন এজন্য আমরা মাঝে মাঝে থামতাম। কিন্তু রোমীয় সড়কগুলো না থাকলে এই যাত্রা তাঁর জন্য আরও কঠিন হ'তো। আমি রোমীয়দের শোষণকে ঘৃণা করতাম, কিন্তু আমি স্বীকার করলাম যে, রাস্তাগুলো তারা ভালো করেই তৈরি করেছে।

সেই সময়ে সেই এলাকার বাইরে জর্দান নদীর অপর পাড়ে রাব্বি ছিলেন। অনেক লোক সেই দিকে যাচ্ছিল, সুতরাং, আমি ভাবলাম যে, আমরা পথ হারাইনি, আমরা ঠিক পথেই এগিয়ে চলছি। চলতে চলতে তৃতীয় দিন দুপুর বেলায় আমরা পৌঁছে দেখি, অনেক লোক সেখানে জড় রয়েছে। আমরা একটি পাহাড়ের পাশে বসে ঈসা মসীহের কথা শুনছিলাম, তিনি বলছিলেন,

***** ঈসার কালাম (আমার তৃতীয় সূরা)***** [৩]

তিনি যখন রোজা সম্পর্কে বলছিলেন, তখন আমি প্রথম বিষয়টি শুনলাম, তিনি বলছিলেন,

> < আর তোমরা যখন রোজা রাখো, তখন ভণ্ড লোকদের মতো মুখ মলিন করে রেখো না; কারণ, তারা মানুষের কাছে রোজাদার হিসেবে দেখানোর জন্য তাদের মুখ মলিন করে রাখে; আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, তারা তাদের ফল পেয়েছে। কিন্তু তুমি যখন রোজা রাখো, তখন মাথায় তেল দিও এবং মুখ ধুইও; যেন তোমার রোজা মানুষকে দেখানোর জন্য না হয়, কিন্তু তোমার পিতা যিনি অদৃশ্য, তিনিই দেখতে পান; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।>

তারপর তিনি আমাদেরকে সবচেয়ে দরকারী বিষয় সম্পর্কে বললেন,

> < তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের জন্য ধন-সম্পদ জমা করো না; এখানে তো পোকায় কাটে ও মরচে ধরে এবং এখানে চোর সিঁদ কেটে চুরি করে। কিন্তু বেহেস্তে নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা কর; সেখানে পোকায় কাটে না এবং মরচেও ধরে না, সেখানে চোরেও সিঁদ কেটে চুরিও করে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেখানে তোমার মনও থাকবে।

---

৩ এখানে যে সব আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো মথি ৫-৭ অধ্যায়ে বর্ণিত "পাহাড়ের ওপরে ঈসার শিক্ষা" থেকে নেয়া হয়েছে। এগুলোকে আমি কোরআনের সূরার সমতুল বলে মনে করি।

চোখই দেহের আলো; তাই তোমার চোখ যদি ভালো হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ আলোকিত হবে। কিন্তু তোমার চোখ যদি খারাপ হয়, তবে তোমার সারা শরীর অন্ধকারে ভরে যাবে। এজন্য, তোমার অন্তরের আলো যদি অন্ধকার হয়ে যায়, তা কতই না ভীষণ অন্ধকারময় হবে! > (মথি ৬:১৬-২৪)

তারপর তিনি কথা বলা বন্ধ করে জনতার মধ্য দিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে চারদিক ঘুড়ে ঘুড়ে হেঁটে হেঁটে রোগীদের সুস্থ করলেন আর ভূতে পাওয়া লোকদের মধ্য থেকে ভূতদের বের করে দিলেন। কোনো কোনো ভূত তাঁকে চিনতে পারলো, এমনকি তাঁকে বললো, < "আপনি তো আল্লাহতায়ালার পুত্র"। মার্ক ৫:৭

তারপর আবার তিনি প্রচার শুরু করে বললেন,

< তোমরা বিচার করও না, যেন বিচারে না পড়। কারণ যে মানদণ্ডে তোমরা বিচার করো, সেই মানদণ্ডে তোমরাও বিচারে পড়বে ; এবং যে পাল্লায় ওজন করো, সেই পাল্লাতে তোমাদিগকেও ওজন করা হবে।

আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটা আছে কেবল তাই বা কেন দেখছো, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ ঢুকে আছে, তা কেন ভেবে দেখছো না? অথবা তুমি কেমন করে তোমার ভাইকে বলবে, 'এসো, আমি তোমার চোখ থেকে কুটাবের করে দেই? আর দেখো, তোমার নিজের চোখেই কড়িকাঠ রয়েছে! হে মোনাফেক! আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের করে ফেলো, আর তখন তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটা বের করতে আরও স্পষ্ট দেখতে পাবে।"> (মথি ৭:১-৫)

ঈসা মসীহ্ সারা দিন ধরে এই কাজ বারবার করছিলেন।[৪] বিকেল ৩টার দিকে তিনি আমাদের কাছে এলেন, তাঁর সেই একই শান্তভাব ছিল, তাঁর দুচোখ ভরা একই মমতা ছিল, যা আমি সেই গরীব বিধবার ছেলেকে সুস্থ করার সময়ে দেখেছিলাম। তিনি একের পর এক রোগীকে ভালো করে আমার শ্বাশুড়ীর কাছে এলেন। তারপর, তিনি আমার শ্বাশুড়ীর হাত দুটো ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন,

"মা, তুমি উঠে দাঁড়াও।"[৫]

আর সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ১৮ বছর বয়সী তরুণীর মতো তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ১ মিনিট ধরে তিনি তাঁর হাত, পা, আঙ্গুলগুলো নাড়ালেন, মাবুদের প্রশংসা করলেন। তারপর লাফ দিয়ে চীৎকার করে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলেন। তিনি

---

[৪] আমি বিশ্বাস করি যে, ঈসা এই ধরনের শিক্ষা বহুবার অনেক গ্রামেই দিয়েছেন। সুতরাং, আমি লূক সিপারার ওপর ভিত্তি করে, আমি স্বাধীনভাবে ঈসা মসীহের অন্যান্য মোজেজা ও শিক্ষা উল্লেখ করলাম, যেগুলো তিনি অন্য জায়গায় , অন্য লোকদের দিয়েছেন। লূক সিপারায় ৫০০০ লোককে খাওয়ানো সম্পর্কে বলা হয়েছে, "অনেক লোক ঈসার পিছনে পিছনে চলিল, তিনি তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট খোদার রাজ্যের কথা বলিলেন, ইহা ছাড়া যাদের সুস' হইবার দরকার ছিল তাহাদের সুস' করিলেন।" (লূক ৯:১১)

[৫] এই মোজেজাটি লূক ১৩:১১,১৩ আয়াতের উল্লেখিত মোজেজার মতো একেবারেই এক

যখন ঈসা মসীহের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর দিকে ঘুড়ে তাকিয়ে অন্যান্য লোকদের যেমন বলেন, তেমনি তাঁকেও বললেন,

< “তুমি বিশ্বাস করেছো বলে সুস্থ হয়েছ।”> (মার্ক ৫:৩৪)

কিন্তু কখনো কখনো তিনি কাউকে বলতেন, ”

< “দেখো, তুমি ভালো হয়েছো, পাপে আর জীবন কাটায়ো না, যাতে তোমার আরও ক্ষতি না হয়”> (ইউহোন্না ৫:১৪)

যদিও সঠিকভাবেই তিনি সেই মানুষের অতীত জানতেন আর লোকেরা বিশ্বাস করত যে, পাপের কারণে লোকেরা অসুস্থ হয়।

তিনি সেদিন অনেক বিষয় শিক্ষা দিলেন। আমি এরই মধ্যে কিছু কিছু আপনাদের বলেছি। এখানে আরও কিছু দেওয়া হলো। তিনি মুনাজাতের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন,

< “চাও, তোমাদেরকে দেওয়া হবে ; তালাশ কর, পাবে; দরজায় কড়া নাড়, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কারণ যে চায়, সে গ্রহণ করে; এবং যে তালাশ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ছেলে খাবার চাইলে তাকে পাথর দেবে? কিংবা মাছ চাইলে সাপ দেবে? এ’জন্য, তোমরা খারাপ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদেরকে ভালো ভালো জিনিস দান করতে জানো, তবে এটা কত বড় নিশ্চয়তা যে, তোমাদের বেহেশতী পিতার কাছে যারা কিছু চায়, তাদেরকে কত ভালো ভালো জিনিস দেবেন। >

তিনি আমাদের বলেছেন যে, যদি কোনো বিষয় সরাসরি শরিয়তের মধ্যে না পড়ে, তাহলে নিয়ম হচ্ছে,

<“তোমাদের প্রত্যেকটি ব্যপারে অন্য লোকেরা তোমাদের প্রতি যা করবে বলে আশা করো, তোমরাও তাদের প্রতি সেরূপ আচরণ কোরো; কারণ এটাই শরিয়ত ও নবীদের কিতাবের মূল কথা।>

পরে তিনি আমাদের সতর্ক করে বললেন, আল্লাহ্‌র পথে চলার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তিনি এটাকে সরু দরজা দিয়ে ঢোকার সাথে তুলনা করলেন।

< “সরু দরজা দিয়ে ঢোকো; কারণ সর্বনাশে যাবার দরজা বড়, পথও চওড়া প্রশস্ত এবং অনেকেই তা দিয়ে ঢোকে; কারণ জীবনে প্রবেশ করার দরজা সোজা এবং পথও সরু এবং কম লোকেই তা পায়।>

ভণ্ডনবীদের সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি আমাদের বললেন,

<“ভণ্ড নবীদের বিষয়ে সাবধান; তারা ভেড়ার পোষাকে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মানুষ-খেকো-বাঘ। তাদের কাজের ফল দিয়েই তোমরা তাদেরকে চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটাগাছ থেকে আঙ্গুরফল, কিংবা শিয়ালকাঁটা থেকে ডুমুরফল আহরণ করে? সেভাবে

প্রতিটি ভালো গাছে ভালো ফল ধরে, কিন্তু খারাপ গাছে খারাপ ফল ধরে। ভালো গাছে খারাপ ফল ধরতে পারে না এবং খারাপ গাছে ভালো ফল ধরতে পারে না। যে গাছে ভালো ফল ধরে না, ওটা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। এ'জন্য, তোমরা ওদের ফল দিয়ে ওদেরকে চিনতে পারবে।>

তারপর তিনি কয়েকটি শক্ত কথা বললেন,

< "যারা আমাকে 'হে প্রভু, হে প্রভু' বলে, তারা সবাই যে বেহেশতী রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে, এমন নয়, কিন্তু যে-লোক আমার বেহেশতী পিতার ইচ্ছা পালন করে, কেবল সেই প্রবেশ করতে পারবে। সেদিন অনেকে আমাকে বলবে, 'হে প্রভু, হে প্রভু', আপনার নামেই কি আমরা নবী হিসেবে কথা বলেনি? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াইনি? আপনার নামেই কি অনেক কুদরতী কাজ করিনি?' তখন আমি তাদেরকে স্পষ্টই বলবো,' আমি কোনোদিন তোমাদেরকে চিনতাম না; হে দুষ্টরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।>

সবশেষে, তিনি দুইজন লোকের মেসাল দিয়ে এই শিক্ষা শেষ করলেন। এদের মধ্যে একজন বালুর ওপর আরেকজন শক্ত পাথরের ওপর ভিত্তি করে ঘর তৈরি করেছিল। বন্যা যখন এলো তখন বালুর ওপর তৈরি ঘরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আর তখন পাথরের ওপর তৈরি ঘর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঈসা মসীহ্ এই গল্প বলা শেষ করে তিনি বললেন,

< "এজন্য, যদি কোনো লোক আমার এই সব হেদায়েত শুনে আমল করে, তাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোক হিসেবে মনে করা হবে, যে পাথরের ওপর নিজের ঘর তৈরি করলো। — -আর যে লোক আমার এই হেদায়েত শুনে তা পালন না করে, সে এমন একজন বোকা লোকের মতো, যে বালির ওপর তার ঘরে তৈরি করলো— ।> (মথি ৭:৭-২৬)

সারাদিন ধরে অধিকার আছে এমন লোকের মতো তিনি লোকদের শিক্ষা দিলেন। তিনি কোনো আলেমদের মতো শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, যারা কেবল শিক্ষা দেওয়ার সময়ে বলে থাকেন,'অমুক রাব্বি এই বলেছেন', 'তমুক রাব্বি সেই কথা বলেছেন]।

পবিত্র খাওয়া-দাওয়া

সবশেষে, বিকেল বেলা ছেলেমেয়ের কান্না ও চারদিকে তাদের দৌড়াদৌড়িতে লোকেরা কিছুটা ক্লান্ত হচ্ছিল। আমাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করেছিলাম যে, এবার আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তখন ঈসা মসীহ্ ঘুড়ে তাঁর একজন সাহাবী হজরত ফিলিপকে ডেকে বললেন,

<"এদেরকে খাওয়াবার জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনবো?' তিনি তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য ওই কথা বললেন; কারণ, তিনি কী করবেন, তা তিনি নিজে জানতেন। ফিলিপ তাঁকে জবাব দিলেন, 'এদের জন্য দু'শো দিনারের রুটিও এরূপ যথেষ্ট নয় যে, প্রত্যেকে কিছু কিছু পেতে পারে।'

তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন, সিমাউন পিতরের ভাই আন্দ্রীয়, তাঁকে বললেন, “এখানে একটি ছেলের কাছে যবের পাঁচটি রুটি এবং দু’টা মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কী হবে?”> (ইউহোন্না ৬:৫-৯)

সেই জায়গায় প্রচুর ঘাস ছিল। আর সাহাবীরা ঘাসের ওপর আমাদের বসতে বললেন, <‘‘তারা একশো একশো ও পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে সারি সারি বসে গেল। > মার্ক ৬:৪০ আর আপনার জন্য বলছি, আমি তাদের গুণেও ছিলাম, এখানে কমপক্ষে ১০০টি দলে ৫০ জন করে লোক ছিল। অর্থাৎ এখানে ৫০০০ লোক ছিল!

< তখন ঈসা সেই রুটি কয়টি নিলেন ও শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসেছিল, তাদেরকে ভাগ করে দিলেন; সেভাবে তিনি মাছও দিলেন > আমাদের পেট না ভরা পর্যন্ত দিলেন।

আমার এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা আগে ছিল না। আমি সেই মোজেজা দেখেছিলাম! একটি রুটি ও ৬টি মাছ আমি নিজেই খেয়েছিলাম। অথচ দুটো মাছ আর ৫টি রুটি দিয়েই তো তিনি মোজেজা শুরু করেছিলেন! এটি ছিল একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার!!

আমাদের খাওয়ার পরে < তখন সাহাবীরা তা জড়ো করলেন, তাতে বারোটা টুকরী পূর্ণ হলো > তাঁর ঘনিষ্ট ১২ জন সাহাবী প্রত্যেকেই এক ঝুড়ি করে রুটি কুড়িয়েছিলেন।

< সেই লোকেরা ঈসার এই নিশানা কাজ দেখে বলতে লাগলো, ‘উনি সত্যই **সেই নবী**, যার দুনিয়াতে আসার কথা ছিল।’[৬] তখন ঈসা বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে বাদশাহ করার জন্য তাঁকে জোর করে ধরতে এসেছে, তাই আবার নিজে একাকী পাহাড়ে চলে গেলেন।> (ইউহোন্না ৬:১১, ১৩-১৫)

তারপর ঈসা মসীহ্ আমাদের কাছে এক আশ্চর্য কথা শুনালেন, তিনি বললেন,

<“আমিই সেই জীবন-রুটি। যে লোক আমার কাছে আসে, তার খিদে পাবে না এবং যে আমার ওপর ঈমান আনে, তার আর কখনো পিপাসাও পাবে না।

— কারণ আমার ইচ্ছামতো কাজ করার জন্য আমি বেহেশত থেকে নেমে আসিনি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছামতো কাজ করার জন্য। কারণ, আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে পুত্রের ওপর ঈমান আনে, সে অনন্ত জীবন পায়; আর আমিই তাকে আখেরাতের দিনে জীবিত করে তুলবো।> (ইউহোন্না ৬:৩৫, ৩৮, ৪০)

এবার, আমাদের ফিরে যাবার জন্য তৈরি হতে হলো। কিন্তু এখন আমার শ্বাশুড়ী সুস্থ হয়েছেন বলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলাম। আর আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার জন্য মাত্র দেড়দিন লেগেছিল। সত্যি কী দারুণ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল!

---

[৬] এরা আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছেন যে, মূসার মত একজন নবী তিনি পাঠাবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ২৩-২৫।

প্রশ্ন

এসব বিষয়ে এখনও কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল। আর এগুলো আসলেই খুব বড়-বড় প্রশ্ন ছিল। আর আমি জানতাম না যে, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি কীভাবে পেতে পারি? ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌কে নিজের পিতা বলেছিলেন, এই কথা বলে তিনি আসলে কী বুঝাতে চেয়েছিলেন?

অবশ্যই এই কথা ঠিক যে, জবুর শরীফ ৬৮ নং গজলে হজরত দাউদ বলেছিলেন, “আল্লাহ্ এতিমদের পিতা ও বিধবাদের রক্ষাকর্তা “আর আল্লাহ, হযরত ইব্রাহিমকে “আমার বন্ধু” বলেছিলেন (ইশাইয়া ৪১:৮)। সম্ভবতঃ এটিও কি এমনি ধরণের কোনো সম্পর্ক ছিল?

সমস্যা হচ্ছে যে, ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র সাথে এমনি ধরনের কোনো দূরবর্তী সম্পর্কের কথা বুঝাননি। তিনি কেবল আল্লাহ্‌কে নিজের পিতা বলে ডাকেননি, কিন্তু তিনি সেদিন আমাদের বলেছিলেন, “এটা কত বড় নিশ্চয়তা যে, **তোমাদের বেহেশতী পিতার** কাছে যারা কিছু চায়, তাদেরকে কত ভালো ভালো জিনিস দান করবেন “আর তিনি মোনাজাত করার জন্য এভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, “হে আমাদের বেহেশতী পিতা।” আমি স্বীকার করছি যে, আল্লাহ্ পিতার মতো আমাদের যত্ন নিতে চান, এই কথা ভাবলে আমরা মনে সান্ত্বনা পাই। কিন্তু এই কথা বলা কি কুফরী নয়?

তাছাড়া তিনি বলেছেন, “আমি বেহেশত থেকে নেমে এসেছি।” এই কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, এর আগে বেহেস্তে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন? তিনি আরও বলেছেন, সেদিন অনেকেই আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলবে, — তখন আমি বলবো ‘আমি তোমাদের চিনি না।” এই কথা শুনে মনে হয় যে, তিনি দাবী করছেন যে, কেয়ামতের দিনে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা থাকবে।

সেই রাতে কফুরনাহুম শহরে থাকার সময়ে আমাদের প্রতিবেশী বিধবা মহিলার চাচাতো ভাইয়ের কাছে যে-কথা শুনেছিলাম তা নিয়েও আরেকটি সমস্যা ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, একরাতে ঈসা মসীহ্ এক ঘরে বসে অনেক লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে কয়েকজন আলেম ছিলেন, যাঁরা জেরুসালেম থেকে এসেছিলেন। হঠাৎ করে গোলমাল শুনা গেল। আর দেখা গেল যে, কয়েকজন লোক সেই ঘরের ছাদের টালি খুলে ফেলছে। তারা তাদের বন্ধু- এক অবশরোগীকে বয়ে নিয়ে এসেছিল আর ঘরে ঢুকার জন্য কেউ সরে তাদের পথ করে না দেওয়ায় তারা বাধ্য হয়েই ছাদের টালি খুলে তাদের বন্ধুকে ঈসা মসীহের সামনে নামিয়ে দিয়েছিল।

সেই সময়ে সাধারনণতঃ যা ঘটে সেই মোজেজা দেখার জন্য লোকেরা অপেক্ষা করছিল। তারা ভেবেছিল যে, ঈসা মসীহ্ কেবল অবশরোগীকে সুস্থ করবেন, আর তারপর আবার প্রচার শুরু করবেন। কিন্তু বরাবরের মতো এবার তা ঘটলো না।

<“তাদের ঈমান দেখে ঈসা সেই অবশ রোগীকে **বললেন**, **“বাবা, তোমার সমস্ত পাপ মাফ হলো।”** ।>

সেই মহিলার চাচাতো ভাই বললেন যে, সেই সময়ে, সেই ঘরে এমন নীরবতা নেমে এলো যে, আপনি সেই সময়ে একটি পিন পড়ার শব্দও শুনতে পেতেন। তিনি নিজে তৌরাত পড়তে পারেন ও ভালোভাবে বুঝতে পারেন। সুতরাং, তিনি ও অন্যান্য আলেমরা- যারা সেখানে বসেছিলেন, তাঁরা বললেন, < এই লোক কেন এমন কথা বলছে? এ যে কুফরী করছে; সেই একজন, অর্থাৎ আল্লাহ, ছাড়া আর কে পাপ মাফ করতে পারেঃ>

তখন ঈসা মসীহ্ তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

< কোনটা সহজ অবশ রোগীকে 'তোমার পাপ মাফ হলো' বলা, না 'উঠো, তোমার খাট তুলে বেড়াও' বলা? >

সেই বিধবার চাচাতো ভাই বললেন, আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, মানুষকে সুস্থ করাই সহজ কাজ। সেই সময়ে হঠাৎ করেই আমি বুঝতে পারলাম, তিনি হয়তো ঘুড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলবেন, যদি তা এতো সহজ হয়, তবে সুস্থ করে দেখাও। তাই আমি কিছু না বলে একেবারেই নীরব হয়ে রইলাম।"

যখন কেউই কোনো কথা বলল না, তখন ঈসা মসীহ্ তাদের বললেন,

< "কিন্তু দুনিয়াতে পাপ মাফ করার অধিকার ইবনুল ইনসানের আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পারো, এজন্য, -তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন-

"তোমাকে বলছি, উঠো, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।"

তাতে সে উঠলো ও তখনি খাট তুলে নিয়ে সবার সামনে বাইরে চলে গেল। > (মার্ক ২:৫-১২)

এখন আপনি এরকম একটি বিষয় সম্পর্কে কী বলবেন? তিনি দাবী করেছেন যে, পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা তাঁর আছে!?! আপনি, "ইব্‌নে-আদম" পরিচয় জেনেও আশ্চর্য হবেন। ওবদীয় বলেছেন যে, ঈসা মসীহ্ নিজের এই নামটি মাঝে মাঝে বলেছেন। কিন্তু এটি কোনো মতেই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না যে, কীভাবে তিনি মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারেন?

যদিও এই কথাই তিনি লোকদের বলেছেন, < যদি আমি মিথ্যে বলি, তবে আল্লাহ্ আমাকে এই লোকটিকে ভালো করার ক্ষমতা দিতেন না। কিন্ত যখন আমি তাঁকে উঠতে বললাম, আর সাথে সাথে সে উঠে দাঁড়ালো-এটি জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, - এই দুনিয়াতে লোকদের গুনাহ মাফ করার ক্ষমতাও আমার আছে।- এই বিষয়টি আপনারা দেখতে পারেন না।">

এখন আপনি আমাদের সমস্যা বুঝতে পারছেন। আমি আর আমার স্ত্রী মিলে একসাথে অনেকবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। ঈসা মসীহ্ বলেছেন যে, তিনি বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন। কেয়ামতের দিনে তিনি বিচার করবেন আর তিনি লোকদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। ভূতেরা তাঁকে বলেছে, "আপনি তো আল্লাহ্‌র সেই পবিত্রজন" আর "ইবনুল্লাহ।"

আমরা বলতে পারি যে, ঈসা মসীহ্ নিজের সম্পর্কে মিথ্যে দাবী করে কুফরী করেছেন। কিন্তু প্রতিবেশী সেই বিধবার ছেলের সম্পর্কে আমরা কী বলবো? সে তো আপনার আমার মতোই দিব্যি বেঁচে আছে, আর এখন তার কোনো কাশিও নেই! আর আমার শ্বাশুড়ীকে যেদিন আমরা ছেড়ে চলে আসি, সেদিন থেকেই তো তিনি সারাদিন ধরে কাজ করেছেন! আর আমার নিজের সম্পর্কেই বা কী বলবো?

আমি তো নিজেই সেই মাছগুলো খেয়েছিলাম! সেই ছেলেটি মাছগুলো ঈসা মসীহের কাছে নিয়ে এসেছিল আর তা আমি নিজের চোখে দেখেছি! মাত্র দুটো মাছ নিয়ে এই মোজেজা শুরু হয়েছিল, আর আমি নিজেই ছয়টি মাছ খেয়েছি! আমি বলতে পারি যে, তিনি অবশ্যই **প্রতিজ্ঞাত মসীহ্** হবেন। আবার অন্যদিকে লোকরা বারবার অনুরোধ করলেও তিনি রাজা হতে অস্বীকার করেছেন? এটিও আমার মাথায় ঢোকে না।

চতুর্থ অধ্যায়

কষ্টভোগী মসীহ্

বিগত অংশে আমরা আমাদের পাঠকদের মাথায় কিছু আজগুবি প্রশ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছি। এগুলো এমন প্রশ্ন যা আমরা বুঝতে পারি না। হজরত ঈসা যদি "মসীহ" হবেন, তবে লোকেরা যখন তাঁকে রাজা বানাতে চেয়েছিল, তখন তিনি কেন রাজা হতে চাননি। আমরা নিজেরা এখন তিনজন নবীর আলাদা আলাদা ভবিষ্যদ্বাণী দেখবো, যেখানে বলা হয়েছে মসীহ্ হজরত দাউদের বংশধর হবেন আর তিনি রাজাও হবেন। সুতরাং, আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি যে, - কেন তিনি রাজা হতে অস্বীকার করেছেন।

আর একটি ওহীতে পাওয়া যাবে, যেখানে বলা হয়েছে, মসীহ্ হবেন একজন "ধার্মিক গোলাম"। যিনি কষ্টভোগ করবেন ও মারা যাবেন। এই ওহীটি প্রায় ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দানিয়েল কিতাবের ৯:২১-২৬ আয়াতে বলা হয়েছিল,

> "আমার দোয়ার কথা শেষ হইতে না হইতে, — জিবরাইল বেগে উড়ে এলেন— তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন এবং আমার সাথে আলাপ করে বললেন, 'ওহে দানিয়েল, আমি এখন তোমাকে বুঝার ক্ষমতা ও বুদ্ধি দিতে এসেছি—
>
> তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে, **অধর্ম শেষ করার জন্য, পাপ শেষ করার জন্য, অপরাধের কাফফারা দেওয়ার জন্য অনন্তকালস্থায়ী ধার্মিকতা আনার জন্য—**
>
> এ'জন্য, তুমি জেনে নাও, বুঝে নাও, জেরুসালেমকে পুনঃস্থাপন ও তৈরি করার হুকুম বের হওয়া থেকে শুরু করে **অভিষিক্ত ব্যক্তি, শাসনকর্তা**, পর্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হবে, ওটা রাস্তা ও পরিখাসহ আবার তৈরি হবে, মসিবতের সময়েই হবে। সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে **অভিষিক্ত ব্যক্তিকে মেরে ফেলা হবে, এবং তাঁর কিছুই থাকবে না।"**

এই শব্দাংশ, **"তাঁর কিছুই থাকবে না"** কখনও কখনও এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে, "কিন্তু তাঁর নিজের জন্য নয়" অথবা "আর কেউই থাকবে না" অনুবাদের ভিন্নতা সত্ত্বেও কোন অনুবাদটি সবচেয়ে ভালো, তা আমরা বিবেচনা করছি না, তবে সব অনুবাদেই এই অর্থটি পরিষ্কার হয়েছে যে, এই অভিষিক্ত ব্যক্তি বা মসীহ্ সেই সময়ে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন না, কিন্তু **অধর্ম শেষ করার জন্য, পাপ শেষ করার জন্য, অপরাধের কাফফারা দেওয়ার জন্য অনন্তকালস্থায়ী ধার্মিকতা আনার জন্য** এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটবে।'"

মসীহ্ এই দুনিয়াতে আসার ৭৫০ বছর আগে দ্বিতীয় ওহীটি নবী ইশাইয়া লিখেছিলেন। এটি আপনি পরের পৃষ্ঠায় ৮ নং ছবিতে দেখতে পাবেন। মসীহের প্রচার শুরুর ১৫০ বছর আগে

ছবি ৮ -

“Dead Sea Scrolls” (IQIs[খ])-এ প্রাপ্ত ইশাইয়া ৫৩ অধ্যায়, সময়কাল ১২৫-১১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

জেরুসালেমের ইসরাইল মিউজিয়ামের অনুমতিক্রমে ছাপা হলো।

পাককিতাবের এই মূল্যবান অনুলিপিটি তৈরি করা হয়েছিল; আর **১৯৪৮** সাল পর্যন্ত কুমরান গুহায় এটি লুকানো ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র এই কালাম পরিবর্তন করা হয়েছে, এই সম্পর্কে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। সুতরাং, আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি যে, এটি তৌরাত-পুরাতন নিয়মের সেই অংশ যার সম্পর্কে কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে, এগুলো ঈসা মসীহের সময়ে ছিল আর এগুলো **"তাঁর হাতের মধ্যে"** ছিল।

ওহীতে বলা হয়েছে,

"আমরা যা শুনেছি, তাতে কে বিশ্বাস করেছে,

মাবুদের শক্তিশালী হাত কার কাছেই বা প্রকাশিত হয়েছে?—

তিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন ও কষ্টের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল; —

তিনি আমাদের পাপের জন্য বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হ'লেন;

আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর ওপরে বর্ষিত হলো এবং তাঁর ক্ষতগুলো দ্বারা আমাদের আরোগ্য হলো। —

আর ধার্মিক বান্দা নিজের প্রাণ দিয়ে অনেককে ধার্মিক করবেন এবং তিনিই তাদের অপরাধগুলো বহন করবেন। —

কারণ, তিনি মৃত্যুর জন্য তাঁর প্রাণ ঢেলে দিলেন, তিনি পাপীদের সাথে গণ্য হ'লেন; আর তিনিই অনেকের পাপের বোঝা তুলে নিয়েছেন এবং পাপীদের জন্য সাফায়াত করছেন।" (ইশাইয়া ৫৩:১, ৩, ৫, ১১খ, ১২খ)

নবী ইশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একজন ধার্মিক গোলাম- যিনি মানুষের পাপ বহন করে মৃত্যুবরণ করবেন। আর পাপীদের জন্য সাফায়াত করবেন। স্টেনলি রসেনথাল-একজন ইহুদী লেখক, পরে তিনি খ্রীষ্টান হয়েছিলেন- লিখেছেন, একজন শক্তিশালী রাজা আর দুঃখভোগী গোলাম আপাতঃদৃষ্টিতে এই দুটো ধারণার মধ্যে বৈপরিত্ত দেখা যায়, আর ইহুদী আলেমরা কীভাবে এর সমাধান করেছেন, সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন,

"এটি আশ্চর্য নয় যে, অনেক প্রাচীন রাব্বি ইহুদী তালমুদে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে দুইজন মসীহের আগমনের কথা লিখেছেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, কেবল একজন মসীহ্ আসবেন না, যাঁকে মসীহ্ ইবনে দাউদ বলা হবে, তিনি দাউদের মতো রাজত্ব ও শাসন করবেন। কিন্তু আরেকজন মসীহ্ আছেন, যাঁকে মসীহ্ ইবনে ইউসুফ বলে ডাকা হবে, তিনি ইউসুফের মতো কষ্টভোগ করবেন।"[১]

এই দুটো ধারণার মধ্যে কীভাবে মিল হতে পারে? প্রথম শতাব্দীর ইহুদীদের কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। আর ঈসা মসীহ্ ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত এর কোনো উত্তরও তাঁদের জানাও ছিল না।

---

[১] *One God or Three?* by Stanley Rosenthal, CLC Publications, Fort Washington, Pa., 1978, p 63.

ওহীর মাধ্যমে ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের দেখিয়েছেন যে, তিনি- ইবনুল ইনসান, প্রথমবার তাদের সাথে ছিলেন, যেন “তাঁকে উচ্ছিন্ন করা হয় “যেন তিনি “অনেকের পাপের বোঝা তুলিয়া লন। “দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে তিনি বেহেশত থেকে প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে ফিরে এসে এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। দুইজন মসীহ্ সম্পর্কে ইহুদীরা কী ভেবেছিল তা আমরা এখন একই মসীহ-নাসরতের ঈসা মসীহের দুটো প্রকাশের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি।

মসীহ্ সম্পর্কে এই বাড়তি জ্ঞান আমাদের মনে রেখে, এখন আমরা নায়িন গ্রামের আমাদের বন্ধু ইলিয়াসের কথা শুনবো।

জেরুসালেমে আলোচনা

আপনি স্মরণ করতে পারবেন যে, সেই রব্বি, যাঁকে নাসরতীয় ঈসা বলে, তাঁর কথা আমি আপনাদের শুনাচ্ছিলাম, যদিও অনেক বিষয়ই এখনও স্পষ্ট হয়নি। যাঁর কাছে আমি ভেড়া বিক্রি করতাম, সেই ভেড়া ব্যবসায়ী জেরুসালেম থেকে আমাদের এখানে এসেছিলেন। তিনি এই গ্রামেই বড় হয়েছিলেন, আর প্রত্যেক লোককে তিনি ভালো করে চিনতেন। তাই প্রতি বছর ঈদুল ফেসাখের আগে তিনি এই নায়িন গ্রামে এসে ঈদুল ফেসাখের কোরবানীর জন্য মোটাসোটা এক বছর বয়সের ভেড়া কিনতেন।

তবে, তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছিলেন, যার জন্য আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে। কয়েকমাস আগে একদিন কুড়ে ঘর উৎসব বা ঈদুল সুক্‌ক পালন করার সময়ে ঈসা মসীহ্ এবাদতখানায় লোকদের সামনে কথা বলছিলেন। তিনি < বলেছিলেন, আমার কথামতো যদি আপনারা চলেন, তবে সত্যই আপনারা আমার উম্মত। তা'ছাড়া আপনারা সত্যকে জানতে পারবেন আর সেই সত্যই আপনাদের মুক্ত করবে”> (ইউহোন্না ৮:৩১-৩২)

এই কথা শুনে আমাদের কয়েকজন ইহুদী আলেম বিরক্ত হলেন। তাই তাঁরা বললেন, ”তুমি কী বলতে চাও? আমরা < কখনও কারও গোলাম হইনি। তুমি কেমন করে বলছ যে, আমাদের মুক্ত করা হবে?”

ঈসা মসীহ্ উত্তরে বললেন, “আমি সত্যই আপনাদের বলছি, যারা পাপে পড়ে থাকে তারা পাপের গোলাম।”> তারপর তিনি আরও বললেন, < “যদি পুত্র আপনাদের মুক্ত করেন, তবে সত্যিই আপনারা মুক্ত হবেন।> (ইউহোন্না ৮:৩৩-৩৪, ৩৬)

পরে সেই ভেড়ার-ববসায়ী আরো বললেন, ঈসা মসীহ্ তাদেরকে বললেন, <**“আমি আপনাদের সত্যই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে, তবে সে কখনো মরবে না।>”**

এই কথা শুনে ইহুদী আলেমরা আসলেই উত্তেজিত হয়ে বললো, “<এ'বার আমরা সত্যি বুঝলাম যে, তোমাকে ভূতে পেয়েছে। ইব্রাহিম ও নবীরা মরে গেছেন, আর তুমি বলছ,'যদি কেউ

আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে, সে কখনো মরবে না।' তুমি কি পিতা ইব্রাহিমের চেয়েও বড়? তিনি তো মরে গিয়েছেন এবং নবীরাও মরে গিয়েছেন। তুমি নিজেকে কি মনে করো?>

উত্তরে ঈসা বললেন, <—আপনাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন দেখার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশি হয়েছিলেন। (হজরত ইব্রাহিম ঈসা মসীহের জন্মের ১৮০০ বছর আগে এই দুনিয়ায় ছিলেন)

'তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি, " আলেমরা বললেন, 'আর তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখেছ!'> < 'আমি আপনাদের সত্যই বলছি, ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করার আগে থেকেই আমি আছি।'>

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন' **আমি আছি'! কিন্তু 'আমি আছি'** হচ্ছে আল্লাহ্‌র আরেকটি নাম! কোনো মানুষের এই নাম হতে পারে না!

ভেড়া-ব্যবসায়ী বলছিলেন যে, আলেমদের অনেকেই পাথর খুঁজছিলেন। তাঁরা তাঁকে < পাথর মারতে চেয়েছিলেন> কুফরী করার জন্য তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন।[2] কিন্তু আলেমরা মনস্থির করার আগেই একফাঁকে ঈসা মসীহ্‌ একটি থামের আড়ালে চলে গেলেন, তারপর তিনি <গোপনে এবাদতখানা থেকে বের হয়ে গেলেন> (ইউহোন্না ৮:৫১-৫৩, ৫৬-৫৯) [3]

যদি কেউ এই কথা বলে, তাহলে অবশ্যই কুফরী করা হয়। কিন্তু সেই মোজেজাগুলো সম্পর্কে কী বলবো?

ভেড়া-ব্যবসায়ী বলছিলেন, পরের দিন ঈসা মসীহ্‌ এক জন্মান্ধ লোককে ভালো করেছিলেন। সেই জন্মান্ধ লোকটি সারা জীবনেও কোনো একটি জিনিস চোখে দেখেনি। সে সাদা কিংবা কালো, লাল বা নীল কোনো কিছুই দেখেনি।

ঈসা জন্মান্ধ লোকটির কাছে গিয়ে তাঁর সাহাবীদের বললেন, < যতদিন আমি দুনিয়াতে আছি, আমি দুনিয়ার নূর।"

এই কথা বলে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে কাদা করে সেই জন্মান্ধ লোকটির চোখে লাগিয়ে দিলেন। তারপর তাকে বললেন, "যাও, শিলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।" কিছু লোক সেই জন্মান্ধ লোকটিকে ধরে পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। < লোকটি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেললো, আর দেখতে পেল।> এ'ভাবেই এক লোক- যে আগে কিছুই দেখতে পেতো না, সে সব কিছু দেখতে পেল।

---

[2] তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ সিপারার ১৩:৬-১০ আয়াতে কুফরী করার জন্য শাসি- সম্পর্কে বলা হয়েছে।

[3] এই আয়াতগুলো ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা "কোডেক্স ভ্যাটিকানুস" এর ছবিতে ১৮৯ পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন।

পরে যখন কেউ তাঁকে এই মোজেজার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, < তখন ঈসা বললেন, “আমি এই দুনিয়াতে বিচার করার জন্য এসেছি, যেন যাঁরা দেখতে পায় না, তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা অন্ধ হয়।> (ইউহোন্না ৯:১, ৫-৭, ৩৯ক)

আর এভাবেই দিনগুলো যাচ্ছিল। একদিন তিনি লোকদের এমন কথা বলেছিলেন যে তা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। আর পরের দিন তিনি এমন আরেকটি অবিশ্বাস্য মোজেজা করেছিলেন, যা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল।

ভেড়া-ব্যবসায়ী আরো বলছিলেন, ”ভেড়া কেনার জন্য নায়িন গ্রামে আসার আগে তিনি শুনেছেন যে, ঈসা মসীহ্ বলেছেন যে, তিনি মারা যাবেন। যেভাবে আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সেভাবেই তিনি মারা যাবেন।

> < তিনি বললেন, আমিই উত্তম রাখাল; আমার নিজের ভেড়াগুলি আমি জানি এবং আমার নিজের ভেড়ারা সবাই আমাকে জানে- পিতা যেমন আমাকে জানেন ও আমি পিতাকে জানি; এবং ভেড়াদের জন্য আমি আমার প্রাণ দেব। — পিতা আমাকে এ’জন্য ভালোবাসেন, কারণ, **আমি নিজের প্রাণ দেব, যেন আবার তা ফিরিয়ে নিতে পারি**। > (ইউহোন্না ১০:১৪-১৫, ১৭ এই আয়াতগুলোর ছবি আপনি ৯ নং ছবিতে পরের পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন।)

এই কথা কে বুঝতে পারে? ঈসা মসীহ্ সব সময়ে এমন রূপকভাবে কথা বলেছেন। কিন্তু অবশ্যই এখানে এর অর্থ এই যে, তিনি প্রাণ দেবেন যেন পরে তিনি আবার তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু কী ধরনের মসীহ্ তিনি? আর কেনই বা তিনি তা করবেন?

এ প্রসঙ্গে ভেড়া-ব্যবসায়ী বলেন, এবাদতখানায় এ নিয়ে বিরাট আলোচনা হয়েছিল। < তাহাদের মধ্যে অনেকে বললো, এ ভূতেধরা ও পাগল, এর কথা কেন শুনছো? > (ইউহোন্না ১০:২০-২১)

কিন্তু, অন্যেরা বললো, এগুলো তো ভূতেধরা লোকের মতো কথা নয়; ভূত কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে? < (ইউহোন্না ১০:২০-২১)

ভেড়া-ব্যবসায়ী তখন আমাকে এই কথা বললেন, আমার খুবই ভালো লাগছিল। আমি আগের মতোই হতবুদ্ধি হয়ে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু তার কথা মতো আমাদের নামকরা আলেমরাও আমার মতোই সমানভাবে হতবুদ্ধি হয়েছিলেন।

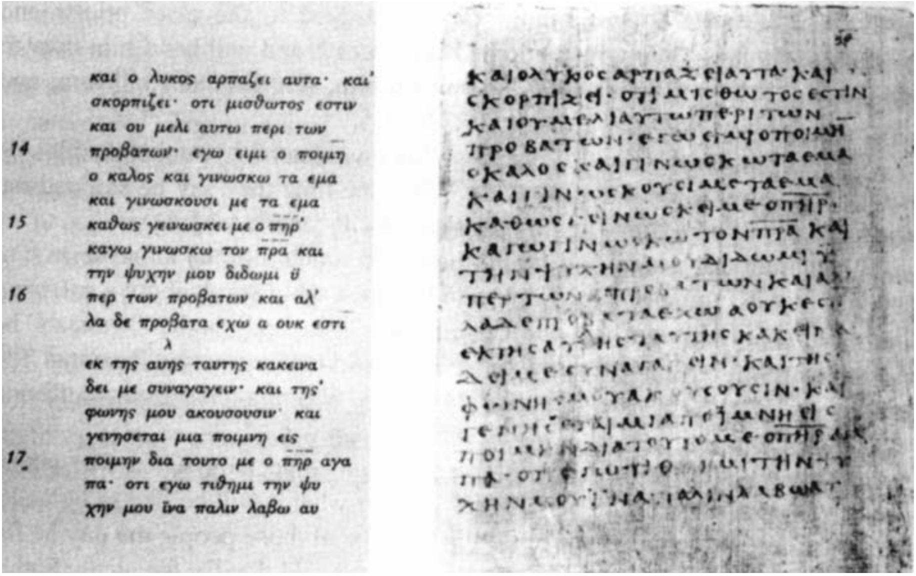

και ο λυκος αρπαζει αυτα· και
σκορπιζει· οτι μισθωτος εστιν
και ου μελι αυτω περι των
14 προβατων· εγω ειμι ο ποιμη
ο καλος και γινωσκω τα εμα
και γινωσκουσι με τα εμα
15 καθως γεινωσκει με ο πηρ
καγω γινωσκω τον πρα και
την ψυχην μου διδωμι ϋ
16 περ των προβατων και αλ
λα δε προβατα εχω α ουκ εστι
λ
εκ της αυης ταυτης κακεινα
δει με συναγαγειν· και της
φωνης μου ακουσουσιν· και
γενησεται μια ποιμνη εις
17 ποιμην δια τουτο με ο πηρ αγα
πα· οτι εγω τιθημι την ψυ
χην μου ϊνα παλιν λαβω αυ

"নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলেই সে ভেড়াগুলো ফেলে পালিয়ে যায়, [[নেকড়ে বাঘ তাদের ধরে নিয়ে যায় আর ভেড়াগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (১৩) কারণ সে কেবল বেতন পাবার জন্য কাজ করে আর ভেড়াগুলোর জন্য চিন্তাও করে না।

(১৪) আমি ভালো রাখাল। আমি আমার ভেড়াগুলোকে জানি এবং তারাও আমাকে জানে। আমি আমার ভেড়াগুলোর জন্য প্রাণ দেবো। (১৫) পিতা যেমন আমাকে জানেন এবং আমি পিতাকে জানি- আমি আমার ভেড়াগুলোর জন্য আমার প্রাণ দেবো। (১৬) আরও ভেড়া আমার আঝে যেগুলো এই খোয়াড়ের নয়, তাদেরও আমাদের আনতে হবে। তারা আমার ডাক শুনবে. তাতে একটি ভেড়ার পাল ও একজন রাখাল হবে। (১৭) পিতা আমাকে এইজন্য মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দেবো, যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি।"]]

ছবি-১০

২০০ খ্রীষ্টাব্দে পেপিরাস পি ৬৬ -এর ওপর লেখা ইউহোন্না ১০:১৩-১৭ আয়াত

জেনেভার বডমার লাইব্রেরীর অনুমতিক্রমে ছাপানো হ'লো।

আরেকদিন ইহুদী আলেমরা ঈসা মসীহকে বললেন, “< তুমি যদি মসীহ্ হও, **স্পষ্ট** করে আমাদেরকে বল।”

ঈসা জবাব দিলেন, “আমি তোমাদেরকে বলেছি, আর তোমরা বিশ্বাস করো না; আমি যে মোজেজাগুলো আমার পিতার নামে করছি, সে’গুলো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।— আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করও না। কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই কাজে বিশ্বাস করো; যেন তোমরা জানতে পারো ও বুঝতে পারো যে, পিতা আমাতে আছেন এবং আমি পিতাতে আছি।>

তিনি যখন এই কথা বললেন, <তাঁরা আবার তাঁকে ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু তিনি তাঁদের হাত এড়িয়ে বের হয়ে গেলেন। > (ইউহোন্না ১০:২৪-২৫, ৩৭-৩৯)

পরবর্তী যে খবরটি ভেড়া-ব্যবসায়ী শুনেছিলেন, তা হলো, ঈসা মসীহ্ ১০জন কুষ্ঠরোগীকে ভালো করার সময়ে একটি হুকুম দিয়ে ছিলেন। < **তিনি কোনো গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে দশজন কুষ্ঠরোগী তাঁর সামনে পড়ল, তারা দূরে দাঁড়ালো, আর তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, —ঈসা, প্রভু, আমাদেরকে দয়া করুন।**

তাহাদেরকে দেখে তিনি বললেন, “যাও, ঈমামদের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে দেখাও।” যেতে যেতে তারা পাকসাফ হলো। > (লূক ১৭:১২-১৪)

এখন, আবারও সেই কথা এখানে বলা হচ্ছে ! ‘কীভাবে তিনি পিতার মধ্যে আছেন আর পিতা তাঁর মধ্যে আছেন?’তাঁকে পাথর মারতে চাওয়ার জন্য আমি আলেমদেরকে দোষ দেই না।

কিন্তু তিনি সব সময়ে চেয়েছেন, যেন লোকেরা বুঝতে পারে তাঁর কথা সত্য আর কথাগুলো যেনো তাদের অন্তরে প্রবেশ করে। আসলে, যদিও তিনি নিজেই সত্য ছিলেন, আর তিনি তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

ভেড়া-ব্যবসায়ী শেষে আমাকে যে-কথা বলতে চাইলেন তা হচ্ছে, তাঁর একজন বন্ধু ঈসা মসীহের সাহাবী ছিলেন, ঈসা মসীহের ১২জন ঘনিষ্ট সাহাবীর তিনি একজন ছিলেন না, কিন্তু ৭০ জন সাহাবীর মধ্যে একজন ছিলেন। ভেড়া-ব্যবসায়ীর বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, জেরুসালেমে যাওয়ার পথে ঈসা মসীহ্ সেই বারোজনকে বললেন, < ইব্‌নুল ইনসানকে মহা-ঈমাম ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে; এবং তারা তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেবে এবং অইহুদীদের হাতে দেবে। আর তারা তাঁকে ঠাট্টা করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ঈসা মসীহ্ তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন? এই কথা তো বিশ্বাস করা যায় না। ওই সব মোজেজা করার শক্তি তো তাঁর ছিল। একবার তাদের কথামতো তিনি তাঁর মুখের কথায় সাগরের ঢেউ ও ঝড়কে থামিয়ে দিয়েছিলেন। (মার্ক ৪:৩৭-৪১)

যদি তাঁর এতো ক্ষমতা থাকে, তবে কীভাবে লোকেরা তাঁকে ছুঁ’তে পারবে, তাঁকে ধরবে? বাঁধবে ও মেরে ফেলবে? এই কথা সত্যি যে, অনেক বছর আগে আমি একজন রাব্বির মুখে কষ্টভোগী “মসীহের” কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে বলেছিলাম, “এটি অসম্ভব, যে-কেউ তোমার একথা শুনবে সেই হাসবে। যদি কেউ মসীহ্ হন, তবে তিনি রাজার মতো দেশ শাসন করবেন। আর এসব জঘন্য খতনাবিহীন রোমীয়দের উৎখাত করবেন! রাব্বি জোর দিয়ে আর কোনো কথা বলেননি। কিন্তু তিনি আমাকে “ধার্মিক কষ্টভোগী গোলামের” কথা বলেছেন।

তুমি জানো যে, আমি এসব বিষয় নিয়ে প্রচুর ভাবি। বিশেষভাবে ছাগলের দুধ দুয়ানোর সময়ে আর আমার মন তখন চিন্তা মুক্ত থাকে তখন এসব বিষয় নিয়ে ভাবি। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে, তাঁর অধীনে বাস করলে কেমন হতো? যেদিন তিনি ৫০০০ লোককে খাইয়েছিলেন, সেদিন তিনি তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন লোককে কঠিন কথা বলেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্‌কে নিজের পিতা বলে ডাকেন, আর বলেন যে, বেহেশতী পিতা আমাদের ভালোবাসেন, এটি আমাদের খুবই আশ্বস্ত করেছিল। আমি এখনও তাঁর কথা স্মরণ করতে পারি, যখন তিনি বলেছিলেন, “তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদেরকে ভালো-ভালো জিনিস দান করতে জানো, তবে এটা কত বড় নিশ্চয়তা যে, তোমাদের বেহেশতী পিতার কাছে যারা কিছু চায়, তাদেরকে কত ভালো-ভালো জিনিস তিনি দান করবেন!”

ওহ্! বলতে ভুলেই গেছি, আমার জন্য কতগুলো ভালো খবর আছে। আমার চাচা - লিবিয়ার কুরিনী শহরে বাস করেন, যাঁকে আমরা ১৫ বছর ধরে দেখি না, - ঈদুল ফেসাখ আর ঈদুল খেমিসসিম উদ্‌যাপনের জন্য এখানে আসছেন। আমি ঈদুল ফেসাখ পালনের জন্য তাঁর সাথে জেরুসালেমে যেতে পারবো না, এবার আমাকে এখানে থেকে আমার দু’ভাই ও আমার দুধ খাওয়ার জন্য ছাগল চরাতে হবে।

কিন্তু যখন ঈদুল খেমিশশিম আসবে, ইনশাল্লাহ, আমি চাচার সাথে অবশ্যই জেরুসালেমে যাবো। তখন আমি আবার ঈসা মসীহের কথা শুনতে পাব। আমি মনে করি তিনি অবশ্যই সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর তারা সবাই এই কথা জানে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাফায়াত করার ক্ষমতা

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, কম করে হলেও কিছু কিছু ইহুদী রাব্বি মসীহের ওপর বিশ্বাস করতেন যে, মসীহ্ এসে দুঃখভোগ করবেন ও পাপীদের জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে সাফায়াত করবেন। অবশ্য, আমরা- খ্রীষ্টানরা যখন বলি যে, ঈসা মসীহ্ হলেন সেই মসীহ্ যাঁরা তাঁকে নাজাতদাতা বলে স্বীকার করবেন, তাঁদের সবার জন্য তিনি সাফায়াত করতে এসেছেন। মুসলমানরা সাধারনতঃ বলে, “নাহ্, হজরত মুহাম্মদ (দঃ)ই কেবল লোকদের জন্য সাফায়াত করবেন।” তিউনিশিয়ার এক প্রাথমিক স্কুলের হেডমাষ্টার সাহেব একবার আমাকে বলেছিলেন, ”কোনো মুসলমান চিরকাল দোযখে থাকবেন না। এর কারণ হচ্ছে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ বা সাফায়াত করবেন।”

খ্রীষ্টানরা বলেন কেবল ঈসা মসীহের সাফায়াত করার অধিকার আছে, কারণ, তিনি ছিলেন কামেল আর তাঁর কোনো পাপ ছিল না। তখন কেউ না কেউ উত্তরে বলবে, “কিন্তু সব নবীরাই তো পাপ থেকে দূরে ছিলেন, তাই তাঁরা পাপ থেকে সুরক্ষিত (মা'ছূম مَعْصُوم)।”

আর যখন খ্রীষ্টানরা বলেন যে, “ঈসা মসীহ্ আমাদের পাপের জন্য মরেছেন, তখন একজন মুসলমান প্রায়ই এই উত্তর দেন যে, আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত নবীকে মেরে ফেলতে দিতে পারেন না।”

সুতরাং, আমরা আবার কোরআনের আয়াত লক্ষ্য করবো। আমরা দেখবো লোকদের এই দাবী সম্পর্কে কোরআন কী বলেছে? অর্থাৎ আমরা শেষের প্রশ্নটাই প্রথমে করবো। আমরা এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে কোরআনের যত আয়াত রয়েছে, সবগুলো আমরা এখানে লক্ষ্য করবো।

আল্লাহ্ কি আগে কখনো তাঁর মনোনীত নবীকে খুন করতে দিয়েছেন?

কোরআনের ৮টি আয়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর সবকটি আয়াত ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। প্রথম অংশের সূরাগুলো নবীদের সম্পর্কে বলেছে, আর এগুলো নিচে দেওয়া হলো।

২ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা (গাভী) ২:৯১ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়,’আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে ঈমান আনয়ন করো,’ তাহারা বলে ‘আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।’ অথচ তাহা ব্যতিত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তাহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সমর্থক।

বলো,'যদি তোমরা মুমিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে?

৩ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আলি ইমরান (ইমরানের পরিবার) ৩:৯১২ আয়াতে বলা হয়েছে,

"—তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং **অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করিত।"**

৩ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আলি ইমরান (ইমরানের পরিবার) ৩:১৮১ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা ও **নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয়** আমি লিখিয়া রাখিব—।"

৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-নিসা (নারী) ৪:৯৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তারা লানতগ্রস্থ হয়েছিল তাদের অংগিকার ভংগের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য, **নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য** এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত, তাদের এই উক্তির জন্য— সুতরাং, তাদের অল্প সংখ্যক লোক বিশ্বাস করে।"

৩ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আলি ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:৯১২ আয়াত থেকে আমরা দেখি যে, এখানে তাদের বিরুদ্ধে আরো ব্যাপক অভিযোগ করা হয়েছে। এখানে নবীদের পাশাপাশি যদিও তারা সাধারণ লোকদের যারা "ন্যায়পরায়নতার নির্দেশ দেয়" এমন লোকদেরও হত্যা করার অভিযোগ করা হয়েছে।

"যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, **অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যাহারা ন্যায়পরায়নতার নির্দেশ দেয়, তাহাদিগকে হত্যা করে**, তুমি তাহাদিগকে মর্মন্তদ শাস্তির সংবাদ দাও।"

শেষে আমরা তৃতীয় দলভুক্ত আয়াতসমূহ দেখবো, এই আয়াতগুলোতে নবীদের সাথে রাসূলগণকেও হত্যা করার অভিযোগ করা হয়েছে।

২ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা বাকারা (গাভী) ২:৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়াছি **এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি,** মরিয়ম তনয় 'ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি, তবে কি যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনপুতঃ নয় তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে Aস্বীকার করিয়াছ এবং **কতককে হত্যা করিয়াছ?"**

৩ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আলি ইমরান (ইমরানের পরিবার) ৩:১৮৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তাহাদিগকে বলো,' আমার পুর্বে যে সকল রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, অবতীর্ণগ্রন্থসমূহ এবং দিপ্তীমান কিতাব-সহ আসিয়াছিল তাহাদিগকেও তো Aস্বীকার করা হইয়াছিল।"

১০ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া সূরা আল-মায়দা (অন্নপাত্র) ৫:৭০ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "বনি-ইসরাইলের নিকট হইতে আমি এই অংগিকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও **তাহাদের নিকটে রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম**। যখনই কোনো রাসূল তাহাদের নিকট এসে কিছু আনে যাহা তাহাদের মনপুতঃ নয়, তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও **কতককে হত্যা করে**।"

এই আটটি আয়াত স্পষ্টভাবে দেখায় যে, **(ক) যেসব ধার্মিক লোক ন্যায় বিচার শিক্ষা দিত (খ) আল্লাহ্‌র নবী (গ) আল্লাহ্‌র রাসলদেরকে** একই সাথে বা আলাদা আলাদা ভাবে প্রায় সময়েই ইহুদী নেতারা **হত্যা করেছে।**

হজরত ইয়াহিয়া বিন জাকারিয়া নবীর ঘটনা এর সবচেয়ে সুপরিচিত উদাহরণ। যদিও কোরআনে তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু ইঞ্জিল শরীফে এই ঘটনা বলা হয়েছে। আর ইহুদী ঐতিহাসিক ফ্লেবিয়াস জোসেফাস এই ঘটনার কথা বলেছেন। *দি এন্টিকুইটস অব দি জিউস* বইয়ের ১৮, ৫ম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন,

> "হেরোদ (ইহুদীদের রাজা) তাঁকে (ইয়াহিয়াকে) হত্যা করেন। তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন আর তিনি *ইহুদীদেরকে সৎজীবন যাপন করার জন্য বলতেন।* (বাঁকা অক্ষর আমি করেছি)

বাঁকা অক্ষরে লেখাগুলো কোরআনের আয়াতের মতো প্রায় একই কথা বলেছে, "যাহারা ন্যায়পরায়নতার নির্দেশ দেয়, তাহাদিগকে হত্যা করে।"

সুতরাং, আমরা এই কথা বলে শেষ করতে চাই, একজন মুসলমান যদি বলেন যে, আল্লাহ্‌ কখনো একজন নবী, রাসূল যেমন ঈসা মসীহকে হত্যা করতে দেবেন না, এই কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন স্পষ্টভাবে বলে যে, সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান মাবুদ অতীতে তা করতে দিয়েছেন।

সব নবীকে পাপ থেকে রক্ষা করা হয়েছে (মা'ছূম)

১. মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে হজরত আদম হলেন প্রথম নবী। আর কোরআন বলে যে, পাপ করার কারণেই তাঁকে বেহেশত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা তাহা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ২০:১২০-১২১ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "অতঃপর শয়তান তাহাকে (আদম) কুমন্ত্রণা দিল— অতপরঃ যখন তাহারা উহা হইতে ভক্ষণ করিল;— **এভাবে আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য** ('আছা عَصَى) [১] **করিল, ফলে সে ভ্রমে** ('গাওয়া غَوَى) **পতিত হইল (বিপথে গেল)**।"

---

[১] এটি খুবই কঠিন শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, অগ্রাহ্য করা, প্রতিরোধ করা, বিদ্রোহ করা, নাফরমানি করা, এই শব্দগুলোর বাধ্যতার একেবারে উল্টো অর্থ প্রকাশ করে।

যদিও শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আরাফের (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৮৯-১৯০ আয়াতে হজরত আদম ও বিবি হাওয়ার নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবু এই আয়াতের মূলভাব অবশই আমাদের তাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় (৪:১ আয়াতেও একই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে) যখন আমাদের বলা হয়,

> "তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়—
>
> **তিনি যখন তাহাদিগকে পূর্ণাংগ সন্তান দান করেন সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র শরিক করে** (শুরাকা' **شُرَكَاء**)।"

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্‌র শরিক করা একটি ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলা হয়েছে, তাই নাফরমানি বা অবাধ্যতার চেয়েও শিরেক জঘন্য পাপ।

২. শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা হুদ (নবীর নাম) ১১:৪৫-৪৭ আয়াতে হজরত নূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "নূহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধনকরিয়া বলিল, "হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত (তাই সে রক্ষা পেতে পারে)—
>
> তিনি (আল্লাহ) বলিলেন,' হে নূহ সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে সে অসৎকর্মপরায়ন! **সুতরাং, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্ভূক্ত না হও।'**
>
> সে (নূহ) বলিল,' হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি. এই জন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। **যদি আপনি ক্ষমা না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্থদিগের অন্তর্ভূক্ত হইব।'"**

আমরা এই আয়াত সম্পর্কে কী বলবো? হজরত নূহ তাঁর অবিশ্বাসী ছেলেকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন। এটি আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, আমরা কদাচিৎ একে পাপ বলি। কিন্তু আল্লাহ্ শক্ত কথা বলে তাকে তিরষ্কার করেছেন। আর হজরত নূহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বুঝতে না পারার জন্য ক্ষমা ও দয়া চেয়ে মোনাজাত করেন।

৩. হজরত ইব্রাহিম, যিনি তিনটি ধর্মের আদি পিতা ছিলেন, আল্লাহ্‌র কাছে তিনি নিজেও মোনাজাত করেছেন। মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা ইব্রাহিম (নবীর নাম) ১৪:৪১ আয়াতে তিনি বলেছেন,

> "হে আমাদের প্রতিপালক যেদিন হিসাব হইবে, সেইদিন **আমাকে**, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে **ক্ষমা করিও।"**

আবারও মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-শুয়ারা (কবিগণ) ২৬:৭৭, ৮১-৮২ আয়াতে তিনি বলেছেন,

"— জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতিত— এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনজীর্বিত করিবেন এবং আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার **অপরাধসমূহ** (খাত্বী'আতী **خَطِيئَتِي**) **মার্জনা** করিয়া দিবেন।"

এখানে দেখা যায় যে, হজরত ইব্রাহিম প্রথম আয়াতের মতো সাধারণভাবে সবার জন্য ক্ষমা চাননি, কিন্তু এখানে সুনির্দিষ্টভাবে **তাঁর নিজের পাপের** জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

৪. আল্লাহ্‌র মহান রাসূল হজরত মূসার সাথে আল্লাহ্‌ সরাসরি কথা বলেছেন, তাঁর কথা যখন আমরা বিবেচনা করি, তখন দেখি যে, তাকেও তিরষ্কার করা হয়েছে। শেষ যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-কাসাস (কাহিনী) ২৮:১৫, ১৬ আয়াতে আমরা পড়ি,

"সে (মূসা) নগরীতে প্রবেশ করিল— সেথায় সে দুইটা লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল- একজন তাহার নিজ দলের এবং অপরজন তাহার শত্রুদলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, 'ইহা শয়তানের কান্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তিকারী।' সে বলিল, **'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলম করিয়াছি; সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করো।'** অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। "

ইউসুফ আলীর ব্যাখা হচ্ছে, হজরত মূসা ইচ্ছে করে সেই মিসরীয়কে হত্যা করেননি। ইহুদী যুদ্ধাকে রক্ষা করার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। এইজন্য হজরত মূসা (আঃ) সেই লোকটিকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চেয়েছেন।

৫. আমরা এখন রাসূল হজরত দাউদের কথা বিবেচনা করবো। যিনি আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় জবুর শরীফ লিখেছেন। প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা সাদ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ) ৩৮:২১-২৫ আয়াতে লেখা আছে,

"তোমার নিকটে বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি? যখন উহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া আসিল, ইবাদতখানায়, এবং দাউদের নিকটে পৌছিল, — উহারা বলিল,'ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ—- অতএব আমাদিগের পক্ষে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।—' এ আমার ভাই, ইহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে,' আমার জিম্মায় এইটি দিয়া দাও।' এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে।'

দাউদ বলিল, 'তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করিবার দাবী করিয়া সে তোমার প্রতি জুলুম করিয়াছে।— করেন না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তাহারা সংখ্যায় স্বল্প।'

দাউদ বুঝিতে পারিল যে, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম। অতঃপর **সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল** ও তাঁহার অভিমুখী হইল।

অতঃপর **আমি তাহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম—।"**

হজরত দাউদ বেথশেবার সাথে ব্যভিচারের পর সেই মহিলার স্বামীকে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলার যে-কাহিনী তৌরাত-পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে,[২] সেই পাপের কথাই কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, এই কথা ইউসুফ আলী বিশ্বাস করেননি।

যদিও হামিদুল্লাহর কোনো সন্দেহ নেই যে, এখানে হজরত দাউদের সেই ভীষণ পাপের কথাই বলা হয়েছে, আর আমিও দুটো কারণে তাঁর এই কথার সাথে একমত পোষণ করছি। এখানে উল্লেখিত ৯৯ও ১টি ভেড়ার সাথে কিতাবুল মোকাদ্দসের বর্ণনার সাথে মিল রয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কোরআনের বর্ণনায় ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "হে দাউদ! — তুমি লোকদিগের মধ্যে সুবিচার করো **এবং খেয়ালখুশীর অনুসরণ করিও না** (আল-হাওয়া **اَلْهَوَىٰ**) কেননা, **ইহা** তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে **বিচ্যুত করিবে**।'

তবে এখানে বাদশাহ **হজরত** দাউদের ব্যভিচারের কথা বলা হোক বা না হোক, এখানে স্পষ্টভাবে তাঁর কিছু সুনির্দিষ্ট পাপের কথা বুঝাতে **(ইহা) বলা** হয়েছে, আর এর জন্য বাদশাহ হজরত দাউদ ক্ষমা চেয়েছেন আর তিনি নত হয়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর প্রতিপালকের অভিমুখী হয়েছিলেন।

৬. প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা সাদ (ব্যবচ্ছেদক বর্ণ বিশেষ) ৩৮:৩৫ আয়াতে হজরত সুলায়মান (আঃ)ও বলেছেন,

> "— হে আমার প্রতিপালক! **আমাকে ক্ষমা করো—"**

যদিও, হজরত সুলায়মান (আঃ)-এর পাপ এখানে খুব স্পষ্ট নয়, তবু মনে হয় এখানে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার চেয়ে ঘোড়ার প্রতি তাঁর বেশী মনোযোগ দেওয়াকে পাপ বুঝানো হয়েছে।

৭. সবশেষে. আমরা নবী হজরত ইউনুস (আঃ)-র কাহিনী দেখবো। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম উদ্দেশ্যমূলকভাবে অমান্য করে নীনবী শহরের অধিবাসীদের সতর্ক করতে না গিয়ে জাহাজ করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এর পরে কী ঘটেছিল, তা প্রাথমিক যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-সাফফাত (শ্রেণীবদ্ধকরণ) ৩৭:১৪২-১৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "—পরে এক বৃহদাকার মৎস তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, তখন **সে নিজেকে ধিক্কার** (মুলীম **مُلِيمٌ**) দিতে লাগিল। সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত. তাহলে তাহাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।"

মাছের পেটের মধ্যে থেকে তিনি যে তাওবা করেছিলেন ,তা মধ্য যুগে নাজিল হওয়া মক্কী সূরা আল-আম্বিয়া)আল্লাহ্‌র সংবাদবাহকগণ (২১:৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে ,

---

[২] ২ শামুয়েল ১১ ও ১২ অধ্যায় এবং জবুর শরীফ ৫১ গজলে হজরত দাউদের তওবার কাহিনী পড়ুন।

"— সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল,' তুমি ব্যাতিত কোনো ইলাহ নাই; তুমি পবিত্র, মহান! **আমি তো সীমালংঘনকারী** (আল-যালিমীন **اَلظّٰلِمِيۡنَ**)।"

এভাবে হজরত ইউনুস (আঃ) স্বীকার করেন যে, তিনি একজন সীমালংঘনকারী পাপী। আর আল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন, তিনি "ধীক্কারযোগ্য" কাজ করেছেন। এই একই শব্দ সূরা সারীয়াহ (বিক্ষীপ্তকারী বায়ূরাশি) ৫১:৪০ আয়াতে ফেরাউনকে "তিরষ্কারযোগ্য "বা "ধীক্কারযোগ্য" বলা হয়েছে।

এই আয়াতগুলি থেকে আমরা দেখেছি যে, সাতজন নবী, এদের মধ্যে দুইজন রাসূল ছিলেন হয় তাঁরা নিজেদেরকে পাপী বলেছেন অথবা আল্লাহ্ তাঁদেরকে পাপী বলেছেন ও পাপ থেকে তওবা করতে বলেছেন। হজরত নূহ (আঃ)-এর পাপ ও হজরত সুলায়মান (আঃ) এর পাপ মনে হতে পারে এগুলো মনের চিন্তার মতো ছোট বা সগিরা গোনাহ বলে আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু তবু আল্লাহ্ তাঁদেরকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন। কিন্তু হজরত আদম (আঃ)-এর বেলায়, কোরআন বলেছে যে তিনি আল্লাহ্র প্রতি নাফরমানি বা বিদ্রোহ (আসা) করেছেন, আর তিনি আল্লাহ্র সাথে শরিক করেছেন, আর হজরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করার পরে তাঁকে "ধীক্কারযোগ্য" বলা হয়েছে।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বিশেষভাবে নিজের পাপের (কাতিয়া) জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। দুইজন রাসূল হজরত দাউদ (আঃ) ও হজরত মূসা (আঃ) তাঁদের পাপের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। হজরত মূসা (আঃ)-এর সেই কাহিনীতে মিসরীয়কে খুন করা ইচ্ছাকৃত না হলেও হজরত দাউদ (আঃ কে সম্পূর্ণভাবে তাঁর পাপের জন্য দায়ী করা হয়েছে।

কিছু কিছু মুসলমান বলতে চান যে, নবী ও রাসূলদের বড় পাপ বা কবিরা গুনাহ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই কথা সত্য নয়।

তানজিয়ার আপিল কোর্টের একজন বিচারক বলেছিলেন যে, "যে ধরণের কাজ একজন সাধারণ লোকের জন্য পাপ হয়, তা একজন নবীর জন্য পাপ নয়।" তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তাঁর কোর্টে কাকে ধীক্কার জানানো হবে ও বেশী শাস্তি পাবে, যে আইন জেনেও আইন ভংগ করে না-কি যে আইন না জেনে ভংগ করে?" তিনি সাথে সাথে উত্তর দিয়েছিলেন, "যে আইন জেনে আইন ভংগ করে সে-ই বেশী শাস্তি পাবে। এখানেও এই শিক্ষা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। **সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন নবী বা রাসুলের দায়িত্ব আরো বেশী, কম নয়।**

এই কথার সাথে কোরআনও একমত পোষণ করে। ৫-৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা আল-আহজাব (দলসমূহ) ৩৩:৭-৮ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ এই নবী ও রাসূলদের কছ থেকে "দৃঢ় অংগিকার" গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদীতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করিবার জন্য। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

"স্মরণ করো, যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, মারয়ম তনয় ঈসার নিকট হইতে, **আর তাহাদের নিকট**

হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অংগিকার। সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য।

আমরা শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, এটা সুস্পষ্ট ও সহজে বুঝা যায় যে, কোরআনের শিক্ষা অনুসারে নবী ও রাসুলেরা পাপ করেছেন।

৮. তবে এখন আমরা একটি সংকটপুর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। সংকটপুর্ণ এইজন্য বলছি যে, এটি পাঠকের মনে ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে- কিন্তু আমরা যদি সত্যের শেষ আলোর বিন্দুটুকু দেখতে চাই, তবে আমাদেরকে এই বিষয়ে যাই ঘটুক না কেন আলোচনা করতে হবে।

কোরআন হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁর পাপ সম্পর্কে কী বলেছে? আমরা এই আয়াতগুলো সূরা নাজিলের সময়ক্রমানুসারে লক্ষ্য করবো। প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-মুদাচ্ছির (বস্ত্রাবৃত) ৭৪:১-৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি! উঠো এবং সতর্কবাণী প্রচার করো এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা করো। তোমার **পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো**, অপবিত্রতা হইতে দূরে থাকো।" (কারণ, এটি আল্লাহ্‌র রাগকে জাগিয়ে তুলবে।)

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-দুহা (দিবসের প্রথম প্রহর) ৯৩:৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাকে এতিম অবস্থায় পান নাই

আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

তিনি তোমাকে পাইলেন **পথ সম্পর্কে অনবহিত** (পথভ্রষ্ট বা দ্বাল্লান ضَالًّا)।"

এখানে যে শব্দ (দ্বাল্লান ضَالًّا) **ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রাথমিক মক্কী যুগে নাজিল হওয়া সূরা ফাতিহায় ১:৫-৭ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে. আর প্রতিটি মুসলমান প্রতিদিন নামাজের সময়ে তা বলেন:**

"আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করো,

তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ,

যাহারা ক্রোধ-নিপতিত নহে, **পথভ্রষ্টও** (আল-যাল্লিন اَلضَّالِّيْن) **নহে।"**

সূরা ইনশিরাহ (বিদারণ) ৯৪:৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

"আমি কি তোমার (মুহাম্মদ) বক্ষ তোমার কল্যানে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই। **আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার** (ওয়িয্‌রাক وِزْرَكَ বা বোঝা) যাহা **ছিল, যাহা তোমার পৃষ্টের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক**, এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি। কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে— অতএব, যখনই অবসর পাও সাধনা করিও এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

এই আয়াতগুলোকে অবশ্যই শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আনআম (গবাদি পশু) ৬:৩১ আয়াতের সাথে তুলনা করা যায়, এখানে বলা হয়েছে,

> “**—তাহারা তাহাদিগের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ** ('আওযারাহুম أَوْزَارَهُمْ বা বোঝা) বহন করিবে; দেখো, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট!”

পাঠকেরা হয়তো স্মরণ করতে পারবেন যে, আমরা আগের পৃষ্ঠায় আমরা এই শব্দটিকে বোঝা বলে অনুবাদ করেছি। আমরা দেখেছিলাম যে, ”কেউই অন্যের বোঝা বহন করতে পাররে না, ” -এর অর্থ হচ্ছে, “কেনো পাপী অন্যের পাপ বহন করতে পারেনা।”

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আবাসা (ভ্রু-কুঞ্চিত করা) ৮০:১-১১ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “সে (নবী) ভ্রুকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল, কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল। তুমি কেমন করিয়া জানিবে- সে হয়ত পরিশুদ্ধ (ধার্মিকতায়) হইত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
>
> পক্ষান্তরে, যে পরওয়া করে না, তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ। অথচ সে নিজ পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোনো দায়িত্ব নাই, অন্যপক্ষে যে তোমার কাছে ছুটিয়া আসিল, আর সে সশংকচিত্ত, তুমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলে; নাহ, **এই আচরণ অনুচিত**।”

এখানে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে কারও প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়ে অন্যকে অবহেলা করার জন্য তিরষ্কার করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো সম্পর্কে জনাব হামিদুল্লাহ টিকায় লিখেছেন, “এরকম ওহী সব সময়েই নবীর জন্য সুখকর ছিল না।

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-মুমিন (বিশ্বাসী)৪০:৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “অতএব, তুমি (মুহাম্মদ) তুমি ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, **তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা (জান্‌বিকা ذَنْبِكَ) প্রার্থনা করো** এবং সকাল-সন্ধায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।”

১ হিজরীর মাদানী সূরা আল-মুহাম্মদ (নবীর নাম) ৪৭:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “সুতরাং, জানিয়া রাখো, আল্লাহ্‌ ব্যতিত অন্য কোনো ইলাহ নাই, **ক্ষমা প্রার্থনা করো, (জান্‌বিকা ذَنْبِكَ)** তোমার এবং মুমিন নর-নারীদিগের **ত্রুটির জন্য**। আল্লাহ্‌ তোমাদিগের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।”

এখানে যেহেতু হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও অন্যান্য বিশ্বাসীদের পাপ একত্রে এবই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে, মনে হয় উভয়ের পাপ একই রকম ছিল।

৫-৬ হিজরী থেকে নজিল হওয়া সূরা নিসা (নারী) ৪:১০৫-১০৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

“তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মিমাংসা করো এবং বিশ্বাসভংগকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না।

এবং আল্লাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো (তোমার অপকার করার সংকল্পের জন্য), আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে তাহাদের পক্ষে ||eev`-বিসম্বাদ করিও না, আল্লাহ্ বিশ্বাসভংগকারী পাপীকে পসন্দ করেন না।”

অনেক তাফসিরকারকেরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আর ইউসুফ আলী তা উদ্ধৃত করেছেন, এগুলোর ওপর ভিত্তি করে যে শব্দ ব্র্যাকেটের মধ্যে একজন অনুবাদক যোগ করেছেন তা এখানে দেওয়া হয়েছে, ইউসুফ আলী লিখেছেন যে, একজন অপরাধী মুসলমানের পক্ষে একজন নিরপরাধ ইহুদীর বিপক্ষে রায় দেওয়ার জন্য তিনি যখন প্রলোভিত হয়েছিলেন, তখন এই সূরা নাজিল হয়েছিল।

৬ হিজরী থেকে নজিল হওয়া সূরা আল-ফাত্হ (বিজয়) ৪৮:১-২ আয়াতে বলা হয়েছে,

“নিশ্চয়ই আমি তোমদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, **যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষৎসমূহ ত্রুটিসমূহ (পাপ বা জান্‌বিকা ذَنْبِكَ) মার্জনা করেন** এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।”

৯ হিজরী থেকে নজিল হওয়া সূরা আল-তাওবা (অনুশোচনা) ৯:৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

“**আল্লাহ্ তোমাকে** (মুহাম্মদ) **ক্ষমা করিয়াছেন!** কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যহতি দিলে?”

আল্লাহ্র কাছে না জেনে অথবা হঠকারিতা করে কিছু লোককে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে তিরস্কার করা হয়েছে।

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে ১০ হিজরী থেকে নজিল হওয়া সূরা আল-নাসর (সাহায্য) ১১০:৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

“তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা -মহিমা ঘোষণা করিও এবং **তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিও**, তিনি তো তওবা কবুলকারী।”

আমরা এই তথ্যগুলোকে সারকথায় বলতে পারি, হজরত আদম (আঃ), হজরত ইউসুফ (আঃ) ও হজরত দাউদ (আঃ) এর মতো হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কোনো বড় পাপ বা কবিরা গুনাহ করেননি। ওপরের আয়াতগুলোতে আলোচিত ও হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে যেজন্য তিরস্কার করা হয়েছে, তা হচ্ছে, হজরত মোহাম্মদের সেই কাজগুলো করা যে কোনো নেতার পতনের জন্য খুবই সহজ। আর তাঁর আগে যেসব নবীরা ছিলেন তাঁদের জীবনেও এগুলো দেখা গিয়েছে। আমরা “তোমার পাপ (জাম্বিকা) “এই কথা দ্বারা কী বুঝতে পারি? এই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হযনি, কিন্তু আমরা বাধ্য

হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে, আমরা যাঁদের কথা ওপরে আলোচনা করেছি, সেই সব নবী ও রাসূলদের মতোই হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিষ্পাপ ছিলেন না।

এই কথা শুনে পাঠকের মেজাজ একেবারেই বিগড়ে যেতে পারে-এমনকি রাগও করতে পারেন। এই আয়াতগুলো কাওকে আনন্দ দেবার জন্যও এখানে দেওয়া হয়নি, বরং সাফায়াতের বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যই এখানে দেওয়া হয়েছে।

সাফায়াত করবেন কি করবেন না, এই সম্পর্কে দুটো মতবাদ

এই অংশের শুরুতে আমি প্রাথমিক স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের কথা উদ্ধৃত করেছিলাম, যিনি বলেছিলেন, হজরত মোহাম্মদের সাফায়াতের কারণে কোনো মুসলমানই শেষ পর্যন্ত দোযখে থাকবেন না।

একই ধরনের বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য *বরকতের দলিল* (জালা'ইলু আল-খায়রাত دَلاَئِلُ اَلْخَيْرَات) নামে আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সুলায়মান আল-জাজুলি একটি বই লিখেছেন। এটি অনেক "বটতলার বই" গুলোর মধ্যে একটি যা সমস্ত উত্তর আফ্রিকা জুড়ে এমনকি মার্সিলেই শহর পর্যন্ত বিক্রি হয়। এই বইয়ে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বলা হয়েছে,

> "মুসলিম উম্মার পক্ষে সাফায়াতকারী ও কেয়ামতের দিনে অনেক সাফায়াতকারীদের মধ্যে একজন সাফায়াতকারী।"[৩]

অন্য খানে হজরত মোহাম্মদের দু'শো নাম" এই অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন ,তাঁকে ডাকা হবে , তিনি

> "কামেল, — সত্য— সাফায়াতকারী—- পবিত্রতার রূহ— সত্যের রূহ— বেহেস্তের চাবি— পাপ ক্ষমাকারী— সাফায়াতের কর্তৃত্বের অধিকারী— ।[৪]

এই বইয়ের অন্য জায়গায় হজরত মোহাম্মদের আরও নাম যোগ করা হয়েছে, যেমন,

> "জ্যোতির জ্যেতি"— "ধার্মিকদের প্রভু",[৫] এমনকি আল্লাহ্‌র নামও তাঁকে দেওয়া হয়েছে, "করুণাময় (আল-রা'উফ اَلرَّؤُوف) এবং দয়ালু (আল-রাহীম اَلرَّحِيم)[৬]

এই বইটি উত্তর আফ্রিকায় এতো সুপরিচিত যে, আমি যেখানে কাজ করি, সেখানের ডিসপেনসারিতে দুইজন পুরুষ নার্স নিজেদের মন থেকেই গানের মতো করে তা আবৃত্তি করতে পারেন।

---

[৩] আল-মানার, তিউনিস,১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪

[৪] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-২৫-৩০

[৫] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৯২

[৬] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-১৫৮

সবশেষে, আমি নিচের এই গল্পটি গূণ বিচার করবো, আমি এই গল্পটি মরক্কো ও তিউনিশিয়ায় দু'জায়গাতেই শুনেছি। (বাংলাদেশেও শুনা যায়)

কেয়ামতের দিনে,

হজরত মূসার উম্মতেরা তাঁকে বলবে, হে মূসা ! আমাদের জন্য সাফায়াত করুন, ”তিনি উত্তরে বলবেন, ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসী, ”[৭]

ঈসা মসীহের উম্মতেরা তাঁকে বলবে, হে ঈসা মসীহ্ ! আমাদের জন্য সাফায়াত করুন, ”তিনি উত্তরে বলবেন, ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসী,

হজরত মোহাম্মদের উম্মতেরা তাঁকে বলবে, হে মুহাম্মদ (দঃ)! আমাদের জন্য সাফায়াত করুন, ”তিনি উত্তরে বলবেন, ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি।

এরকম বিশ্বাস ও কাহিনী বারবার শুনে শুনে উত্তর আফ্রিকার (এমনকি বাংলাদেশেও) মুসলমানদের মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিনে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) অবশ্যই তাঁদের জন্য সাফায়াত করবেন। তাই, আমরা আবারও কোরআন থেকে বিশদ আলোচনা করে দেখবো যে, আসলেই সারা দুনিয়ার প্রচলিত ইসলাম ধর্মে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, কেয়ামতের দিনে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাদের পক্ষে সাফায়াত করবেন, কোরআন থেকে তাদের এই বিশ্বাসের সমর্থনে কোনো প্রমাণ আছে কি?

কোরআনের শিক্ষা অনুসারে কেয়ামতের দিনে সাফায়াত সম্পর্কে বর্ণনা

কোরআনে আমরা দেখি যে, ক্রিয়া পদ “তিনি সাফায়াত করেন” (শাফা'আ شَفَعَ)। সাফায়া এই মূল শব্দ থেকে যে ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদ রয়েছে, তা সব মিলিয়ে গোটা কোরআন শরীফে আল্লাহ্কে বুঝাতে ২৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে।[৮] কেবল ১টি আয়াত ছাড়া -কারণ, এই আয়াতটি আমি বিশেষভাবে আলাদা করে দেখবো- এই আয়াতগুলোকে স্বাভাবিকভাবে ৩টি দলে ভাগ করা যায়। আমরা এখন প্রতিটি আয়াত বিশদভাবে দেখবো। প্রয়োজন অনুসারে এই আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য এর সাথে জড়িত প্রসঙ্গও আমরা ব্যাখ্যা করে দেখবো।

১. মূর্তি বা দেব-দেবী সাফায়াত করতে পারবে না।

---

[৭] এখানে স্মরণ করা যেতে পারে এই কথা সূরা আল-আরাফের ৭:১৪৮-১৫৬ আয়াতের বর্ণিত বক্তব্যের বিরোধিতা করছে। কারণ, সেখানে বলা হয়েছিল, মুসা নিজের ও তাঁর লোকদের জন্য মুনাজাত করে বলেছেন,“আমাদিগকে ক্ষমা করো ও আমাদিগের প্রতি দয়া করো।'

[৮] এই “শাফায়া” শব্দ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'সুপারিশ' সূরা ৪:৮৫ আয়াতে ৪ বার ও সূরা ৮৯:৩ আয়াতে ১ বার ব্যবহার করা হয়েছে। কিন' কোনো সময়েই ওই আয়াতগুলোতে আল্লাহর সাথে শাফায়াতের সর্ম্পক আছে একথা বলা হয়নি

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-মুদাচ্ছির (বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি) ৭৪:৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, (এখানে ২ বার বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করা হয়েছে)

"তখন **সুপারিশকারীদিগের সুপারিশ** উহাদিগের কোনো কাজে আসিবে না।

মধ্য যুগের মক্কী সূরা ইয়াসিন (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ৩৬:২৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

"দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে চাহিলে উহাদিগের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধারও করিতে পারিবে না।।"

মধ্য যুগের মক্কী সূরা রূম (রোম সাম্রাজ্য) ৩০:১৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

"উহাদিগের দেব-দেবীগুলি উহাদিগের সুপারিশ করিবে না এবং উহারাই উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে Aস্বীকার করিবে।"

মধ্য যুগের মক্কী সূরা আল-শুয়ারা (কবিগণ)২৬:১০০-১০১ আয়াতে বলা হয়েছে,

"পরিণামে, আমাদিগের কোনো শুপারিশকারী নাই; এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নাই।"

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:৫৩ আয়াতে (একবার ক্রিয়া পদ ও একবার বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে) বলা হয়েছে,

"তাহারা কি শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল, আমাদিগের কি এমন কোনো সুপারিশকারী আছে যে আমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে— ।" (এখানে প্রসঙ্গ অনুসারে এর অর্থ হচ্ছে, "এখন আমাদের সুপারিশ করার জন্য আমাদের মিথ্যে দেবতারা কোথায় রয়েছে।"

শেষ যুগের মক্কী সূরা মুমিন (বিশ্বাসী) ৪০:১৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"পরিনামে আমাদিগের জন্য কোনো সুপারিশকারী নাই। এবং কোনো সহৃদয় বন্ধু নাই।" জালিমদিগের জন্য কোনো অন্তরংগ বন্ধু নাই, যাহার শুপারিশ গ্রাহ্য হইবে এমন কোনো সুপারিশকারী নাই।"

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আনআম (গবাদী পশু) ৬:৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমরা যাহাদিগকে তোমাদিগের ব্যাপারে শরিক করিতে সেই সুপারিশকারীগণকেও (মিথ্যে)তোমাদিগের সহিত **আমি দেখিতেছি না;"**

২ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা বাকারা (গাভী) ২:৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমরা সেইদিনকে ভয় করো, যেদিন কেহ কাহারও কোনো কাজে আসিবে না এবং কাহারও সুপারিশ গ্রহণ হইবে না এবং **কাহারও নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ গৃহিত হইবে না** এবং তাহারা কোনো প্রকার সাহায্য পাইবে না।

২ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা বাকারা (গাভী) ২:১২৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

"এবং তোমরা সেইদিনকে ভয় করো, যেদিন কেহ **কাহারও কোনো উপকারে আসিবে না**, এবং কাহারও নিকট হতে কোনো ক্ষতিপূরণ গৃহিত হইবে না, এবং **কোনো সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না** এবং তাহারা কোনো সাহায্যও পাবে না।"

২ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা বাকারা (গাভী) ২:২৫৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"সেই দিন আসবার পুর্বে -যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং **সুপারিশ থাকিবে** না।"

২. সাফায়াত করার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতে আছে

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-যুমার (মানুষের দল) ৩৯:৪৩-৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতিত অপরকে সুপারিশ ধরিয়াছে? বলো, 'উহাদিগের কোনো ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?' বলো,'সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই এখতিয়ারে,'।"

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আনআম (গবাদী পশু) ৬:৭০ আয়াতে বলা হয়েছে,

"ইহা (সত্য) দ্বারা তুমি তাহাদিগকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতিত তাহার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তাহা গৃহিত হইবে না।"

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আনআম (গবাদী পশু) ৬:৫১ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তুমি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতিত তাহাদিগের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।"

মধ্য যুগের মক্কী সূরা আল-সাজদা (প্রণিপাত) ৩২:৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তিনি ব্যতিত তোমাদিগের কোনো অভিভাবক নাই এবং সাহায্যকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?"

৩. কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই সাফায়াত করা যাবে।

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল- নাজম (নক্ষত্র) ৫৩:২৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

"আকাশে কত **ফেরেশতা** রহিয়াছে! উহাদিগের কোনো **সুপারিশ ফলপ্রসু হইবে না, যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমতি না দেন**।"

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা সাবা (দেশ বিশেষ) ৩৪:২৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

“যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতিত আল্লাহ্‌র নিকট **কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসু হইবে না।”**

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-আম্বিয়া (আল্লাহ্‌র সংবাদবাহক গণ) ২১:২৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

“তাহারা শুপারিশ করে শুধু উহাদিগের জন্য যাহাদিগের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।”

মধ্য যুগের মক্কী সূরা মরিয়ম (এক ধার্মিকা মহিলার নাম) ৯৯:৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

“যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যতিত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।”

মধ্য যুগের মক্কী সূরা তাহা (ব্যবচ্ছেদক শব্দ) ২০:১০৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

“দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন সে ব্যতিত কাহারও সুপারিশ সেইদিন কোনো কাজে আসিবে না।”

শেষ যুগের মক্কী সূরা ইউনুস (নবীর নাম) ৯০:৩ আয়াতে বলা হয়েছে,

“তাঁহার অনুমতি লাভ না করিয়া **সুপারিশকারী কেহ** নাই।”

২ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা বাকারা (গাভী) ২:২৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

“আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার। **সে কে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে?** ”

*** এই চারটি আয়াত স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউই সাফায়াত করতে পারবেন না।

৪. সত্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতারা সাফায়াত করতে পারেন।

সবশেষে, আরেকটি আয়াত আমরা দেখবো, যে আয়াতটিকে আমি আলাদা বলে মনে করি, কারণ, এখানে আরেক ধরণের লোকের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, যিনি সাফায়াত করতে পারবেন।

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-যুখরোখ (সুবর্ণ) ৪৩:৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

“আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে (মিথ্যে দেবতা) ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদিগের নাই, তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া সাক্ষ্য দেয় তাহারা ব্যতিত।”

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, - এই লোকগুলো কে, যাঁরা সত্য উপলব্ধি করে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেন?

জনাব ইউসুফ আলী এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে টিকায় লিখেছেন, অনেক তাফসীরকারক এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, অনেক রাসূল যারা ইঞ্জিল শরীফের মিল সম্পর্কে প্রচার করেছেন, এখানে তাঁদের কথাই বলা হয়েছে। অন্যরা, বিশেষভাবে ইউসুফ আলী নিজেও মনে করেছেন যে, এখানে হজরত মোহাম্মদের কথাই বলা হয়েছে।

এই আয়াতে বিশেষভাবে কারও কথা বলা হয়নি। একজন কেবল এই প্রশ্ন করতে পারেন, এখানে কি হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর কথা বলা হয়েছে? এখানে কি হজরত মোহাম্মদের কথা বলা হয়েছে? না-কি এখানে ঈসা মসীহের কথা বলা হয়েছে? ঈসা মসীহ্ হচ্ছেন একমাত্র নবী, যিনি নিজের সম্পর্কে দাবী করেছেন, **"আমি — সত্য।"** কিন্তু শেষে আমরা বলি যে, আমরা জানি না। বিশেষভাবে কারও কথা আমাদের বলা হয়নি।

সারকথা হলো এই যে, তিনি সাফায়াত করবেন" এখান থেকে ১১টি আয়াতের মধ্যে ১৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে যে, এই কথা বোকার মতো অর্থহীন চিন্তা করা হবে যদি কেউ ভাবে যে, কেয়ামতের দিনে মৃত মূর্তিরা সাফায়াত করতে পারবে। তৃতীয়ত, কে সাফায়াত করতে পারবে, এই বিষয়টি আটটি আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে,

ক) আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি, এমনকি ফেরেস্তরাও সাফায়াত করতে পারবে না।

খ) যারা আল্লাহ্র মনোনীত তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষে সাফায়াত করতে পারবেন।

গ) যিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেন, কেবল তিনি সাফায়াত করতে পারবেন।

৫. যদিও সাফায়াত শব্দটি এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়নি, তবু এই বিষয়ে উল্লেখিত অন্যান্য আয়াতগুলো এখানে দেওয়া হলো।

ওপরে উল্লেখিত একই শিক্ষা কিন্তু বিভিন্ন শব্দে আরেক প্রকাশ ভংগীতে কোরআনে দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-ইনফিতর (বিস্ফোরণ) ৮২:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "**সেইদিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ থাকিবে না** এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্র।"

প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা আল-নাবা (সংবাদ) ৭৮:৩৭-৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "— **তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদিগের থাকিবে না।** সেই দিন রূহ্ ও ফেরেশতাগণ সরিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; **দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতিত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।**"

শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আন আম (গবাদী পশু) ৬:১৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

"—প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটাইযাছিলে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।" ***

*** আমরা ৬-৭ পৃষ্ঠায় দেখেছি যে, গাঢ় অক্ষরে লেখা অংশগুলো অন্যান্য আরো চারটি সূরা যেমন, ১৭:১৫, ৩৫:১৮, ৩৯:৭ এবং ৫৩:৩৮ আয়াতে পাওয়া যায়,

অন্য লোকদের জন্য মোনাজাত করতে আল্লাহ্ যে সব নবীদেরকে হুকুম দিয়েছেন

কোরআনে অনেক আয়াত রয়েছে, যেখানে অন্য লোকদের জন্য মোনাজাত করতে বা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নবীদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এসব নবীদের কী হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তা আমরা লক্ষ্য করবোঃ

১. হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে বলা কথাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা মুহাম্মদ (নবীর নাম) ৪৭:১৯ আয়াতে বলা হয়েছে,

"সুতরাং, জানিয়া রাখো, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোনো ইলাহ নাই, **ক্ষমা প্রার্থনা করো, তোমার ত্রুটি** (জান্‌বিকা **ذَنْبِكَ**) এবং **মুমিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।**"

২. হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আলি ইমরান (ইমরানের সন্তানগণ) ৩:১৫৯ আয়াতে এখানে হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"— তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করো ও **তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো**।"

৪-৫ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-মুনাফিকুন (অবিশ্বাসীগণ) ৬৩:৫ আয়াতে ভণ্ডদের যারা বিশ্বাসী হওয়ার ভান করেছিল, তাদের কথা বলা হয়েছে,

"যখন উহাদিগকে বলা হয়, **'তোমরা আইস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন**।' তখন তাহারা মাথা ফিরাইয়া লয়— ।"

৫-৬ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-নিসা (নারী) ৪:৬৪ আয়াতে সেই সব ভণ্ড লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা তাঁর কাছে আসতে অস্বীকার করে, এখানে বলা হয়েছে,

"যখন তাহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন তাহারা তোমার নিকটে আসিলে ও আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং **রাসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলে তাহারা আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল** ও দয়ালুরূপে পাইবে। "

৫-৬ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-নূর (জ্যোতি) ২৪:৬২ আয়াতে যারা কোনো সমষ্টিগত ব্যাপারে রাসুলের সাথে একমত হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,, তারা কোনো কাজের ব্যাপারে বাইরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিতে বলা হয়েছে,

> "— তাহারা তাহাদিগের কোনো কাজে বাহিরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাহিলে তাহদিগের মধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং **তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"**

৮ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-মুমতাহিনা (পরিক্ষীত) ৬০:১২ আয়াতে মুমলমান হতে আগ্রহী একজন মহিলার কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে,

> "হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন তোমার কাছে আসিয়া বায়াত পড়ে— তখন তাহাদের বায়াত গ্রহণ করিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিও।"

৯ হিজরী থেকে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-তাওবা (অনুশোচনা) ৯:১০৩ আয়াতে আরবের মরুভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "উহাদিগের সম্পদ হইতে 'সাদাকা' গ্রহণ করিবে, — তুমি উহাদিগকে দোয়া করিবে। **তোমার দোয়া উহাদিগের জন্য** ‼PË-স্বস্তিকর| "

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যে সাফায়াত করবেন, এই শিক্ষা এখানে সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু এর আগে যে-কথা বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিনে এই সাফায়াত কোনো কিছুই করতে পারবে না। আর দ্বিতীয়তঃ কোরআন আমাদের বলে যে, অন্যান্য নবীদেরও এভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছিল।

২. হজরত নূহকে তাঁর পবিবার ও লোকদের পাশাপাশি তাঁর নিজের জন্যও দোয়া করেছিলেন। প্রাথমিক যুগের মক্কী সূরা নূহ (নবীর নাম) ৭১:২-৪, ৭-১০ আয়াতে তাঁর প্রচারের কথা বলা হয়েছে,

> সে (নূহ) বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদিগের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এই বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তাঁহাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো; তিনি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন—'
>
> সে বলিয়াছিল, "হে আমার প্রতিপালক! আমি যখনই উহাদিগকে আহ্বান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা করো, উহারা কানে আঙ্গুলি দেয়, — আর আমি বলিয়াছি,' তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল,'"

একই সূরার ২৮ আয়াতে আমরা পড়ি,

> "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মুমিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মুমিন পুরষ ও মুমিন নারীদিগকে--।"

৩. হজরত ইব্রাহিম অন্যদের ছাড়াও নিজের জন্য দোয়া করেছেন, শেষ যুগের মক্কী সূরা ইব্রাহিম (নবীর নাম) ৯৪:৪১ আয়াতে বলা হয়েছে,

"[ইব্রাহিম বললেন] হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করিও।"

মধ্য যুগের মক্কী সূরা আল-শুয়ারা (কবিগণ) ২৬:৮৬ আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের দোয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে,

"আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো তিনি তো পথভ্রষ্টদিগের (আল-যাল্লীন **اَلضَّآلِّيْن**) **শামিল ছিলেন।"**

৯ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা ৯:১১১-১১৪ আয়াতে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে যে, বিশ্বাস সম্পর্কে জানার পর ঘনিষ্ট আত্মীয়রা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, তাদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হযেছে।

শেষ যুগের মক্কী সূরা হূদ (নবীর নাম) ৯১:৭৪ আয়াতে আমাদের বলা হয়েছে, নিজের লোক ছাড়াও হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এমনকি অন্য এক নবী-তাঁর ভাইপো হজরত লুত (আঃ)-এর লোকদের জন্য দোয়া করেছেন।

"অতঃপর যখন ইব্রাহিমের ভীতি দূরীভূত হইল, এবং তাঁহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন **সে লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে** আমার সহিত **বাদানুবাদ** (ইউজাদিলুনা **يُجَادِلُنَا**) করিতে লাগিল।" (এখানে আরবী যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা দুইজন লোকের মধ্যে বিবাদির পক্ষে অভিযোগের উত্তর দেওয়া বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আর হামিদুল্লাহ এই শব্দের অনুবাদ করেছেন "বাদানুবাদ")।

৪. হজরত **ইয়াকুব (আঃ)কে** তাঁর **১০**জন ছেলের পাপ ক্ষমা করার জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে,

শেষ যুগের মক্কী সূরা ইউসুফ (নবীর নাম) ১২:৯৭-৯৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"উহারা বলিল, '**হে আমাদের পিতা আমাদিগের পাপের** (জুনূবানা **ذُنُوبَنَا**) **জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন**; আমরা তো অপরাধী (খাত্বি'ইন **خَاطِئِين**)।' সে বলিল.' **আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব**। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

৫. শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তি স্থান) ৭:১৪৮-৯৫৬ আয়াতে সোনার বাছুরের কাহিনী ও ১৫৫ আয়াতে হজরত **মূসা** (আঃ) কীভাবে তাঁর লোকদের জন্য দোয়া করেছেন সেই কথা বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন,

"— হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে! আমাদিগের মধ্যে যাহারা নির্বোধ, তাহারা যাহা করিয়াছে সেইজন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্দারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী

করো এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো। তুমিই তো আমাদিগের অভিভাবক; সুতরাং, **আমাদিগকে ক্ষমা করো ও আমাদিগের প্রতি দয়া করো** এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ট।"

কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখিত নবী, অন্য লোকদের জন্য যাঁরা দোয়া করেছিলেন

কিতাবুল মোকাদ্দসও আমাদের বলে যে, নবীরা এভাবে অন্যলোকদের জন্য দোয়া করেছেন,

১. ওপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াতে হজরত **মূসা** (আঃ) যেভাবে দোয়া করেছেন, তওরাতের হিজরত কিতাবের ৩২:৩১-৩২ আয়াতেও সেভাবে একই দোয়ার কথা বলা হয়েছে,

"পরে মূসা মাবুদের কাছে ফিরিয়া গিয়া বললেন, হায় হায়, এই লোকেরা কবিরা পাপ্ করিয়াছে, নিজেদের পূজার জন্য সোনার মূর্তি তৈরি বানাইয়াছে। আহা! **এখন উহাদের পাপ্ মাফ করো-**; আর যদি না করো, তবে আমি আরজ করিতেছি, তোমার লিখিত কিতাব হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেলো।"

২. হজরত **দানিয়েল** (আঃ) এভাবে দোয়া করেছেন,

"হে প্রভু, শুন, **হে প্রভু মাফ করো!** হে প্রভু, মনোযোগ দাও ও কাজ করো, দেরি করিও না; হে আমার আল্লাহ্, তোমার নিজের খাতিরে কাজ করো, কেননা তোমার নগর ও তোমার লোকেরা তোমার নামেই পরিচিত।" (দানিয়েল ৯:১৯-২০)

৩. হজরত **আমোষ** (আঃ) তাঁর লোকদের জন্য দোয়া করে বলেছেন,

"--আমি বললাম, **হে প্রভু মাবুদ, আরজ করি, মাফ করো!** ইয়াকুব (জাতি) কিরূপে উঠে দাঁড়াবে? কারণ সে তো খুবই ছোট।" (আমোষ ৭:২)

৪. যাঁরা হজরত আইয়ুবের (আঃ) বিরুদ্ধে পাপ করার অভিযোগ করেছিল, তিনি তাদের জন্যও দোয়া করেছেন।

"আইয়ুবকে এই কথাগুলো বলার পর মাবুদ তৈমনীয় ইলিফসকে বললেন, 'তোমার প্রতি ও তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার গজবের আগুন জ্বলে উঠেছে, কারণ, আমার বান্দা আইয়ুব যেরূপ বলেছে, তোমরা আমার বিষয়ে তেমনি সঠিক কথা বলনি। এ'জন্য, তোমরা সাতটি ষাঁড় ও সাতটি ভেড়া নিয়ে আমার বান্দা আইয়ুবের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য হোমকোরবানী করো। **আর আমার বান্দা আইয়ুব তোমাদের জন্য দোয়া করবে; কারণ, আমি তার দোয়া কবুল করবো; তা না হ'লে আমি তোমাদের বোকামী অনুযায়ী শাস্তি দেবো;** — আর মাবুদ আইয়ুবের দোয়া কবুল করলেন।" (আইয়ুব ৪২:৭-৯)

৫. হজরত **পৌল** তাঁর ইহুদী ভাইদের জন্য দোয়া করেছেন,

“ভাইয়েরা, **আমার অন্তরের নেকনিয়ত এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি এই,** যেন **তাহাদের নাজাত হয়।**” (রোমীয় ১০:১)

হজরত পৌলের অনুভূতি আর দোয়ার গভীরতা এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে বুঝা যায়,

“আমার হৃদয়ে খুব দুঃখ ও সব সময়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। **কারণ, আমার ভাইদের জন্য, যারা দেহের দিক দিয়ে আমার স্বজাতীয় তাদের জন্য, আমিই যেন মসীহ্ থেকে পৃথক থেকে অভিশপ্ত হই, এমন কামনা করতে পারতাম।** কারণ, তারা ইসরাইলীয়।” (রোমীয় ৯:২-৪)

৬. কিতাবুল মোকাদ্দসেও হজরত **ইয়ারমিয়া** (আঃ)কেও আল্লাহ্ শেষে আর কারও জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন,

“এ’জন্য, তুমি এই জাতির জন্য দোয়া করো না, তাদের জন্য আমার কাছে ফরিয়াদ ও দোয়া পেশ করো না, অনুরোধও করো না; কারণ আমি তোমার কথা শুনবো না। তারা ইহূদার নগরে-নগরে ও জেরুসালেমের সড়কে-সড়কে যা করছে, তা কি তুমি দেখছো না? **— অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে পানীয় নজরানা পেশ করার জন্য ইহা করে,** যাতে এ’ভাবে তারা আমাকে অসন্তুষ্ট করে।” ইয়ারমিয়া ৭:১৬-১৮

কোরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে এই আয়াতের অংশগুলো পরীক্ষা করে, আমরা দেখতে পাই যে, এখানে উল্লেখিত সবগুলো আয়াতেই জীবিত নবীদেরকে তাঁদের সংস্পর্শে থাকা জীবিত উম্মতদের জন্য দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। আমরা গোটা কোরআনের মধ্যে এমন একটি আয়াতও খুঁজে পাই না, যেখানে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, হজরত নূহ থেকে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত এঁদের মধ্য থেকে কোনো একজন নবীকে কেয়ামতের দিনে সাফায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর তাই এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সম্ভাব্য উৎস খুঁজে বের করার জন্য আমাদের কেবল হাদিসগুলো খুঁজে দেখার বাকী রয়েছে।

হাদিস অনুসারে কেয়ামতের দিনে সাফায়াত

আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমি এই বিষয়ে জানার জন্য হাদিসগুলো খুঁজে দেখবো, আর ঠিক সেই সময়েই আল-নাওয়াবীর *৪০টি হাদিস* বইয়ের একটি অনুলিপি আমি একটি বইয়ের দোকানে খুঁজে পাই। সেখানে, আমি ভেবেছিলাম, এই বইটা আমার কাজকে সহজ করবে। যদি কোনো হাদিসে “সাফায়াত” সম্পর্কে কোনো আয়াত থাকে, তবে এই প্রখ্যাত হাদিস সংকলন বইয়ে কমপক্ষে একটি হাদিসে অবশ্যই থাকবে। কিন্তু আমি অবাক হলাম, যখন দেখলাম যে, এ সম্পর্কে একটি হাদিসও নেই- এমনকি একটি ছোট হাদিসও নেই!

“ডিক্সনারী অব ইসলাম” নামক অভিধানে “সাফায়াত” শিরোনামে, টি. পি হিউজেস এই বিষয়ে ২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

হজরত মোহাম্মদের বক্তব্য হাদিসে এভাবে বলা হয়েছে:

"কেয়ামতের সেই দিনে আমার সাফায়াত লাভের সম্ভাবনা সেই লোকের সবচেয়ে বেশী হবে, যে কোনো ভন্ডামী না করে নিজের হৃদয় থেকে বলবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।'"

"আমি সেসব লোকের জন্য সাফায়াত করবো, যারা কবিরা গুনাহর মতো বড় পাপ করেছে।"

"বিচারের দিনে তিন ধরনের লোক সাফায়াত করবেন, নবী, জ্ঞানী ও শহীদ।" মিসকাত, কিতাব ১৮ অধ্যায় ১২

"সারা-ই-মাওয়ায়িফ" বইয়ের লেখক ৫৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সুন্নীদের মত অনুসারে, যারা বড় পাপ (আহলা - ই-কবির) কবিরা গুনাহ করেছেন, তারা যাতে পাপের শাস্তি হতে রেহাই পায়, এজন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশেষভাবে তাদের জন্য সাফায়াত করবেন। কারণ, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই বলেছেন, "যারা কবিরা গুনাহর মতো বড় পাপ বা কবিরা গুনাহ করেছে, আমি তাদের জন্য সাফায়াত করবো। কিন্তু মুতাজিলা-ইসলামের যুক্তিবাদী সম্প্রদায়- তাদের মত অনুসারে, হজরত মোহাম্মদের সাফায়াত করলে তাদের ছওয়াব বাড়বে এই কথা ঠিক, কিন্তু তিনি তাদের পাপের শাস্তি থেকে রেহাই করে দিতে পারবেন না। কারণ, কোরআনে সূরা বাকারা (গাভী) ২:৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে,

"তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, **যেদিন কেহ কাহারও কোনো কাজে আসিবে না এবং কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গৃহিত হইবে না** এবং তাহারা কোনো প্রকার সাহায্য পাইবে না! (আমরা ওপরে ১ নং তালিকায় এই আয়াতটি দেখেছি।)

আমি কোরআনের বেলায় নিজস্ব অধ্যয়ন যেভাবে করেছি, সেভাবে হাদিসের বেলায় তা করিনি। কিন্তু সার কথা থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে যে হাদিস আছে তা খুবই কম ও বিপরীত কথায় ভরা। আর কেয়ামতের দিনে হজরত মোহাম্মদের সাফায়াত করা সম্পর্কে এখানে এতো কম কথা বলা হয়েছে যে, হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুতাজিলা সমপ্রদায়ের লোকেরা সুনিশ্চিতভাবে বলেন যে, পাপকে প্রতিরোধ করার জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কোনো ধরণের সাফায়াত করবেন না।

এই শিক্ষা খুঁজে পাওয়ার জন্য যে কোনো লোককে মুতাজিলা সমপ্রদায়ের পর্যন্ত পেছন ফিরে দেখতে হবে না। ওয়াহাবী সমপ্রদায়ের প্রধান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে "*দি বুক অব ইনফিনিটি*" নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইয়ে "তিনি সাধারণ ভাবে লোকদের মতে প্রচলিত বিশ্বাস যেমন পীর ও পরহেজগার লোকদের ক্ষমতা, এসব বিশ্বাসের অনুশীলন যেমন, আওলিয়া, পীরকে সেজদা করা, পীরের দরগাহ সেজদা করা, পীর **ও নবীদের সাফায়াত করার ক্ষমতা আছে তা বিশ্বাস করা,** আসলে প্রচলিত ধর্মের ওপরই তিনি আগাগোড়া আক্রমণ করেছেন।" [৯]

---

[৯] রহমান, ইসলাম, ওপরে উল্লেখিত কিতাব ,পৃষ্ঠা ১৯৭

অতি সমপ্রতি 'সাফায়াত' সম্পর্কে ইসলামে বিশ্বাস সম্পর্কে একটি আধুনিক বক্তব্য "*দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল*" মে- জুন ১৯৮৩, সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। "*ইসলামিক কনসেপ্ট অব গড এন্ড প্রফেট*" বইয়ে, শেখ জামাল আল-বান্না লিখেছেন,

'ইসলাম ধর্মে নবীরা মানুষ ছিলেন এই ধারণার ওপর জোর দিয়েছে— । সুতরাং, **যে কোনো ধরণের মধ্যস্থতা ইসলামে অনুমোদন করা হয়নি বা স্বীকার করা হয়নি**। নবীরা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিনিধী। যদি কেউ পাপ করে, তবে তার পাপ তিনি ক্ষমা করতে পারেন না, বা তাকে পাপের শাস্তি থেকে রেহাই করে দিতে পারেন না। **তাঁরা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে সাফায়াত করতে পারেন না। কেননা, এই ধরণের সাফায়াতের কোনো ধারণা থাকার কথা ইসলাম স্বীকার করে না।**"[১০]

শেখ আল-বান্নার বক্তব্যের সমর্থনে এবং ওয়াহাবিদের বিশ্বাস সমর্ধনে এই দুটো হাদিস আরো জোরালোভাবে হজরত মোহাম্মদের সাফায়াতের ধারণার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। প্রথম হাদিসটি ঈমাম বোখারী, *টেষ্টিমনিজ* বইয়ের ৩০ অধ্যায়ে "কষ্টিং লট টু সলভ প্রবলেম" এই শিরোনামে, "হজরত ওসমান নামে একজন দৃঢ় বিশ্বাসীর কথা বলা হয়েছে, যিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ইন্তেকাল করেন। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তখনি তাঁর বাড়িতে যান এবং শুনেন যে, ওম্ম -এল- আলা নামে এক মহিলা যিনি হজরত ওসমানের অসুস্থতার সময়ে সেবাযত্ন করেছিলেন, তিনি তাঁর বুকের ওপরে পড়ে থেকে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, "আল্লাহ্‌র দয়া তোমার সাথে আছে। আমি তোমার পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছি, আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়ালু ছিলেন।"

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি কীভাবে এটা জানলেন, আর যখন সেই মহিলা স্বীকার করলেন যে তিনি জানেন না, তখন তিনি বললেন,

'ওসমান এখন মৃত, আর আমি সেই সুনির্দিষ্ট আল্লাহ্‌র কাছে কেবল তার জন্য মঙ্গল কামনা করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, (যদিও) আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, (এমনকি) আমি নিজেও জানি না যে, আল্লাহ্ তার প্রতি কেমন আচরণ করবেন।"

দ্বিতীয় হাদিসটি আতহার হোসেন রচিত "*প্রফেট হজরত মুহাম্মদ এন্ড হিজ মিশন" (১৯৬৭)* নামক বইয়ের ১২৮ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন,

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন,

"হে কুরাইশ গোত্রের লোকরা এর পরে যা ঘটছে তার জন্য সাবধান হও। আমি
তোমাকে আল্লাহ্‌র দেওয়া শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবো না।
হে বনি আব্দ মান্নাফ— আমি তোমাদেরও রক্ষা করতে পারবো না
হে সুফিয়া, নবীর চাচি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না,

---

[১০] *The Muslim World League Journal,* Volume 10, No 8, p 9.

হে ফাতিমা, মোহাম্মদের মেয়ে, এমনকি আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না। ”

ঈমাম বোখারী ও ঈমাম মুসলিম ওপরে উল্লেখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

একজন লোক কী বলতে পারে? যদি হজরত মুহাম্মদ (দঃ) একজন মুসলমান উম্মতের জন্য সাফায়াত করতে পারেন না, যিনি হজরত মুহাম্মদ (দঃ)কে অনুসরণ করার জন্য বাড়ি-ঘর ও পরিবার ত্যাগ করেছেন, আর তাঁর নিজের বিশ্বাসী মেয়েকে যিনি রক্ষা করতে পারেন না, তবে আর কে বাকি থাকে? আর কাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন?

শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি, কোরআন বা হাদিসে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যার দ্বারা ওপরে বলা কাহিনী যেখানে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলবেন, ইয়া উম্মুিত ইয়া উম্মুিত, এই কথা সত্য। বরং কোরআনে বলা হয়েছে, অন্যদের জন্য সাফায়াত করার বদলে নবীরাই আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজবেন। ১ হিজরীতে নাজিল হওয়া সূরা বনি- ইসরাইল (ইসরাইলের সন্তানগণ) ১৭:৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> “উহারা যাহাদিগকে (ফেরেশতা ও নবী) আহ্বান করে তাহারাই তো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে **যে তাহাদিগের মধ্যে** কে কত **নিকটতর** হইতে পারে, **তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে।”**

একজন মুসলমান আশা করেন যে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বাসীদের জন্য দোয়া করবেন, এই রকম আয়াত খুঁজে বের করার পরিবর্তে সূরা আল-আহযাব (দলসমূহ) ৩৩:৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, আর বিশ্বাসীদেরও হুকুম দেওয়া হয়েছে, তারাও যেন নবীর জন্য ও তাঁর নাজাতের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। এখানে বলা হয়েছে,

> “আল্লাহ্‌ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! **তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো — তার নাজাতের জন্য প্রার্থনা করো।”**

এই হুকুম দেওয়ার কারণে প্রতিটি মুসলমান হজরত মোহাম্মদের নাম নেয়ার সময়ে, তাঁর নাজাতের জন্য দরুদ শরীফ পাঠ করেন।

ওপরে উল্লেখিত ২০০ পৃষ্ঠার ‘সস্তা বই’ *“প্রুফস অব ব্লেজিং”* গোটা বইটি জুড়ে হজরত মোহাম্মদের জন্য দোয়া করার জন্য পাঠকদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বহুবার হজরত মোহাম্মদের জন্য দোয়া করার সাথে যে কেউ দোয়া করে তার জন্য হজরত মুহাম্মদ (দঃ) সাফায়াত করবেন এই তথ্যটি একসাথে জড়িত করা হয়েছে। নিচের উদাহরণে তা দেখানো হলো,

> “যে লোক হজরত মোহাম্মদের জন্য শুক্রবার দিন ১০০ বার দোয়া করবে, তার ৮০ বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে।”

“জিবরাইল ফেরেশতা বলেছেন, “যদি কেউ আপনার (হজরত মুহাম্মদ (দঃ)) জন্য মোনাজাত করে, তবে তার জন্য ৭০০০ ফেরেশতা দোয়া করেন। আর যার জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন, তিনি বেহেস্তে বাস করবেন।”

আর হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেও বলেছেন, “আমার জন্য যত বেশী দোয়া করবে, বেহেস্তে তুমি তত বেশী স্ত্রী পাবে।”[১১]

যদিও এসব দাবীর সমর্থনে কোরআনে কোনো আয়াত নেই, তবু এটা দুভার্গ্যজনক যে, লোকেরা এ-সব ধারণা বিশ্বাস করে, বারবার বলে এবং আশা ও বিশ্বাস করে যে, এসব সত্যি হবে।

প্রথম মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম দুইজন সেরা মুসলমান

সবশেষে, এই অধ্যায় শেষ করার আগে, সবচেয়ে পুরানো ও মহান দুইজন মুসলমান নেতার মত্যুর সময়ে তাঁদের আচরণ আমরা লক্ষ্য করবো। অনেক বছর ধরে ইসলামি শিক্ষা লাভ করার পরে জেনস ক্রিসটেনসেন লিখেছেন,

“ইসলাম নিয়ে প্রথম পড়াশোনার সময়ে ইসলামের অনেক মহান লোকদের মৃত্যুশয্যায় তাঁদের নিরাশা ও অসহায় অবস্থার কথা ভেবে আমি প্রা্যয়ই আশ্চর্য হয়েছি।

“উদহারণ হিসেবে হজরত আবু বকরের কথা বলা যেতে পারে, তিনি বিশ্বাসীদের আমির বা আমিরুল মোমেনিন ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল খাঁটি ও তিনি একজন প্রকৃত মুসলমান ছিলেন। যদিও তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি শেষকাল সম্পর্কে এতো ভীত ছিলেন এবং এর জন্য এতো কঠোর পরিশ্রম করতেন যে, তিনি হতাশায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতেন। দুটো হাদিস থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁর মেয়ে হজরত আয়েশাকে বলেছিলেন,

“মা, আজকের দিনে আমি মুক্ত হচ্ছি, আর তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি, **যদি** আনন্দ হয়, এটি দীর্ঘস্থায়ী হবে; **যদি** দুঃখজনক হয়, তবে এটিও কখনো শেষ হবে না।’[১২]

এখানে কি আপনি দুটো যদি দেখেছেন। ইসলামের কোনো কিছুই এই “যদি” কে মুছে দিতে পারে না। এমনকি যদিও হজরত আবু বকরকে আতিক (মুক্ত) উপাধি দেওয়া হয়েছিল, কারণ, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁকে বলেছিলেন যে, আপনি দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।”

হজরত ওমরের কথা উদ্ধৃত করে টি পি হিউজেস লিখেছেন, “যদি আমি মুসলমান না হতাম, তবে আমার আত্মার খুব কষ্ট হতো।”[১৩]কিন্তু হজরত ওমরের মত্যুর বিষয়ে ক্রিসটেনসেন লিখেছেন, “যখন হজরত ওমর তাঁর মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তিনি বলেছেন,

---

[১১] সালমান আল-জাজুলি, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

[১২] হজরত ওমর সম্পর্কে এটি ও পরের উদ্ধৃতিটি দি সার্চ অব গাইডেন্স টু দি মিস্ট্রি অব রিডেমশন” বইয়ে রয়েছে। এটি অনুবাদ করেছেন স্যার ডব্লুও মুর, রিলিজিয়াস ট্রাষ্ট সোসাইটি কতৃক বইটি মুদ্রিত হয়েছে।

[১৩] Hughes, ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা ৬৫৪

> "— আমি অন্যান্য ডুবন্ত মানুষের মতো নই, যে বাঁচার সম্ভাবনা দেখে এবং বাঁচার আশা করে, কিন্তু ভয় পায়, কেননা, তার আশা ভেংগে যেতে পারে, আর সে মারা যেতে পারে। তাই সে হাত পা ছুঁড়ে বাঁচার জন্য চেষ্টা করে। এই ডুবন্ত মানুষ থেকেও তিনি সাহসী মানুষ, যিনি দর্শনের মধ্য দিয়ে বেহেশত ও দোযখ দেখতে পান। — আমার পুর্ব-পশ্চিমে যা কিছু ছিল, আমার ওপর নেমে আসা এই ভয়ংকর যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আনন্দে আমার যা কিছু আছে, সবই দিতে রাজী। আর সবশেষে, মাটিতে পা রাখার সাথে সাথে তিনি চিৎকার করে বলে উঠেন: 'ওমরের জন্য দুঃখ হচ্ছে, আর ওমরের মার জন্যও দুঃখ হচ্ছে, **যদি** আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাদের মাফ করে না দেন।"

আপনি কি হজরত ওমরের সমস্যা বুঝতে পারছেন? শেষ বাক্যের যদি শব্দের মধ্য দিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে। এই "যদি" শব্দটি হজরত ওমরের ঈমান সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেনি। হজরত ওমর এক আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসী ছিলেন। নবীর ওপর হজরত ওমরের আস্থা ও নির্ভরশীলতা ছিল অথবা হজরত ওমরের নৈতিক জীবনযাপনের কোনো কমতি ছিল না। একজন মানুষ যা সত্য বলে বিশ্বাস করে তা করতে পারে যতদূর সম্ভব তার সবগুলোই করেছিলেন। "না, **এখানে যদি শব্দটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত; যদি আল্লাহ্ তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষমা না করেন।"**

কোনো মানুষই জানতে পারে না

"ইয়াজিদকে কবর দেওয়ার সময়ে তাঁর পিতা ওমর বলেছিলেন, 'আমি সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ-যাঁর সামনে সে এখন যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র সামনে তার গৌরব আমি কখনও করবো না। **যদি** তিনি তাকে ক্ষমা করেন, তবে তিনি তাঁর দয়ার কারণেই তাঁকে ক্ষমা করবেন, আর যদি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন, তবে তিনি তার পাপের জন্যই সেই প্রতিশোধ নিবেন।'"

এখানেও আপনি দেখছেন, দুটো "**যদি**" রয়েছে।

যদি আল্লাহ্ ক্ষমা করেন—

যদি আল্লাহ্ প্রতিশোধ নেন—

"ইয়াজিদ সম্পর্কে এই কথা মনে হয় গোটা ইসলামের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছে।"[১৪] হজরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজে বা আরবের বাইরে কমশিক্ষিত সাধারণ মুসলমান- যিনি কেবল কয়েকটি দোয়া জানেন- কোনো মুসলমানই ধারণা করতে পারেন না অথবা সাহস করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না যে, এই "যদি"-র অর্থ তাঁর জন্য কী হবে?[১৫]

অথবা অন্যভাবে এই কথা বলা যায় যে, আল্লাহ্ প্রতিটি লোকের কাছ থেকে চূড়ান্ত বাধ্যতা আশা করেন, কিন্তু তিনি তাঁর কোনো বান্দার ব্যক্তিগত জীবনে নিজেকে প্রকাশ করার কোনো প্রতিশ্রুতি কখনও তিনি দেননি। একজন মুসলমান নাজাত পেয়েছেন কি পাননি, এই কথা জানার কোনো উপায়ই নেই।

স্পষ্টভাবে মধ্য যুগের মক্কী সূরা আল-শুয়ারা (কবিগণ) ২৬:৮২ আয়াতে এই অনিশ্চয়তা দেখা যায়, এখানে হজরত ইব্রাহিম বলেছেন,

> "জগৎসমূহের প্রতিপালক—তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনজীবিত করিবেন (হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এটা বিশ্বাস করতেন এবং তা ঘটবেই এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন) এবং **আমি আশা করি** ('আত্‌মা'উ **أَطْمَعُ**) তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিয়া দিবেন (পাপ ক্ষমার ব্যাপরে তিনি কেবল আশা করেছিলেন যে, হয়তো তাঁর পাপ ক্ষমা করা হবে)।"

একই সূরার ৫১ আয়াতে হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত হারুন (আঃ) ফেরাউনকে বলেছেন,

> "**আমরা আশা করি** (নাতমায়ু **نَطْمَعُ**) যে আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

আর ১৭:৫৭ আয়াতে আমরা ওপরে দেখেছি,

---

[১৪] Practical Approach, পাকিস্তান ১৯৬০, ডাকযোগে শিক্ষা,রাওয়ালপিন্ডি, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩৭৯

[১৫] ওপরে উল্লেখিত বই, পৃষ্ঠা-৩৮১

“এমনকি যাহারা (ফেরেশতা ও নবী) আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছে, **তাহারাই** তাঁহার দয়া **আশা** (ইয়ার্‌ জুনা يَرْجُونَ) **করে** ও তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে।

সবশেষে, কোরআনের আরো ৩টি আয়াতে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, যারা সবচেয়ে বেশী নেককাজ করেছেন, তাদের নাজাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ কেবলমাত্র বলেছেন, **“সম্ভবতঃ”** তাঁরা নাজাত পাবে। শেষ যুগের মক্কী সূরা আল-কাসাস (কাহিনী) ২৮:৬৭ আয়াতে আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের বলেছেন,

“তবে যে ব্যক্তি তওবা করিয়াছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সৎকর্ম করিয়াছিল সে **সম্ভবতঃ** ('আসা আন عَسَى أَنْ) সাফল্য অর্জনকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত হইবে।”

একই ধারণা আবার ৭ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-তাহরিম (অবৈধকরণ) ৬৬:৮ আয়াতে বিশ্বাসীদের বলা হয়েছে,

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো- বিশুদ্ধ তওবা; **সম্ভবতঃ** ('আসা আন عَسَى أَنْ) তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দকর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।”

৯ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-তাওবা (অনুশোচনা) ৯:১৮ আয়াতে কোরআন নাজিলের সময়ের শেষের দিকে আল্লাহ্‌ বলেছেন,

“তাহারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ভয় করে না, **সম্ভবতঃ** ('আসা আন عَسَى أَنْ) **উহাদেরই সৎপথ পাইবার আশা আছে।”**

শেষে, এটি এককভাবেই পাঠকের নিজেরই সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়। যদি কোনো লোক বিশ্বাস না করেন, তবে তিনি নিশ্চিত যে, তিনি দোযখেই যাবেন, কিন্তু এমনকি যদি তিনি বিশ্বাস করেন, শেষ-বিচারের দিনে তিনি কেবল একাকী আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবেন। সেখানে কোনো সাফায়াতকারী বা কোনো বন্ধু তাঁর সাথে থাকবেন না, আর তিনি কেবল **এই আশা করতে পারেন যে, হয়তো, সম্ভবতঃ.** তিনি রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধার্মিক গোলাম ও সাফায়াতকারী রূপে ঈসা মসীহের ভূমিকা

কোরআনে সাফায়াত সম্পর্কে আয়াতগুলো পরীক্ষা করে দেখার পর আমরা এখন তৌরাত-পুরাতন নিয়ম ও ইঞ্জিল শরীফ-নতুন নিয়মের ক্ষেত্রেও একইভাবে পরীক্ষা করবো। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি হজরত ইশাইয়া (আঃ) নবী বলেছিলেন, **"ধার্মিক গোলাম"** সাফায়াত করতে পারেন। কিন্তু অবশ্যই এই কথা বলা যায় যে, ঈসা মসীহ্ একজন বান্দা হিসেবে এসেছিলেন, আর এই কথা সব সময়েই মুসলমানরা জোরালো গলায় বলে থাকেন।

ঈসা মসীহ্ যেসব মোজেজা করেছিলেন সেগুলো উল্লেখ করে একজন খ্রীষ্টান যখন দেখাতে চান যে, ঈসা মসীহ্ যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছিলেন এই মোজেজাগুলো হচ্ছে তার প্রাথমিক সাক্ষী - দ্বিতীয় সাক্ষী হলো, তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা লোকদেরকে দিয়েছিলেন। তখন মুসলমানরা সাথে সাথে উত্তর দেন, এই মোজেজাগুলো কেবল তিনি "আল্লাহ্‌র অনুমতি"র সাহায্যেই করেছেন। এই সাথে তাঁরা আরও বলেন যে, ঈসা মসীহ্ অন্যান্য লোকের মতোই আল্লাহ্‌র একজন বান্দা **(আব্‌দ عَبْد)** বা গোলাম। আর কখনও কখরও তাঁরা শেষে মধ্য যুগের মক্কী সূরা মরিয়ম (এক ধার্মিকা মহিলার নাম) ১৯:৩০ আয়াত উল্লেখ করেন, এখানে বলা হয়েছে ঈসা মসীহ্ দোলনায় থাকা অবস্থায় বলেছিলেন,

"আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন।"

এই বক্তব্যের উত্তরে আমি যে-কথা বলতে চাই তা হলো কেবল তিনি "আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে" মোজেজা করেছেন এই কথা বললে, দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে এর মর্যাদা কোনোভাবেই খাটো করে না। এটা প্রমাণ করে যে, ঈসা মসীহের মোজেজা ও কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠকেরা এই কথা জেনে আশ্চর্য হতে পারেন যে, যদিও খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, ঈসা মসীহ্ কেবল গোলাম বা বানন্দা থেকে আরও অনেক বড় ছিলেন, তবু তাঁরা সম্পুর্ণভাবেই এই কথার সাথে একমত পোষণ করেন যে, ঈসা মসীহ্ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র একজন আবদ-আল্লাহ্‌র বান্দা বা গোলাম হিসেবে কাজ করেছেন।

হজরত ইশাইয়া (আঃ) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছিলেন যে, একজন ধার্মিক গোলাম আসবেন। এখানে গোলামের জন্য তিনি যে হিব্রু শব্দ ববহার করছেন, তা হচ্ছে গোলাম বা **"আবেদ'**। এই শব্দটি লেখতে হিব্রু অক্ষর- আয়ইন, বেথ ও দালেথ লাগে, যা একেবারে হুবুহু তিনটি আরবি অক্ষর- ”আইন, বা, দাল”- এর প্রয়োজন। এর অর্থ "বান্দা" বা "গোলাম" আর যখন কোনো লোক এই শব্দটির মূল ক্রিয়া পদ দেখেন, তবে তিনি দেখবেন যে, এর অর্থ "কাজ করা, সেবা করা, এবাদত করা" বুঝায়। এটি একবারে আরবী মূল ক্রিয়া "আবাদা"র মতোই হুবহু এক।

“আবেদ” আল্লাহ্‌র নামের সাথে যোগ করে শব্দগুচ্ছ তৈরি করা হয়। যেমন আরবী ভাষায় কেউ যোগ করে “আব্দুল্লাহ” লিখতে পারেন। “ইল” শব্দের সাথে যোগ করে একে বলা যায়, ‘আব্দেইল’ বা আল্লাহ্‌র বান্দা, আর ‘ইয়া’ (ইয়াওয়েহ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ’)-র সাথে যোগ করে হয়, ‘ওবাদইয়াওয়েহ’ বা ইয়াওয়েহ-র সেবা করাকে বুঝায়। এই ‘ওবাদইয়াওয়ে’ নামটি সংক্ষিপ্ত করে ইংরেজী ভাষা সহ বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে ওবদিয়। আর তৌরাত-পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে যে, ওবদিয় নামে একজন নবী ছিলেন।

সুতরাং, আমরা পুরাতন নিয়মের ইশাইয়া কিতাব থেকে বুঝতে পেরেছি যে, একজন বিশেষ **“ধার্মিক আবেদ”** আসবেন, যিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবেন।

এই **আবেদ** শব্দের সমতুল শব্দ ইঞ্জিল-নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, “δοῦλος” (দৌলস্)। ফিলিপীয় কিতাবের ২:-৮ আয়াতে আল্লাহ্‌র পরিচালনায় ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে হজরত পৌল লিখেছেন,

> “কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন, **গোলামের δοῦλος** রূপ ধারণ করলেন, মানুষের ছুরতে জন্মিলেন; এবং চেহারায় মানুষ হয়ে মৃত্য পর্যন্ত নিজেকে নীচু করলেন; এমনকি, সলিবে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থাকলেন।”

ইঞ্জিল শরীফে ঈসা মসীহ্ নিজে দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে যে-কথা বলতে বলেছেন, তিনি কেবল সেই কথাগুলোই বলেন। তিনি বলেছেন,

> “কারণ, আমি নিজ হতে বলিনি; কিন্তু আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে হুকুম করেছেন কি আমি বলবো। আর আমি জানি যে, তাঁর হুকুম অনন্ত জীবন দেয়। এইজন্য, আমি যা যা বলি, তা পিতা আমাকে যেমন বলেছেন, তেমনি বলি” (ইউহোন্না ১২:৪৯-৫০)।

তিনি এ দাবীও করেছেন যে, তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে গোলাম বা সেবকের ধারণা পূর্ণ করেছেন।

> “আমার খাবার এই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করি ও তাঁর কাজ করি” (ইউহোন্না ৪:৩৪)

> “আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না, যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কারণ, আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না, কিন্তু **আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি”** (ইউহোন্না ৫:৩০)।

> “কারণ, **আমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমি বেহেশত থেকে নেমে আসিনি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য”** (ইউহোন্না ৬:৩৮)।

এই আয়াতগুলো দেখায় যে, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারেই ঈসা মসীহ্‌ বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন। তিনি যা কিছু করেছেন বা বলেছেন তা পিতার প্রতি বাধ্য থেকেই করেছেন। **যে কোনো দিক দিয়েই তিনি "ধার্মিক গোলাম"- ধার্মিক আবেদ ছিলেন।**

এর সাথে আরও বলা যায় যে, তিনি একজন গোলাম-আবেদ হতে এসেছিলেন। হজরত পৌল ওহীর মধ্য দিয়ে রোমীয় ১৫:৮ আয়াতে লিখেছেন, "কেননা, আমি বলি যে, আল্লাহ্‌র সত্যের জন্যই মসীহ্‌ খত্‌নার ব্যাপারে সেবক হয়েছেন, যেন তিনি পূর্বপুরুষদের নিকট দেওয়া আল্লাহ্‌র ওয়াদাগুলো পূর্ণ করেন।"

অন্য কথায় বলা যায় যে, আমরা ইহুদী বা অ-ইহুদী যাই হই না কেন, সবার সেবা কবে তিনি আল্লাহ্‌র গোলাম বা "আল্লাহ্‌র আব্দ" হিসেবে নিজেকে দেখিয়েছেন। ইঞ্জিল শরীফে ঈসা মসীহ্‌ তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন,

> "কারণ, **আসলে ইবনুল ইনসানও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে** এবং অনেকের বদলে আপন প্রাণ নাজাতের কাফফারা হিসেবে দিতে **এসেছেন" (মার্ক** ১০:৪৫)।

ওপরের কোনো আয়াতই স্পষ্টভাবে এই কথা প্রকাশ করে না যে, ঈসা মসীহ্‌ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বা মা'ছুম ছিলেন। তবে, আমাদের এই আলোচনা চালিয়ে গেলে, আমরা অন্যান্য আয়াতগুলোতে দেখতে পাব যে, যেখানে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ্‌ নিষ্পাপ বা মা'ছুম ছিলেন।

ইউহোন্না ৮:২৮-২৯ আয়াতে ঈসা মসীহ্‌ বলেছেন,

> "তখন ঈসা বললেন, যখন তোমরা ইবনুল ইনসানকে উচ্চে উঠাবে, তখন জানবে যে, আমিই তিনি, আর আমি নিজ থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, সেই মতো এই কথাগুলো বলি। আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ, **আমি সব সময়ে তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করি।"**

একবার তিনি তাঁর শ্রোতাদের বলেছিলেন যে, তারা শয়তানের সন্তান। আর এজন্য শ্রোতারা তাঁর ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঈসা মসীহ্‌ এই সময়ে তাঁর শ্রোতাদের ইউহোন্না ৮:৪৬ আয়াতে বলেছিলেন,

> "তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে প্রমাণ করতে পার? "

ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পরে হজরত পিতর তাঁর শ্রোতাদের বলেছিলেন,

> **"তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্মিক লোককে Aস্বীকার করেছিলে—"** (প্রেরিত ৩:১৪)।

ইঞ্জিল শরীফের লূক সিপারায় ১:৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহের জন্মের বিষয়ে বলার সময়ে হজরত ময়িয়মের কাছে হজরত জিবরাইল ফেরেশতা এই "পবিত্র" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

যদিও কোরআনে আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবু কোরআন ওপরে বলা কথার সাথে একমত পোষণ করে। মধ্য যুগের মক্কী সূরা মরিয়ম (এক ধার্মিকা মহিলার নাম) **১৯:১৯** আয়াতে দেখা যায়, এখানে ফেরেশতা এসে হজরত মরিয়মকে বলছেন,

> "সে বলিল, আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, **তোমাকে এক পবিত্র পুত্র ('ঘুলামান যাকীয়ান غُلَامًا زَكِيًّا) দান করিবার জন্য।"**

- ইউসুফ আলী গেলমান জাকিয়া শব্দের অনুবাদ করেছেন, "**পবিত্র পুত্র,** "

- পিকথল অনুবাদ করেছেন, **"দোষশুন্য পুত্র"**

- হামিদুল্লাহ অনুবাদ করেছেন, **"খাঁটি পুত্র"**।

আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, হজরত ঈসা মসীহই একমাত্র নবী, যিনি কোনো সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাননি (**يَسُوعُ هُوَ اَلنَّبِيُّ اَلْوَحِيدُ اَلَّذِي لَمْ يَسْتَغْفِرْ اَللَّهَ قَطّ مِنْ أَجْلِ تَفْسِهِ**)।

ইবরানী কিতাবে বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ্ হলেন একজন মহা-ঈমাম।

> "— যিনি আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সঙ্গে দুঃখ পান না, কিন্তু তিনি **পাপ না করেও** সমস্ত বিষয়ে আমাদের মতো পরীক্ষিত হয়েছেন" (ইবরানী ৪:১৫)।

ওহী হিসেবে ইবরানী কিতাবে বলা হয়েছে,

> "সত্যিই আমাদের জন্য এমন এক মহা-ঈমামের প্রয়োজন ছিল, **যিনি কামেল**, **দোষশূন্য**, **খাঁটি**, পাপীদের **থেকে আলাদা** এবং আসমানের চেয়েও ওপরে আছেন" (ইবরানী ৭:২৫-২৬)।

ইবরানী ৯:১৪ আয়াতে আবারও বলা হয়েছে,

> "যিনি অনন্তজীবী রূহ্ দ্বারা **নির্দোষ কোরবানীরূপে নিজেকেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পেশ করেছেন**, সেই মসীহের রক্ত তোমাদের বিবেককে নিষ্ফল কাজকর্ম থেকে আরও কত না বেশী করে পবিত্র করবে, যেন তোমরা জীবন্ত আল্লাহ্‌র এবাদত করতে পারো!"

সবশেষে, হজরত পিতর- যিনি ঈসা মসীহের সাথে থেকে তাঁর সব কাজ নিজের চোখে দেখেছিলেন, তিনি লিখেছেন,

> "তোমরা— নির্দোষ নিখুঁত মেষের মতো মশীহ্ের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা নাজাত পেয়েছো" (১ পিতর ১:১৮খ-১৯)

সবশেষে, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ঈসা মসীহের কোনো পাপ ছিল না। আর এটি আমাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।" কিন্তু একজন নিষ্পাপ নবীর ক্ষেত্রে কী বলা যায়? একজন রাসূল যার কোনো বোঝা নেই? একজন কামেল সাফায়াতকারী? এই বইয়ের প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায়ে ও বর্তমান অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে কোরআন এই সম্পর্কে কিছুই বলে না। কিতাবুল

মোকাদ্দস অবশ্য এ-সম্পর্কে বলেছে। সুতরাং, আমরা এখন সাফায়াত সম্পর্কে যত কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত আছে সবগুলো দেখবো।

নিষ্পাপ মসীহ্ বিশ্বাসীদের সাফায়াত (شَفَاعَة) করবেন

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সেখানে কষ্টভোগী গোলামের কথা বলা হয়েছে। আমরা এখন আবার, সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্য থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখবো। এর সাথে সেই আয়াতটিও দেখবো, যেখানে আল্লাহ্‌র "কুদরতি হাত"- একজন ধার্মিক গোলামের সাহায্যে সাফায়াত করার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম অংশটি আমাদের বলে যে, অনন্ত আল্লাহ্ যেহেতু সাফায়াত কারার জন্য কাউকে দেখতে পেলেন না, তাই তিনি বলেছেন যে, তাঁর "কুদরতি হাত" দিয়েই তিনি তা করবেন। প্রায় ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইশাইয়া নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে,

> "আর মাবুদ এই সব দেখলেন, ইনসাফ নেই বলে অসন্তুষ্ট হ'লেন। তিনি দেখলেন যে, **ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াবার কেউ নেই**; এবং আশ্চর্য হ'লেন, এই কারণে তাঁরই শক্তিশালী হাত দিয়ে নাজাতের কাজ করলেন, তাঁরই ন্যায্যতা এই কাজে তাঁকে সাহায্য করলো।" (ইশাইয়া ৫৯:১৬)।

এই অংশের ২৬৩ পৃষ্ঠায় আমরা ইশাইয়া কিতাব থেকে নিচের আয়াতগুলো উদ্ধৃত করে আমরা দেখেছিলাম, একজন দুঃখভোগী মসীহের কথা এখানে বলা হয়েছে। এখন আমরা আবার সেই আয়াতগুলোতে, আল্লাহ্‌র কুদরতি হাতের সাহয্যে সাফায়াত বা অনুরোধ করা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে, তা দেখবো। এখানে বলা হয়েছে,

> **মাবুদের শক্তিশালী হাত** কার কাছেই বা প্রকাশিত হয়েছে?—
>
> তিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন ও কষ্টের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল;—
>
> তিনি আমাদের পাপের জন্য বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হ'লেন;
>
> আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁর ওপরে বর্ষিত হলো এবং তাঁর ক্ষতগুলো দ্বারা আমাদের আরোগ্য হলো।—
>
> আর **ধার্মিক বান্দা** নিজের প্রাণ দিয়ে অনেককে ধার্মিক করবেন এবং তিনিই তাদের অপরাধগুলো বহন করবেন।—
>
> কারণ, তিনি মৃত্যুর জন্য তাঁর প্রাণ ঢেলে দিলেন, তিনি পাপীদের সাথে গণ্য হ'লেন; আর তিনিই অনেকের পাপের বোঝা তুলে নিয়েছেন এবং পাপীদের জন্য **সাফায়াত করছেন**" (ইশাইয়া ৫৩:১, ৩, ৫, ১১খ, ১২খ)।

এই আয়াতগুলো বলে যে, একজন মানুষকে "মাবুদের কুদরতি হাত" বলে ডাকা হবে, তিনি আসবেন। তিনি কষ্টভোগ করবেন, আমাদের পাপের জন্য তাঁকে বিদ্ধ করা হবে। তাঁর শাস্তির মধ্য

দিয়ে আমাদের শান্তি হবে। তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দেবেন। **আর তিনি পাপীদের জন্য অনুরোধ করবেন।"**

একজন লোক এসে পাপীদের জন্য অনুরোধ করবেন, ঈসা মসীহ্ আসার ৭৫০ বছ আগে নবী ইশাইয়া এই স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন। ২৬৪ পৃষ্ঠায় ১০ নং ছবিতে এই আয়াতগুলোর ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই আয়াতগুলোর অনুলিপি ঈসা মসীহের আগমনের ১০০ বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল, - এরকম একটি অনুলিপি ঈসা মসীহের সামনে ছিল আর কোরআন সাক্ষ্য দিয়েছে যে, কিতাবের এই রকম একটি অনুলিপি "তাঁর হাতের মধ্যে ছিল।"

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কি কেউ পূর্ণ করেছেন?

আমরা ওপরে দেখেছি, ঈসা মসীহ্ নিষ্পাপ ছিলেন। যেহেতু, তিনি নিষ্পাপ ছিলেন, তাই তাঁর নিজের পাপের জন্য তিনি ক্রুশে মারা যাননি। ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে, তিনি আমাদের পাপের শাস্তি বহন করার জন্য মারা গিয়েছেন। আর এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন। সব মানুষ যারা নিজেদের পাপের জন্য মরে, তারা কেয়ামত পর্যন্ত তারা মৃত অবস্থায় থাকবে।

ইঞ্জিল শরীফ- নতুন নিয়মে বলা হয়েছে,

"যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে C/Cস্বরূপ করলেন" (২ করিন্থীয় ৫:২১)

কোরআনের বর্ণনারীতি অনুসারে এই কথাকে এভাবে বলা যায়,

"ঈসা- যাঁর নিজের কোনো বোঝা ছিল না, তিনি আমাদের বোঝা বহন করেছেন।"

পরে ঈসা মসীহ্ বেহেস্তে আরোহণ করেন, আর নিচের আয়াতগুলো দেখাচ্ছে যে, এখন তিনি আল্লাহ্র উপস্থিতিতে জীবিত থেকে আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন।

ইবরানী ৭:২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

"এই জন্য, যারা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে হাজির হয়, তাদেরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নাজাত দিতে পারেন, **কারণ, তাদের জন্য সাফায়াত করতে তিনি সব সময় জীবিত আছেন**। সত্যিই আমাদের জন্য এমন এক মহা-ঈমামের প্রয়োজন ছিল, **যিনি কামেল, দোষশূন্য, খাঁটি**, পাপীদের থেকে **আলাদা** এবং আসমানের চেয়েও ওপরে আছেন।"

রোমীয় ৮:৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে,

মসীহ্ ঈসা তো ইন্তেকাল করলেন এরং উঠলেন; আর **তিনিই আল্লাহ্র ডানে আছেন, আবার তিনিই আমাদের পক্ষে সাফায়াত করছেন**।

১ ইউহোন্না ২:১, ২ আয়াতে বলা হয়েছে,

আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমাদেরকে এইগুলো লিখে জানাচ্ছি, যেন তোমরা পাপ না করো। আর যদি কেউ পাপ করে, তবে **পিতার কাছে আমাদের এক সাহায্যকারী আছেন, তিনি ধার্মিক ঈসা মসীহ**। আর তিনিই আমাদের গোনাহের জন্য কাফ্‌ফারা, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সারা জাহানেরও গোনাহ্‌র জন্য।

অনুরোধকারী হিসেবে পাক-রূহ্‌ - পারাক্লিটের ভূমিকা

সবশেষে, আরেকজন সহায় আছেন, যিনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অনুরোধ করেন। ইঞ্জিল শরীফ - নতুন নিয়মের আল্লাহ্‌ আমাদের বলেছেন যে, যখন আমরা জানি না, কীভাবে মোনাজাত করতে হয়, মোনাজাতের সময়ে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই রকম আকুলতার সাথে **পাক-রূহ্‌** নিজেই আমাদের হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে অনুরোধ করেন।

রোমীয় ৮:২৬-২৭ আয়াতে বলা হয়েছে,

> "আর সে'ভাবে রূহও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কারণ কীভাবে মোনাজাত করা উচিত, তা আমরা জানি না, কিন্তু যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেইরকম আকুলতার সাথে রূহ্‌ **নিজেই আমাদের পক্ষে সাফায়াত করেন**। আর যিনি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখেন, তিনি জানেন, রূহের ভাব কী, কারণ, **ইনি মুমিনদের পক্ষে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারেই সাফায়াত করেন**।"

এই আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি ও বিশ্বাস করতে পারি যে, ঈসা মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন কালাম (কালিমাতুল্লাহ **كَلِمَةُ اَللّٰهِ**) আর অনন্ত পাক-রূহ্‌ আমাদের পাশে আছেন, তিনি আমাদের জন্য পিতার কাছে আজ, আগামীকাল, যতদিন জীবিত থাকবো, ততদিন আমাদের হয়ে অনুরোধ করবেন।

তাহলে আগাগীকাল, ভবিষ্যতে নেই ভয়াবহ বিচারের দিনে, কোনো খ্রীষ্টানকে একজন বন্ধু ছাড়া, অনুরোধকারী ছাড়া, অনন্তকালীন ইয়াওয়েহ এলোহিমের ভয়াবহ উপস্থিতির সামনে দাঁড়াতে হবে না। কারণ, ঈসা মসীহ্‌ সেই ধার্মিক, পাপীদের বন্ধু, কেয়ামতের সেই দিনে সেখানে উপস্থিত থেকে যারা তাঁকে নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তাদের সবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলবেন ও তাঁদের জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সাফায়াত করবেন।

এই কথা ইঞ্জিল শরীফ -নতুন নিয়মে লেখা আছে আর এতে কোনো সন্দেহ নেই আর এর কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এখন, এই বইয়ের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমরা যা জেনেছি আমাদের ধারণার পটভূমির আলোকে এখন চলুন আমরা আরেকবার নায়িন গ্রামের আমাদের বন্ধু ইলিয়াসের কথা শুনার জন্য তাঁর কাছে ফিরে যাই।

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিটি লোক নিজের ভাষায় শুনেছে

আমরা ঠিক সময়েই জেরুসালেমে পৌঁছালাম। আর আমি কখনও এখানে এই সময়ে আসিনি। আপনার হয়তো স্মরণ আছে যে, আমার চাচা ঈদুল ফেসাখ পালনের জন্য লিবিয়া খেকে এই জেরুসালেমে এসেছিলেন। তিনি আর আমার দুইজন ভাই যেভাবে তাঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন, সেভাবেই তাঁরা সেখানে পৌঁছেছিলেন ও বৃহস্পতিবার রাতে অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনদের সাথে ঈদুল ফেসাখের খাবার খেয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার দিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল। আমি যে চমৎকার রব্বির কথা আপনাদের বলেছিলাম, সেই রাব্বিকে মহা-ঈমাম ধরেছিলেন, আর রোমীয়রা তাঁর বিচার করেছিল।

আমি যখন ভাইদের মুখ থেকে এই খবর শুনলাম, আমি নিজে গোয়াল ঘরের পেছন থেকে বেড়িয়ে এসে বাইরে গেলাম। মানুষকে কাঁদার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই আমি বলতে পারবো না, আমি সেদিন কেঁদেছিলাম না কাঁদিনি। কিন্তু আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। সমস্ত বিষয়টিকে একেবারেই বিশ্বাস করতে পারিনি- বিশেষভাবে তারা যে তাঁকে ধরতে পারলো, এটি আমার কাছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। যে-কথা আমি আপনাদের আগেই বলেছি, যদি তিনি তাঁর মুখের কথায় একটি ঝড়কে থামাতে পারেন, কীভাবে তাঁকে ধরার জন্য তাঁর কাছে যেতে পারলো।

যাই হোক, আমরা পরে আরো জানতে পারি যে, শুক্রবার দিন সকালে তারা একটি বিচারের আয়োজন করেছিল। বিচারের সময়ে তারা মসীহকে জিজ্ঞেস করেছিল, “< তুমি কি সেই মসীহ, পরম ধন্যজনের পুত্র?”> যখন তিনি বললেন, <“আমি সেই”>; তারা বললো, সে কুফরি করেছে। তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আর তারা তাই করলো। **(মার্ক ১৪:৬১-৬৩)**

তারা তাঁকে শহরের বাইরে নিয়ে গেল ও একজন পুরানো অপরাধী হিসেবে দুইজন ডাকাতের সাথে ক্রুশে দিল। আমি যখন এসব কথা শুনলাম, তখন অবশ্যই আমি ঈদুল খেমিশশিমের সময়ে জেরুসালেমে যেতে আর আগ্রহী ছিলাম না।[১] এমনকি ঠিক করলাম যে, আর কোনো ঈদের সময়েই জেরুসালেমে যাবো না। এমনকি আমি ভাবতে লাগলাম, যদি এমন একজন মহান মানুষ, যিনি এতসব মোজেজা করেছেন, আর লোকদের সাহায্য করেছেন। তবে কি তিনি আল্লাহ্‌র মতো ছিলেন না।

---

[১] পঞ্চাশত্তমি ইদ একটি ইহুদী উৎসব। ইদুল ফেসাখের ৫০ দিন পরে এই উৎসব পালিত হয়। এ'সময়ে গম কাটার উৎসব শুরু হয়। প্যালেষ্টাইন দেশে যে সব ইহুদীরা বাস করেন না, তাঁরা এই দুটো ঈদ পালনের জন্য প্যালেষ্টাইনে ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করেন।

ওহ! আমি জানি, আপনি আমাকে বলেছেন, এই কথাগুলো বলা কুফরি কাজ। আর আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু আমি যা ভেবেছিলাম, তা আমার নিজের ভাবনা ছিল। তবু, আমি আমার চাচার কাছে কথা দিয়েছিলাম যে, আমি ঈদের সময়ে জেরুসালেমে যাব। সুতরাং, আমি ভাবলাম যে, আমার কথা রক্ষা করা উচিত। যদিও আমার মন মাঝে মাঝে খারাপ হতো, তবু আমি বললাম যে, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমরা কয়েকদনি আগে এসেছিলাম। তাই আমরা বেশীরভাগ জায়গা দেখে ফেললাম আর রবিবার একটু আগেই সকাল সাড়ে আটটার দিকে আমরা এবাদতখানা দেখতে গেলাম। হঠাৎ করেই আমার চাচা থেমে গেলেন আর আমাকে বললেন, “দাঁড়াও, সেই লোক কী কথা বলছে, তা শুন!”

আমি বললাম, “কোন লোকের কথা শুনতে বলছেন? এখানে অনেক লোকই তো কথা বলছে।”

“দেখো! এই কথা বলে আরও পাঁচ পা সামনে এগিয়ে গিয়ে একজন লোককে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, “ঐ লোকটির! যদিও তিনি গালীলের লোকদের মতো পোষাক পড়ে আছেন, কিন্তু, তিনি আমার গ্রামের লিবীয় ভাষায় অনন্তকালীন ইয়াওয়েহ এলাহিমের প্রশংসা করছেন! কিন্তু আমি একমাত্র ইহুদী, এবার আমার গোটা এলাকা থেকে আমি কেবল একাই এসেছি, আর তিনি কীভাবে আমার ভাষা শিখলেন, আর আমার জাতির উচ্চারণ না জেনেও তিনি কথা বলছেন!

আরও দু’জন লোক নায়িন গ্রাম থেকে এসেছিল। তাঁর সংগী লোক দু’জন বললো, “বোকার মতো ভেবো না, তিনি মাতাল হয়েছেন।”

“না, না! আমার চাচা বললেন, তিনি নাসরতের ঈসা সেই রাব্বি সম্পর্কে বলছেন, যাঁর কথা তোমরা বলো। এছাড়াও তিনি বলছেন যে, তিনি মসীহ্ ছিলেন, আর পাক-রূহ্ সম্পর্কে কিছু বলছেন।”

ঠিক তখনি একজন লোক এবাদতখানার সিড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থেকে জোরালো কণ্ঠে আমাদের কাছে বথা বলছিলেন। অন্যান্য লোকেরা তখন বলছিল যে,’ এরা অবশ্যই মাতাল হয়েছে।’ এজন্য, তিনি বললেন, < আপনারা যেমন মনে কে্েছন যে, এরা মাতাল হয়েছে, এই লোকেরা কিন্তু মাতাল হয়নি, এখন সকাল নটা ! না, এটা সেই ঘটনা, যার কথা য়োয়েল নবী বলেছেন, > তারপর তিনি বললেন, তাঁরা সবাই পাকরূহে পূর্ণ হয়েছেন। নবী য়োয়েলের কথামতোই তা ঘটেছে (প্রেরিত ২:১৫-১৬)।

পরে তিনি রব্বি ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে বলা শুরু করলেন। আল্লাহ্ তাঁর মধ্য দিয়ে যেসব মোজেজা ও নিশানা কাজ করেছেন তা উল্লেখ করার পর, তিনি বললেন, < সেই লোককে আল্লাহ্ আগে থেকে জানতেন, সেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার পর, তোমরা তাঁকে অবিশ্বাসীদের হাত দ্বারা সলিবের ওপর হত্যা করেছ।>

অতঃপর তিনি বললেন, < কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন;> (প্রেরিত ২:২৩-৩৪ ক)।

তাঁর একথা শুনে আমার মনে হলো আমার বুকের ওপর ভারি বোঝা চাপানো হয়েছে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো আর আমার শিরদাঁড়ার ওপর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি আমার চাচার কাঁধ এতো জোড়ে খাঁমচে ধরেছিলাম যে, তিনি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন> পরে বক্তা- আমি তাঁকে পরে চিনেছিলাম, তিনি কফুরনাহুম গ্রামের ঈসা মসীহের সাহাবী হজরত পিতর ছিলেন। তিনি জবুর শরীফের ১৬ নং গজল তেলাওয়াত করে বলতে লাগলেন,

“— এজন্য আমার অন্তর খুশি ও আমার জিহবা খুশি হলো; আবার আমার দেহও আশা নিয়ে বাস করবে; কারণ, তুমি আমার প্রাণ কবরে ফেলে রাখবে না, আর তোমার ভক্তলোককে ক্ষয় দেখতে দেবে না (জবুর শরীফ ১৬:৯-১০)।

এই কথা বলার পর তিনি বলতে লাগলেন, ভাইয়েরা, তোমাদিগকে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, দাউদ ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছে, আর তাঁর কবর এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে। ভালো, তিনি নবী ছিলেন এবং জানতেন, আল্লাহ কসম খেয়ে তাঁর কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরের একজনকে তাঁর সিংহাসনে বসাবেন; এইজন্য, আগে থেকে দেখে তিনি মসীহেরই পুনরুত্থানের সম্বন্ধে এই কথা বললেন যে, তাঁকে কবরে ফেলে রাখা হয়নি, তাঁর দেহ ক্ষয়ও দেখেনি।> (প্রেরিত ২:২৯-৩১)।

আর তাঁর শেষ কথা আমি কখনো ভুলবো না। তিনি বলেছিলেন, “< আল্লাহ্ এই ঈসাকেই জীবিত করেছেন, আমরা সবাই এই ঘটনার সাক্ষী। — (আর) এ'জন্য, ইসরায়েলের সকল বংশ নিশ্চিতভাবে জানুন যে, যাঁকে তোমরা সলিবে দিয়েছিলে, সেই ঈসাকেই আল্লাহ্ প্রভু এবং মসীহ্ উভয়ই করেছেন।> এই কথা শুনার পরে আমার বুক আবার ফুলে গেল, আমি আবার আগের মতো নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। (প্রেরিত ২:৩২, ৩৬)।

আমি জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে হজরত পিতরের কাছ থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আমি অন্যান্য লোকদের সাথে বললাম, “< আমরা এখন কী করবো?”

হজরত পিতর বললেন, < তওবা করো এবং তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের গুনাহ মাফের জন্য ঈসা মসীহের নামে তরিকাবন্দী গ্রহণ করো; তা হলে পাক-রূহরূপ নিয়ামত লাভ করবে—এই যুগের ফাসেক লোকদের থেকে নিজেদের হেফাজত করো।> (প্রেরিত ২:৩৭খ, -৩৮, ৪০খ)।

তিনি যখন কথাগুলো বলা শেষ করলেন, তখন প্রতেকে কথা বলা শুরু করলো, তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করা শুরু করল। আমি হজরত পিতরের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, “আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু কফুরনাহুম গ্রামে আমি আপনার বন্ধু ওবদীয়কে চিনি। আর ঈসা মসীহ্ যখন ৫০০০ লোককে খাইয়েছিলেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। কিন্তু এখন আমি একটি বিষয় জানতে চাই, হজরত ইব্রাহিম, হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুবের অনাদি, অনন্ত আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে আপনাকে বলছি, আপনি সত্যি করে বলুন যে, ঈসা মসীহ্ ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পরে আপনি কি তাঁকে জীবিত দেখেছেন? হজরত পিতর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছি!”

তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, “আপনি কতবার তাঁকে দেখেছেন?”

তিনি উত্তর দিলেন, “ঈদুল ফেসাখের পরের রবিবারে মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পরে সেদিনই ঈসা মসীহ্ একবার নিজে আমাকে দেখা দিয়েছেন। তিনি আমাদের সবাইকে দেখা দিয়েছেন। এক সপ্তাহ পরে, তিনি যখন বিশেষভাবে হজরত থোমার সাথে কথা বলেন, তখনও আমি সেখানে ছিলাম। কয়েকদিন পরে, আমরা যখন ৭জন গালীল সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম, তিনি আমাদের অলৌকিকভাবে মাছ ধরতে সাহায্য করেছিলেন। আমরা যখন নৌকা থেকে তীরে নামলাম, তিনি আমাদের জন্য সকালের খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। পরে, তিনি একবার ৫০০০ এর বেশী লোককে একসাথে দেখা দিয়েছিলেন। শেষবার তিনি ১ সপ্তাহ আগে বৃহস্পতিবার তিনি আমাদের চোখের সামনেই বেহেস্তে আরোহন করেছেন।”

আমি প্রশ্ন করলাম, ”তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি তাঁর ভেড়াদের পাপের মূল্যরূপে নিজের প্রাণ দেবেন, তারপর তিনি মৃত্যু থেকে উঠবেন এবং তৃতীয় দিনে আবার জীবিত হবেন, তাহলে, এই কথা সত্যি?”

“হ্যাঁ, এই কথা অবশ্যই সত্যি !” হজরত পিতর উত্তর দিলেন।

‘তাহলে ঠিক আছে!’ আমি বললাম,’ আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে, ঈসা মসীহ্ আমার পাপের জন্য মরেছেন, আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন। এখন আপনার কথামতো আমাকে তরিকাবন্দী দিন।’

তখনি তিনি আমাকে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে গেলেন আর আমাকে ঈসা মসীহের নামে তরিকাবন্দী দিলেন। সম্ভবতঃ আমি সবার আগে তরিকাবন্দী নিয়েছিলাম। প্রায় <তিন হাজার> লোক সেদিন আমরা তরিকাবন্দী নিয়েছিলাম। আমার চাচাও সেদিন তরিকাবন্দী নিয়েছিলেন। (প্রেরিত ২:৪১) তিনি বলেছিলেন, “যখন সেই গালীলের লোকটি আমার নিজের ভাষায় প্রচার করছিলেন, আমি তখনি জেনেছিলাম যে, এটি সত্য ঘটনা ছিল। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই।”

আর এখন আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। আর আমি ঈসা মসীহের প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি এখন মুক্ত। “তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, “তাই পুত্র যদি আপনাদের মুক্ত করেন তবে সত্যিই আপনারা মুক্ত হবেন।”

***

সবশেষে, আমি পাঠকদের কোরআনের একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এই আয়াতটি ৬ হিজরীতে নাজিল হওয়া মাদানি সূরা আল-আনআম (গবাদী পশু) ৬:৯ আয়াতে রয়েছে। পিকথল আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করেছেন,

“যদি তাকে ফেরেশতা করতাম (আমার দূত হিসেবে), তবে আমি তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম (যেন সে মানুষের সাথে কথা বলতে পারে)—।”

ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ এই দুনিয়াকে নিজের সাথে সম্মিলনের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি মানুষ হিসেবে এই দুনিয়াতে এসেছিলেন, যেন তিনি মানুষদের সাথে কথা বলতে পারেন আর

যারা তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র নেয়ামত হিসেবে নাজাত গ্রহণ করবেন, তাঁদের সবার জন্য তিনি বেহেস্তের দরজা খুলে দিতে পারেন।

পরিশিষ্ট ক

ঈসা মসীহের মোজেজার প্রত্যক্ষদর্শীদের আনুমানিক সংখ্যা

প্রতিটি মোজেজার তথ্য এভাবে দেওয়া হবে:

কী ধরনের মোজেজা — কোথায় মোজেজা করা হয়েছে

কিতাবের আয়াতসমূহ,

সুস্থ রোগীর সংখ্যা — প্রত্যক্ষ্যদর্শী সাক্ষীদের সংখ্যা — রোগীদের যাঁরা দেখেছেন আর তারপর রোগীকে সুস্থ দেখেছেন এমন লোকের সংখ্যাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

১. পানিকে আঙ্গুর রসে পরিণত করা — কান্না গ্রাম

সেখানে ইহুদীদের পাকসাফ করার নিয়ম অনুসারে পাথরের ছয়টা জাল বসানো ছিল, এর এক-একটাতে দুই তিন মণ করে পানি ধরতো। ঈসা তাদেরকে বললেন, 'ওই জালাগুলোতে পানি ভর।' তারা সেগুলো কাণায়-কাণায় পূর্ণ করলো। — ভোজের কর্তা যখন সেই পানি, যাহা আঙ্গুররস হয়েছিল, তা পান করলেন, তখন ভোজের কর্তা বরকে ডেকে বললেন, —তুমি ভালো আঙ্গুররস এখন পর্যন্ত রেখেছো? (ইউহোন্না ২:৬-৭, ৯, ১০খ)

সাহাবী ও চাকরেরা = ২০জন। — সম্ভবতঃ সব অতিথী

২. কুয়ার ধারে সেই সামেরীয় মহিলার অতীত কাহিনী ঈসা মসীহ্ জানতেন — সামেরিয়া

ঈসা তাকে বললেন,'যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।' মহিলাটি বললো, 'আমার স্বামী নেই।' ঈসা তাকে বললেন, "'তুমি ঠিকই বলেছ যে, আমার স্বামী নেই'; কারণ, তোমার পাঁচজন স্বামী হয়েছে, আর এখন যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; তুমি সত্য কথাই বলেছ।" মহিলাটি তাঁকে বললো,' জনাব, আমি দেখছি যে, আপনি একজন নবী' (ইউহোন্না ৪:১৬-১৯)।

১ জন

৩. একজন রাজকর্মচারীর ছেলেকে না দেখেই ঈসা মসীহ্ ভালো করেছিলেন। — কান্না গ্রাম

পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না গ্রামে গেলেন, যেখানে পানিকে আঙ্গুররস করেছিলেন। আর একজন রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁর ছেলে কফুরনাহুমে অসুস্থ ছিল। ঈসা ইহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন শুনে তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন, যেন তিনি গিয়ে তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন; কারণ সেই ছেলেটি মৃতপ্রায় হয়েছিল। তখন ঈসা তাঁকে বললেন, 'নিশানা

ও মোজেজা যদি না দেখো, তোমরা কোনো মতে ঈমান আনবে না।' সেই রাজকর্মচারী তাঁকে বললেন,' হে প্রভু, আমার ছেলেটি মারা যাওয়ার আগেই আসুন।' ঈসা তাঁকে বললেন,' যাও, তোমার ছেলে বাঁচলো।' ঈসা তাঁর ছেলেকে যে-কথা বললেন, তিনি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। তিনি যাচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর গোলামেরা তাঁর কাছে এসে বললো, 'আপনার ছেলেটি বেঁচেছে।' তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কখন ভালো হয়েছে?' তারা বললো,' কাল সাতটার [১] সময়ে তার জ্বর ছেড়েছে।' তখন তার পিতা বুঝলেন, ঈসা সেই সময়েই তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলেটি বাঁচলো;' তখন তিনি নিজে ও তাঁর সমস্ত পরিবার ঈসার ওপর ঈমান আনলেন (ইউহোন্না ৪:৪৬, ৪৭, ৫০-৫২, ৫৩)।

১জন	রাজকর্মচারীর পরিবাবেরর সদস্যরা?=১০	যদি স্বল্পকালীন অসুস্থতা হয়?=৩০, পরিবাবের সদস্য ও বন্ধু-বান্ধব

৪. পুকুরে পাড়ে ৩৮ বছরের রোগীকে সুস্থ করা — জেরুসালেম

আর সেখানে একজন লোক ছিল, সে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল। ঈসা তাকে — বললেন, 'তুমি কি সুস্থ হতে চাও? 'রোগী জবাব দিল, 'জনাব, আমার এমন কোনো লোক নেই যে, যখন পানি কাঁপানো হয়, তখন আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়; আমি যেতে না যেতেই অন্য একজন আমার আগে নেমে পড়ে।'— ঈসা তাকে বললেন, 'উঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।' তাতে তখনি সেই লোক সুস্থ হলো এবং নিজের বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলো (ইউহোন্না ৫:৫, ৬খ-৭ক, ৮-৯)

১জন	সাহাবীরা	দীর্ঘদিন অসুস্থতার জন্য অনেকেই জানতেন? =২০০

৫. অলৌকিকভাবে মাছ ধরার বিরবণ — কফুরনাহুম

একদিন যখন তিনি (ঈসা) গিনেষরত হ্রদের তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর ওপরে চাপাচাপি করে আল্লাহ্‌র কালাম শুনছিল, তাতে তিনি ঐ দু'টির মধ্যে একটিতে উঠে — তিনি নৌকায় বসে লোকদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। পরে কথা শেষ করে তিনি সিমাউনকে বললেন, 'তুমি গভীর পানিতে নৌকা নিয়ে চলো, আর তোমরা মাছ ধরার জন্য তোমাদের জাল ফেলো।' তাঁরা জাল ফেললে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়লো ও তাঁদের জাল ছিঁড়তে লাগলো; (লূক ৫:১, ৩-৪, ৬)

৪ জন জেলে	"জনতা"?=১০০

[১] দুপুর একটায়

৬. ঈসা মসীহ্ জ্বীনকে দূর করেন কফুরনাহুম

তখন তাদের জামাতখানায় একজন লোক ছিল, তাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল; সে চিৎকার করে বললো,'হে নাসরতবাসী ঈসা, আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে বিনাশ করতে এলেন? আমি জানি, আপনি কে; আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র লোক।' তখন ঈসা তাকে ধমক দিলেন, 'চুপ করো, ওর মধ্য থেকে বের হও। তাতে সেই নাপাক আত্মা তাকে মুচড়ে ধরে জোরে জোরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল। (মার্ক ১:২৩-২৬)

১ জন | জামাতখানা পূর্ণ? = ২০০ | শহরের অন্যান্য লোক=২০০

৭. হজরত পিতরের শ্বাশুড়ির জ্বর ভালো হওয়া কফুরনাহুম

তাতে তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে উঠালেন। তখন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল, আর তিনি তাঁদের সেবা করতে লাগলেন (মার্ক ১:৩১)।

১জন | কয়েকজন সাহাবী ও পরিবারে সদস্য?=১০

ক. অনেকের সুস্থ হওয়ার বিবরণ কফুরনাহুম- রোমীয় সেনারা সেখানে ছিল, শহরের লোকসংখ্যা?=৪০০০

পরে সন্ধ্যাকালে, সূর্য ডুবে গেলে লোকেরা সমস্ত অসুস্থ লোককে এবং ভূতে ধরা লোকদের তাঁর কাছে আনলো। আর নগরের সব লোক দরজায় জড় হলো। তাতে তিনি নানা রকমের অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন, আর তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনতো (মার্ক ১:৩২-৩৪)।

এসব লোকের মধ্যে ১০জনের ১জন অসুস্থ ছিল=৫০ | ? ৫০০ লোক অসুস্থদের সাথে এসেছিল। | ?৪০০০ লোক কমপক্ষে একজন অসুস্থ লোককে চিনতো।

৮. ঈসা একজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন
গালীল

একদিন একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে আরজ করলো, 'যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে পাকসাফ করতে পারেন।' তিনি মমতা করে হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, 'আমার ইচ্ছা, তুমি পাকসাফ হও।' তখনি কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেল, সে পাকসাফ হলো। (মার্ক ১:৪০-৪২)

১জন | সাহাবীরা | তাঁর পরিবাররও বন্ধু?=২০০

৯. ঈসা মসীহ্ একজন অবশ রোগীকে সুস্থ করে প্রমাণ করেন যে, তিনি ইবনুল ইনসান ও পাপ ক্ষমা করার অধিকার তাঁর আছে

কফুরনাহুম

"—তখন লোকেরা চারজন লোক দিয়ে একজন অবশ-রোগীকে বহন করে তাঁর কাছে আনছিল। —তাদের ঈমান দেখে ঈসা সেই অবশ-রোগীকে বললেন, 'বাছা, তোমার সমস্ত পাপ মাফ হ'লো।'

কিন্তু সেখানে কয়েকজন আলেম বসেছিলো; তারা মনে-মনে এ'রূপ তর্ক করতে লাগলো, এই লোক এমন কথা বলছে? এ যে কুফরী করছে; সেই একজন, অর্থাৎ আল্লাহ, ছাড়া আর কে পাপ মাফ করতে পারে? —কিন্তু দুনিয়াতে পাপ মাফ করার অধিকার ইবনুল ইনসানের আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পারো, এ'জন্য, তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন,'তোমাকে বলছি, উঠো, তোমার খাট তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।' তাতে সে উঠলো — (মার্ক ২:৩, ৫, -৭, ১০-১২ক)

১জন　　বাড়ি ও আংগিনা লোকে পূর্ণ ছিল? =১৫০ জন　　দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা?=২০০

১০. ঈসা মসীহ্ সাব্বাতবারে একজন হাত শুকিয়ে যাওয়া রোগীকে ভালো করেছিলেন

কফুরনাহুম

তখন তিনি সেই হাত শুকিয়ে যাওয়া লোকটিকে বললেন, 'মাঝখানে এসে দাঁড়াও।' পরে তাদেরকে বললেন, 'বিশ্রাম বারে কী করা জায়েজ? ভালো করা না ক্ষতি করা? প্রাণরক্ষা করা না খুন করা? 'কিন্তু তারা চুপ করে রইলো। তখন তিনি তাদের মনের কঠোরতার জন্য দুঃখিত হয়ে রাগ করে চারদিকে তাদের প্রতি তাকিয়ে সেই লোকটিকে বললেন, 'তোমার হাত বাড়িয়ে দাও'; সে তা বাড়িয়ে দিল, আর তার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হলো। (মার্ক ৩:৩-৫)

১জন　　জামাতখানা পূর্ণ?=১০০　　দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা?=২০০

খ. সোর ও সিদন থেকেও অনেক রোগী সুস্থ হওয়ার জন্য ঈসা মসীহের কাছে এসেছিল

"আর ইহূদিয়া, জেরুসালেম, ইদোম, জর্দান নদীর অপরপারের দেশ এবং সোর ও সিদোনের চারদিক থেকে অনেক লোক, তিনি যে সমস্ত বড় বড় কাজ করছিলেন, তা শুনে তাঁর কাছে এলো। — কারণ, তিনি অনেক লোককে সুস্থ করলেন, সে'জন্য অসুস্থরা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টায় তাঁর গায়ের ওপর পড়ছিল। আর নাপাক আত্মারা তাঁকে দেখলেই তাঁর সামনে পড়ে চিৎকার করে বলতো, 'আপনি ইবনুল্লাহ!'" (মার্ক ৩:৮, ১০-১১)

১০ জনের একজন অসুস্থ?=২০০	?=২০০০ লোক এসেছিলেন	১০০০ লোক প্রতিটি সুস্থ হওয়া রোগীকে চিনতেন?=২০, ০০০

১১.শতসেনাপতির চাকরকে ঈসা মসীহ্‌ তাকে সুস্থ করেছিলেন কফুরনাহূম

তখন একজন শতসেনাপতির এক গোলাম অসুস্থ হয়ে মরার মতো হয়েছিল, তিনি তাঁকে ভালোবাসেন। তিনি ঈসার খবর শুনে ইহুদীদের কয়েকজন মুরুব্বীকে দিয়ে তাঁর কাছে অনুরোধ করে পাঠালেন, যেন তিনি এসে তাঁর গোলামকে বাঁচান। তাঁরা ঈসার কাছে এসে আগ্রহের সাথে অনুরোধ করে বলতে লাগলেন, 'আপনি যে তাঁর জন্য এই কাজ করেন, তিনি তার যোগ্য; কারণ, তিনি আমাদের জাতিকে ভালোবাসেন, আর আমাদের জামাতখানা তিনি নিজে তৈরি করে দিয়েছেন।'

ঈসা তাঁদের সঙ্গে গেলেন, আর তিনি বাড়ির কিছু দূরে থাকতেই শতসেনাপতির কয়েকজন বন্ধু দ্বারা তাঁকে খবর পাঠালেন, "প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না; কারণ আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার বাড়িতে আসেন; সে'জন্য আমাকেও আপনার কাছে আসার যোগ্য মনে করলাম না; আপনি মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম সুস্থ হবে। কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার সেনারা আমার অধীন; আর আমি তাদের একজনকে যাও বললে যে যায় এবং ও এসো বললে সে আসে, আর আমার গোলামকে 'এই কাজ করো' বললে সে তা করে।"

এই কথাগুলি শুনে ঈসা তাঁর বিষয়ে আশ্চর্য হ'লেন এবং যে লোকেরা তাঁর পেছনে-পেছনে আসছিল, তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে বলছি, ইসরায়েলের মধ্যেও এত বড় ঈমান দেখতে পাইনি।' পরে যাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ঘরে ফিরে গিয়ে সেই গোলামকে সুস্থ দেখতে পেলেন। (লূক ৭:২-৩ক, ৬-৮, ৯ক-১০)

১জন শতসেনাপতির পরিবার? =১০

১২. একজন বিধবার ছেলেকে ঈসা মসীহ্‌ মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন নায়িন

"যখন তিনি নগরের সদর-দরজার কাছে এলেন, দেখো, লোকেরা একজন মৃত মানুষকে বহন করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলো; সে তার বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে এবং নগরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। — পরে কাছে গিয়ে খাট ছুঁলেন; — তিনি বললেন, 'হে যুবক, তোমাকে বলছি, উঠো।' তাতে সেই মরা মানুষটি উঠে বসলো এবং কথা বলতে লাগলো; পরে তিনি তাকে তার মায়ের হাতে দিলেন।" (লূক ৭:১২, ১৪-১৫)

১জন গরীব বিধবা, ছোট-খাটো দাফন অনুষ্ঠান?=৫০ অন্যান্য লোক?=৫০

১৩. ঈসা মসীহ্‌ ঝড়কে শান্ত করেছিলেন গালীল সাগর

"পরে ভীষণ ঝড় উঠলো এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমনি আঘাত করলো যে, নৌকা পানিতে ভরে যেতে লাগলো। তিনি নৌকার পেছনে বালিশে মাথা দিয়ে তখন ঘুমাচ্ছিলেন; — তিনি উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন ও সাগরকে বললেন, 'শান্ত হও;' তাতে বাতাস থামলো এবং সম্পূর্ণ শান্তি

হলো। পরে তিনি তাঁদেরকে বললেন, 'তোমরা এরূপ ভয় পাও কেন? এ কেমন, তোমাদের ঈমান নেই?' তাতে তাঁরা খুব ভীত হয়ে একজন অন্যজনকে বলতে লাগলেন,' ইনি তবে কে যে, বাতাস এবং সাগরও এঁর হুকুম মানে?" (মার্ক ৪:৩৭-৩৮ক, ৩৯, ৪১)

তাঁর সাহাবীরা

১৪. ভূতে পাওয়া লোককে সুস্থ করা গেরাসেনি (জর্দান)

— "তিনি নৌকা থেকে বের হ'লে তখন একজন লোক কবরস্থান থেকে তাঁর সামনে এলো, — সে কবরে থাকত এবং কেউ তাকে শিকল দিয়েও আর বেঁধে রাখতে পারতো না। কারণ, লোকে বার বার তাকে বেড়ী ও শিকল দিয়ে বাঁধতো, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়ে ফেলতো এবং বেড়ী ভেঙ্গে টুক্রা- টুক্রা করত; কেউ তাকে বশ করতে পারতো না। (—সে দূর থেকে ঈসাকে দেখে দৌড়ে এলো, তাঁর পায়ে উবুড় হয়ে পড়ল এবং জোরে চিৎকার করে বললো, 'হে ঈসা, ইবনুল্লাহ, আপনার সহিত আমার সম্পর্ক কী? আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আমাকে কষ্ট দেবেন না।' এ'জন্য যে, তিনি তাকে বলেছিলেন, 'হে নাপাক আত্মা, এই লোকের মধ্য থেকে বের হও।' —তখন সেই নাপাক আত্মারা বের হয়ে শূকরদের মধ্যে ঢুকলো; তাতে সেই শূকর পাল, — ভীষণবেগে দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ল এবং ডুবে মরলো।

তখন সেগুলোকে যারা চরাচ্ছিলো, তারা পালিয়ে গিয়ে নগর-নগরে ও গ্রামে-গ্রামে গিয়ে খবর দিল। তখন কী ঘটেছে, তা দেখার জন্য লোকেরা এলো; এবং ঈসার কাছে এসে দেখে, সেই ভূতেধরা লোক, যাকে বাহিনী-ভূতে পেয়েছিল, সে কাপড় পরে শান্ত হয়ে বসে আছে; তাতে তারা ভয় পেল। (মার্ক ৫:২খ, ৪, ৬-৮, ১৩, ১৫)

১জন সাহাবীরা গোটা এলাকা?=৫০০০

১৫. জায়িরের মেয়েকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন কফুরনাহুম

আর জামাতখানায় যায়ীর নামে একজন নেতা এসে ঈসাকে দেখে তাঁর পায়ে পড়লেন এবং অনেক মিনতি করে বললেন, 'আমার মেয়েটি মারা যাচ্ছে,' —তখন ঈসা তাঁর সঙ্গে চললেন; এবং অনেক লোক তাঁর পেছনে-পেছনে চললো ও তাঁর ওপরে চাপাচাপি করে পড়তে লাগলো। —তিনি ভেতরে গিয়ে তাদেরক বললেন, 'তোমরা হৈচৈ ও কান্নাকাটি করছো কেন? বালিকাটি তো মরেনি, ঘুমিয়ে আছে।' এতে তারা তাঁকে উপহাস করলো; — যেখানে বালিকাটি ছিল, তিনি সেখানে গেলেন। পরে তিনি বালিকার হাত ধরে তাকে বললেন,' টালিথা কুমী'; অনুবাদ করলে এর অর্থ এই, বালিকা, তোমাকে বলছি, উঠো। তাতে বারো বছর বয়সের বালিকাটি তখনি উঠে চলাফেরা করতে লাগলো— । (মার্ক ৫:২২-২৩ক, ২৪খ, ৩৯-৪০, ৪১-৪২খ)

১জন সাহাবীরা ও মেয়েটির বাবা-মা, গুরুত্বপূর্ণ লোক?=৪০০

১৬. বারো বছরের রক্তস্রাবরোগীকে ভালো করা কফুরনাহুম

একজন মহিলা যে বারো বৎসর থেকে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল, — সে তাঁর চাদর ছুঁলো— আর তখনি তার রক্তস্রাব বন্ধ হলো ; —ঈসা তখনি মনে-মনে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে। (মার্ক ৫:২৫, ২৭খ, ২৯ক, ৩০ক)

১জন ? ৫০জনের জনতা গরিব মহিলা?=১০০

১৭. দুইজন অন্ধরোগী সুস্থ হওয়ার বিবরণ ? কফুরনাহুমের বাইরে

"পরে ঈসা সেই জায়গা থেকে রওনা হ'লে, দুইজন অন্ধ তাঁর পেছনে-পেছনে চললো; তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে দাউদ সন্তান, আমাদের প্রতি মেহেরবানি করুন।' তিনি ঘরে প্রবেশ করার পর সেই অন্ধেরা তাঁর কাছে এলো; তখন ঈসা তাদেরকে বললেন,' তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, আমি এটা করতে পারি? তারা তাঁকে বললো,' হ্যাঁ, প্রভু।' তিনি তখন তাদের চোখ ছুঁলেন, —তখন তাদের চোখ খুলে গেল। (মথি ৯:২৭-২৯ক, ৩০ক)

২ ঘর পূর্ণ?=২০জন ?১০০*২ =২০০

১৮. এর পরপরেই একজন ভূতে ধরা লোককে সুস্থ করার বিবরণ একই গ্রাম

"তারা বাইরে যাচ্ছে, আর দেখো, লোকেরা একজন ভূতেধরা বোবা লোককে তাঁর কাছে আনলো। ভূত ছাড়ানো হ'লে সেই বোবা কথা বলতে লাগলো; তখন সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে বললো, 'ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায়নি।'" (মথি ৯:৩২-৩৩)

১ জনতা?=১০০ গোটা গ্রামবাসী =৫০০

১৯. দুটো মাছ আর পাঁচটি রুটি দিয়ে ৫০০০ লোককে খাওয়ানো জর্দানের কাছে বেথসাইদা গ্রাম

"পরে ঈসা গালীল সাগরের— অপর পারে চলে গেলেন। — আর ঈসা চোখ তুলে দেখলেন, অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে, তিনি ফিলিপকে বললেন, 'ওদেরকে খাবার দেবার জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে পারবো?'

ফিলিপ তাঁকে বললেন,' ওদের জন্য দুশো দিনারের (৮ মাসের মুজুরী) রুটিও এরূপ যথেষ্ট নয় যে, প্রত্যেকে কিছু কিছু পেতে পারে।'

তাঁর একজন সাহাবী—বললেন,' এখানে একটি বালক আছে, তার কাছে যবের পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ আছে;—ঈসা মসীহ্ বললেন, 'লোকদেরকে বসিয়ে দাও।' সেখানে অনেক ঘাস ছিল। তাতে পুরুষরা, **সংখ্যায় অনুমান পাঁচ হাজার লোক**, বসে গেল। তখন ঈসা মসীহ্ সেই রুটি কয়টা নিলেন ও শুকরিয়া আদায় করলেন এবং যারা বসেছিল, তাদেরকে ভাগ করে দিলেন;

সেভাবে তিনি মাছও দিলেন, — তখন উম্মতেরা জড়ো করলেন, — বারো টুকরী পূর্ণ করলেন।— সেই লোকেরা ঈসার এই নিশানা কাজ দেখে বলতে লাগলো,' উনি সত্যই সেই নবী, যার **দুনিয়াতে** আসার কথা ছিল।'" (ইউহোন্না ৬:১, ৫, ৭-১০, ১৩-১৪)

ঈসা তাদেরকে বললেন, 'আমিই সেই জীবন খাদ্য।— কারণ, আমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমি বেহেশত থেকে নেমে আসিনি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য' (ইউহোন্না ৬:৩৫, ৩৮)।

৫০০০ লোক এই মোজেজা দেখেছিলেন ও অলৌকিক খাবার খেয়েছিলেন।

২০. ঈসা মসীহ্ মসীহ্ পানির ওপর দিয়ে হেঁটেছিলেন গালীল সাগর

"সন্ধ্যা হ'লে তাঁর সাহাবীরা সাগর পারে নেমে গেলেন, এবং একটি নৌকায় উঠো সাগর পারে কফরনাহূমের দিকে যেতে লাগলেন। — এভাবে পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার যাওয়ার পর তাঁরা ঈসাকে দেখতে পলেন, তিনি সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে নৌকার কাছে আসছেন; এতে তাঁরা ভয় পেলেন।

কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন,'এ আমি, ভয় করো না।'

তখন তাঁরা তাঁকে নৌকায় তুলতে চাইলেন;— (ইউহোন্না ৬:১৬, ১৯-২১ক)

তাঁর সাহাবীরা

গ .যারা ঈসা মসীহকে ছুঁয়েছিল ,তারা সবাই সুস্থ হয়েছিল গিনেষরত এলাকা

"পরে সাগর পার হয়ে তাঁরা গিনেষরত প্রদেশে এলেন। —সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে সেই দেশের চারদিকে খবর পাঠালো এবং যত অসুস্থ লোক ছিল, সবাইকে তাঁর কাছে আনালো; আর তাঁকে মিনতি করলো,' যেন ওরা তাঁর চাদরের ঝালর ছুঁ'তে পারে; আর যত লোক ছুঁ'ল, সবাই সুস্থ হলো। (মথি ১৪:৩৪-৩৭)

১০জনের ১ জন? =৪০০	?= ২০টি গ্রামের ৪০০০ লোক	৪০০*১০০ বন্ধু =৪০, ০০০

২১. একজন গ্রীক মহিলার মেয়েকে ঈসা মসীহ্ ভালো করেন। সোর এলাকার একটি বাড়ি

"পরে তিনি (ঈসা) উঠে সেই জায়গা থেকে সোর ও সিদোন এলাকায় গেলেন। আর তিনি একটি বাড়িতে ঢুকলেন, ইচ্ছা করলেন, যেন কেউ জানতে না-পারে; কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। কারণ, তখনই একজন মহিলা, যার একটি মেয়ে ছিল, আর তাকে নাপাক আত্মায়

আছর করেছিল, মহিলাটি গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী ছিল। সে তাঁহাকে মিনতি করতে লাগলো, যেন তিনি তার মেয়ের ভূত ছাড়িয়ে দেন। — তখন তিনি তাকে বললেন, 'এই কথার জন্য চলে যাও, তোমার মেয়ের ভূত ছেড়ে গিয়েছে।' পরে সে বাড়ি গিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং ভূত ছেড়ে গিয়েছে। (মার্ক ৭:২৪-২৬, ২৯-৩০)

১জন ঘরপূর্ণ=২০ জন ?২০০

২২. একজন বোবা ও কালা লোককে সুস্থ করা- দেকাপলি-জর্দানের বৃহত্তর এলাকা

"পরে তিনি সোর এলাকা হইতে বের হ'লেন এবং সিদোন হয়ে দিকাপলি এলাকার মধ্য দিয়ে গালীল সাগরের কাছে এলেন। তখন লোকেরা একজন কালা-বোবা লোককে তাঁর কাছে এনে তাঁকে তার ওপরে হাত রাখতে অনুরোধ করলো। — **এক পাশে এনে** তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল দিলেন, থুথু ফেললেন ও তার জিহ্বা ছুঁলেন। আর তিনি বেহেস্তের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, 'ইপ্‌ফাথা,' অর্থাৎ খুলে যাক। তাতে তার কান খুলে গেল, জিহ্বার জড়তা দূর হলো, আর সে স্পষ্ট-কথা বলতে লাগলো। (মার্ক ৭:৩১-৩২ক, ৩৩-৩৫)

১জন ?=২০০

ঘ. গালীল সাগরের পূর্বদিকে মহাজনতা দেকাপলিস

"পরে ঈসা সেই জায়গা থেকে রওনা হয়ে গালীল সাগরের তীরে হাজির হ'লেন এবং পাহাড়ে উঠে সেখানে বসলেন। আর **প্রচুর লোক** তাঁর কাছে আসতে লাগলো, তারা নিজেদের সঙ্গে খোঁড়া, অন্ধ, বোবা, নুলা এবং আরও অনেক লোককে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রাখলো; আর তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন—। আর তাঁরা ইস্রায়েলের আল্লাহ্‌র গৌরব করলো। (মথি ১:২৯, ৩০, ৩১খ)

১০জনের "প্রচুর লোক?=২০০০ প্রত্যেকজন* ১০০? =২০, ০০০
১ জন=২০০

২৩. ৪০০০ লোককে খাওয়ানো দেকাপলিস

"— যখন আবার **অনেক লোকের ভিড়** হলো, — পরে তিনি লোকদেরকে মাটিতে বসতে হুকুম দিলেন এবং সেই সাতটি রুটি নিয়ে বরকত দান করে ছিঁড়ে লোকদের সামনে রাখার জন্য সাহাবীদেরকে দিতে লাগলেন; তাঁরা লোকদের সামনে রাখলেন। —তাঁদের কাছে কয়েকটি ছোট-ছোট মাছও ছিল— তাতে লোকেরা খেয়ে তৃপ্ত হলো; এবং তাঁরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সাত ঝুড়ি তুলে নিলেন। সেখানে কমবেশ চার হাজার লোক ছিল—" (মার্ক ৮:১ক, ৬-৭ক, ৮-৯)

"৪০০০ লোকের এক "মহাজনতা"

২৪. একজন অন্ধ রোগী সুস্থ হওয়া বেদসাইদা গ্রাম,

"— **লোকেরা** একজন অন্ধকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে মিনতি করলো, — তখন তিনি সেই অন্ধের হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; এবং তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার ওপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছো?' সে চোখ তুলে চেয়ে বললো, 'মানুষ দেখছি, গাছের মতো দেখছি, বেড়াচ্ছে।' তখন তিনি তার চোখের ওপরে আবার হাত রাখলেন, তাতে তার চোখ খুলে গেল, স্পষ্টরূপে সবই দেখতে পেল।" (মার্ক ৮:২২, ২৩খ, ২৫)

১ জন 'লোকেরা'?=১০ ১০০

২৫. একজন ভূতে-ধরা লোককে সুস্থ করা দামেস্কের দিকে সিসেরা-ফিলিপি এলাকা

"তাদের (সাহাবী) চারপাশে **অনেক লোক** জমায়েত হয়েছে। — তাঁরা তাকে (বালককে) ঈসার কাছে নিয়ে এলো; তাঁকে দেখার সাথে-সাথে সেই আত্মা তাকে ভীষণভাবে মুচড়ে ধরলো, আর তার মুখ থেকে ফেনা বের হলো, সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। — ঈসা সেই নাপাক আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন,' হে বধির, বোবা-আত্মা, আমিই তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও, আর কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করও না।'

তখন সে চিৎকার করে তাকে ভীষণভাবে মুচড়ে বের হয়ে গেল; — কিন্তু ঈসা তার হাত ধরে তাকে তুললে সে উঠলো।" (মার্ক ৯:২০, ২৫খ, -২৬ক, ২৭)

১ জন "অনেক লোক"? ৫০০-১০০০০ ২০০

২৬. একটি বিশেষ মাছ ধরা কফুরনাহুম

"পরে তাঁরা কফুরনাহুমে এলে, কর-আদায়কারীরা পিতরের কাছে এসে বললো,' তোমাদের মুরশিদ কি কর দেন না?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি তো কর দেন।' — ঈসা আগেই তাঁকে বললেন, — 'তুমি সাগরে গিয়ে বড়শী ফেলো, তাতে প্রথম যে মাছটি উঠবে, ওটা ধরে ওর মুখ খুললে একটি টাকা পাবে; ওটা নিয়ে আমার এবং তোমার পক্ষে ওদেরকে দাও। (মথি ১৭:২৪ক-২৫ক, ২৭)

১জন

২৭. জন্মান্ধ লোককে সুস্থ করা জেরুসালেম

"আর তিনি যেতে -যেতে একজন লোক দেখলেন, সে জন্ম থেকে অন্ধ ছিল। (তিনি বললেন,) 'আমি যখন **দুনিয়াতে** আছি, তখন আমিই দুনিয়ার নূর।' এই কথা বলে তিনি মাটিতে থুথু ফেলে সেই থুথু দিয়ে কাদা করলেন; পরে ঐ লোকের চোখে সেই কাদা লেপে দিলেন ও

তাকে বললেন, 'শীলোহ্ পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল—' তখন সে গিয়ে ধুয়ে ফেলল এবং চোখে দেখতে পেয়ে ফিরে এল।

তখন ঈসা বললেন, 'বিচার করার জন্য আমি এই দুনিয়াতে এসেছি, যেন যারা দেখে না তারা দেখতে পায় -' (ইউহোন্না ৯:১, ৫-৭, ৩৯ক)।

১জন বন্ধু + যাদের কাছে সে ভিক্ষা চাইত?=৩০০

৭২জন সাহাবী জোড়ায় জোড়ায় প্রচার কাজে যাওয়ার সময়ে মোজেজা করেছিলেন সারাদেশে

"এর পর প্রভু আরও সত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, আর নিজে যেখানে যেতে আগ্রহী ছিলেন, সেই সব শহরে ও স্থানে নিজের আগে দুইজন-দুইজন করে তাদেরকে পাঠালেন।

পরে সেই সত্তরজন আনন্দে ফিরে এসে বললো, 'প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের কথা শুনে' (লূক ১০:১, ১৭)।

৩৬ জোড়া * ২ মোজেজা=৭২ ? ৭২১০০=৭২০০

২৮. একজন বোবা লোককে সুস্থ করা

এহুদা এলাকা

আর তিনি একটা ভূত ছাড়িয়েছিলেন, সে বোবা ছিল। ভূত বের হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগলো; তাতে লোকেরা আশ্চর্য হলো (লূক ১১:১৪)।

১জন "লোকেরা"?=১০০ ২০০

২৯. কুজা মহিলা সুস্থ হওয়ার বিবরণ

এহুদা এলাকা

কোনো এক বিশ্রামবারে **ঈসা জামাতখানায়** হিদায়েত করছিলেন। আর দেখো, একজন মহিলা, যাকে আঠারো বৎসর ধরে ভুতে ধরেছিল, সে কুঁজা ছিল, কোনোমতেই সোজা হ'তে পারতো না।

—পরে তিনি তার ওপর হাত রাখলেন; তাতে সে তখনই সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর আল্লাহ্‌র গৌরব করতে লাগলো" (লূক ১৩:১১, ১৩)।

১জন জামাতখানা পূর্ণ?=১০০০ ২০০

৩০. শোথ রোগীকে ভালো করার বিবরণ মধ্য জর্দানের পেরেয়া এলাকা

তিনি এক বিশ্রাম বারে **ফরিশীদের একজন প্রধান নেতার বাড়িতে** দাওয়াত খেতে গেলেন, — একজন শোথরোগী তাঁর সামনে ছিল। — তখন তিনি তাকে ধরে সুস্থ করলেন, পরে বিদায় দিলেন।

১জন প্রধান নেতার পরিবারের লোকেরা?=২০ ২০০

৩১. ৪ দিনের মৃত লাসারকে জীবিত করা জেরুসালেমের কাছে বেথেনিয়া গ্রাম

“মার্থা (লাসারের বোন) যখন শুনলেন, ঈসা আসছেন, তিনি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন, — মার্থা ঈসাকে বললেন, ‘প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তা হ’লে আমার ভাই মারা যেত না। —

ঈসা তাঁকে বললেন, ‘তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।’ মার্থা তাঁকে বললেন,’ আমি জানি, আখেরাতের দিন পুনরুত্থানের সময়ে সে উঠবে।’ ঈসা তাঁকে বললেন, ‘আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার ওপর ঈমান আনে, সে মরলেও জীবিত হ’বে; ‘— তখন ঈসা পুনরায় অন্তরে অস্থির হয়ে কবরের কাছে এলেন। - ঈসা বললেন, ‘তোমরা পাথরটি সরিয়ে ফেলো। মৃত লোকের বোন মার্থা তাঁকে বললেন, ‘প্রভু, এখন ওতে দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ, আজ চার দিন হলো সে মারা গিয়েছে।’

— পরে ঈসা ওপরের দিকে চোখ তুলে বললেন, ‘পিতা, তোমার শুকরিয়া আদায় করি যে, তুমি আমার কথা শুনেছো। আর আমি জানতাম, তুমি সবসময়ে আমার কথা শুনে থাকো; কিন্তু **এই লোকগুলি চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে,** এদের জন্য এই কথা বললাম, যেন এরা ঈমান আনে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। এই কথা বলে তিনি চিৎকার করে ডেকে বললেন,’ লাসার, বাইরে এসো!’ তখনই সেই মৃত লোক বাইরে এলেন; তাঁর পা ও হাত কাফনের কাপড়ে বাঁধা ছিল এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল।” (ইউহোন্না ১১:২০-২৫, ৩৮ক, ৩৯, ৪১খ-৪৪)

১জন দাঁড়ানো লোকের সংখ্যা? =৫০ ২০০

৩২. ঈসা মসীহ্ দশজন কুষ্ঠরোগীকে ভালো করেন শমরিয়া

“তিনি কোনো গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে দশজন কুষ্ঠরোগী তাঁর সামনে পড়ল, তারা দূরে দাঁড়াল, আর তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, ‘ঈসা, প্রভু, আমাদেরকে দয়া করুন।’ তাদেরকে দেখে তিনি বললেন,’ যাও, ঈমামদের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে দেখাও।’যেতে যেতে তারা পাকসাফ হলো। (লূক ১৭:১২-১৪)

১০ জন সাহাবীরা ১০*?১০০=১০০০

৩৩. দুইজন অন্ধ রোগীর ভালো হওয়ার বিবরণ যিরিহো

"পরে যিরিহো হ'তে তাঁদের বের হওয়ার সময়ে **অনেক লোক** তাঁর পেছনে- পেছনে গেল। আর দুইজন অন্ধ পথের পাশে বসেছিল; — তারা চিৎকার করে বললো,'প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাদের প্রতি রহম করুন।' তাতে সব লোকেরা চুপ্- চুপ্ বলে তাদেরকে ধমক দিল; কিন্তু তারা আরও বেশী জোরে-জোরে চিৎকার করে বললো, 'প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাদের প্রতি রহম করুন!"

তখন ঈসা দয়া করে তাদের চোখ ছুঁ'লেন, আর তখনই তারা দেখতে পেল ও তাঁর পেছনে-পেছনে চলল। (মথি ২০:২৯-৩০, ৩৪)

২জন **"অনেক লোক?=৫০০** ২জন লোক*?১০০ =২০০

৩৪. ডুমুরগাছের শুকিয়ে যাওয়া একটি প্রতীক জেরুসালেম

"পরদিন যখন তাঁরা বেথানিয়া থেকে বের হয়ে এলেন, তখন তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন; এবং দূর থেকে পাতাসহ এক ডুমুরগাছ দেখে, হয়তো তা থেকে কিছু ফল পাবেন ভেবে কাছে গেলেন; কিন্তু কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কারণ, তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। তিনি গাছটিকে বললেন,' এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল আহার না করুক।' এই কথা তাঁর সাহাবীরা শুনতে পেলেন। —ভোরে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছটি শিকড়শুদ্ধ শুকিয়ে গেছে (মার্ক ১১:১২-১৪, ২০)।

সাহাবীরা

৩৫. ঈসা মসীহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হজরত পিতর তিনবার তাঁকে অস্বীকার করবেন। জেরুসালেম

"পিতর তাঁকে বললেন, 'যদিও সকলে বিঘ্ন পায়, তবু আমি পাব না।' ঈসা তাঁকে বললেন,' আমি তোমাকে সত্য বলছি, তুমিই আজ, এই রাতে, মোরগ দু'বার ডাকার আগে, তিনবার আমাকে Aস্বীকার করবে।' কিছু সময় পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা আবার পিতরকে বললো,' সত্যি তুমি তাদের একজন; কারণ, তুমি গালীলের লোক।' কিন্তু তিনি নিজেকে অভিশাপ দিয়ে কসম খেয়ে বলতে লাগলেন, 'তোমরা যে লোকের কথা বলছো, তাকে আমি চিনি না।'তখনি দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠলো; তাতে পিতরের মনে পড়লো; এবং তিনি সেই বিষয় চিন্তা করে কাঁদতে লাগলেন। (মার্ক ১৪:২৯-৩০, ৭০খ-৭২)

সাহাবীরা

৩৬. ঈসা মসীহকে গ্রেফতার করতে আসা   জেরুসালেম

লোকদের মধ্যে ঈসা মসীহ্ একজন লোক- মালকিকে সুস্থ করেছিলেন। "তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখো, অনেক লোক এবং যার নাম ইহূদা, - সেই বারোজনের মধ্যে একজন- সে তাদের আগে আগে আসছে— কিন্তু ঈসা তাকে বললেন, 'ইহূদা, চুমু দিয়ে কি ইবনে আদমকে ধরিয়ে দিচ্ছ?' আর তাঁদের মধ্যে একজন লোক পেশ-ঈমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। কিন্তু ঈসা জবাব দিলেন, 'এই পর্যন্ত থামো! পরে তিনি তার কান ছুঁয়ে তাকে সুস্থ করলেন। (লূক ২২:৪৭-৪৮, ৫০-৫১)

১জন   সাহাবী ও "অনেক লোক"?=৫০

৩৭. ঈসা মসীহ্ অলৌকিক ভাবে মাছ ধরার মধ্য দিয়ে মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পরে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।   গালীল সাগর

"অতঃপর ঈসা তিবিরিয়া সাগরের তীরে আবার সাহাবীদের কাছে নিজেকে এভাবে প্রকাশ করলেন। সিমাউন পিতর তাঁদেরকে (অন্য ৬ জন সাহাবী) বললেন,' আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।' তাঁরা তাঁকে বললেন,'আমরাও তোমার সাথে যাবো।'

তাঁরা বাইরে গিয়ে নৌকায় উঠলেন, আর সেই রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না। পরে সকাল হয়ে আসছে, এমন সময় ঈসা তীরে দাঁড়ালেন, তবু সাহাবীরা তাঁকে চিনতে পারলেন না যে, তিনি ঈসা। ঈসা তাঁদেরকে বললেন, 'বাছারা, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে?' তাঁরা জবাব দিলেন, 'না।' তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন,'নৌকার ডান পাশে জাল ফেল, পাবে।' তখন তাঁরা জাল ফেললেন এবং এতো মাছ পড়ল যে, তাঁরা আর তা টেনে তুলতে পারলেন না। তখন ঈসা যাঁকে ভালোবাসতেন, সেই সাহাবী পিতরকে বললেন,' উনি প্রভু!'

তাঁদের খাওয়ার পরে ঈসা সিমাউন পিতরকে বললেন, 'হে ইউহোন্নার পুত্র সিমাউন, এগুলির চেয়ে তুমি কি আমাকে বেশী ভালোবাস? তিনি বললেন,' হ্যাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) চরাও।] — এই কথা বলার পর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার পেছনে এসো।' (ইউহোন্না ২১:১, ৩-৭ক, ১৫, ১৯খ)

৭জন সাহাবী

ওপরের আলোচনায় ৩৭টি মোজেজার মধ্য দিয়ে বিশদভাবে ৩৯জন ভিন্ন-ভিন্নরোগী সুস্থ হওয়ার বিবরণ রয়েছে। ৪টি অংশ আর এর সাথে ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর ঘটনা একসাথে বিবেচনা করলে আমরা দেখি যে, যারা ঈসা মসীহের কাছে এসেছিল, তাদের সবাইকে তিনি সুস্থ করেছিলেন। খসড়া হিসাব অনুসারে, এই কথা বলা যায় যে, কমপক্ষে ১০০০ লোক এই গণসুস্থ হওয়ার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুস্থ হয়েছিল।

এর সাথে আরো যোগ করা যে, অবশ্যই ১৪৫০০- ১৫০০০ লোক এই সুস্থ হওয়ার ঘটনাগুলো দেখেছিল, এর মধ্যে তারাও রয়েছেন, একবার ৫০০০ ও আরেকবার ৪০০০ লোক- যাঁরা এই অলৌকিক খাবার খেয়েছিলেন, তাঁরা এই মোজেজা নিজের চোখেই দেখেছিলেন। এমনকি যদি অর্ধেক সাক্ষীও দুটো মোজেজা দেখেছিলেন, তবু বলা যায় যে, ১১০০০ লোক প্রায় ১০০০০ মোজেজার সাক্ষী হয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ সম্ভবতঃ আরো ৮৬০০০ লোক রয়েছেন, যাঁরা এসব অসুস্থ রোগীদের-পুরুষ ও মহিলাকে চিনতেন, তারা যখন ভূতে পাওয়া রোগী ছিল, অথবা তারা অবশরোগী ছিল। যদিও তাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না. কিন্তু এসর রোগী ভালো হওয়ায় তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটি মোজেজা ঘটেছে। যদি সেই সময়ে ২০ লক্ষ লোক প্যালেষ্টাইনে বাস করতেন, তবে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রতি ২০ জন লোকের মধ্যে ১৯জন লোক এই মোজেজা দেখেছিলেন বা রোগ থেকে ভালো হয়েছে, এমন লোকের কথা তাঁরা জানতেন।

এভাবে ঈসা মসীহের সময়ে খাঁটি বিশ্বাসীরা প্রচুর মোজেজা দেখেছিলেন, এগুলো প্রমাণ করছে যে, আসলেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ইয়াওয়েহ এলোহিম ঈসা মসীহকে পাঠিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট খ

মসীহের মৃত্যুর বিশদ বিবরণ ও এর পূর্ণতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ঈসার নিজের ভবিষ্যদ্বাণী

"দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। সেখানে ইব্‌নে-আদমকে প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁরা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে স্থির করবেন এবং অ-ইহুদীদের হাতে দেবেন। " **অ-ইহুদীরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, তঁর গায়ে থুথু দেবে, তাঁকে ভীষণভাবে চাবুক মারবে এবং হত্যা করবে। তিন দিনের দিন আবার তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।"**

(মার্ক ১০:৩৩-৩৪)

ইশাইয়া ৫৩ (৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, **কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না...**

(৭ আয়াত)

"রাতের বেলায় আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে আমি তাকিয়ে **ইব্‌নে-আদমের মত একজনকে আকাশের মেঘের মধ্যে আসতে দেখলাম। তিনি সেই বৃদ্ধ জনের কাছে এগিয়ে গেলে পর তাঁকে তাঁর সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সেই ইবনে আদমকে কর্তৃত্ব, সম্মান ও রাজত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হল যেন সমস্ত জাতির, দেশের ও ভাষার লোকেরা তাঁর সেবা করে। তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী; তা শেষ হবে না আর তাঁর রাজ্য কখনও ধ্বংস হবে না।** (দানিয়াল ৭:১৩-১৪, ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

জুলুম ও অন্যায় বিচার করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল ... যদিও তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি কিংবা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না। (৮-৯ আয়াত)

ইঞ্জিল শরীফ

তখন মহা-ইমাম সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন জবাবই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই লোকেরা এই সব কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?"

ঈসা কিন্তু জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইলেন।

মহা-ইমাম আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, **"তুমি কি গৌরবময় আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্‌?"**

ঈসা বললেন, "আমিই সেই। আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডান দিকে ইব্‌নে-আদমকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আসমানের মেঘের সংগে আসতে দেখবেন।"

এতে মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আর সাক্ষীর আমাদের কি দরকার? আপনারা তো শুনলেনই যে, ও কুফরী করল। আপনারা কি মনে করেন?"

তাঁরা সবাই ঈসাকে মৃত্যের শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন। তখন কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিলেন এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মেরে বললেন, "তুই না নবী? কিছু বল্ দেখি!" তারপর রক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে চড় মারতে লাগল। (মার্ক ১৪:৬০-৬৫)

জবুর শরীফ ২ (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

কেন অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে **সমস্ত জাতির লোক?** কেন লোকেরা মিছামিছি ষড়যন্ত্র করছে? মাবুদ ও তাঁর মসীহের বিরুদ্ধে **দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা একসংগে দাঁড়াচ্ছে আর শাসনকর্তারা করছে গোপন বৈঠক।**

(জবুর ২:১-২, (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

জবুর শরীফ ২২ (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

কিন্তু আমি তো কেবল একটা পোকা, মানুষ নই; লোকে আমাকে টিট্‌কারি দেয় আর মানুষ আমাকে তুচ্ছ করে। যারা আমাকে দেখে তারা সবাই আমাকে ঠাট্টা করে। তারা আমাকে মুখ ভেংগায়, আর মাথা নেড়ে ...

(৬-৭ আয়াত)

ইশাইয়া ৫৩ (৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন... (৩ আয়াত)

আমাদের গুনাহের জন্যই
তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে;

আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে

(৫ আয়াত)

কারণ **তিনি** নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন।
তাঁকে গুনাহ্‌ গারদের সংগে গোণা হয়েছিল;
(১২ আয়াত)

ইঞ্জিল শরীফ

তখন সেই সভার সকলে উঠে ঈসাকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের কাছে নিয়ে গেলেন...**শাসনকর্তা হেরোদের শাসনের অধীনে যে প্রদেশ আছে, ঈসা সেই জায়গার লোক জানতে পেরে পীলাত তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন... তখন হেরোদ ঈসাকে অপমান ও ঠাট্টা করলেন, আর তাঁর সৈন্যেরাও তা-ই করল। তার পরে ঈসাকে জমকালো একটা পোশাক পরিয়ে তিনি তাঁকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।**

(লূক ২৩:১,৭ক,১১)

তারা ঈসাকে গল্‌গথা, অর্থাৎ মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় নিয়ে গেল। পরে তারা ঈসাকে গন্ধরস মিশানো সিরকা খেতে দিল, কিন্তু তিনি তা খেলেন না।

এর পরে তারা ঈসাকে ক্রুশে দিল।

সৈন্যেরা তাঁর কাপড়-চোপড় ভাগ করবার জন্য গুলিবাঁট করে দেখতে চাইল কার ভাগ্যে কি পড়ে।

(মার্ক ১৫:২২-২৪)

তারা দু'জন ডাকাতকেও ঈসার সংগে ক্রুশে দিল, একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে। তাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হল: "তাঁকে অন্যায়কারীদের সংগে গোণা হল।"

যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে ঈসাকে ঠাট্টা করে বলল, "ওহে, তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেংগে আবার তিন দিনের মধ্যে তা তৈরী করতে পার!" এখন ক্রুশ থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা কর!"

জবুর শরীফ ২২ (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

"ও তো মাবুদের উপর ভরসা
করে, তাহলে তিনিই
ওকে রক্ষা করুন;

তিনিই ওকে উদ্ধার করুন,
কারণ ওর উপর তিনি সন্তুষ্ট।"

(৮ আয়াত)

আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্
আমার, কেন তুমি আমাকে
ত্যাগ করেছ? আমাকে রক্ষা না
করে, আমার কান্না-ভরা
মুনাজাত না শুনে, কেন তুমি
দূরে সরে রয়েছ? (১ আয়াত)

আমাকে পানির মত করে
ঢেলে ফেলা হয়েছে, আমার
সমস্ত হাড়ের জোড়া খুলে
গেছে... মাটির পাত্রের শুকনা
টুকরার মত আমার শক্তি
শুকিয়ে এসেছে, **আর আমার**
জিভ্ তালুতে লেগে যাচ্ছে...
(১৪ক-১৫ আয়াত)

"...আর পিপাসার সময়
দিয়েছিল সিরকা"

(জবুর ৬৯:২১)

ইশাইয়া ৫৩ (৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

আসলে মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে
তাঁকে চুরমার করেছিলেন
আর তাঁকে কষ্ট ভোগ
করিয়েছিলেন (১০ আয়াত)

ইঞ্জিল শরীফ

" প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরাও
ঈসাকে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে
লাগলেন, "ও অন্যদের রক্ষা করত,
নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। " ঐ
যে মসীহ্, বনি-ইসরাইলদের
বাদশাহ্ ! ক্রুশ থেকে ও নেমে
আসুক যেন আমরা দেখে ঈমান
আনতে পারি।"
ঈসার সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া
হয়েছিল তারাও তাঁকে টিটকারি
দিল।
পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা
তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার
হয়ে রইল। বেলা তিনটার সময় ঈসা
জোরে চিৎকার করে বললেন,
"এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী,"
অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্
আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ
করেছ?"
যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের
কয়েকজন এই কথা শুনে বলল,
"শোন, শোন, ও নবী ইলিয়াসকে
ডাকছে।"

(মার্ক ১৫:২৭-৩৫)

ঈসা বললেন, "আমার পিপাসা
পেয়েছে।" (ইউহোন্না
১৯:২৮)

তখন একজন লোক দৌড়ে গিয়ে
একটা স্পঞ্জ সিরকায় ভিজাল এবং
একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে তা
ঈসাকে খেতে দিল...

জবুর শরীফ ২২ (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

তুমি [আল্লাহ্] আমাকে কবরে শুইয়ে রেখেছ...

(১৫ আয়াত)

ইশাইয়া ৫৩ (৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

জুলুম ও অন্যায় বিচার করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়কার লোকদের মধ্যে কে খেয়াল করেছিল যে, আমার লোকদের গুনাহের জন্য তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে শেষ করে ফেলা হয়েছে?

তিনি অনেকের গুনাহ্ বহন করেছিলেন আর গুনাহ্ গারদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন

(৮ক ও ১২খ আয়াত)

তবুও দুষ্টদের সংগে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল আর মৃত্যুর দ্বারা **তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন**।

(৯ আয়াত)

ইঞ্জিল শরীফ

এর পরে ঈসা জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।

(মার্ক ১৫:৩৬-৩৮)

যখন সন্ধ্যা হয়ে আসল তখন অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে **ঈসার লাশটি চাইলেন।** তিনি মহাসভার একজন নাম-করা সদ্যে ছিলেন এবং তিনি নিজে আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পীলাত আশ্চর্য হলেন যে, ঈসা এত তাড়াতাড়ি মারা গেছে... যখন সেনাপতির কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছে তখন লাশটি ইউসুফকে দিলেন। **ইউসুফ... ঈসার লাশটি নামিয়ে সেই কাপড়ে জড়ালেন, আর পাহাড় কেটে তৈরী করা একটা কবরে সেই লাশটি রাখলেন।** তারপর তিনি কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। ঈসার লাশটি কোথায় রাখা হল তা মগ্‌দলীনী মরিয়ম ও ইউসুফের মা মরিয়ম দেখলেন।

(মার্ক ১৫:৪৩-৪৭)

ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ও এর পূর্ণতা

জবুর শরীফ ২২ (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

ভাইদের কাছে আমি তোমার বিষয় প্রচার করব আর সমাজের মধ্যে তোমার গুণগান করব।

(২২ আয়াত)

ইশাইয়া ৫৩ (৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

মাবুদের গোলাম যখন তাঁর
প্রাণকে দোষের কোরবানী
হিসাবে দেবেন

তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু বাড়ানো হবে,

(১০ আয়াত)

হযরত পৌলের সাক্ষ্য (৫৫ খ্রীষ্টপূর্ব)

আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদেরও দিয়েছি। সেই বিষয় হল এই- পাক-কিতাবের কথামত মসীহ্ আমাদের গুনাহের জন্য মরেছিলেন, তাঁকে দাফন করা হয়েছিল, কিতাবের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যি থেকে জীবিত করা হয়েছে, আর

১) তিনি পিতরকে ও

২) পরে তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন।

৩) এর পরে তিনি একই সময়ে পাঁচশোরও বেশী ভাইদের দেখা দিয়ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেলেও বেশীর ভাগ লোক এখনও বেঁচে আছেন।

৪) তার পরে তিনি ইয়াকুবকে

৫) ও পরে সব সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন।

(১ করিন্থীয় ১৫:৩-৭)

ওপরের বর্ণিত ঈসা মসীহের সাক্ষাত ছাড়াও, **ঈসা মসীহ্ নিজেকে** (৬) মগ্দলিনি মরিয়মকে দেখা দিয়েছিলেন। (ইউহোন্না ২০:১০-১৮) (৭) মরিয়মের সংগী আরেকজন মহিলাকে দেখা দিয়েছিলেন (মথি ২৮:৮-১০) (৮) ইম্মায়ু যাবার পথে দুইজন সাহাবীকে (লূক ২৪:১৩-৩২) (৯) মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার ১ সপ্তাহ পরে **হজরত থোমাকে** দেখা দিয়েছিলেন। (ইউহোন্না ২০:২৪-২৯) এর কিছু সময় পরে (১০) যেসব সাহাবীরা মাছ ধরতে গিয়েছিলেন ঈসা মসীহ্ মসীহ্ এমন **সাতজন সাহাবীকেও** দেখা দিয়েছিলেন (ইউহোন্না ২১)।

এখান থেকে আমরা দেখতে পাই ১০টি লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায যে, মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর ৪০ দিন সময় ধরে ঈসা মসীহ্ ৫০০০ এরও বেশী লোককে দেখা দিয়েছিলেন। (প্রেরিত ১:৩)।